ত্রয়োদশ ভাগ] [প্রথম সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ধর্ম্মমঙ্গল *

ধর্ম্মমঙ্গলকার কবি মাণিক গাঙ্গুলীর বংশাবলী এইরূপ—আদিপুরুষ গোপাল গাঙ্গুলী, তাঁহার বংশপর্য্যায় ২। সুদাম, ৩। অনন্তরাম, ৪। গদাধর, ৫। মাণিকরাম। গদাধরের ছয় পুত্র, তন্মধ্যে মাণিক সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, দ্বিতীয় দুর্গারাম, তৃতীয় মুক্তারাম, চতুর্থ ছকুরাম, পঞ্চম রামতনু, ষষ্ঠ নয়ান। কবির মাতার নাম কাত্যায়নী এবং কন্যার নাম অভয়া; তিনি ধর্ম্মঠাকুরের নিকট কাশীনাথ, বিশ্বনাথ ও রমানাথের জন্য শুভাশিষ প্রার্থনা করিয়াছেন (১১পৃঃ ৮২।৮৩ শ্লোক)। ইহাঁরা তাঁহার পুত্র কিংবা ভ্রাতুষ্পুত্র, তাহা ঠিক বলা যায় না। কবির জন্মস্থান "বেলডিহা" গ্রাম এবং এই পরিবারের কৌলিক উপাধি "গাঙ্গুলী", ইহাঁরা "বাঙ্গাল মেল"-ভুক্ত।

কবির পরিচয়।

অল্প বয়সে মাণিকরাম তুঙ্গাড়ি নামক স্থানে ন্যায়শাস্ত্র পাঠ করিতে গমন করেন, এক মাস না যাইতে যাইতেই তিনি একদা স্বপ্ন দেখেন, তাঁহার মাতার মৃত্যু হইয়াছে এবং একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাঁহাকে নানারূপ উপদেশ দিতেছেন। এই স্বপ্ন দেখিয়া তিনি বাড়ী যাইবার জন্য উৎসুক হইয়া পড়েন এবং ভট্টাচার্য্যের নিকট বিদায় লইয়া পরদিনই স্বগৃহাভিমুখে যাত্রা করেন। ছয়দণ্ড বেলার সময় কবি "বেতানল" নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া একটি নদী পার হন, কিন্তু দৈবক্রমে পথ হারাইয়া "খাঁটুল" নামক স্থানে পৌঁছিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়েন। খাঁটুল হইতে অনতিদূরে "দেশতলার মাঠে" এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়। ব্রাহ্মণের হস্তে একখানি "আশাবাড়ি" ছিল। ব্রাহ্মণ বড়ই শাস্ত্রজ্ঞ, তিনি কবিকে শাস্ত্র পড়াইতে সম্মত হন এবং আপনাকে "রঙ্গাপুরবাসী রাজধর বিদ্যাপতি" বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। কিন্তু কথা বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণ সহসা কোথায় চলিয়া গেলেন, কবি তাহা বুঝিতে পারিলেন না; কবি খুঙ্গিপুঁথি হস্তে এক বৃক্ষতলে বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় অপর একটি পণ্ডিত আসিয়া তাঁহার নিকট রাজধর বিদ্যাপতির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, শেষোক্ত

কবির আত্মপরিচয়।

* সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে যে ৺মাণিকরাম গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল প্রকাশিত হইয়াছে, এই প্রবন্ধটী তাহারই ভূমিকাস্বরূপ।—সা॰ প॰ প॰ সং।

পণ্ডিতটির "ধর্ম্মের পাদুকা দুটী বাঁধা আছে গলে"; কবির নিকট তাঁহার কথা শুনিয়া পণ্ডিতটি বলিলেন, "তুমি চিনিতে পার নাই, এই রাজধর বিদ্যাপতি আর কেহ নন, ইনি স্বয়ং ধর্ম্মঠাকুর, তুমি পুষ্করিণী হইতে পদ্ম আনিয়া তাঁহার পাদুকা পূজা কর।" সবিস্ময়ে কবি পদ্ম তুলিয়া আনিলেন, কিন্তু সহসা সেই সরসী, সেই পণ্ডিত ও পাদুকা কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল!

এই রহস্যে বিভোর কবি সন্ধ্যাকালে স্বীয় পল্লীতে উপস্থিত হইলেন; মধ্যে একটি দিন বিশ্রাম করিয়া কবি তৃতীয় দিবসে রঙ্গাপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন, হাজিপুর অতিক্রম করিয়া তারামণি নদীর তীরে উপনীত হইয়া কবি দেখিলেন, সেই "রাজধর বিদ্যাপতি" নামধেয় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পথে দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার হাতে সে "আশাবাড়ি"খানি নাই, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে একটি ভীষণ যষ্টি ধারণপূর্ব্বক যমসদৃশবেশে ব্রাহ্মণ তাঁহাকে মারিতে অগ্রসর হইতেছেন, যেন আশঙ্কায় কবির মুখ শুষ্ক হইয়া গেল, তিনি অনেক অনুনয় করিয়া বলিলেন, "আপনি ব্রাহ্মণ, দস্যুবৃত্তি আপনাতে শোভা পায় না।" অট্টহাস্য করিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিলেন, "স্বয়ং বাল্মীকি এই ভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিতেন, তাঁহার তুল্য ভাল ব্রাহ্মণ আর কে আছে?" তখন কবির দুইটি চক্ষু হইতে বিন্দু বিন্দু অশ্রু পতিত হইতে লাগিল এবং তিনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট কাতর ভাবে বলিতে লাগিলেন, "আপনার নিকট পাঠ লইবার জন্য আমি আসিয়াছি, আমার প্রতি নির্ম্মম হইবেন না।" তখন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মৃদুহাস্যের সহিত বলিলেন, "আমি হাজিপুর যাইতেছি, বিশেষ কার্য্য আছে, তুমি রঙ্গাপুরে যাইয়া আমার জন্য প্রতীক্ষা কর।"

এই কথায় আশ্বস্ত হইয়া কবি রঙ্গাপুরে গমন করেন, তথায় অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন, "রাজধর বিদ্যাপতি" নামক কোন ব্যক্তি সে গ্রামের অধিবাসী নন্—সমস্তই মিথ্যা। উৎকট মানসিক দুশ্চিন্তায় তাঁহার জ্বর হইল, তিনি বাড়ীতে ফিরিয়া রোগের শয্যায় পড়িয়া রহিলেন, তথায় ধর্ম্ম সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া তাঁহাকে ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করিতে আদেশ করেন; তিনি কবিকে নিজহস্তে বীজমন্ত্র নকল করিয়া দিলেন এবং তাহা দেখিয়া বার পালা গান রচনা করিতে উপদেশ দিয়া গেলেন। মাণিকরাম স্বকৃত ধর্ম্মমঙ্গল গানের জন্য একদল গায়কের সৃষ্টি করেন, তাঁহার চতুর্থ সহোদর ছকুরাম গাঙ্গুলী সেই দলের প্রধান গায়ক ছিলেন।

ধর্ম্মপালের ক্ষেত্রজ পুত্র গৌড়ের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, উপাখ্যান বর্ণিত ঘটনা তাঁহার রাজত্বকালে ঘটে। এই কাব্যে তিনি গৌড়েশ্বর নামেই পরিচিত, তাহার স্বতন্ত্র নাম প্রদত্ত হয় নাই; এই গৌড়াধিপের আশ্রিত সেবক সোমঘোষ রাঢ়স্থ অজয়নদের তীরবর্ত্তী ঢেকুর নামক স্থানে বিদ্রোহী হইয়া গৌড়ে কর প্রেরণ করিতে অস্বীকৃত হন।

গল্পসার।

সোমঘোষ প্রথমতঃ স্বয়ং গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে সাহসী ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার প্রবলপ্রতাপান্বিত পুত্র ইছাই ঘোষ প্রকাশ্যভাবে গৌড়েশ্বরের প্রেরিত দূতকে অবমাননা করিয়া ঢেকুর স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন। ইছাই ঘোষের বিরুদ্ধে বিপুল সৈন্যদল প্রেরিত

হয়, গৌড়ের অধীন অনেক রাজা এই সৈন্যসহ যোগদান করিয়া ইছাই ঘোষকে দমন করিতে ঢেকুরে গমন করেন। ময়নাগড়বাসী কর্ণসেন এই দলের অন্যতর অধিনায়ক ছিলেন। গৌড়ের সমস্ত সৈন্য ইছাইঘোষকর্ত্তৃক পরাস্ত হয়। বৃদ্ধ কর্ণসেনের চারিপুত্র এই যুদ্ধে নিহত হয়; পুত্রশোকে কর্ণসেনের পত্নী প্রাণত্যাগ করেন, কর্ণসেন সন্ন্যাসীর বেশে গৌড়েশ্বরের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার দুঃখকাহিনী জ্ঞাপন করেন। গৌড়াধিপের রঞ্জাবতী-নাম্নী এক সুন্দরী শ্যালিকা ছিল, বৃদ্ধ কর্ণসেনকে রাজার অনুরোধে তাহাকে বিবাহ করিতে হইল। রঞ্জার সহোদর ভ্রাতা গৌড়েশ্বরের শ্যালক মহামদ এই সময় গৌড়ের মহাপাত্রের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন; বৃদ্ধের সঙ্গে রঞ্জাবতীর বিবাহ মহামদের অপ্রীতিকর হইবে, এই আশঙ্কায় রাজা তাঁহার অজ্ঞাতসারে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। বিবাহান্তে মহামদ এই ঘটনা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং কৌশলক্রমে কর্ণসেনকে গৌড় হইতে দূর করিয়া দেন, কিন্তু রঞ্জাবতী বৃদ্ধ স্বামীর পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক ভ্রাতার অমতে স্বামীসহ ময়নাগড়ে পলায়ন করিলে মহাপাত্রের ক্রোধের সীমা রহিল না। তিনি স্বীয় ভগিনীর উপরিই বিশেষ ভাবে ক্রুদ্ধ হইলেন, তিনি রঞ্জাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, সে চিরবন্ধ্যা হইয়া থাকিবে। মহামদের এই ক্রোধজনিত নানা প্রকার দুষ্ট অভিসন্ধিই ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্যের ভিত্তি।

ময়নাগড়ে উপনীত হইয়া রঞ্জাবতী পুত্র-লাভের আশায় নানারূপ কৃচ্ছ্র সাধন করেন, পুত্র প্রার্থনা করিয়া তিনি ধর্ম্মসেবায় প্রাণ পর্য্যন্ত প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া কাব্যভাগে বর্ণিত আছে, ধর্ম্মের কৃপায় তাঁহার পুনর্জ্জীবন লাভ হয় এবং তিনি অভীষ্ট বর লাভ করেন। অচিরাৎ তিনি পুত্রবতী হইয়া ভ্রাতার অভিশাপ বিফল করিয়া ফেলেন। এই পুত্রের নাম লাউসেন, ইনিই ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের প্রধান নায়ক। এই পুত্রলাভের শুভসংবাদ গৌড়েশ্বরের নিকট প্রেরিত হইল, রাজা ও রাণী এই সংবাদে বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু নবজাত শিশুর মাতুল মহামদের বিদ্বেষ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। মহাপাত্র চক্রান্ত করিয়া ভিদা নামক এক চোরকে ময়নাগড়ে প্রেরণ করেন,—চোর অপগণ্ড শিশুটিকে চুরি করিয়া গৌড়াভিমুখে প্রস্থান করে। কিন্তু ধর্ম্মঠাকুরের কৃপায় হনুমানের দ্বারা সেই শিশু পুনর্ব্বার মাতৃক্রোড়ে আনীত হয়, অধিকন্তু রঞ্জাবতী এই উপলক্ষে ধর্ম্মঠাকুরের সৃষ্ট আর একটী শিশু লাভ করেন, তাহার নাম কর্পূর। এই শিশুটিকেও রঞ্জাবতী ঠিক গর্ভজ পুত্র লাউসেনের ন্যায় যত্নে লালন পালন করেন। কুমারদ্বয় পাণিনি ও কলাপ-ব্যাকরণ পাঠ করিয়া ভারবি, ভট্টি প্রভৃতি কবির কাব্য ও পিঙ্গলকৃত ছন্দঃশাস্ত্রে অচিরে ব্যুৎপন্ন হইলেন। ধর্ম্মঠাকুরের আদেশে হনুমান্ বৃদ্ধ মল্লবেশে উপস্থিত হইয়া লাউসেনকে যুদ্ধবিদ্যা-শিক্ষা প্রদান করেন। লাউসেন চণ্ডীদেবীর নিকট খড়্গ লাভ করেন ও সেই খড়্গের জন্য অপূর্ব্ব কারুকার্য্যখচিত একখানি ফলা বা বাট বিশ্বকর্ম্মা নিজে নির্ম্মাণ করিয়া দেন। কুমারদ্বয় গৌড়ে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া অনুমতি প্রার্থনায় গৌড়েশ্বরের নিকট দূত প্রেরণ করেন। মহাপাত্র মহামদ গৌড়ের প্রধান মল্ল সারঙ্গধর ও তাঁহার ভ্রাতাদিগকে ময়নাগড়ে যাইয়া গোপনে লাউসেনকে বধ করিতে নিযুক্ত করেন।

কর্পূর ভয়ে পলাইয়া যায় এবং লাউসেন মল্ল সারঙ্গধর কর্ত্তৃক বিষম আহত হইয়া জড়বৎ পড়িয়া থাকেন। এই অবস্থায় ধর্ম্মের আদেশে হনুমান্ আসিয়া লাউসেনকে নিরাময় করিয়া দেন। লাউসেন স্বাস্থ্যলাভ করিয়া এবার সারঙ্গধর ও তাহার সপ্তভ্রাতাকে নিহত করেন, কিন্তু রঞ্জাবতীর আদেশে ধর্ম্মঠাকুরের কৃপায় লাউসেন নিহত মল্লগণকে পুনর্জ্জীবিত করিতে সমর্থ হন। তৎপর দুইভ্রাতা গৌড়োদ্দেশে যাত্রা করেন, যাত্রাকালে দৈবজ্ঞ শুভদিনের জন্য একবৎসর প্রতীক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু লাউসেন এই গণনা অগ্রাহ্য করিয়া ময়নাগড় পরিত্যাগ করিয়া, উষৎপুর, পদুমা, উচানন, বীরহাট, বর্দ্ধমান, যশোর, জগৎবাটী প্রভৃতি স্থান অতিক্রমপূর্ব্বক জলন্ধরগড়ে উপস্থিত হন। কর্পূর যুদ্ধাদি ব্যাপারে সর্ব্বদা পরাঙ্মুখ, কিন্তু সে সমস্ত দেশের বিবরণ জানিত এবং প্রতিপাদক্ষেপে লাউসেনকে সতর্ক করিয়া দিত। জলন্ধরগড়ে এক ব্যাঘ্র রাজত্ব করিতেছিল, ইন্দ্রপুত্র শ্রীধর শাপবশতঃ ব্যাঘ্রদেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জলন্ধরগড়াধিপ জাল্লানশিখর এই ব্যাঘ্রশাবকের মাতাকে নিহত করিয়া ইহাকে অতি যত্নে পালন করেন; কিন্তু ব্যাঘ্রশাবক শেষে তাঁহার অদম্য হইয়া পড়ে এবং সেই বৃহৎ জনপদকে মনুষ্যশূন্য অরণ্যে পরিণত করিয়া নিজেই তথায় প্রভুত্ব করিতে থাকে। লাউসেন ব্যাঘ্রকে বধ করিতে ইচ্ছাপ্রকাশ করিলে, কর্পূর তাঁহাকে এই অসীম সাহসিকতার জন্য অনেক ভর্ৎসনা করে, কিন্তু লাউসেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে তৎকার্য্যে অগ্রসর হইলে কর্পূর লুকাইয়া আত্মরক্ষা করেন। লাউসেন ব্যাঘ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া হনুমানের সাহায্যে তাহার বধসাধন করেন এবং ভ্রাতার সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া পুনশ্চ গৌড়োদ্দেশে যাত্রা করেন। পথে কোন বৃহৎ দীর্ঘিকায় একটি ভীষণ কুম্ভীর পরিদৃষ্ট হয়, এই কুম্ভীর ইন্দ্রের সভার শাপভ্রষ্ট নর্ত্তক হীরাধর; লাউসেনের হস্তে কুম্ভীর নিহত হয়।

কুম্ভীর গন্ধর্ব্বদেহ প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে গমন করিলে পর ভ্রাতৃদ্বয় তথা হইতে পুনঃ পথপর্য্যটন আরম্ভ করেন; বারুইগণের প্রতিষ্ঠিত জামাতিনগরে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা আর এক বিপদে পতিত হন। সেখানকার রমণীগণ অতিশয় দুশ্চরিত্রা ছিল, তাহারা তাহাদের স্বামিগণকে অগ্রাহ্য করিয়া যথেচ্ছাচার অবলম্বনপূর্ব্বক জীবন যাপন করিত; এই বারুই মহিলাকুলের অগ্রগণ্যা ছিল—নারায়ণ বারুয়ের স্ত্রী নয়ানসুন্দরী। এই দুষ্টানারী তাহার সঙ্গিনীগণের সঙ্গে লাউসেন ও কর্পূরের নিকট উপযাচিকা হইয়া উপস্থিত হয়; লাউসেনের গঞ্জনাপূর্ণ প্রত্যাখ্যানে অপমানিত হইয়া নয়ানসুন্দরী তাহার কক্ষস্থ শিশুকে স্বয়ং হত্যা করিয়া রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত করে। লাউসেন তাহার পুত্রের হত্যাকারী, তথাকার রাজা এই অভিযোগ শ্রবণমাত্র কোন বিচার না করিয়া লাউসেনকে বন্দী করেন—তাঁহার বক্ষস্থলে এক জগদ্দলপ্রস্তরখণ্ড চাপাইয়া তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করা হয়; এস্থলে বলা উচিত, কর্পূর বিপদের সূচনাতেই পলাতক হইয়াছিল; এই বিপৎকালে হনুমান্ আসিয়া তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করেন এবং লাউসেনকে অচিরাৎ মুক্তি দিবার জন্য রাজাকে স্বপ্নে আদেশ করেন।

ধর্ম্মের ক্রোধে ময়ানীর পতি-পুত্র সকলের মৃত্যু হয়; লাউসেন মুক্ত হইয়া ইহাদিগকে পুনর্জীবন দান করেন, কিন্তু সেইস্থান ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে ময়ানীর নাসিকা এবং কর্ণচ্ছেদন করিয়া বিকৃত করেন। তৎপর কর্পূরের সঙ্গে সম্মিলিত লাউসেন সুরিক্ষার পাট নামক স্থানে উপস্থিত হন, সুরিক্ষা সেই দেশের রাণী, কিন্তু গণিকাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক কত রাজা ও রাজপুত্রের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই; কর্পূর লাউসেনকে বিশেষরূপে সাবধান করেন, গণিকা রাণীর সংস্পর্শে আসা ও তাহার হাতের অন্ন খাওয়ার আশঙ্কায় কর্পূর পলাতক হন, কিন্তু লাউসেন সেই মায়াবিনীর চক্রান্তে পড়িয়া দরবারে আনীত হন এবং কতকগুলি সমস্যার উত্তর না দিতে পারিলে সেই গণিকার হাতের অন্ন তাঁহাকে আহার করিতে হইবে এবং তাহার অধীন হইয়া সেই রাজ্যে বাস করিতে হইবে, এই আদেশ প্রচারিত হয়। প্রায় সকলগুলি সমস্যারই সদুত্তর লাউসেন করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ সমস্যাটির উত্তর দিতে না পারিয়া লাউসেনকে গণিকা-রাণীর অন্ন আহার করিতে প্রস্তুত হইতে হয়; এই বিপদে লাউসেন মুহূর্ত্তকাল নিতান্ত আর্ত্তভাবে ধর্ম্মঠাকুরকে স্মরণ করাতে হনুমান্ আসিয়া চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতেই সূর্য্যকে পূর্ব্বাকাশে উদিত করাইয়া সুরিক্ষার অন্নাহাররূপ বিপদ্ হইতে তাঁহাকে অব্যাহতি দেন। তৎপর সুরিক্ষার শেষ সমস্যার সদুত্তর প্রদান করিয়া তাহারও নাসাকর্ণচ্ছেদনপূর্ব্বক তথা হইতে গৌড়ে যাত্রা করেন। তৎপরে দুই ভ্রাতা গৌড়ে উপস্থিত হইলে, মহামদ পাত্র জানিতে পারিয়া, তাহারা তস্কর এই মিথ্যা সংবাদ রটনা করিয়া দেয়; কর্পূর ভয়ে পলাইয়া এক ময়রার বাড়ীতে অপত্যস্নেহে গৃহীত হয়; লাউসেনকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে একটি হস্তী প্রেরিত হয়। হস্তী লাউসেনকে হত্যা না করিয়া মাহুতকে হত্যা করে, তৎপর মহামদকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া কোটাল লাউসেনকে তস্করের ন্যায় রাজদরবারে উপস্থিত করে। লাউসেন স্বীয় পরিচয় প্রদান করিলে রাজা তাহাকে মহাসমাদরের সহিত গ্রহণ করেন, কিন্তু মহামদ লাউসেন কখনই কর্ণসেন ও রঞ্জার পুত্র নহে এবং তদ্বর্ণিত পথের বীরত্ব ও পৌরুষের কাহিনী সর্ব্বৈব কল্পনামূলক ও মিথ্যা, এই তর্ক উপস্থিত করিয়া রাজাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করে, কিন্তু লাউসেন অকাট্য প্রমাণ সমস্ত উপস্থিত করেন এবং স্বীয় বীরত্ব প্রদর্শন উপলক্ষে একটি বৃহদাকার হস্তীকে বধ করিয়া পুনরায় তাহার প্রাণদান করেন, তখন মাতুল মহাশয় নিরুত্তর হইয়া পড়েন, কিন্তু লাউসেন তাঁহাকে প্রণাম না করাতে, রাজার নিকট বিচারপ্রার্থী হন। লাউসেন বলেন, ধর্ম্মঠাকুর ও রাজা ব্যতীত তিনি যাহাকে প্রণাম করিবেন, সেই ভস্মীভূত হইবে, এই কথা সপ্রমাণ করিয়া দেখাইলে মহামদ পাত্র সভয়ে তাঁহার দিকে তাকাইয়া বলিলেন—প্রমাণ করিয়া কাজ নাই "অম্‌নি আশিষ করি কল্যাণে থাকিবে।"

কর্পূর এই সময় উপস্থিত হইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে রাজকীয় প্রসাদ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। রাজা নয় লক্ষ টাকা আয়ের সমস্ত ময়নাগড়রাজ্যের আধিপত্য লাউসেনকে প্রদান করেন, এ বিষয়েও মহামদ বাদী হইয়াছিলেন, কিন্তু রাজাদেশ পরিবর্ত্তিত হইল না; কিন্তু

তাঁহার চক্রান্তে একটা ক্ষেপা ঘোড়া লাউসেনকে প্রদত্ত হইল; এই ঘোড়া লাউসেনের কাছে আসিয়া অতি অপূর্ব্ব তেজ ও বশ্যতা প্রদর্শন করিয়া মাতুলের অভিসন্ধি ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিল। রাজা ও রাণীর নানা প্রকার প্রসাদচিহ্নে অভিনন্দিত হইয়া লাউসেন ও কর্পূর স্বগৃহাভিমুখে যাত্রা করেন, পথে কালু ও তাহার প্রতিবাসী সঙ্গী ১৩ ঘর ডোম লাউসেনের সঙ্গী হইল। ইহারাই উত্তরকালে লাউসেনের অজেয় সৈন্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলস্বরূপ হইয়াছিল; তৎপর এক ব্যক্তির নিকট হইতে দৈবশক্তিসম্পন্ন সারীশুক ক্রয় করিয়া তাঁহারা সঙ্গে লইয়া যান, নিম্নলিখিত স্থানগুলি অতিক্রম করিয়া তাঁহারা ময়নাগড়ে উপনীত হন—গোলাহাট, জামাতি, পুরাণপুর পঞ্চকেলিসার, বর্দ্ধমান, পদুমা, রাঙ্গামাটী, গোলপুর, গড়মন্দারণ, উষৎপুর, বসুবাটী—তৎপরে ময়নাগড়। গৃহে প্রত্যাগত হইয়া ইহারা পিতামাতার আদরে কিছুকাল সুখসম্ভোগ করেন, কিন্তু মহামদ পাত্রের চক্রান্তে সেই সুখ অধিককাল স্থায়ী হইল না; কাঙুর বা কামরূপের অধিপতি কর্পূরধল গৌড়েশ্বরের কর দেওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে গৌড়াধিপ আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই। সম্প্রতি লাউসেন রাজাকে প্রবর্ত্তিত করিয়া লাউসেনকে কাঙুর জয় করিতে অচিরাৎ গমন করিবার জন্য আদেশ পাঠাইয়া দিলেন। লাউসেন কর্পূরধলকে দমন করিতে স্বীয় ডোমসৈন্য লইয়া কাঙুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন, কাবেরী পার হইয়া কামতার গড় এবং তৎপরে গণ্ডকী নদীর পর পারে যাইয়া দেউলদীঘীর তীরে উপস্থিত হন, তথা হইতে কাঙুরে উপনীত হইয়া কর্পূরধলের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, গৌড়েশ্বরের মাতা সফুল্লার নিকট এক অজেয় কাটারি ছিল, তাহা হস্তগত না হইলে কর্পূরধলের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয় লাভ করা অসম্ভব। ধর্ম্মঠাকুরের আদেশে হনুমান্ সেই কাটারি লইয়া আসিয়া লাউসেনকে প্রদান করেন, এই উপলক্ষে ধর্ম্মপালের স্ত্রী সফুল্লার কি ঘটনায় ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহার একটি কৌতূহলোদ্দীপক আখ্যায়িকা আছে। কাটারি প্রাপ্ত হওয়ায় পরে—লাউসেনের সেনাপতি কালুডোমের হস্তে কর্পূরধল সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন, তৎপর কর্পূরধল গৌড়ের সমস্ত বাকী কর প্রদান করিয়া স্বীয় কন্যা কলিঙ্গাকে লাউসেনের হস্তে প্রদান করেন; যখন নবপরিণীত লাউসেন জয়লাভ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছিলেন, তখন বর্দ্ধমানের রাজা কালিদাস তাঁহার দুই কন্যাকে লাউসেনের হস্তে সমর্পণ করেন, তিন স্ত্রী সঙ্গে করিয়া লাউসেন স্বগৃহে প্রত্যাগমন করেন। সেই সময় গৌড়ে আর একটি ঘটনা ঘটে; হীরা নামক এক নর্ত্তকী গৌড়েশ্বরের সভায় নৃত্য ও গীতদ্বারা সৌন্দর্য্যের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে; রাজা এই তরুণীর রূপে মুগ্ধ হইয়া পড়েন। কিন্তু তাহার সচিবগণ, গণিকার প্রতি এই ভাব তাঁহার যোগ্য নহে—বহু উপদেশ দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন করেন, এবং এতদুপলক্ষে শিমুল্যার রাজা হরিপালের কন্যা কাণড়ার রূপ গুণের বিষয় রাজার নিকট উল্লেখ করেন। যদি রাজা এই তরুণী রাজকুমারীকে বিবাহ করেন, তবে তাহার সৌন্দর্য্যলিপ্সা চরিতার্থ হইতে পারে, অথচ রাজপদের অযোগ্য দুর্নীত আমোদ হইতে তিনি আত্মগৌরব রক্ষা করিতে পারেন। এই উপদেশানুসারে রাজা হরিপালের নিকট তৎকন্যা কাণড়ার পাণিগ্রহণ প্রার্থনা

করিয়া দূত প্রেরণ করেন—কাণড়া চণ্ডীর সেবা করিয়া অপূর্ব্ব শক্তিলাভ করিয়াছিলেন, গৌড়েশ্বরের বিরাগের ভয়ে যখন হরিপাল ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, তখন কন্যা কাণড়া রাজ-প্রেরিত গঙ্গাধর ভাটকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিয়া তাড়াইয়া দেন; এই সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া গৌড়েশ্বর নয়লক্ষ সৈন্যের সঙ্গে হরিপালের রাজধানী শিমুল্যা নগরী অবরোধ করেন। পত্রে মহামদের উপদেশানুসারে রাজা অধিবাসের উপবাস করিয়া হাতে সূতা বাঁধিয়া শিমুল্যায় উপস্থিত হন, হরিপালকে পরাভূত করিয়া সেই দিনই কাণড়াকে বিবাহ করিবেন, এই সংকল্প করেন। শিমুল্যায় উপস্থিত হইলে কাণড়া দেবীপ্রদত্ত লৌহগণ্ডা পাঠাইয়া রাজাকে বলিয়া পাঠান, সেই গণ্ডা যে দ্বিখণ্ডিত করিতে পারিবে, সেই তাঁহার পাণিগ্রহণ করিবে। বৃদ্ধ রাজা গণ্ডা কর্ত্তন করিতে যাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পাত্র মহামদেরও দুর্দ্দশার চূড়ান্ত হইল, অবশেষে পাত্রের মন্ত্রণায় রাজা ময়নাগড় হইতে লাউসেনকে দূত পাঠাইয়া তথায় উপস্থিত করাইলেন, লাউসেন হনুমানের প্রসাদে অনায়াসে গণ্ডাটি দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন, কাণড়া তাঁহাকেই বরমাল্য প্রদান করিলেন; এই ঘটনায় মহামদ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা পান, যে কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য রাজা স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাকে কোন্ বিচারে লাউসেন বিবাহ করিলেন। রাজার সৈন্য শিমুল্যা ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হয়—কিন্তু কাণড়া স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া রণরঙ্গিণী বেশে রাজসৈন্যকে দলন করিতে লাগিলেন, চণ্ডীর প্রভাবে কেহই তাহার সহিত সমকক্ষতা করিতে সাহসী হইল না, তখন লাউসেনের সঙ্গে কাণড়ার যুদ্ধ বাধিয়া গেল, কিন্তু দেবীর প্রসাদে দম্পতীর পরস্পরের হস্তনিক্ষিপ্ত অস্ত্রগুলি কুসুম কোমল হইয়া পরস্পরকে স্পর্শ করিল। মহামদের দুরভিসন্ধি সমস্ত ব্যর্থ হইয়া গেল, রাজা লাউসেনকে আদরের সহিত অভিনন্দন করিয়া লইলেন। কাণড়াকে লইয়া লাউসেন স্বগৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

মহামদ এবার যে কোন প্রকারে হউক ভাগিনেয়কে নিহত করিবার সঙ্কল্প স্থির করিতে লাগিল। যে ইছাই ঘোষের হস্তে একদা গৌড়েশ্বরের সমস্ত সৈন্য পরাভূত হইয়াছে, কর্ণসেন স্বয়ং একবার যাহার দ্বারা নির্ব্বংশ হইয়াছিলেন, সেই ইছাই ঘোষের বিরুদ্ধে লাউসেনকে পাঠাইতে পারিলে তাহার আর ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং মহামদ রাজাকে বুঝাইল, লাউসেন অমিতবলসম্পন্ন, ইছাই ঘোষকে দমন করা তাঁহার পক্ষে সহজ। রাজা লাউসেনকে চিঠি পাঠাইলেন—ইছাই ঘোষের নিকট হইতে বাকী কর আদায় করিয়া গৌড়ে শীঘ্র পাঠাইতে হইবে। লাউসেন এই চিঠি পাইয়া ঢেকুরে রওনা হইলেন; ঢেকুর-যাত্রার সময় কর্ণসেন ও রঞ্জাবতী লাউসেনকে অনেকবার বারণ করিয়াছিলেন, এই ঢেকুরে একবার কর্ণসেনের সর্ব্বনাশ হয়, কিন্তু লাউসেন পিতামাতাকে প্রবোধ দান করিয়া ইছাইকে হত্যা করিয়া পূর্ব্ব অপকারের প্রতিশোধ লইতে কৃতনিশ্চয় হইয়া চলিয়া গেলেন; প্রহ্লাদপাড়া, শিবপুর, সাতগেছে, নিধুবাটী প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া অজয়নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন, অজয় উত্তীর্ণ হইয়াই ঢেকুর। তথায় কালিকার বরে অপ্রমিত বলসম্পন্ন ইছাই

একাধিপত্য করিতেছিলেন। প্রথম যুদ্ধ ইছাই ঘোষের সেনাপতি লোহাটার সঙ্গে, লোহাটা নিহত হইল; ইছাই লাউসেনের সেনাপতি কালুকে বধ করিয়া শত্রুসৈনা দলিত করিতে লাগিলেন, লাউসেন ঘোরতর যুদ্ধে যতবার ইছাই ঘোষের মস্তক ছেদন করিলেন, ততবারই উহা চণ্ডী দেবী যথাস্থানে স্থাপন করিয়া ইছাই ঘোষের পুনর্জ্জীবন সঞ্চার করিয়া দিতে লাগিলেন। ইছাই ঘোষ লাউসেনের একটা মায়ামুণ্ড নির্ম্মাণ করাইয়া ময়নাগড়ে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন—ময়নাগড়ে লাউসেনের মৃত্যু সংবাদ রটিত হইলে তাঁহার চারি পত্নী অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কিন্তু ধর্ম্মঠাকুর স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে আশ্বাস দিলেন—লাউসেনের মৃত্যুসংবাদ মিথ্যা। এদিকে লাউসেন ইছাই ঘোষকে কোনও রূপেই বধ করিতে সমর্থ হইলেন না, তাহার কর্ত্তিত মস্তক যেখানে যে ভাবে থাকে, তাহা কোন জীবের উদরস্থ হয়, কিংবা অন্য কোনরূপ দুর্গতি প্রাপ্ত হয়—চণ্ডী তাহার অণুপরমাণু লইয়া পুনর্জ্জীবন সঞ্চার করিয়া দেন; দেবগণ লাউসেনের পক্ষে নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন, কিন্তু চণ্ডী তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টা বারংবার ব্যর্থ করিয়া দিলেন। শেষবার দেবতারা ইছাই ঘোষের মস্তক লইয়া বিষ্ণুপাদমূলে নিক্ষেপ করিলেন, ইছাই ঘোষের মুক্তি হইয়া গেল, এবার চণ্ডী নিরুপায় হইয়া ক্রোধে লাউসেনকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু কাণড়া তাঁহার দাসী, লাউসেন তাঁহারই স্বামী, এই কথা স্মরণ করিয়া লাউসেনকে বিনষ্ট করিলেন না।

ধর্ম্মঠাকুরের কৃপায় কালু প্রভৃতি নিহত ডোমগণ পুনরায় জীবন লাভ করিল। লাউসেন ইছাই ঘোষকে বধ করিয়াছেন এবং ঢেকুরের সমস্ত কর আদায় করিয়া দিয়াছেন, মহামদের নিকট এই সংবাদ বজ্রাঘাতের মত বোধ হইল। উপায়ান্তর না পাইয়া মহাপাত্র রাজাকে বলিল, ধর্ম্মঠাকুরকে পূজা করা যাক্, ধর্ম্মকে পূজা করিয়াই লাউসেন এইরূপ জয়ী হইতে পারিয়াছে, এই পূজা আমরা করিলেও তাহারই মত হইতে পারিব। বিরাট্ আয়োজনে ধর্ম্মের পূজা আরব্ধ হইল, মহাপাত্র ধর্ম্মের নিকট কায়মনোবাক্যে লাউসেনের মৃত্যু প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ধর্ম্মঠাকুর ক্রুদ্ধ হইয়া গৌড়ে এরূপ ভয়ানক বাদলের সৃষ্টি করিলেন, যে গৌড়ের সর্ব্বস্ব ভাসিয়া যাইবার মুখে আসিল, সমস্ত পূজার আয়োজন নষ্ট হইয়া গেল। গৌড়ের রক্ষার উপায় না দেখিয়া মহামদ লাউসেনকে ময়নাগড় হইতে সংবাদ দিয়া আনাইলেন। ধর্ম্মপূজার ব্যাঘাত হইয়াছে, ইহার প্রায়শ্চিত্তের জন্য হাকণ্ড নামক স্থানে উৎকট তপশ্চরণের দ্বারা সূর্য্যদেবকে পশ্চিমে উদয় করাইতে হইবে, ইহা বুঝাইয়া রাজার নিকট হইতে লাউসেনের হাকণ্ডে গমনের আদেশপত্র বাহির করিলেন। সে বড় দুশ্চর, উৎকট তপস্যা। নিজের প্রত্যেক অঙ্গ স্বহস্তে ছেদনপূর্ব্বক এই তপস্যা করিতে হইবে, যাহা কিছু শুনিলে মানুষ ভয়ে শিহরিয়া উঠে, তাহার সমস্তই সেই উৎকট তপস্যার নিয়মাবলীর অন্তর্ভুক্ত। লাউসেন এই মহা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া পবিত্র ধর্ম্মব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক হাকণ্ডে যাত্রা করিলেন। এদিকে মহামদ সুযোগ পাইয়া লাউসেনের পিতা কর্ণসেন, মাতা রঞ্জাবতী ও ভ্রাতা কর্পূরকে ময়নাগড়

হইতে গৌড়ে আনাইয়া কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন এবং বহুসৈন্য সমভিব্যাহারে স্বয়ং যাইয়া ময়নাগড় অবরোধ করিলেন। কালুর স্ত্রী লখ্যা অপূর্ব্ব বীরত্ব দেখাইয়া পতিপুত্রকে যুদ্ধে উদ্বোধিত করিল। তাহার পুত্র শাখা মহামদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিল, কালু স্বয়ং সত্যের এক অভিসন্ধিতে পড়িয়া স্বীয় জীবন সমর্পণ করিল; তখন ডোমরমণী লখ্যা স্বামিপুত্রের মস্তক লইয়া যাইয়া লাউসেনের পত্নীদিগকে জানাইল, তাঁহাদের যাহা কর্ত্তব্য, লাউসেনের লবণের ঋণ শোধ করিবার জন্য তাহারা তাহা করিয়াছে, এখন তাহাদের শক্তি নাই, উপায়ান্তর থাকিলে রাণীগণের এখন তাহা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। রাণী কলিঙ্গা যুদ্ধে যাইয়া নিহত হইলেন, কিন্তু কালীর বরে কাণড়া শত্রুসৈন্যের উপর এক ঘূর্ণাবর্ত্তের ন্যায় পড়িয়া তাহা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন. পদুমার বিলের তীরে মহামদ সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইলেন; কাণড়া শ্বশুর মহাশয়কে অপমানিত করিয়া তাহার শিরোমুণ্ডন ও সমস্ত দেহে কালী লিপ্ত করিয়া পদুমার বিলের অপর তীরে পাঠাইয়া দিলেন; হনুমান্ দৈবজ্ঞের বেশ ধারণ করিয়া মহাপাত্রের বাড়ী উপস্থিত হইয়া জানাইলেন, সেইদিন সন্ধ্যাকালে একটা অপূর্ব্বমূর্ত্তির ভূত সেই বাড়ীতে আসিবে, সে যেন বাড়ীতে প্রবেশ করিতে না পারে, প্রবেশ করিলে বিশেষ অমঙ্গল। মহামদ সন্ধ্যার আঁধারে যেমনই বাড়ীতে প্রবেশ করিবেন, তেমনই তাহার পুত্রগণ আসিয়া তদবস্থায় তাহাকে চিনিতে না পারিয়া বিষম প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিল।

মহামদ রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং জানাইলেন, ময়নাগড়ে তাঁহার সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছে। এদিকে লাউসেন সামুলার উপদেশানুসারে হাকণ্ডে অতি কঠোর তপশ্চরণ করিলেন, নিজের অঙ্গ বলিস্বরূপ দান করিয়া ধর্ম্মঠাকুরের তপস্যা করিলেন। দীর্ঘকালের কৃচ্ছ্র ও তপশ্চর্য্যার পুণ্যে সহসা অস্তগিরি হইতে সূর্য্যদেব একদা প্রফুল্ল হইয়া উদয় হইলেন। বীর হনুমানের চেষ্টায় এই অসম্ভব ব্যাপার সিদ্ধ হইল। যখন মহামদ নানারূপে ব্যর্থমনোরথ হইয়া লাউসেনের উপর ক্রোধে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছিলেন, তখন সহসা একদিন গৌড়বাসিগণ দেখিতে পাইলেন, পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উদয় হইয়া শ্যামল শস্যগুলির উপর স্বর্ণ ফলাইয়া তুলিয়াছেন। তখন সেই হাকণ্ডপ্রবাসী বীরবরের প্রতি সমস্ত লোকের গভীর কৃতজ্ঞতা অর্পিত হইতে লাগিল।

এদিকে লাউসেনের শুকপাখী হাকণ্ডে যাইয়া তাহাকে সংবাদ দিল, কালু প্রভৃতি ডোমগণ মহাপাত্রের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হইয়াছে এবং তাঁহার প্রাণপ্রিয়া রাণী কলিঙ্গাও যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। জয়ী ও তপঃসিদ্ধ বীরের পাদক্ষেপ বিষাদে মন্থর হইল; গভীর শোক অন্তরে ধারণ করিয়া কিন্তু বাহ্যে বিকারের চিহ্নমাত্র না দেখাইয়া লাউসেন গৌড়ের অভিমুখে যাত্রা করিলেন; পথে মহাপাত্র তাঁহাকে তস্কর বলিয়া ধৃত করাইয়া বাশুলিদেবীর নিকট তাহাকে বলিস্বরূপ দিতে চক্রান্ত করিয়াছিলেন। সেই বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইয়া লাউসেন গৌড়েশ্বরের সভায় উপস্থিত হইলেন। তিনি হাকণ্ডে যে দুশ্চর তপস্যা সাধন করিয়া সূর্য্যদেবকে পশ্চিমে উদিত করাইয়াছেন, তাহা বলাতে মহাপাত্র সে সকল কথা

আদৌ বিশ্বাস করিলেন না এবং রাজাকেও তাহার মতাবলম্বী করিতে চেষ্টিত হইলেন; সূর্য্য পশ্চিমে উদয় হইয়াছিল, তাহার সাক্ষ্য দিবার জন্য হরিহর নামক এক ব্যক্তিকে আহ্বান করা হইল, মহাপাত্র হরিহর বাইতিকে ২০০৲ টাকা এবং ১২ খানি মোহর ঘুষ দিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে সম্মত করাইল; কিন্তু হরিহরের অন্তঃপুরের স্ত্রীলোকগণ রাজসভায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে তাহাদের সর্ব্বনাশ হইবে, এই বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। হরিহর মহাপাত্রের টাকা খাইয়াছে, কি করিবে—তাহাকে মিথ্যাসাক্ষ্য দিতেই হইবে; রাজসভায় হরিহর বাইতি ইষ্টনাম জপ করিতে করিতে উপস্থিত হইল, কিন্তু সে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে পারিল না, তাহার গৃহের রমণীগণের বিলাপধ্বনি—তাহার স্বীয় অনুতাপকে ঘনীভূত করিয়া তুলিল। ঠিক সময়ে সে মিথ্যা বলিতে যাইয়া সত্য বলিয়া ফেলিল, মহামদের মুখখানি মলিন ও নিষ্প্রভ হইয়া গেল। কিন্তু মহামদ দুষ্ট অভিসন্ধিপূর্ব্বক হরিহর বাইতিকে চোর বলিয়া ধৃত ও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিল। হরিহর বাইতির শূলে মৃত্যু হইবে, এইরূপ নির্দ্ধারিত হইল। কিন্তু অল্পকাল মধ্যে সে প্রাণত্যাগ করিয়া শূলে আরোহণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিল। মহাপাত্র এখন রাজাকে বুঝাইলেন যে, তস্করের সাক্ষ্য প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। কিন্তু দুষ্কর্ম্মের সীমা আছে, মহামদের দুষ্ট অভিসন্ধির মাত্রা বড় অতিরিক্ত হইয়াছে দেখিয়া ধর্ম্মঠাকুর হনুমানকে পাঠাইয়া মহামদের সমস্ত পুত্রগুলিকে বধ করিলেন এবং তাহার সমস্ত দেহ শ্বেতরোগে আচ্ছন্ন করিয়া দিলেন। মাতুলের এই দুর্দ্দশায় ব্যথিত হইয়া লাউসেন তাহার পুত্রগুলিকে জীবন দান করিলেন এবং তাহার রোগ আরোগ্য করিয়া দিলেন, শুধু ধর্ম্মনিন্দার চিহ্নস্বরূপ মহামদের অধরে একটি শ্বেতচিহ্ন রহিয়া গেল। রঞ্জাবতী, কর্ণসেন ও কর্পূর কারাবিমুক্ত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে লইয়া লাউসেন ময়নাগড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; কলিঙ্গা রাণী ও কালু প্রভৃতি ডোমগণ লাউসেনকর্ত্তৃক পুনর্জীবিত হইল।

এইবার লাউসেন স্বর্গারোহণ করিলেন, কলিযুগে লোকের নানারূপ দুর্গতি এতদুপলক্ষে বর্ণিত হইয়াছে।

কাব্য-রচনাকাল

এই পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় ধর্ম্মমঙ্গল-রচনার কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেই অংশটি এরূপ মুদ্রাঙ্কণ-দোষদুষ্ট যে তাহা হইতে সময় উদ্ধার করিতে আমাদিগকে বড়ই বেগ পাইতে হইয়াছে। ২২৭ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত সময়-নির্দ্দেশক দুটি ছত্র এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম—

"সাফেরী ও সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে
সিদ্ধ সহ যুগ দক্ষে যোগ তার সনে॥"

এই "সাফেরি ও" শব্দটিকে "শাকে ঋতু" পড়িতে হইবে এবং দ্বিতীয় ছত্রটির "পক্ষ" শব্দটী মুদ্রাকর "দক্ষে" পরিণত করিয়াছেন। প্রথম ছত্রটির অর্থ ৬৪৭, অঙ্কের "বামাগতি" এস্থলে অনুসরণ করিতে হইবে না—"দক্ষিণে" শব্দটীর দ্বারা তাহাই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় ছত্রটির গোল একবারে মিটে নাই, সিদ্ধ বা সিদ্ধি=৮, যুগ=২ বা ৪, পক্ষ ২, দ্বিতীয়

ছত্রোক্ত অঙ্কটি প্রথম ছত্রের সংখ্যার সহিত যোগ করিয়া আমরা ১৪৬৯ শক অথবা ১৪৮৯ শক পাইতেছি। যুগ শব্দ সাধারণতঃ ২ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, উহার কালবাচক সংখ্যা গ্রহণ না করিলে গ্রন্থ-রচনাকাল ১৪৬৯ শক অথবা ১৫৪৭ খৃঃ অব্দ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এইকাল নির্দ্দেশ সম্বন্ধে আমরা বিশেষ দ্বিধাযুক্ত নহি।

"ময়ুর ভট্ট", "আদিরূপরাম"—ইহাঁরা মাণিকরামের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি, রূপরামের পূর্ব্বে অনেক স্থলেই 'আদি' শব্দ কেন প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। ময়ূর-ভট্টের সময় সম্বন্ধে আমরা অবগত নহি, রূপরামের সময়নির্দ্দেশক দুইটি ছত্রযুক্ত একখণ্ড প্রাচীন পত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছিল, অনেক পণ্ডিত মাথা খুঁড়িয়াও তাহার কোন অর্থ করিতে পারেন নাই—তাহা লিপি প্রমাদ বশতঃ একবারে পণ্ড হইয়া গিয়াছে।

ময়ুরভট্ট ও রূপরামের পরবর্ত্তী ধর্ম্মমঙ্গলের কবি খেলারাম; ইহাঁর খণ্ডিত একখানি পুঁথি স্বর্গীয় হারাধন ভক্তিনিধি মহাশয়ের বাড়ীতে ছিল। খেলারামের ধর্ম্মমঙ্গল ১৫২৭ খৃঃ অব্দে রচিত হয়, খেলারামের পরে ১৫৪৭ খৃঃ অব্দে বর্ত্তমান ধর্ম্মমঙ্গল বিরচিত হইয়াছিল; মাণিক-রামের পরে ১৬০৩ খৃঃ অব্দে সীতারাম দাস নামক জনৈক কবি একখানি ধর্ম্মমঙ্গল প্রণয়ন করেন; সম্ভবতঃ কৈবর্ত্তবংশোদ্ভব রামদাস আদকের ধর্ম্মমঙ্গল সীতারাম কৃত পুস্তকের পরবর্ত্তী; ১৭১৩ খৃঃ অব্দে ঘনরাম ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য প্রণয়ন করেন, এই পুস্তকখানি বঙ্গবাসী আফিস হইতে প্রকাশিত হওয়াতে অপরাপর ধর্ম্মমঙ্গল হইতে অধিকতর প্রচার লাভ করিয়াছে। ঘনরামের পরে সহদেব চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক লেখক আর একখানি ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করেন। এই পুস্তকের রচনাকাল ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে। সর্ব্ব সম্মতিক্রমে ধর্ম্মমঙ্গলের আদি কবি ময়ুরভট্ট এবং যে পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে, তাহাতে সহদেব চক্রবর্ত্তীই শেষ কবি। অনুসন্ধান করিলে আরও বহু সংখ্যক ধর্ম্মমঙ্গলের পুঁথি বাঙ্গালা দেশের নানা স্থান হইতে বাহির হইয়া পড়িতে পারে।

বৌদ্ধ প্রভাব

বৌদ্ধযুগের প্রধান প্রধান রাজ-চরিত্র কীর্ত্তন করিবার জন্য ব্রাহ্মণগণ কাব্য রচনা করেন নাই। কিন্তু সমস্ত বাঙ্গালা দেশ জুড়িয়া সেই সকল কীর্ত্তির কথা প্রবাদ বাক্যের ন্যায় প্রচলিত ছিল। হিন্দু-উপাখ্যানগুলি পুরাণকারগণ সংস্কৃত শ্লোকে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন; বৌদ্ধ উপাখ্যান গুলিকে তদ্রূপ ভক্তির সহিত রক্ষা করিয়া জাতীয় সাহিত্যের অন্তর্গত করিতে কোন শিক্ষিত ব্যক্তি অগ্রসর হন নাই।

কিন্তু সেই উপাখ্যানগুলি জনসাধারণের অতীব প্রিয় ছিল, তাহারা পুরুষানুক্রমে যে সকল কীর্ত্তির কথায় প্রীত হইয়াছে, ব্রাহ্মণগণের উপেক্ষা সত্বেও তাহারা তাহা বিস্মৃতির গর্ভে নিমজ্জিত করিতে সম্মত ছিল না। ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত চৈতন্যভাগবত পুস্তকে গ্রন্থকার বৃন্দাবন দাস আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন যে জন সাধারণ "যোগীপাল গোপীপাল ও মহীপালের" সম্বন্ধীয় প্রচলিত গান শুনিতেই ভালবাসে, হরিকথায় মনোনিবেশ করেন না। এই সকল গান এখনও প্রাচীন গৌড়ের সমীপবর্ত্তী স্থানসমূহে প্রচলিত আছে।

নিম্ন শ্রেণীর ব্যক্তিগণের চেষ্টায় প্রাচীন জগতের ইতিহাস কতক পরিমাণে রক্ষিত হইয়াছে, সুতরাং সেই উপাখ্যানগুলিতে অনেক বিকৃত কল্পনা ও আবর্জ্জনা প্রবেশ লাভ করিয়াছে, কিন্তু তথাপি তন্মধ্যে যে ক্ষীণ ঐতিহাসিক সত্যের প্রভা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে প্রাচীনকালের অনেক লুপ্ত তত্ত্বের উদ্ধার পাইবার সম্ভাবনা। ধর্ম্মমঙ্গলের পুঁথি যখন বহুলোকে ভক্তি-ভাবে শুনিতে লাগিল—তখন ডোমাচার্য্যগণকে বিতাড়িত করিয়া ব্রাহ্মণগণ উহা অধিকার করিয়া লইলেন এবং বৌদ্ধ উপাখ্যানগুলিতে যথাসম্ভব হিন্দু-ধর্ম্মের ভাব প্রদান করিয়া ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য নিজস্ব বলিয়া প্রচার করিলেন।

প্রাচীনতম ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে বৌদ্ধপ্রভাব সুস্পষ্ট। পরবর্ত্তী কাব্যগুলিতে হিন্দু-লেখকগণ ইহার কতকটা নূতন গড়ন দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মন্দিরের ইষ্টকে পূর্ব্বকালে অনেক মসজিদ রচিত হইয়াছে, সম্মুখের গুম্বজ ও খিলান দেখিয়া তাহা ধরা পড়ে না, কিন্তু ইষ্টকগুলির পশ্চাতের দিকে হিন্দু দেবতার মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে; বালির আস্তর উঠাইয়া ফেলিলেই সত্য আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে। ধর্ম্মমঙ্গলের পুঁথিরও গণেশবন্দনা ও ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবের দিক্‌টা ফিরাইয়া লইলে অপর দিক্ হইতে অজ্ঞাত বৌদ্ধ জগতের একটা সুস্পষ্ট আভাষ ফুটিয়া উঠিবে।

বস্তুতঃ এই পুঁথি আদৌ ব্রাহ্মণগণের হস্তে ছিল না। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে রমাই পণ্ডিত ধর্ম্ম-পূজার একখানা পদ্ধতি প্রণয়ন করেন, সেই পদ্ধতি এবং তৎসাময়িক ধর্ম্মপূজার মন্ত্র তন্ত্র কতকগুলি পাওয়া গিয়াছে—তাহাতে আছে, "ধর্ম্মরাজ যজ্ঞনিন্দা করে।" "সিংহলে শ্রীধর্ম্মরাজ বহুৎ সম্মান।" অন্যত্র "আগেতে ছিলেন প্রভু ললিত অবতার।" দুর্লভ মল্লিক কৃত গোবিন্দচন্দ্রের গানে ধর্ম্ম-সেবক গোবিন্দচন্দ্র হাড়িপাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম কি? হাড়িপা তদুত্তরে বলিয়াছিলেন "বাছা শুন গোবিন্দাই। অহিংসা পরমধর্ম্ম যারপর নাই।" একখানি প্রাচীন ধর্ম্ম-পূজার পদ্ধতিতে যাজপুরে ধর্ম্মঠাকুরের সঙ্গে ব্রাহ্মণ-গণের ঘোর বিবাদের কথা উল্লিখিত আছে, এবং অনেকগুলি ধর্ম্মমঙ্গলেই 'হাড়িপা' 'কালুপা' প্রভৃতি ডোমাচার্য্যগণের কথা বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত উল্লিখিত আছে। এই পুঁথি লেখকও প্রাচীন বৌদ্ধরীতি অনুসরণপূর্ব্বক "ওঁ নমোধর্ম্মায়" বলিয়া পুঁথি শেষ করিয়াছেন। এই ধর্ম্ম আখ্যানে নানা দিক্ হইতে সুস্পষ্ট বৌদ্ধ প্রভাব লক্ষিত হয়। বস্তুতঃ এই বৌদ্ধধর্ম্ম-সংক্রান্ত ডোমাচার্য্যগণের নিজস্ব কাব্য হাতে লইয়া ব্রাহ্মণ মাণিকচাঁদকে স্বপ্নের বরপ্রাপ্তি স্থলে একটা কৈফিয়ৎ দিতে হইয়াছিল। ডোমপুরোহিতের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসিয়া পাছে জাতিচ্যুত হন; মাণিকচাঁদ এই আশঙ্কায় ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্মঠাকুরের প্রত্যাদেশের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—

"এতেক শুনিয়া মোর উড়িল পরাণ। জাতি যায় তবে প্রভু করি যদি গান।"

কিন্তু মাণিকচাঁদের পূর্ব্বে অন্ততঃ আরও দুইজন ব্রাহ্মণ এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, ময়ূরভট্ট ও রূপরামের কথা উল্লেখ করিয়া কবিবর নিজকে আশ্বস্ত করিয়াছেন।

ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য যে পুঁথিকে বেদ বলিয়া মান্য করিয়াছেন সেই পুঁথির নাম "হাকণ্ড পুরাণ" ইহা কোন হিন্দুপুরাণ বলিয়া মনে হয় না। হাকণ্ড শব্দটি "সপ্ত খণ্ড" শব্দের অপভ্রংশ হইতে পারে। এই লুপ্ত বৌদ্ধ পুরাণটির উদ্ধার হইলে ধর্ম্মমঙ্গল সম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে ধর্ম্মঠাকুরকে "শূন্যরূপী" "শূন্যমূর্ত্তি" প্রভৃতি কথায় বর্ণনা করা হইয়াছে—"বল্লুকা" নদীর তীরে তাঁহার একটা বিরাট পূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল ; রমাই, কংসাই, নীল ও শ্বেত এই চারি বৌদ্ধ পণ্ডিতের নাম স্তোত্রের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ধর্ম্মপূজার পদ্ধতি লেখক রমাই পণ্ডিতের কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, অপর তিনজন সম্বন্ধে আমরা কিছুই পরিজ্ঞাত নহি।

কিন্তু বৌদ্ধ জগতের কথা লইয়া এই কাব্যের উৎপত্তি হইয়া থাকিলেও উত্তরকালে ইহা বিভিন্ন ধর্ম্মের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম ত ইহাকে একরূপ স্বাধিকার-চিহ্নিত করিয়া লইয়াছে ; এমন কি যে নিম্বাদিত্যের অবতার বলিয়া লাউসেনকে কল্পনা করা হইয়াছে, তিনি বৈষ্ণবগণের একজন নেতা। ঐতিহাসিক নিম্বাদিত্য লাউসেনের বহুপরবর্ত্তী ব্যক্তি। কোন কোন স্থানে ধর্ম্ম-রাজের যে শ্বেতরূপের বর্ণনা আছে, তাহা হিন্দুশাস্ত্রোক্ত চতুর্দ্দশ যমের অন্যতমরূপের সহিত অভিন্ন, বেদের "ধর্ম্মায় ধর্ম্মরাজার" প্রভৃতি স্তবের উদ্দিষ্ট দেবতার সঙ্গে ইহাঁর একত্ব প্রতিপাদন করা যায়। কোন কোন পুরাণকার বুদ্ধদেবের সঙ্গে এই ধর্ম্মরাজের কথা গোলযোগ করিয়া ফেলিয়াছেন। কোন পুরাণে দৃষ্ট হয় ধর্ম্মরাজ শাপগ্রস্ত হইয়া হাড়িদের পূজা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। হিন্দু ধর্ম্মের প্রভাব-চিহ্ন এই কাব্যের প্রায় প্রতি পত্রেই দ্রষ্টব্য, কিন্তু মুসলমানী প্রভাবও এই কাব্য হইতে বাদ পড়ে নাই, কেন না ধর্ম্মঠাকুরের দ্বাদশ অন্তরঙ্গ-ভক্তের সঙ্গে "দ্বাদশ আমিনী"র কল্পনাও আমরা এই পুস্তকে প্রাপ্ত হইতেছি।

অপরাপর ধর্ম্মের প্রভাব

বৌদ্ধজগৎ সম্বন্ধে অনেক কথাই আমরা বুঝিতে পারি নাই। এই পুস্তকের ৮২ পৃষ্ঠায়

"জলেতে আঁকিয়া যন্ত্র যথাবিধি জ্ঞান। তদুপরি পদ্মপুষ্প দিলা পড়ি ধ্যান॥"

অজ্ঞাততত্ত্ব।

এবং ২১১ পৃষ্ঠায় ৪৮।৪৯।৫০ চরণে পদ্মের সম্বন্ধে যে সকল কথা লিখিত আছে, তাহা হিন্দুতন্ত্রোক্ত কিম্বা "ওঁ মণি পদ্মহুঁ" প্রভৃতি বৌদ্ধমন্ত্রের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত তাহা আমরা জানি না। ধর্ম্মঠাকুরের দ্বাদশপূজার কথাও কোন হিন্দু-শাস্ত্রে নাই। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে "হাখণ্ড পুরাণ" কোন হিন্দুপুরাণ বলিয়া মনে হয় না। "কুবা-দত্ত," "হরিচন্দ্র" প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ভক্তগণের কথাও ধর্ম্মমঙ্গল ভিন্ন অন্য কোথায়ও আমরা পাই নাই। ধর্ম্মঠাকুরকে "প্রভু বাল্লার সখা" বলিয়া উক্ত হইয়াছে এবং ধর্ম্মবিগ্রহসমূহের যে সকল নাম পাওয়া যায়, তাহাও কোন হিন্দুপুরাণে থাকা সম্ভবপর নহে, যথা—বেলডিহায় "বাঁকুড়ারায়", গোপালপুরের "কাঁকড়া বিছা", শ্যামবাজারের "দলুরায়", বৈতালের "ঝকভাই", বেতারের "কেতিরেশ্বর" প্রভৃতি বহু বিগ্রহের নাম আমাদিগের নিকট সমস্যার ন্যায় বোধ হইতেছে ; অনেক স্থলে ইহাঁদের আকার এবং পূজাপদ্ধতিও অদ্ভুত রকমের। ময়ণাগড়ে লাউসেন প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মঠাকুরের

বিগ্রহমূর্ত্তি কতকটা কচ্ছপের ন্যায়; শ্রীমান্ বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ তাহা দেখিয়া আসিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন—কোন কোন স্থানে ধর্ম্মঠাকুরের নিকট উপহৃত সামগ্রীর মধ্যে চুণ দৃষ্ট হইয়া থাকে, এই চুণ উপহার কোন হিন্দুবিগ্রহকে প্রদান করা শাস্ত্রসঙ্গত নহে।

এক সময়ে চীন,হুণ ও ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধগণ এতদ্দেশে তাঁহাদের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেক প্রকারের অদ্ভুত পূজাপদ্ধতি ও দেবতা-বিগ্রহ এদেশে এক সময়ে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছিল। বন্যা চলিয়া গেলে যেরূপ কতকগুলি জঞ্জালমাত্র নিদর্শন পড়িয়া থাকে, বৌদ্ধপ্রভাব লুপ্ত হওয়ার পর তাঁহাদের আচারব্যবহার ও পূজাপদ্ধতির যৎসামান্য অবশেষ হয় ত এই ভাবে পড়িয়া আছে। ডোম, হাঁড়ি প্রভৃতি জাতিগণ এক সময় আচার্য্য-সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া সমাজের শীর্ষস্থানে অবস্থিত ছিল। হাড়ি ও ডোম পণ্ডিতগণকে রাজন্যবর্গ ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় সম্মান করিতেন, প্রাচীন বাঙ্গালাসাহিত্যে তাহার অনেক প্রমাণ আছে। তাহাদের কেন এই দুর্দ্দশা হইল, ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের দুর্দ্দশার সঙ্গে তাহারও একটা ইতিহাস উদ্ধার করা কর্ত্তব্য। বঙ্গদেশের বহুদেবতার পূজার অধিকার এখনও যোগী, ডোম ও হাড়ি জাতীয় ব্যক্তিগণের একচেটিয়া; এই সকল দেবতা কখনই হিন্দু দেব-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নহেন, কারণ তাহা হইলে ব্রাহ্মণগণ কখনই সমাজের অতি নিম্ন সোপানে অবস্থিত ব্যক্তিগণের উপর তাঁহাদের পূজার ভার ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন না। যে সমস্ত আচার ব্যবহার ও দেবপূজার কথা উল্লিখিত হইল, তাহার কতকগুলি এই স্থানের "দেশজ" এবং আর্য্যগণের উপনিবেশের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া প্রমাণিত হওয়া আশ্চর্য্য নহে। সমস্ত বৌদ্ধজগতের ইতিহাসের উদ্ধার না পাওয়া পর্য্যন্ত আমাদের দেশের অনেক পূজাপদ্ধতি ও আচারব্যবহারের মূল নির্দ্দেশ করা সম্ভবপর হইবে না।

তথাপি একথা নিশ্চয়রূপে বলা যাইতে পারে যে বৌদ্ধধর্ম্ম এদেশে হিন্দুধর্ম্মের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল। বৌদ্ধতন্ত্রের ও হিন্দুতন্ত্রের বিশেষ ঐক্য সাধিত হইয়াছিল। ডুবন্ত দিবালোক ও সন্ধ্যার আঁধার একটা জায়গায় এমনই ভাবে মিলাইয়া যায় যে কোন্‌টা আলোর রেখা এবং কোথায় আঁধারের সূত্রপাত তাহা নির্ণয় করা যায় না, এদেশে বৌদ্ধভাব ও হিন্দুভাবের তেমনই অবিচ্ছিন্ন সংযোগ হইয়া গিয়াছে। হিন্দু পুরাণে বা হিন্দু-কাব্যে সেই রেখান্তর-বর্জ্জিত মিলন পার্থক্যের চিহ্নলেশ প্রদর্শন করে না। কিন্তু ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে এই দুই ধর্ম্মভাবের সেরূপ শুভসংযোগ হয় নাই। যাহা বিদেশাগত, যে ভাব হিন্দু-পুরাণাদিতে প্রত্যাখ্যাত, সেই সকল ভাবের কতকটা আভাষ এই কাব্যে দৃষ্ট হয়, তাহা আমাদিগের কল্পনাকে কোন অজ্ঞাত রাজ্যের সন্ধানে উদ্বোধিত করে।

ঐতিহাসিক অংশ

ধর্ম্মকথা বাদ দিলেও ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের একটা মূল্যবান ঐতিহাসিক দিক্ আছে, তাহা উপেক্ষা করা যায় না। মেদিনীপুরের অন্তর্গত ময়নাগড়ে লাউসেনের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়—ইহাঁর যে সকল কীর্ত্তির

কথা উল্লিখিত আছে, তাহা কবি-কল্পনায় জড়িত হইলেও তাহা ভিত্তিশূন্য নহে। লাউসেন একজন প্রধান কীর্ত্তিমান্ পুরুষ ছিলেন, তাহা না হইলে হিন্দুপঞ্জিকায় কলিযুগের রাজচক্রবর্ত্তীগণের মধ্যে যুধিষ্ঠিরাদির নামের সঙ্গে তাঁহার নাম উল্লিখিত হইবে কেন? কিন্তু যে অপূর্ব্ব পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া তিনি ঢেকুরবাসী সোমঘোষ নন্দন ইছাইকে, সিমুলিয়ার রাজা হরিপালকে এবং কামরূপের রাজা কর্পূরধবল প্রভৃতি বিক্রান্ত যোদ্ধৃবর্গকে গৌড়ের রাজার বশীভূত করিয়াছিলেন, যে আশ্চর্য্য চরিত্র-বলে তিনি সুরিক্ষা, নয়ানসুন্দরী প্রভৃতি রমণীবর্গের কুহক হইতে আপনার উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন, যে অপূর্ব্ব তপোপ্রভায় মাতুল "মাহুদ্যার" ষড়যন্ত্রগুলি একে একে নিষ্ফল করিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং যে কঠিন ব্রতধারণ করিয়া দুশ্চর ধর্ম্মপূজা উদযাপন করিয়াছিলেন, তাহার বৃত্তান্ত ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের অতিরঞ্জনে ও কল্পনা-বাহুল্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি মূলতঃ তাহাদের ঐতিহাসিকত্বে আমাদের সংশয় নাই। লাউসেনের প্রাসাদাবলীর ধ্বংসাবলী যেরূপ এখনও বিদ্যমান, তেমনই অজয় নদের তীরে ইছাই ঘোষের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ এখনও দৃষ্টিগোচর হয়, হাণ্টার সাহেব কৃত "রুরাল্ বেঙ্গল" নামক পুস্তকে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। সিমুলিয়ার যে স্থানে রাজা হরিপাল অবস্থিত ছিলেন, অধুনা তথায় সিমুলগড় নামক স্থান দৃষ্ট হয়, উহা ব্রহ্মাণী নদীর তীরবর্ত্তী ছিল, ব্রহ্মাণী শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তদ্দেশবাসী প্রাচীন ব্যক্তিগণের নিকট ব্রহ্মাণী নদীর নাম অপরিচিত নহে—ব্রহ্মাণী বিমলা * এমন কি কৌশিকী নদী পর্য্যন্ত তদ্দেশে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। শিমুলিয়ার সন্নিকটবর্ত্তী একটী স্থান হরিপালের নামেই পরিচিত, হরিপালের বিস্তৃত রাজধানীর এখনও চিহ্ন একবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই—এখন তাঁহার প্রাসাদের বহির্ভাগ "বাহির খণ্ড" নামে সুপরিচিত। হরিপাল গৌড়েশ্বরের অধীন রাজা ছিলেন, এবং তদ্দুহিতা কানড়া যুদ্ধবিদ্যায় কৃতী মহিয়সী মহিলা ছিলেন—এই ঐতিহাসিক অংশের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। গ্রন্থভাগে যে সকল ব্যক্তির নাম দৃষ্ট হয়, তাহা কল্পনা-সৃষ্ট বলিয়া বোধ হয় না। প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালীদের নাম সংস্কৃতাত্মক ছিল না, কুলজী-গ্রন্থগুলি পর্য্যালোচনা করিলেই জানিতে পারা যায়। এখনকার ২৫।৩০ পুরুষ পূর্ব্বে নামগুলি প্রাকৃত; লুইচন্দ্র, মাহুদ্যা, লোহাটা, জাম্লানশেখর, লাউসেন, কাণড়া কলিঙ্গা, সামোলা, ইছাই প্রভৃতি নাম সংস্কৃত প্রভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী, এই সকল নাম বৌদ্ধযুগের বলিয়া মনে হয়। ইহাঁদের কীর্ত্তিকলাপ সম্বন্ধে যে সকল জনশ্রুতি ছিল ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে তাহাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়াধিপের প্রবল প্রতাপের কতকটা সুস্পষ্ট আভাস এই কাব্যের সর্ব্বত্রই প্রাপ্ত হওয়া যায়; তাঁহার আদেশমাত্র একদিকে "কোঁচের ভূপতি" ও "কাঙুরের রাজা" (প্রাগ্জ্যোতিষপুরাধিপ), অপরদিকে "বারেন্দ্র-অধিপতি", "পল্লিপুরার রাজা", "কৈঁউঝড়া", "সিমুল্যা", "ময়নাগড়", "দলুইপুর" প্রভৃতি প্রদেশের রাজন্যবর্গ একত্র হইতেন। সৈন্যবর্গের মধ্যে "চুয়াণ" রাজপুতদিগকে সুবাদারশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত দৃষ্ট হয়, বাগ্দী ও চাড়ালগণ" যে যুদ্ধবিদ্যায়

* ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে এই নদীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

অতিশয় দক্ষ ছিল, তাহার প্রমাণও সর্ব্বত্র ; "মাহুদ্যা" পাত্রের চারিশত দুর্দ্ধর্ষ চাঁড়ালসৈন্যের উল্লেখ সিমুলিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনায় পরিদৃষ্ট হয়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, এই পুস্তকে মুসলমান-সময়ের কথাও প্রবেশলাভ করিয়াছে, সুতরাং লাউসেনের সময়েও 'পাঠান' এবং 'হাবসী' সৈন্যের উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে, কাব্যের সর্ব্বত্রই এই ভাবে ঐতিহাসিক তত্ত্ব কল্পনার আবর্জ্জনায় জড়িত হইয়া আছে।

গৌড়ের রাজধানী "রমতি নগরের" উল্লেখ সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে, এই রমতি নগর মদনপালের তাম্রশাসনে উল্লিখিত "রামাবতী" ভিন্ন আর কিছুই নহে। রমাবতীই প্রচলিত বাঙ্গালায় "রমতি" নামে এতদ্দেশে সুপরিচিত ছিল, ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য হইতে তাম্রশাসনোক্ত স্থানের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। গৌড়ের কোন্ অংশে এই রমতি বা রমাবতী নগর অবস্থিত ছিল, তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা হওয়া উচিত, কিন্তু চেষ্টা ফলবতী হইবে কিনা সন্দেহ, কেননা গৌড়ের বিখ্যাত স্থানগুলিকে মুসলমান-সম্রাট্‌গণ নামান্তরে পরিচিত করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মমঙ্গলকাব্যের রাজা গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালের ক্ষেত্রজপুত্র, ধর্ম্মপালের তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে এবং তাঁহার সময় নির্দ্ধারিত হইয়াছে, গৌড়েশ্বরের উদ্ভব ইংলণ্ডের রাজা আর্থারের জন্মের ন্যায় একটা আশ্চর্য্য গল্পজড়িত। ১৬ পৃষ্ঠায় ইহাঁকে "সরিৎপতি-সুত" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, এতৎসম্বন্ধে সমস্ত উপাখ্যানটি ১২৩-১২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। ইনি গৌড়াধিপ ছিলেন, এজন্য "গৌড়েশ্বর" বলিয়া উক্ত হন নাই, ইহাঁর নামই "গৌড়েশ্বর" ছিল ১২৫ পৃষ্ঠা।

বারভূঞা।

প্রাচীনকালে, দ্বাদশ জন সামন্ত নিযুক্ত করিবার প্রথা সমস্ত আর্য্যজাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। মনু ও শুক্রাচার্য্যের গ্রন্থে দ্বাদশ মণ্ডলাধিপের কথা উল্লিখিত আছে। প্রাচীন গ্রীক্‌দিগের "দোদেকেপোলিস" বা "দ্বাদশপুরী" সম্বন্ধীয় ইতিহাস অনেকেই অবগত আছেন। সম্রাট্ দরায়ুসের সময় এই দ্বাদশ ভৌমিক এতদূর পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন যে তাঁহারা সমস্ত গ্রীস্‌রাজ্যের শাসন উচ্ছৃঙ্খল করিয়া ফেলিয়া ছিলেন। রাজপুতনার কোন কোন রাজ্যে দ্বাদশ ভৌমিক নিযুক্ত করিবার প্রথা এখনও আছে, বঙ্গদেশে ত্রিপুরারাজ্যে "বার ঘর" সামন্ত এখনও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

অনেকের ধারণা, মুসলমানদের সময়ে বঙ্গদেশের দ্বাদশটি প্রবল পরাক্রান্ত ভূম্যধিকারী "বারভূঞা" নামে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই প্রথা বহু প্রাচীন! হিন্দু-রাজগণের সভায় পাত্র ও মহাপাত্র প্রভৃতি পদস্থ ব্যক্তিগণের সঙ্গে দ্বাদশটি সেনানায়ক নির্ব্বাচিত করাও সনাতন প্রথা ছিল। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে এই তত্ত্বের বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। যে দেশের যে কোন রাজসভার বর্ণনা দৃষ্ট হয়, সেইখানেই "বারভূঞার" উল্লেখ অপরিহার্য্য। ধর্ম্মমঙ্গলকাব্যে জলন্দরগড়ের রাজসভা-বর্ণনোপলক্ষে (৬৭ পৃঃ ২০ শ্লোক), গৌড়েশ্বরের রাজ-সভায় (১১৯ পৃঃ ১৩ শ্লোক, ১৩৪ পৃঃ ৬ শ্লোক, ১৪০ পৃঃ ২ শ্লোক, ১৫৩ পৃঃ ২ শ্লোক), ময়নাগড়ের বর্ণনায় (১৫৪ পৃঃ ১২ শ্লোক), সিমুলের বিবাহ-বর্ণনায়

রাজপার্শ্বচরদিগের সঙ্গে (১৪৬।২২ শ্লোক) "বারভূঞা"র উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পাত্র, মিত্র, মহাপাত্রের সঙ্গে "বারভূঞা"র উল্লেখও সমস্ত রাজ-সভাবর্ণনায়ই পরিদৃষ্ট হইতেছে। ইহাঁরা রাজ-সভায় ঠিক রাজার পার্শ্বেই উপবেশন করিতেন। মহাপাত্রের পদ ইহাঁদিগের পদ হইতে উচ্চ ছিল এবং মিত্ররাজগণও ইহাঁদিগের অপেক্ষা সম্মানিত ছিলেন। ইহাঁরা সেনা-নায়করূপে রাজাকে সাহায্য করিতেন। "বারভূঞা ব'সে আছে, বুকে দিয়া ঢাল" (১১৯ পৃঃ ১৩ শ্লোক) প্রভৃতি বর্ণনায়ও ইহাঁদিগকে রাজার শরীররক্ষক এবং প্রধান সহায় স্বরূপ দৃষ্ট হইতেছে। ইহাঁদিগের কাহাকেও সময় সময় প্রধান সেনানায়কের পদে প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়—(১৪১ পৃঃ ৪ শ্লোক)। রাজগণের অভিষেকের সময় এবং রাজপুত্র বা রাজকন্যার বিবাহপ্রাঙ্গণেও "বারভূঞা"দের কতকগুলি অবধারিত কর্ত্তব্য ছিল। ১৪৬ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট হয়, কাণড়ার বিবাহোপলক্ষে বারভূঞাগণ লাউসেনকে বরমাল্য প্রদান করিতেছেন। ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে জানা যায়, কাঙুর বা কামরূপের রাজা কর্পূরধল "বারভূঞার" অন্যতম ছিলেন। চলিত কথায় যে "সৈন্য সামন্ত" শব্দ ব্যবহৃত হয়, বারভূঞাগণ সম্ভবতঃ সেই সামন্ত শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন।

উপাখ্যানের সারাংশ সঙ্কলনকালে আমরা ময়না হইতে গৌড়ের পথিস্থিত কয়েকটি স্থানের নির্দ্দেশ করিয়াছি। স্থান নির্দ্দেশ সম্বন্ধে প্রাচীন কবিগণের উপর একেবারেই নির্ভর করা চলে না; এই কাব্যে কটকের পরেই রামেশ্বর সেতুর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কবি তাঁহার স্বীয় বাসস্থানের অব্যবহিত নিকটবর্ত্তী পল্লীগুলি ছাড়া বাঙ্গালা দেশেরই আর কোন খবর রাখিতেন না, রামেশ্বর সেতু ত বহুদূরে। তারপর পুঁথিলেখকদিগের কল্যাণে নামগুলি এরূপ ভ্রম-সঙ্কুল হইয়াছে যে, কতটা কবির অজ্ঞতা ও কতটা লিপিপ্রমাদ তাহা মীমাংসা করা সুকঠিন। আমরা কাব্যভাগে যে ভাবে পাইয়াছি, সেই ভাবেই কতকগুলি স্থানের নাম নিম্নে প্রদান করিলাম;—ভৌগোলিক পণ্ডিতগণ প্রয়োজন হইলে আলোচনা করিয়া ইহাদের তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিবেন।

ভৌগোলিকতত্ত্ব।

ময়নাগড় হইতে গৌড়ের পথ—ময়না কালিনী নদীর তীরবর্ত্তী, তৎপর পুণ্যাজোলসনা গ্রাম, উসৎপুর, ভিতরগড় গ্রাম, রাঙ্গামেট্যা, পদ্মা, উচানন, শ্যামগঞ্জ, উত্তরে দামোদর বামে বর্দ্ধমান ও ব্রহ্ম ডাঙ্গা—তৎপর (উত্তরে) জলন্দরগড়, তারাদীঘী, বিশারদ বিশ্ববাটী, দলুই, গজেন্দ্র মথনপুর, গয়াসোম, জামাতিনগর, সুরিক্ষার পাট, গোলাহাট,—পদ্মাবতী পার হইয়া পীলাগ্রাম, তৎপর গৌড়ের রাজধানী রমতি নগর।

ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের ঐতিহাসিক অংশ ছাড়া আর একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাতে বাঙ্গালা দেশের স্বাধীনতার সময় যে সকল সদ্‌গুণ বাঙ্গালী চরিত্র অলঙ্কৃত করিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে অনেক আভাষ পাওয়া যায়। সত্য কথা বলা—বিশেষতঃ রাজদ্বারে সত্য সাক্ষ্য দেওয়ার উপলক্ষে হরিহর বাইতির উপাখ্যান ধর্ম্মভীরু প্রাচীন বাঙ্গালী গৃহস্থের একখানি অতি উৎকৃষ্ট ছবি। হরিহর বাইতির সত্যরক্ষার উপাখ্যান (২১৭-২১৯ পৃষ্ঠা) হরিচন্দ্র রাজার আখ্যান হইতেও উপাদের

ধর্ম্মমঙ্গলে প্রাচীন সমাজের ছায়া।

মনে হইয়াছে; যে হেতু হরিচন্দ্র রাজার সত্যরক্ষার কথায় অনেকটা অতিরঞ্জিত বীরত্ব আছে, কিন্তু বাইতির ভীরুতা, অর্থলোভ, অসত্য বলিবার চেষ্টা সত্ত্বেও অক্ষমতা এই সকলের মধ্যে বাস্তব চিত্রের ছায়া সমধিক লক্ষিত হয়। মাহুদ্যার ভয়ে হরিহর মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত হইল; যখন রাজকর্ম্মচারী গুণিয়া কয়েকখানি মোহর হরিহরের হাতে দিল, তখন ভয় অপেক্ষা লোভ প্রবলতর হইয়া উঠিল; কিন্তু হরিহর রাজদ্বারে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে শুনিয়া বাড়ীতে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কান্নাকাটি পড়িয়া গেল এবং হরিহর কেবলই শুনিতে পাইল যেন তাঁহার সপ্ত পুরুষ স্বর্গ হইতে নরকে পতিত হইবার আশঙ্কায় উৰ্দ্ধ দেশে কাঁদিয়া বেড়াইতেছেন; তথাপি হরিহর মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত হইয়া রাজদ্বারে দাঁড়াইল, কিন্তু সেই সময়ে তাঁহার কণ্ঠে মিথ্যা উচ্চারিত হইল না, সে সহসা সত্য বলিয়া উৎকোচদাতাকে ক্ষুব্ধ এবং স্বগণবর্গকে চমৎকৃত করিয়া ফেলিল। পশ্চিম দিক্ সুবর্ণকিরণে অনুরঞ্জিত করিয়া জগদ্‌বাসীর বিস্ময় ও অপূর্ব্ব ভক্তির উদ্বোধন করিয়া সূর্য্যদেব লাউসেনের তপঃপ্রভায় কি ভাবে পশ্চিমে উদিত হইয়াছিলেন, সে তাহা জীবনের ভয় ত্যাগ করিয়া অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিয়া ফেলিল।

প্রজাগণ ভূম্যধিকারীর প্রতি কিরূপ অনুরক্ত ছিল, তাহার দৃষ্টান্ত লক্ষ্যা ডুমুনি প্রভৃতির চিত্রে সুস্পষ্ট; রাজার জন্য প্রজারা প্রাণ দিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত, কোনরূপ ভয়, উৎপীড়ন বা শাস্তি তাহাদিগের অসামান্য রাজভক্তির কণামাত্রও হ্রাস করিতে পারিত না। লক্ষ্যাডুমুনির চরিত্র সম্বন্ধে ১৩১০ সালের পৌষের ভারতী পত্রিকায় আমরা যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, তাহা এবং মূল অবলম্বন করিয়া দুই বৎসর হইল শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাঁহার সুন্দর রঞ্জাবতী নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। হরিহর বাইতি সম্বন্ধেও আমরা ১৩১০ সালের চৈত্রের ভারতীতে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছিলাম।

রাজা হরিচন্দ্রের পুত্রদান, রঞ্জার শালে ভর দেওয়া, লাউসেনের হাকণ্ডে তপস্যা—প্রভৃতি উপাখ্যানের মধ্যে বহুল অতিরঞ্জন আছে সত্য, কিন্তু অনেক যুগ ব্যাপিয়া এই সকল গল্প বাঙ্গালী হৃদয়ে ভক্তি ও অনুরাগ জাগ্রত রাখিয়াছে—সুতরাং ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, এই সকল গল্পের মূলে এমন কোন নিত্য সত্য আছে—যাহা বাঙ্গালী চরিত্রের অনুকূল। ভক্তির সাধনায় বাঙ্গালী-চরিত্র অনেকটা আত্মবলিদানের জন্য উপযোগী না হইলে এই সকল গল্প পড়িয়া তাহারা এত প্রীত হইত না এবং এতকাল ধরিয়া ধর্ম্মমঙ্গলের পুঁথি নকল করিবার কষ্ট স্বীকার করিত না। হরিচন্দ্র রাজার উপাখ্যানটি হইতে দাতাকর্ণের আখ্যানটি গৃহীত হইয়াছে কি না, তাহাও বিচার্য্য।

ধর্ম্মমঙ্গলকে কাব্যসংজ্ঞায় অভিহিত না করিয়া বরং পুরাণ বলিয়া পরিচয় দিলে ভাল হয়। ইহা পাঠ করিয়া কাব্যামোদী ব্যক্তিগণ বিশেষ পরিতৃপ্ত হইবেন বলিয়া ভরসা দেওয়া যায় না।

কবিত্ব

ইহার কতকটা ইতিহাস, কতকটা সাধারণ লোকের কল্পনা এবং অধিকাংশই দৈব-লীলাপূর্ণ। লাউসেন এই গ্রন্থের প্রধান নায়ক। তিনি যে সকল বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অনন্যসাধারণ, অথচ তাহাতে আমরা প্রকৃত বীরত্ব খুঁজিয়া পাই না।

ধর্ম্মঠাকুর স্বীয় ভক্তের গাত্র হইতে মশকটি পর্য্যন্ত তাড়াইয়া দিতেছেন, সুতরাং লাউসেনের অজস্র বীরকীর্ত্তির মধ্যে বীরপণা বা পুরুষকারের পরিচয় নাই, সে সকলই দেবলীলার অন্তর্গত।

গল্পবর্ণনায়ও পত্রে পত্রে অসঙ্গতি দৃষ্ট হয়। লাউসেন তপোবলে সূর্য্যকে পশ্চিম দিক্ হইতে উদিত করাইলেন। গৌড়ের সমস্ত প্রজা সেই দৃশ্য দেখিল, স্বয়ং গৌড়েশ্বর এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া ভক্তিগদগদচিত্তে দান ধ্যানাদি করিলেন; অথচ সেই রাজাই এই ঘটনা প্রমাণের জন্য লাউসেনের নিকট সাক্ষী তলব করিয়া মাহুদ্যার মন্ত্রণায় তাহাকে বিড়ম্বিত করিতে লাগিলেন। দুর্ব্বাসার শাপে যেরূপ দুষ্মন্তের বিস্মৃতি ঘটিয়াছিল, গৌড়েশ্বর এবং সমস্ত গৌড়বাসী প্রজাবৃন্দের কাহার অভিশাপে এরূপ বিস্মৃতি ঘটিল, তাহা কবি বলিয়া দিলে ভাল হইত। লাউসেন পাছে বিদেশে যান এই আশঙ্কায় তাঁহার মাতা রঞ্জাদেবী মল্লদ্বারা তাঁহার পদদ্বয় ভগ্ন করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন, ইহা মাতৃস্নেহ কিংবা মাতৃস্নেহের বিকার তাহা বলা শক্ত। যতপ্রকার নৃশংস আচরণ কল্পনা করা যাইতে পারে, মাহুদ্যা তাঁহার ভাগিনেয়ের বিরুদ্ধে সে সমস্ত বারংবার অনুষ্ঠান করিয়া রাজার নিকট প্রতিবারই দোষী সাব্যস্ত হইতেছে, অথচ তাহার প্রতি রাজার অবিচলিত বিশ্বাস কিছুতেই হ্রাস পাইতেছে না, ইহাও অতি আশ্চর্য্য। কর্পূরকে কবি ভীরুরূপে অঙ্কিত করিতে যাইয়া একান্তপক্ষে অস্বাভাবিক করিয়া ফেলিয়াছেন। এই প্রকার নানা অসঙ্গতি কাব্যভাগে রাশি রাশি দৃষ্ট হইবে।

সুতরাং কাব্যের মানদণ্ডে এই গ্রন্থের বিচার করিলে পদে পদে পল্লী-কবির ত্রুটি দৃষ্ট হইবে। কিন্তু আমরা ইহার তদ্রূপ বিচারের পক্ষপাতী নহি।

এই কাব্য গীত হইত, ইহার একটা আসর ছিল, অধুনা সেই আসর লুপ্তপ্রায়; কিন্তু সেই আসর—তাহার আনুষঙ্গিক আস্‌বাব, খঞ্জনী ও খোলের বাদ্য, চামর হস্তে নূপুর পরিহিত গায়নের ভক্তিবিহ্বলতা ও বিচিত্র ভঙ্গী, দলের লোকের উচ্চকণ্ঠে দোহার গান, সর্ব্বোপরি সেই মূর্খ বা অর্দ্ধশিক্ষিত বালবৃদ্ধ যুবক রমণী পরিবৃত সভা—তাহাদের সরল ধর্ম্ম বিশ্বাস, এই সমস্ত চিত্রটি মনে আদায় না করিতে পারিলে এই কাব্যের রসাভাস উপলব্ধি হইবে না। এই গ্রন্থের সামান্য ছত্রে যে কবিত্ব আছে, পাঠকের চক্ষে তাহা এড়াইয়া যায়, কিন্তু দর্শক ও শ্রোতার নিকট গায়েন তাহা বিশেষ কৃতিত্বের সহিত প্রত্যক্ষ করাইয়া দিত। এই সমস্ত কাব্য ব্যাপিয়া নানা অসঙ্গতি সত্ত্বেও যে কঠোর তপস্যার কথা আছে, ইহাতে দেবতার প্রতি যে অসীম নির্ভরের ভাব দৃষ্ট হয়—যাহাতে পুরুষকার আদৌ স্থান পায় নাই, তাহার পূর্ণ চিত্র শ্রোতৃবর্গের চিত্তে মুদ্রিত হইয়া যাইত। গায়েন যখন নর্ত্তনশীল পদের নূপুরধ্বনি ও মুখর খঞ্জনী নিনাদের সঙ্গে সঙ্গে হস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক গাহিয়া যাইত—

"পেলাপেলী চেলাচেলী প্রমদে প্রমত্তং।
হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি দোহে অপচিত্তং॥
বলাহক সমডাক ছাড়ে সিংহনাদং।
মার মার অনিবার করে ঘোর শব্দং॥

সারঙ্গধর সেনপর উতরিল কিলং।
যেন মিশে ভাদ্রমাসে পড়ে পাকা তালং ॥

হৃদিমাঝে ধর্ম্মরাজ পদ পুণ্ডরীকং।
সদা মনে ভাবি ভণে দ্বিজ শ্রীমাণিকং ॥" ৬০-৬১ পৃঃ।

কিংবা—

"দড় বড় দম্পই, অবনী কম্পই,
দলবল দনুজ নিঘাতং।
মোহি মোহিপর, অবতহে লুটই,
তুরঙ্গ কুঞ্জর সাতং ॥" ১৮৭পৃঃ

তখন সংস্কৃতের এই হাস্যাস্পদ অনুকরণেও রণক্ষেত্রের সমর-রঙ্গের একটা পূর্ণভাব শ্রোতৃবর্গের মনে অঙ্কিত হইত; এই আনন্দোচ্ছ্বাস মাটি করিবার জন্য কোন বৈয়াকরণ বা আভিধানিক তথায় আমন্ত্রিত হইতেন না, ইহাই সেকেলে লোকের সৌভাগ্য ছিল।

বাঙ্গালা প্রত্যেক কাব্যেই প্রেমের অভিনয়ের একটা আতিশয্য আছে, কিন্তু ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য প্রেম ও রমণীর প্রাণ লইয়া নাড়াচাড়া করে নাই। এমন কি কাব্যনায়ক লাউসেন, অনেক সময় যুদ্ধবিগ্রহাদির জন্য প্রবাসে পড়িয়া থাকা সত্ত্বেও তাঁহার পত্নী কলিঙ্গা বা কাণড়ার বারমাসী বিরহপালা বর্ণনা করিবার জন্য কবিগণ চেষ্টা করেন নাই; বসন্তের কমলপল্লব বা বর্ষার পদ্মরেণুক্ত রক্তাঙ্গ চক্রবাক-প্রসঙ্গে বিরহিণীর শিরঃপীড়া বর্ণনাও ধর্ম্মমঙ্গলে নাই, তৎস্থলে রঞ্জার উৎকট তপস্যা, কাণড়ার যুদ্ধ-ব্যাপার, লখাডুমুনীর অদ্ভুত রাজভক্তি প্রভৃতি বর্ণনায় প্রাচীন বাঙ্গালা-সমাজের যে দিক্‌টা আমাদের চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালীর অধুনা-লুপ্ত চরিত্রবল, উচ্চলক্ষ্যের প্রতি অনুরাগ, রমণীজীবনের সাধুত্ব— এই সকল বিষয়ের একটা আভাস আছে; যে জগৎ ঐন্দ্রজালিক দৃশ্যের ন্যায় অপসৃত হইয়াছে বঙ্গদেশের সেই প্রাচীন স্বাধীন সমাজের কথা এই পুস্তক পড়িয়া অনেক স্থলে মনে হইয়াছে। ইহাতে প্রাচীনকালের বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতি সম্বন্ধেও নানা আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। এককালে স্ত্রীলোকের কাঁচলী, অসির ফলা, প্রভৃতি নির্ম্মাণে যে সূক্ষ্ম কারুকার্য্য প্রদর্শিত হইত, তাহার বর্ণনা এই কাব্যের অনেক স্থলেই আছে, সেই সকল বর্ণনা কিছু কিছু অতিরঞ্জিত হইলেও তাহাতে যথেষ্ট ঐতিহাসিক তত্ত্ব আছে। কেমিকাল স্বর্ণের অলঙ্কার তখনও এদেশে প্রচলিত ছিল। (৯৪পৃঃ ৫৪ শ্লোক)। স্ত্রীলোকগণ পাদুকা ব্যবহার করিতেন। (৯৭ পৃঃ ৪০ শ্লোক)। যুদ্ধের সাজসজ্জার অনেক বর্ণনা পুস্তকের স্থানে স্থানে পরিদৃষ্ট হয়। রণমুকুট মণিমুক্তায় গ্রথিত হইত, "সাজুয়া" অঙ্গে পরিয়া মকমলের পাদুকা পায় পরিয়া, স্বর্ণখচিত চেলবস্ত্রের উত্তরীয় গায়ে বড় লোকেরা হস্তী বা অশ্বপৃষ্ঠে যুদ্ধে যাইতেন, তাঁহাদের বপু কান্তিপূর্ণ ও বিশালতর ছিল, অনেক বর্ণনায় তাহা বুঝা যায়। যথা—

"সেনার প্রধান সাজে সীতারাম ভূঞে।
যার ভারে প্রমত্ত কুঞ্জর পড়ে মুঞে॥" ১৪১ পৃঃ

উদ্যানবাটীতে বা কোন আরাম-স্থানে রাজা ভ্রমণ করিতেছেন, কবি সহসা দু'একটি ছন্দে তাঁহার বেশভূষার যে চিত্র দিয়াছেন, তাহা মনোজ্ঞ ও কৌতুহলোদ্দীপক যথা—

"মাথায় সোণায় চীরা মকমলী পায়।" ৫৯ পৃঃ।

কিংবা অমাত্যের চিত্র যথা—

"পাল্কীর উপরে চেপে যায় নিজ ঘর॥
মাথায় মোহন পাগ মাণিক কপালে।
শর্ব্বরী সংযোগ পেয়ে সূর্য্যসম জ্বলে॥
গিদ্দায় গৌরব করি হেলায়েছে পা।
হুজুরে হতেছে শ্বেত চামরের বা॥" ১০৫ পৃঃ (৩৮-৪০ শ্লোক)

মাণিকরাম অনেক স্থলেই রাজসভা-বর্ণনোপলক্ষে ভাগবত-পাঠের অবতারণা করিয়াছেন; যে কোন ঘটনা পরে বর্ণিত হইবে, ভাগবতপ্রসঙ্গে তাহার পূর্ব্বাভাস প্রদত্ত হইয়াছে। কবি স্বভাবের যে বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন, তাহা বঙ্গদেশের পল্লী হইতে গৃহীত। পাঠক কাব্যেরী অনেক স্থলেই বঙ্গ-পল্লীর তরুগুলির অনেকের নাম পাইবেন, কিন্তু ৮৬ পৃষ্ঠায় বঙ্গের ব্যোমবিহার যে সকল পক্ষীর নাম দেখিবেন, সে তালিকায় কাদাখোচা ও শালিক হইতে আরম্ভ করিয়া কোন পাখীই বাদ পড়ে নাই। এই তালিকায় যে সকল পাখীর নাম আছে, তাহাদের সকল-গুলির পরিচয় জানিতে হইলে পাড়াগাঁয়ের ভাল শিকারীর শরণ লইতে হইবে;—এই বর্ণনো-পলক্ষে কবি পক্ষিজগতের সম্বন্ধে বিলক্ষণ অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন, সারস ঠোঁটে শামুক ভাঙ্গিতেছে, বাদুড় উর্দ্ধে পা তুলিয়া তপস্যায় রত, মাছরঙ্গা মাছ ধরিবার জন্য মাঝ দরিয়ায় পড়িতেছে, চড়ুই অতি ধূর্ত্ত, ধানবনেই সে বাড়ী করিয়াছে, প্রভৃতি ভাবের ইঙ্গিতবাক্যে প্রত্যেক শ্রেণীর পাখীরই বিশেষত্ব টুকু ফুটিয়া উঠিয়াছে ও তাঁহাদের চিত্র মনশ্চক্ষে জীবন্তরূপে উপস্থিত করা হইয়াছে।

প্রাচীন বাঙ্গলা কবিগণের কতকগুলি বাঁধা বিষয় আছে; অধিকাংশ কবিই সেই সকল বিষয়ে লেখনীক্ষেপ করিয়াছেন। রঞ্জার গর্ভবর্ণনায় গর্ভিণীর রুচিকর শাক-সবজী প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্যের একটী বর্ণনা আছে (৩৮ পৃঃ)। কবিকঙ্কণ নিদয়ার গর্ভাবস্থায় এইরূপ যে তালিকাটি দিয়াছেন, তাহা এই জাতীয় বর্ণনার মধ্যে উৎকৃষ্ট। বহুপত্নীক, বৃদ্ধাবস্থায় বালিকাপত্নীক বাঙ্গালী গৃহস্থের বাড়ীতে বধূগণ অনেক সময়ে নানা প্রকার কষ্ট ভোগ করিতেন, পতিনিন্দার প্রসঙ্গও আমরা বিজয়গুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতচন্দ্র পর্য্যন্ত অনেক কবির রচনাতেই পাইয়াছি। মাণিকরাম ৮৫ পৃষ্ঠায় এইরূপ পরিচিত ব্যাপার বর্ণনা করিতে ছাড়েন নাই। এই পতিনিন্দা উপলক্ষে কবিগণ মধ্যে মধ্যে যেরূপ রুচির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা আমরা সমর্থন করিতে পারি না। অবরোধক্লিষ্টা বঙ্গীয় মহিলাগণ একটু অবকাশ পাইলেই কতক পরিমাণে

অসংযত হইয়া উঠেন। কৃষ্ণের বাঁশীর স্বরে গোপীগণের যে অবস্থা ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে, গ্রামে বর আসিলে বা তদ্রূপ কৌতুহলোদ্দীপক অন্য কোন ঘটনা ঘটিলে মহিলাগণ যে ভাবে উৎসুক হইয়া ছুটিয়া আসেন, সেই অসংযত, চপল এবং অসম্বৃত ভাবটিও কবিগণ অনেক স্থলেই করিয়া গিয়াছেন। মাণিকরামও স্থানে স্থানে তদ্রূপ চিত্রের অবতারণা করিয়াছেন।

বঙ্গীয় প্রাচীন কাব্যে হনুমানের বিচিত্র অনুষ্ঠান সমূহ বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। মনসার ভাসান, চণ্ডীকাব্য, ধর্ম্মমঙ্গল প্রভৃতি সকল কাব্যেই ইহাঁর একটা গণনীয় স্থান আছে, যে কোন দুরূহ কার্য্য সাধন করিতে হইবে, তাহাতেই দেবতাগণের পক্ষ হইতে হনুমান্ আহূত হইতেন। মনসার ভাসানে চাঁদ সদাগরকে বিপদে ফেলিবার জন্য মনসাদেবী বারংবার ইহাঁকে আহ্বান করিয়াছেন। চণ্ডীকাব্যে সমুদ্র ঝড় উঠাইবার জন্য চণ্ডীদেবী হনুমানের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যেও বারংবার আমরা লাউসেনকে রক্ষা করিবার জন্য ধর্ম্মঠাকুর কর্ত্তৃক ইঁহাকে নিযুক্ত দেখিতেছি। হনুমান্ সমুদ্র লঙ্ঘনাদি দুরূহ রাম-কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন বলিয়া ইহাঁর বঙ্গীয় দেব-সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু বৌদ্ধ-পুরাণাদিতে ইহার কোন প্রকার উল্লেখ আছে কি না এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বৌদ্ধ উপাখ্যানাদি হইতে ইহাঁর একটা প্রাদুর্ভাব কল্পিত হইয়াছে কি না তাহাও বিচার্য্য।

মৃত্যু ও জীবন সম্বন্ধে এতদ্দেশীয় সাধারণ লোকদের যে উচ্চ তত্ত্বমূলক ধারণা আছে,অন্যদেশে তাহা দুর্লভ। এতৎসম্বন্ধে অতি হীন শ্রেণীর লোকেরাও দার্শনিকের কথাগুলি আদায় করিয়া ফেলিয়াছে। ১৫৪।৫৫ পৃষ্ঠায় মাণিকরাম লিখিয়াছেন :—

"জন্মিলে মরণ আছে এড়াবার নাই।
দশ দিন পর কিংবা দশ বৎসর বই॥
কোথা বা সে কর্ণ দাতা কোথা বলি রাজা।
কোথা গেল রাবণ রাক্ষস মহাতেজা॥
কোথা বা সে দুর্য্যোধন শকুনি দুর্ম্মতি।
কোথা গেল ভীষ্ম দ্রোণ কোথা কুরুপতি॥
সবাকার কপালে মরণ আছে লেখা।
আগু পাছু এক পথ এক ঠাঁই দেখা॥"

বিগত ৫০০ বৎসর যাবৎ বঙ্গভাষাকে বিশুদ্ধ করিবার চেষ্টা চলিতেছে। যে সকল শব্দ বাঙ্গালাদেশে বহুদিন যাবৎ প্রচলিত ছিল, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাহাদিগকে বিচারাসনের নিকট

অমার্জ্জিত শব্দ

উপস্থিত করিয়া তাহাদের বিকৃত অবস্থা ঘুচাইয়া সংস্কৃত আকারে চালাইবার চেষ্টা করিতেছেন। ক্রিয়া, বিভক্তি ও সর্ব্বনাম সম্বন্ধে তাঁহাদের এই চেষ্টা নিষ্ফল, তাঁহারা সেরূপ অসম্ভব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন নাই, কিন্তু নাম শব্দ গুলিকে পরিশুদ্ধ করিতে তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা পাইতেছেন। এই পুস্তকে কতকগুলি শব্দ তাহাদের প্রাকৃত ও কথিত আকারেই ব্যবহৃত হইতেছে, সাহিত্য-পরিষৎ তাহাদিগকে পরিবর্ত্তন করা যুক্তি সঙ্গত

মনে করেন নাই। অন্য কোন স্থান, এমন কি ব্যাকরণ ও অভিধানের এলাকা বহির্ভূত বটতলা হইতে প্রকাশিত হইলেও তাহাদের বিশুদ্ধ অবস্থাই আমরা মুদ্রিত পুস্তকে দেখিতে পাইতাম। ১৬৫ পৃষ্ঠায় "মচ্ছ" (মৎস্য) ও বজ্জর (বজ্র), ১৬৫ পৃষ্ঠায় "মচ্ছব" (মহোৎসব) ও "বচ্ছল" (বৎসল) আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সকল কথা কথিত ভাষায় এখন প্রচলিত আছে, কিন্তু লিখিত পুস্তকে এখন আর স্থান পাইবে না।

আমি এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু পুস্তকখানি যখন মুদ্রিত হয়, তখন ইহার পাঠ শুদ্ধি প্রভৃতি দেখিতে আমি অবকাশ পাই নাই। গ্রন্থভাগে অনেক

মুদ্রাকরের ভ্রম

মুদ্রাকরের প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে, ১০৯ পৃষ্ঠায় "দস্ত" স্থলে "দণ্ড" (৪৮ শ্লোক) ৫৫ পৃষ্ঠায় "গেলা" স্থলে "পেলা" এবং শেষ পৃষ্ঠায় "শাকে ঋতু" স্থলে "সাকে রিও" প্রভৃতি পাঠ বহুসংখ্যক প্রমাদের কয়েকটি সামান্য নিদর্শন। এই সকল ভ্রমের জন্য অনেক স্থলে অর্থোদ্ধার করা অতীব দুরূহ হইয়াছে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

বাঙ্গালীর মেয়ের ব্রতের কথা

পৌরাণিক ব্রত ছাড়া, বাঙ্গালীর মেয়ের আরও কতকগুলি ব্রত আছে বা ছিল। সেগুলিকে 'গৃহস্থালি ব্রত' বলিলেও চলে। ধর্ম্মের ভাব, কোনরূপ পূজার পদ্ধতি, আমাদের প্রায় সকল কর্ম্মেই থাকে, মেয়েদের ব্রতে ত থাকিবেই, তা ছাড়া এই সকল ব্রতে বাঙ্গালীর গৃহস্থালির কথা অনেক থাকে। গৃহস্থালী-ব্যাপারে বাঙ্গালীর মেয়ের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও আব্দারের কথা অনেক এই সকল ব্রত হইতে জানা যায়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ভাবি সতীনের উপর আক্রোশের কথাও বিস্তর থাকিত। "হাতা হাতা হাতা! খাও সতীনের মাথা।" "বেড়ী বেড়ী বেড়ী সতীন আমার চেড়ী।" এই সকল আক্রোশের কথা এখন আর শুনা যায় না। ব্রতব্যাপারে কোন কোন স্থলে যৎকিঞ্চিৎ রিফর্মেশন হইয়াছে।

খ্যাতনামা লেখকগণ বহু পরিশ্রমে বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিতেছেন, কিন্তু প্রায়ই এই সকল ইতিহাস শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিয়াও বেশ বুঝা যায় না, যে, তাঁহাদের বর্ণিত সময়ে বাঙ্গালীর মেয়েরা কিরূপ ছিল। বাঙ্গালীর মেয়ের ব্রতকথা সঙ্কলিত হইলে, হয় ত বুঝিতে পারিব যে বাঙ্গালীর মেয়ের আশা, আকাঙ্ক্ষা এবং আব্দার কিরূপ ছিল।

সেঁজুতী ব্রতের চিত্র ও প্রকরণ প্রকাশিত করা হইল, বাঙ্গালার সর্ব্বত্র যে একই পদ্ধতি

তাহা নহে ; আমাদের অঞ্চলের (রিফর্ম'ড্) পদ্ধতি আমি দিলাম ; অন্যান্য স্থলের পাইলে পরিষৎ হয় ত প্রকাশ করিতে পারিবেন।

'নমঃ শিবায়' বলিয়া সেঁজুতির মঙ্গলাচরণ। "সাঁঝ ভোজন সেঁজুতি"—ইত্যাদি শ্লোক বলিয়া আরম্ভ। নক্ষত্রপূজার শেষ। মধ্যে কোন্‌টির পর কোন্‌টি বলিতে হইবে তাহার কোন ক্রম নাই। সমস্ত অগ্রহায়ণ ভোর, প্রতিদিন দূর্ব্বা দিয়া, সন্ধ্যার সময় দীপ জ্বালিয়া এই ব্রত করিতে হয়। প্রতি ঘরে ৩ গাছি করিয়া দূর্ব্বা দিতে হয়। সমগ্র অগ্রহায়ণ মাসের দূর্ব্বাগুলি তুষগোবরের সহিত গুলি পাকাইয়া শুকাইয়া রাখিবে। পৌষমাসে যতদিন তাহার ডবল নম্বর গুলি। পৌষমাসের প্রত্যহ প্রাতে মূলাফুল, সরিষাফুল ও ৬ গাছি করিয়া দূর্ব্বা দিয়া, ছুটি করিয়া ঐ গুলি পূজা করিবে। ঐ পূজার মন্ত্র :—

তুষতুষলি জাঁতাজাতি।
বাপমার ধন, স্বামীর ধন, নিজের খ্যাতি ॥
ঘর করবো নগরে, মরবো ত সাগরে।
জন্মাবত উত্তম কায়স্থ ব্রাহ্মণের ঘরে ॥
তুষুলি গো রাই, তুষুলি গো ভাই !
তোমার কল্যাণে খাই ছ-বুড়ি ছ-গণ্ডা ক্ষীরের নাড়ু।
আমার যেন হয় সবার আগে স্থবর্ণের খাড়ু ॥

(ব্রতী শেষদিনে ক্ষীরের নাড়ু দুধে ফুটাইয়া খাইবে।)

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

সেঁজুতির ব্রত

হিত পত্রিক শ ভাগ পৃষ্ঠ
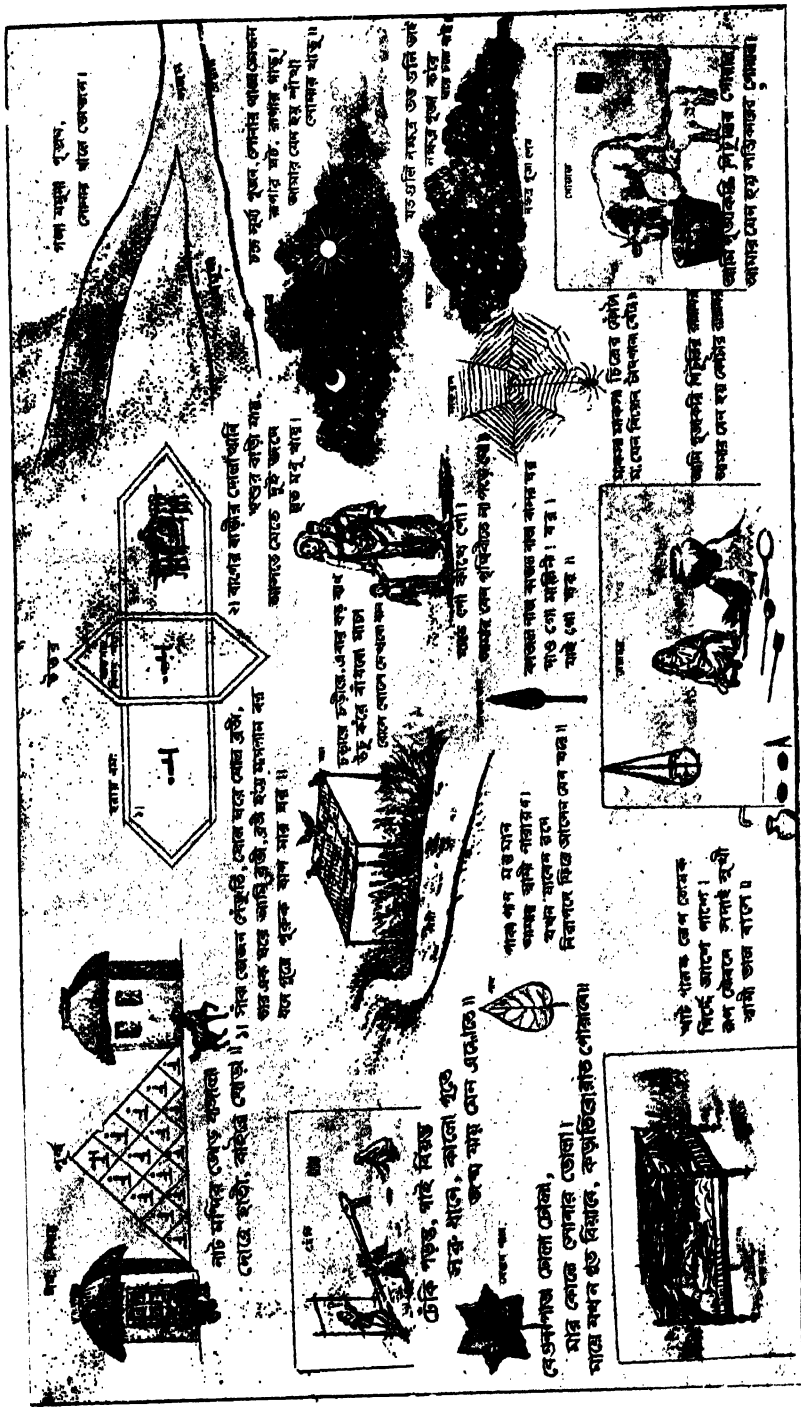
শুকবিবল্লভাদি-বিরচিত

বৃহৎ

পদ্মাপুরাণ

(অপ্রকাশিত প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্য)

গ্রন্থ।—১৭৪২ শক, বাঙ্গালা ১২২৭ সালের লিখিত, তুলট কাগজের ১৮×৪×২।৷০ ইঞ্চি ৪৪৮ পৃষ্ঠার (১৪৴০ পাতা) বৃহৎ পুঁথি। উভয়-

লেখক ও অধিকারী

দিকের আবরণ (মলাট) কাষ্ঠের। লেখক-স্বাক্ষর 'শ্রীরাম-নারায়ণ নাগ'। সাকিন আটাপাড়া, পরগণে কাগমারি *। পুঁথির অধিকারী তিন ব্যক্তি; 'শ্রীরামলোচন শর্ম্মা ও শ্রীরামধন শর্ম্মা ও রাধানাথ শর্ম্মা' সাকিন দিঘাপাইত, পরগণে পুখরিয়া †। উপসংহারটুকু এইরূপ :—"ইতি পুস্তক সমাপ্তঃ॥ ভিমশ্যাপি রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ॥ জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষোক নাস্তি দোশকঃ খকির পুস্তক শ্রীরামলোচন শর্ম্মা শাকীন দীগপাইত, পরগণে পুখরিয়া তাবক রামগৌরিদেব মহাল খারিজা মজকুরী জীলে ময়মনশীংহ সন ১২২৭ সন বারশত্ত সাতাইষ সন, সাক্ষর শ্রীরামনারায়ণ নাগ সাকী ‡ আটাপাড়া পরগনে কাগমারি হালমোকাম দিগপাইত শকাব্দা ১৭৪২ বাঙ্গালা তারিখ ১৫ বৈসাখ রোজ বুধবার বেলা অন্দাজ (১) দুই দণ্ড থাকিতে, চতুর্দ্দশী তিথিমৈধ্যে শম্পুর্ণ্ণঃ॥ পুথির হকদার শ্রীরামলোচন শর্ম্মা ও শ্রীরামধন শর্ম্মা ও রাধানাথ শর্ম্মা। এই তিনজন শেওায় (২) আর কেহ দাওা (৩) করে ছুটা বাতিল ঃ।। পটস্তিবেদসাপ্রানি : বিচার জন্য পুনঃ : ন জানন্তি পরং ব্রর্ম্ম দব্যপাক-বশমধীনা ঃ॥১॥ একাক্ষর গুরুমাল্য* মায়া স্লোকেনে পঠীতা থাদন্তী পক্ষিরাজেন্দ্র মেকাকী গুরুদক্ষিনা ঃ॥১॥ (ক)। শ্রীযুত রাধাকান্ত শর্ম্মার বাড়িতে চৌওারি ঘরের মধ্যে শমাপ্ত ঃ॥" ইহা হইতে বুঝা যায়, প্রাপ্ত গ্রন্থখানি মূল পুস্তক নহে, কারণ লেখক লিখিয়াছেন—'যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং'। বিশেষতঃ সঙ্গে প্রথমাংশের কতকগুলি অতিরিক্ত পত্র পাওয়া গিয়াছে, সেগুলিও একই হাতের লেখা। সুতরাং মূল পুস্তকদৃষ্টে লেখক

---

* ষ্টেঃ টাঙ্গাইল (ময়মনসিংহ)।

† ষ্টেঃ জামালপুর　ঐ

‡ সাকিন।

(১) অনুমান। (২) ব্যতীত। (৩) দাবী।

(ক) সংস্কৃত শ্লোকগুলি নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ

কয়েকখানি পুঁথি নকল করিতেছিলেন বোধ হইল। সম্ভবতঃ রামলোচন শর্ম্মার 'খকিয় পুস্তক'খানিই মূল পুস্তক।

অধিকারিত্রয়ের বংশধর কাহারও সন্ধান আমরা পাই নাই। সুতরাং লেখকেরও বিশেষ পরিচয় কিছু পাওয়া যায় নাই।

গ্রন্থপ্রাপ্তি স্থান।

দিঘপাইতে ভৌমিক উপাধিক খ্যাতনামা ভূম্যধিকারিগণের বাস; ইহাঁদেরই বড়-তরফের (৩৬ গণ্ডা) ১৩০৪ সালের ভূকম্পভগ্ন একটা ইষ্টকালয়ে আঁধারকুঠারির রাবিশ স্তূপের মধ্য হইতে প্রাগুক্ত কাষ্ঠের মলাটযুক্ত পুঁথির প্রথম অংশ (প্রায় ১০০।১৫০ পত্র) পাওয়া গিয়াছিল। অবশিষ্টাংশ চণ্ডীমণ্ডপমধ্যস্থ একটী জীর্ণ পেটিকার অভ্যন্তরে পাওয়া গিয়াছে,—প্রথমভাগের অতিরিক্ত পত্রগুলি এবং 'বেহুলার বারমাস্যার' একখানি পত্র ইহারই অন্তর্ভুক্ত। (খ)

গ্রন্থের আগাগোড়া কতকটা স্থান ইন্দুরে কাটিয়াছে, সম্ভবতঃ সে সময় সম্পূর্ণ পুঁথিখানি একত্র ছিল, পরে এরূপ স্থানান্তরিত হইয়াছিল। কোন কোন পৃষ্ঠার চারিদিকের কাগজ নিতান্ত জীর্ণ। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, ইহাতেও কবিতার পংক্তিগুলির দু'একটিমাত্র নষ্ট হইয়াছে, নতুবা সম্পূর্ণ পুঁথিই অটুট আছে। পদ্মাপূজার সময় পুঁথিখানির রীতিমত পূজা করা হইত, তাহার চিহ্নস্বরূপ ২৷৵০ ও ১২৷৵০ পৃষ্ঠার চারিদিকে বহুসংখ্যক রক্তচন্দনের ফোঁটা দেওয়া রহিয়াছে।

অক্ষর।—ক্ষ, যু, মু, ঘ, যু, থ; ধু, ছ, শু; ত্র, শ্র, ভু এইরূপ অনেক অক্ষরের পরস্পর পার্থক্য বড়ই অল্প। এ জন্য পাঠোদ্ধারে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয়। মূর্দ্ধণ্য ণ ঙঁ এর মত উচ্চারিত হইত, এ জন্যই বোধ হয় প্রত্যেক ণ—'ঙ' রূপে লেখা হইয়াছে। ক কোথাও কোথাও সংস্কৃত 'ক্ক' এর ন্যায়, যথা—'মুঞী করিমু ক্কী।' উ, হ্ন প্রভৃতি কতকগুলি অক্ষর সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের, তাহা প্রচলিত টাইপদ্বারা দেখাইবার উপায় নাই। বানান সম্বন্ধে 'যথাদৃষ্টং' ইত্যাদি লিখিয়া লেখক নিজেকে বাঁচাইয়া গিয়াছেন, সুতরাং তদ্বিষয়ের আলোচনা এস্থলে করা হইল না।

গ্রন্থের নাম

গ্রন্থের ।৵০ পৃষ্ঠায় ইহাকে 'পদ্মাপুরাণ' এবং ১৪৵০ পৃষ্ঠায় 'পদ্মাপুরাণগীত' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে,—

"লোমসে কহিল কথা সনকের ঠাঞী
পদ্মাপুরাণের কথা কহত গোসাঞী ॥" ।৵০

(খ) গ্রন্থের ১৩৵ পৃষ্ঠায়—

'বেউলার বারয়মাসি লোক শুন মন দিয়া।'

ইত্যাদি লেখা আছে, কিন্তু গ্রন্থের সেস্থলে বেহুলার বারমাসি নাই; বারমাসি একটী স্বতন্ত্র পত্রে পাওয়া গিয়াছে। পত্রটী জীর্ণ।

"নারায়ণদেব কয় নরসিংহ সুতে
পদ্মপুরাণ গিত সম্পূর্ণ এহিমতে ॥" ১৪/০

পুনরায় গ্রন্থোপসংহার-শেষে ইহাকে 'পদ্মার পাঁচালি' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।• স্থূলতঃ সনকবর্ণিত পদ্মাপুরাণই কবি পাঁচালিছন্দে রচনা করিয়াছেন। সুতরাং ইহাকে পদ্মার পাঁচালী বা পদ্মাপুরাণ উভয়ই বলা যাইতে পারে। তবে ইহা বলা প্রয়োজন যে, এ পদ্মাপুরাণের সহিত মহাপুরাণান্তর্গত 'পদ্মপুরাণের' কোন সম্পর্ক নাই। ইহা মনসার পুঁথি।

রচয়িতৃগণ।—সমুদায় গ্রন্থে একাদশ জন পদরচয়িতার নাম পাইয়াছি। এই একাদশ জন কবি যে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বীভাবে পদরচনা করিয়াছেন তাহা নহে, অথবা একই বিষয় লইয়া এক এক কবি যে পুনঃ পুনঃ স্বীয় রচনাচাতুর্য্য দেখাইয়াছেন, তাহাও নহে। কারণ গ্রন্থে সেরূপ একই বিষয়ের পুনরুক্তি দেখা যায় না। চন্দ্র-সূর্য্যের পৃথিবীতে ক্রমপর্য্যায়ে আলো দেওয়ার ন্যায়, এক ধারাবাহিক বৃত্তান্তই কবিগণ পরস্পরে ক্রমাগত গাইয়া গিয়াছেন। এই জন্যই গ্রন্থের রচয়িতা না লিখিয়া রচয়িতৃগণ লিখিতে হইয়াছে। এই একাদশ জন কবির নাম :—

তাঁহাদের বাসস্থানাদি ও কাল

১। সুকবিবল্লভ নারায়ণদেব (দ্বিজ); ২। চন্দ্রপতি; ৩। দ্বিজ বংশীদাস; ৪। বৈদ্য জগন্নাথ ও দ্বিজ জগন্নাথ (বিপ্র); ৫। দ্বিজ বলরাম (বিপ্র বলাই); ৬। বিপ্র জানকীনাথ (পণ্ডিত); ৭। দ্বিজ জয়রাম; ৮। হরিদত্ত ('দত্ত'); ৯। বিশ্বনাথ; ১০। হৃদয় ('হৃদয়ে ব্রাহ্মণ'); ১১। গুণাকর।

ইহাঁদের কেহই কাহা অপেক্ষা একেবারে ন্যূন নহেন। জগন্নাথ-ভণিতাযুক্ত পদগুলিতে কোথাও কোথাও ঈষৎ স্বাতন্ত্র্য আছে বলিয়া বোধ হইল, নতুবা আর সকলের রচনার মধ্যে পরস্পর বিভিন্নতা নাই বলিলেই হয়। তবে সুকবিবল্লভ নারায়ণদেবের রচনা যে-যে স্থলে ধারাবাহিকরূপে চলিয়াছে, সে সমুদায় স্থান পড়িলে ইহাঁরই রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। আমাদের মতে নারায়ণদেবই এ গ্রন্থের রচয়িতা। অন্য ১০ জন কবি ইহাঁর সহায়তা করিয়াছেন মাত্র। যে দুইটী প্রধান বিষয় ধরিয়া আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহা এই :—

(১) সমুদায় গ্রন্থে যত শ্লোক আছে, তাহার কিঞ্চিদূর্দ্ধ আড়াই আনা পরিমাণ শ্লোক ঐ দশজন কবির রচিত, ইহা ছাড়া আর সকল শ্লোকই নারায়ণ দেবের রচনা।

(২) পাঁচালীদলের কবি (রচয়িতা গায়েন) গীতকালে শ্রোতাদের ফরমাসমত অনেক গান রচনা করেন। কখনও কখনও তিনি ক্লান্ত হইলে দলের অন্যান্য উপযুক্ত ব্যক্তিগণ (কেহ কেহ শিক্ষার্থীও থাকেন।) অনেক সময় গীত চালাইতে থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আবার স্বরচিত পদ ও লাচাড়ী গান করান। নারায়ণ দেবের পুঁথিতেও সম্ভবতঃ এই উপায়েই বৈদ্য জগন্নাথ প্রভৃতির রচনা প্রবেশ করিয়াছে। এ

সিদ্ধান্ত করিবারও আমাদের প্রমাণ আছে—গ্রন্থের ৪৬০ পৃষ্ঠায়—একস্থলে এইরূপ পাওয়া গিয়াছে :—

"চান্দর গোচরে, আনিয়া সমারে, পদ্মা পুজীল জেহি লোকে।
চতুর্দ্দশী পাইয়া, প্রাচিত্য করাইয়া, সুদ্ধ করাইল একে একে ॥
পদ্মার আশন জত, পুজে জথা মণ্ডপ, যথাতথা সাধুতারে সুনে।
নারায়ণদেবে কয়, সুকবিবল্লব হয়, বিপ্র জানকিনাথে ভুনে ॥"

একই কবিতার একই পদে দুই কবির নাম,—বিশেষতঃ নারায়ণ দেবের সহিত জানকীনাথের নাম দেখিয়া কি বোধ হয় না, যে নারায়ণ দেব-অনুষ্ঠিত গীতের আসরে তাঁহার অবসর সময় মধ্যে জানকীনাথ কিছু গাইয়াছেন ?

এ সম্বন্ধে আরও একটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। বৈদ্য জগন্নাথ, দ্বিজবংশীদাস প্রভৃতি অন্যান্য পদরচয়িতৃগণের কেহই নিজ-নিজ নামের সহিত 'কবি' প্রভৃতি আখ্যা সংযোগ করেন নাই—কেহ 'সরস শুদ্ধমতি', কেহ 'গায়েন' ইত্যাদি বিশেষণ দিয়াছেন মাত্র। কিন্তু, নারায়ণ দেব—দু'এক স্থলে 'মনসার দাস', দ্বিজ নারায়ণ ইত্যাদি লিখিলেও —প্রায় সর্ব্বত্রই

'সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাচালি'
'নারায়ণ দেবে কয় সুকবিবল্লব হয়'

এইরূপ লিখিয়াছেন। ইহা হইতেও আমাদের ধারণা হয় যে, নারায়ণদেবই এ গ্রন্থের মূল রচয়িতা ; অন্যান্য কবিগণ তাঁহার সহকারী।

যাহা হউক, তথাপি আমাদের নিকটে প্রত্যেক কবিই প্রভূত সম্মানের পাত্র, তাহার সন্দেহ নাই। বরং সুকবিবল্লভের সঙ্গে সঙ্গে আরও দশজন সুকবির পরিচয় ও তাঁহাদের কবিতামৃত আস্বাদন করিতে পাইয়া আমরা সমধিক আনন্দিত।

সমস্ত কবিরই বাসস্থান পূর্ব্ববঙ্গে, খুব সম্ভব ঢাকা, ময়মনসিংহ, বগুড়া অথবা পাবনার কোন না কোন স্থানে। স্বীয় পরিচয় কেহই দেন নাই, গুণাকর, চন্দ্রপতি ও বিশ্বনাথ নিজ-নিজ কৌলিক উপাধিটী পর্য্যন্ত দেন নাই। একমাত্র নারায়ণদেব তাঁহার সুকবিবল্লভ খ্যাতি এবং

"নারায়ণ দেবে কয় নরসিংহসুতে"

এইটুকু মাত্র জানিতে দিয়াছেন। কিন্তু কবির পরিচয় জানিবার পক্ষে ইহা প্রচুর নহে। তাঁহার সুকবিবল্লভ উপাধি প্রাপ্তির বিষয়ও আমরা যেমন জানিতে পারিলাম না তেমনই আবার নরসিংহ দেবের পরিচয়ও আমরা অবগত নহি। *

* শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার তাঁহার "ময়মনসিংহের বিবরণে" লিখিয়াছেন—নারায়ণ দেব বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় ৪২৫ বৎসর পূর্ব্বে বোরগ্রাম নামক একটী ক্ষুদ্র পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার রচিত "পদ্মাপুরাণে" তিনি যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়— * *

দ্বিজ বংশীদাস, + দ্বিজবলরাম, বিপ্র জানকীনাথ, হৃদয় ব্রাহ্মণ ও দ্বিজ জয়রাম ইঁহারা

নারায়ণ দেবে কয় জন্ম মগধ। ভট্টপণ্ডিত নহো নহো বিশারদ॥
মধুকুল্যা গোত্রেতে গায়েন পুরকর। জন্ম লভিল সুত্রকায়স্থের ঘর॥
বৃদ্ধ পিতামহ মোর নাম ধনপতি। পিতামহ হয় মোর অতি সুর্দ্ধমতী॥
উদ্ধবতনয় হয় নরসিংহ পিতা। মাতামহ প্রভাকর রুক্মি মর মাতা॥
পূর্ব্বপুরুষ মর অতি শুদ্ধমতি। বার তেজিয়া বোরগ্রামেতে বসতি॥

বোরগ্রাম কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত একটী গ্রাম। অদ্যাপি নারায়ণদেবের বংশধরগণ বোরগ্রামে বাস করিতেছেন। তাঁহারা বোরগ্রামের বিশ্বাস বলিয়া পরিচিত এবং নারায়ণ দেব হইতে ১৭শ পুরুষ অধস্তন। নারায়ণদেবই পদ্মাপুরাণের আদি রচয়িতা কি না তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে না। নারায়ণদেবের কবিতার আদর্শ অতি প্রাচীন। নারায়ণদেবের সম্পূর্ণ পদ্মাপুরাণ এখন আর পাওয়া যায় না' বোরগ্রামে তাঁহার বংশধর-দিগের নিকট যেখানা ছিল, তাহাও হারাইয়া গিয়াছে।"

কবির পরিচয়সূচক উপরোক্ত ভণিতাগুলি আলোচ্য 'পদ্মাপুরাণে' আমরা পাই নাই। তবে নারায়ণদেবের রচনাভঙ্গী ও "নরসিংহ পিতা" দেখিয়া বোধ হয়, সুকবিবল্লভ নারায়ণদেব ও ইনি একই ব্যক্তি এবং ইনি কায়স্থ। তবে 'দ্বিজনারায়ণ' কি জানকীনাথাদির ন্যায় সুকবিবল্লভের সহকারী ভিন্ন ব্যক্তি? কেদারবাবু আরও লিখিয়াছেন—"বটতলা হইতে বেণীমাধব দে এণ্ড কোং যে পদ্মাপুরাণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ নারায়ণদেবের নয়। এই গ্রন্থের অর্দ্ধেকের অধিক দ্বিজ বংশীদাসের রচনা। কিন্তু আলোচ্য পুঁথিতে দ্বিজ বংশীদাসের রচনা মাত্র দুইটী স্থলে পাওয়া যায়। আমরা বেণীমাধব দে কোং'র প্রকাশিত পুস্তক দেখি নাই, সুতরাং ঐ পুস্তকের রচনার সহিত এ গ্রন্থের কোন কোন রচনার মিল আছে কি না বলিতে পারিলাম না। এ গ্রন্থে নারায়ণদেবের (সুকবিবল্লভ) রচনাই প্রায় সমস্ত। কেদারবাবুর লিখিত নারায়ণদেবের বংশধরগণের নিকট হইতেও গ্রন্থ পাওয়া যাইবে না, যে, মিলাইয়া দেখিয়া স্থির করা যায়। তবে যদি তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ নারায়ণদেবের পদ তাঁহারা চিনিয়া লইতে পারেন ও তাঁহার সুকবিবল্লভ উপাধির বিষয় তাঁহারা কিছু জ্ঞাত থাকেন, তবে এ বিষয়ের মীমাংসা হইতে পারে। ইহা বিশেষ অনুসন্ধান সাপেক্ষ।

+ দ্বিজ বংশীদাস সম্বন্ধে কেদারবাবু লিখিয়াছেন:—"পদ্মাপুরাণের অন্যতম রচয়িতা দ্বিজ বংশীদাস। ইঁহার নাম নারায়ণদেবের ন্যায় সর্ব্বত্র সুপরিচিত। এই কবির বাসস্থান কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত পাতুয়াইর গ্রাম। বংশীদাস ঠাকুর পদ্মাপুরাণে এইরূপ আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন—

"বন্দিঘটী গাঞি বন্দু জাহার প্রধান। শাণ্ডিলগোত্র বন্দু যাহার বাখান॥
গৌতম মুনির শাখা ত্রিতিয় প্রবর। দাম উঝার ধারা শ্যামবেদ পর॥
• বংশিদ্বিজ পূর্ব্ব গোশাঞি গুরু চক্রপাণি। ভবিষ্যত বর্ত্তমান তৃকালস্য জ্ঞানী॥
বাড়া হতে আসিলেক লুহির্ত্তের পাশ। পাতুয়াড়ি দর্জ্জিবাজু গ্রামের নিবাস॥
সর্ম্মন্দ করিল রত্নাবতী ঠাকুরাণী। যার পুত্র কাশীদাস হৈল মহাজ্ঞানী॥
তানপুত্র প্রসুর্ত্তম প্রাজ্ঞ মহাশয়। এক প্রজাপতি করি সর্ব্বলোক কয়॥
ভূমিষ্ঠে কুলেশীলে সম্বন্ধ অতিসয়। হৃদয়ানন্দ হইলেক তাহান তনয়॥
তানপুত্র যাদবানন্দ অতি সুদ্ধাসয়। দ্বিজ বংশীদাস কৈল তাহান তনয়॥"

বংশীদাস বর্ত্তমান সময়ে সপ্তম পুরুষে অবতীর্ণ। সুতরাং তিনি প্রায় ১১০ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।" ইত্যাদি

অবশ্যই ব্রাহ্মণ, চন্দ্রপতি ও বিশ্বনাথ ব্রাহ্মণ কি না বুঝা গেল না। গুণাকর উপাধি, কি, নাম এ বিষয়ে সংশয় আইসে। মাত্র একটী স্থানেই ইঁহার সামান্য কয়েকটী পদ পাইয়াছি। ভণিতার ভঙ্গীতে নাম বলিয়াই বোধ হইল। হরিদত্তের দত্ত উপাধি দ্বারা কায়স্থ বলিয়া জানা যায়। বৈদ্য জগন্নাথ ও দ্বিজ জগন্নাথ একই ব্যক্তি বলিয়া অনুমান হয়, কারণ অনেক স্থানে শুধু জগন্নাথ বলিয়াও ভণিতা আছে। সম্ভবতঃ 'বৈদ্য' উপাধিটী বিজ্ঞ বা কবিরাজ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে। নতুবা, বৈদ্যের উপবীত সংস্কার হয় বলিয়া যদি 'দ্বিজ' ধরা যায়, তথাপি 'বিপ্র' জগন্নাথ ব্রাহ্মণ বৈ বৈদ্য হওয়া সম্ভব নহে।

কবিগণকে যে আমরা পূর্ববঙ্গবাসী বলিয়াছি, ইহার আর বিশেষ নিদর্শন না থাকিলেও, একমাত্র রচনার ভাষাদিদ্বারাই তাহা বুঝা যায়।—

তদ্‌যথা—

গাইব, করিব	স্থলে	গাইমু, করিমু ইত্যাদি—
মোর, তোর	"	মর, তর
জাতিতে	"	জাতিত

শিবেক, নেতাক প্রভৃতি চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত পদ (পাবনায় ও বগুড়ায় এইরূপ ব্যবহৃত হয়।)

ঝালা (তেজ), মেলে (মুলুকে, কোথাও সঙ্গে অর্থে ব্যবহৃত হয়) হনে (বা থনে—অর্থ স্থান হইতে, স্থলে)

পাইয়া, খাইয়া	স্থলে	পায়া, খায়া
অপ্সরী	"	অপঃচ্ছরি
তবু	"	তমু
এলান (চুল)	"	আউলান
আট (অষ্ট)	"	আষ্ঠ
তা-হ'লে-ত	"	তবে-সে।

জোকার (হুলুধ্বনি), লোড়ালোড়ী পারে (দৌড়ায়),

সামাইল (সান্ধাইল—অর্থ প্রবেশ করিল), খাইয়াত (গর্ত্তে) দশেবিশে, আথালি পাথালি, পাছড়াপাছড়ি, খৈলাপাতিল প্রভৃতি যুগ্মশব্দ।

হাক্কল—(টিকটিকি),

এ ভণিতাও আমরা পাই নাই। কেদারবাবুর লিখিতমতে দেখা যায়, নারায়ণদেব ও বংশীদাস সমসাময়িক নহেন। তবে এ দুই কবির রচনা কিরূপে একাঙ্গভূত হইল বুঝা যায় না।

যাহা হউক, আমাদের আলোচ্য পুঁথিখানির যদি কোনরূপে প্রকাশিত হইবার সুযোগ উপস্থিত হয় বা প্রকাশিত হইবার আশা পাওয়া যায়, তবে এতৎ সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয়ের সংগ্রহ ও অনুসন্ধান অবশ্যই করিতে হইবে। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা কেবল গ্রন্থোদ্ধারসংবাদ ও গ্রন্থের স্থূল পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছি।

দস্ত নিকটিয়া—(নিট্‌কাইয়া-অর্থ বিকাশ করিয়া),
বেরুয়া, ভূরা—(ভেলা), বিচারিতে (বিচ্‌রাইতে—খুঁজিতে),
আযুন—(ব্যঞ্জনের সখাশব্দ, যা ব্যঞ্জন-আযুন)
কাকৈ (চিরুণী), কেতর (চোকের পিচুটী), বাতর (ক্ষেতের আল),
বিকুম্বিনী বাকুম্বা,—বা বাওকুড়াণী—বা ঘূর্ণি, অর্থাৎ ঘূর্ণিবায়ু),
পোলাই (পোলা—অর্থাৎ শিশু), পৈথান (শয্যার পদস্থান),
ছালি (ছাই) প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত অসংখ্য শব্দ।

এবং খাদ্যদ্রব্য মধ্যে 'মরিচ অষ্টাদশ' ও 'কাসন্দ' (সরিষাসহ নানাবিধ মশলা মিশাইয়া প্রস্তুত একরূপ চাট্‌নী,—পূর্ব্ববঙ্গের একটী বিশেষ খাদ্যদ্রব্য) নামক দ্রব্যের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দেখা যায়।

স্থূলতঃ আলোচ্য কবিগণের প্রতিভাপ্রসূত গীতরত্নমালা এবং বঙ্গসাহিত্যের প্রাচীন কীর্ত্তি এই পদ্মাপুরাণ যে পূর্ব্ববঙ্গেরই সম্পত্তি, এ সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কিছু নাই।

এই গ্রন্থের রচনাকাল নির্ণয় করা সুকঠিন। ১৭৪২ শকে (১২২৭ সালে) আদর্শ দৃষ্টে লেখক রামনারায়ণ নাগ কর্ত্তৃক বর্ত্তমান গ্রন্থ লিখিত হয়। মূল আদর্শখানি অবশ্যই তাহার পূর্ব্বেকার,—তবে কথা হইতেছে, আদর্শ পুস্তক রামলোচন শর্ম্মার 'স্বকীয়' পুঁথিখানিই মূলগ্রন্থ কি-না? যদি উহাই মূলগ্রন্থ হয়, তবে, ১২২৭ সনে মূলগ্রন্থ (অর্থাৎ নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ) সাধারণের আদরের বস্তু ছিল ইহাতে সন্দেহই নাই। কারণ, উপসংহারে অধিকারি-সাব্যস্তের দৃঢ়তা দেখিয়াই তাহা বুঝা যায়। ইহাও ৮৪ বৎসরের কথা। তাহা হইলে ৮৪ বৎসর পূর্ব্বে এই পদ্মাপুরাণ সাধারণ্যে প্রচুর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। সুতরাং এই গ্রন্থকে আমরা ১০০ কি ১২৫ বৎসর পূর্ব্বের রচিত বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি। আর যদি রামলোচন শর্ম্মার পুস্তক মূলগ্রন্থ না হয়, অথবা মূলগ্রন্থ দৃষ্টে সওয়াশত বৎসরেরও পূর্ব্বে উহা লিখিত হইয়া থাকে, তবে এ রচনা যে আরও প্রাচীন সে বিষয়ে সন্দেহ কি?

গ্রন্থ যে সময় রচিত হইয়াছিল, তখন বুড়ি, পণ, কাহণ ও কড়ি দ্বারা সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় (বা বিনিময়) হইত। * এবং তণ্ডুলাদির 'পুড়া' হিসাবে ওজন প্রচলিত ছিল। এতদ্ভিন্ন সামাজিক আচারাদির সম্বন্ধে গ্রন্থে যেরূপ উল্লেখ আছে, তদ্দারা এবং গ্রন্থের রচনার ভঙ্গী হইতেও ইহার রচনাকালের প্রাচীনত্বই প্রতীয়মান হয়।

শ্লোকসংখ্যা। ৪৪৮ পৃষ্ঠা পুঁথিতে মোট শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৬,৫০০ সাড়ে ছয় হাজার। তন্মধ্যে লাচাড়ী (ত্রিপদী) প্রায় সওয়া হাজার এবং বাকী সমস্তই পদবন্দ (পয়ার)। এতদ্ব্যতীত ধূয়া প্রায় পৌনে দুইশতটী।

* গ্রন্থের কোথাও 'সিকা' প্রভৃতিরও উল্লেখ পাওয়া গেল না।

মোট শ্লোকসংখ্যা সাড়ে ছয়হাজারের মধ্যে সুকবিবল্লভ নারায়ণ দেবের নামেই প্রায় পাঁচ হাজার। বাকী দেড়হাজার অপর দশ কবির। এই কবিদের মধ্যে জানকীনাথ, জগন্নাথ ও চন্দ্রপতিরই অপেক্ষাকৃত বেশী; ইঁহাদের নিম্নে বলরাম এবং সর্ব্বনিম্নে জয়রাম, বংশীদাস ও হরিদত্ত। গুণাকর, বিশ্বনাথ এবং হৃদয় ব্রাহ্মণের নাম মাত্র এক-একটী স্থানে পাওয়া গিয়াছে।

ধুয়াগুলির অধিকাংশই মনসাদেবী-সংক্রান্ত অর্থাৎ আলোচ্য পুঁথির বিষয়ানুযায়ী। আবার কতকগুলি অসংলগ্নও আছে; তাহাদের সংখ্যা অল্প এবং এ সমস্তের প্রায়ই 'কানাই' 'রাম' ও 'তারা' সম্বন্ধীয়। গ্রন্থে শ্লোকসংখ্যা পূর্ব্বাপর রীতিমত দেওয়া নাই, লেখকের ইচ্ছামত কোথাও কোথাও ৫।৭ শ্লোকের সংখ্যা দেওয়া আছে, তাহাও গ্রন্থানুযায়ী ধারাবাহিক নহে—অর্থাৎ কোন এক লাচাড়ির প্রথম হইতে ঐ লাচাড়ির শেষ পর্য্যন্ত পয়ারের অধিকাংশই সংখ্যা নাই। সুতরাং শ্লোকসংখ্যা নির্দ্দেশে পুঁথির আগাগোড়া শ্লোক গণিতে হয়। তাহাতেও আবার বিভিন্ন নামের পদ বলিয়া বাছিয়া লইতে নিতান্ত ক্লান্ত হইতে হয়।

রচনা। সমগ্র গ্রন্থ পয়ার ও লহরী (লাচাড়ি) ছন্দে রচিত। কিন্তু গীতার্থে রচিত বলিয়া সর্ব্বত্র অক্ষরের সংখ্যা সমান রক্ষিত হয় নাই—সুরের মিলে পদের মিল দেওয়া হইয়াছে। লাচাড়ির বিভিন্ন সংখ্যা আছে :—

যথা :—যোটক লাচাড়ী
মাল্লুষ লাচাড়ী
পয়ার লাচাড়ী
লাচাড়ী গায়েন ছন্দ।

লাচাড়ী ত্রিপদী; যোটক, মাল্লুষ ও গায়েন ছন্দে বিশেষ পার্থক্য কিছু নাই। পয়ার লাচাড়ী অবিকল পয়ারের ন্যায়। লাচাড়ী নৃত্যের সহিত গীত হয়, সম্ভবতঃ নৃত্যের নামানুযায়ী ছন্দের এরূপ বিভিন্ন নামকরণ হইয়াছে।

গ্রন্থ যে যে রাগে গীত হইয়াছিল, তাহা এই :—

কামদরাগ, পঠমঞ্জরী রাগ,
ভাটিয়াল রাগ, করুণ ভাটিয়াল রাগ,
ভবানীরাগ, শ্রীরাগ,
করুণ রাগ, কুহক রাগ
ও নটরাগ।

কোন কবিই রচনাতে পাণ্ডিত্য প্রকাশের চেষ্টা করেন নাই। প্রচলিত ভাষায় সুললিত সরল ভাবে শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়গুলি পর-পর গাঁথা। তবে মধ্যে মধ্যে দুএকটী অবান্তর বিষয় মূল বিষয়ের মধ্যে সহসা আসিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছে দেখা যায়—(যথা কৃষ্ণের

পারিজাত হরণ) এগুলি সম্ভবতঃ শ্রোতৃবর্গের ফরমাইস্‌মত পালার মধ্যে যুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। সমগ্র রচনায় লক্ষ্য করিবার প্রধান বিষয় ইহার বর্ণনীয় বৃত্তান্তের অতি মৃদুগতি। নানা শাখা প্রশাখার সঙ্গে মিশিয়া মিশিয়া মূল ঘটনা এত ধীরে চলিয়াছে যে, বিষয় সমাপ্তিতে গ্রন্থখানি এক বিপুল আকৃতি ধারণ করিয়াছে। তবে, বুঝা যায় যে, ১লা শ্রাবণ হইতে এক মাসকাল (কিন্তু পুঁথিতে 'নওদিন' লেখা আছে) ক্রমাগত গানের আসর জমাইয়া রাখিবার জন্যই ইহাকে টানিয়া এত বড় করা হইয়াছে।

গ্রন্থের আরম্ভ এইরূপ ;—

"শ্রীশ্রীসিবায় নমঃ ॥ দেব বন্দো গণপতিরে আরে হয়।

গ্রন্থারম্ভ ও বিষয়। বন্দো ভবানিসঙ্কর। মহাদেব .... লম্বোদর ॥ ধ্র ॥

কথ আজ্ঞি পড় গনাই না চিন অক্ষর।

সকলের আগে পুজা পুজিলা শঙ্কর ॥ ১ ॥

পার্ব্বতিনন্দন পহু (১) জানে জগজনে।

সনি দৃষ্টে মুণ্ড গেল পাইলা কেমনে ॥ ২ ॥

শিশুকালে মহাদেবে পড়াইল গ্রন্থ।

ভাকু (২) যে ভাঙ্গিল দাত নাম একদন্ত ॥

একদন্ত নাম হইল বেদেত প্রচার।

হুয়জে (৩) গজানন বিঘ্ন অপহার ॥ ৪ ॥" ইত্যাদি।

গ্রন্থের সূচীপত্র বা অধ্যায়বিভাগাদি কিছু নাই। ২ পৃষ্ঠা হইতে মূল বিষয় আরম্ভ হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে দেববন্দনাদি এবং সৃষ্টিতত্ত্ব ও কার্ত্তিক গণেশের জন্মকথা ইত্যাদি পৌরাণিকী বার্ত্তা। পূর্ব্বাংশকে আদিকাণ্ড এবং পরবর্ত্তী সমগ্র মনসার বৃত্তান্তটীকে গ্রন্থের উত্তরকাণ্ড ধরা যায়। আদিকাণ্ডের ঘটনা,—বিশ্বসৃষ্টি, সমুদ্রমন্থন, গড়ুরকর্ত্তৃক অমৃতহরণ, গজকচ্ছপযুদ্ধ, শিববিবাহ, কার্ত্তিকগণেশের জন্ম, তারকাখ্য-অসুরবধ ইত্যাদি।

উত্তর কাণ্ডের মূল ঘটনা—

"দেব দানবে হেন না করিছে কাজ।

মনুষ্যের হাতে পদ্মা পায়াআছে (৪) লাজ ॥

ধনঞ্জয় রাজার পুত্র রাজা কুটীশ্বর। (৫)

তার পুত্র চান্দো পাইছে হরগৌরীর বর ॥

পুজা খাইতে পদ্মা গেল ঝালুমালুর ঘরে।

ভক্তি করি শোনাই (৬) নিল পদ্মা পুজিবারে ॥

(১) প্রভু। (২) ভুণ্ড। (৩) হয়।

(৪) পাইয়াছে। (৫) কোটীশ্বর। (৬) চান্দোর মহিষী।

চণ্ডির ইঙ্গিত পাইয়া চান্দো অধিকারি।
হেমতালের বাড়ি দিয়া ভাঙ্গিল কাঁকুলি ॥
আপনে চলিল পদ্মা শিবের গোচর।
শিবে বোলে পুত্র খাও রাখ সদাগর ॥
ছয় পুত্র পদ্মাবতি খাইল সন্ধানে।
সকল শুনিবা তুমি পদ্মা বিদ্যমানে ॥ (৪)
তার শেষে পদ্মাবতি গেলা সুরপুরী।
অনিরুদ্র উসা আনে ইন্দ্রে ভিক্ষা করী ॥ (৫)
অনিরুদ্র জন্মাইল সোনকার উদরে।
উশারে জন্মাইল নিয়া সাহারাজার ঘরে ॥
দুই জনের জন্ম হইল জাতিশ্বরা (৬) হইয়া।
সাহা চান্দো মিলি তারে করাইল বিয়া ॥
স্নান করিল বেউলা মুক্তাসরের কুলে ।
মায়া পাতি পদ্মাবতি তার পাশে মিলে ॥
পদ্মাবতির গায়ে পড়ে গোড়ানিয়া পানি।
পদ্মা বোলে প্রভুতর খাইব নাগিণী ॥"

ইহার পর লোহার বাসরে সর্পদংশনে লখাইর মৃত্যু, বেহুলা কর্ত্তৃক তাহাকে পুনর্জ্জীবিত-করণ এবং চান্দো কর্ত্তৃক বামহস্তে পদ্মাপূজন ইত্যাদি। স্থূল ঘটনা এই, তবে অভ্যন্তরে বহু শাখা-প্রশাখা আছে।

বিবিধ। গ্রন্থে যে সকল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেগুলির প্রায় সমস্তেরই বর্ণবিন্যাস অদ্ভুত রকমের। একই শব্দের শুদ্ধ বানান ও অশুদ্ধ বানান উভয়ই আছে। লিখিবার সময় হাতে সহজভাবে যাহা আসিয়াছে, যেন তাহাই লিখিত হইয়াছে। নিম্নে কয়েকটীর নমুনা দেওয়া গেল।—

(ক) বানান। কবিত্ব = কবিত্য, কবিত্র, কবির্ত্ত। জিজ্ঞাসিল = জিঙ্গাসিল, জিজ্ঞাসিল।
বেহুলা = বিফুলা, বেউলা। ঋষি = হ্রিশী
জামাই = জাঞাঞঞী, জাঞাঞী, জামাঞী।
ইচ্ছা, কচ্ছপ, আচ্ছাদিত = ইৎসা, কৎসব, আৎসাদিত ॥
দময়ন্তী = দৈয়মন্তি। ইত্যাদি।

গ্রন্থে বহু নূতন শব্দ পাওয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে দুই চারিটী শব্দের কোনই অর্থগ্রহ

(৪) ধামাই কালনাগিনীর নিকট এই বৃত্তান্ত বলিতেছে। (৫) অনিরুদ্ধ ও উষাকে ইন্দ্রের নিকট হইতে চাহিয়া আনিলেন। (৬) জাতিস্মর।

করিতে পারা যায় না। (খ) শব্দ। গ্রন্থরচনাকালে কোন্ শব্দ কিরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইত, তাহার কয়েকটী নমুনা এই :—

আউজাইয়া = টানিয়া　　ঠান = ঠাম।
পুতন্তি = সুপুত্রবতী।　　নিয়ড়ে = নিমিষে ও নিকটে।
তিতা = ভিজা অর্থাৎ 'তিতল'।　　আধুইন = অধোত।
বেস্তাই = বিহাই—বৈবাহিক।　　অশম = অসীম।
সমায় = সকলে।　　বৈতালি = তালহীনা, জ্ঞানহীনা (স্ত্রীলোকের ব্যবহৃত ভৎসনা বিশেষ)
খবরি = বাটি—পাত্রবিশেষ।
বর্ত্তিব = জীবন পাইবে।　　সোয়া = শব।
আয়ড় = অন্তরাল।　　সবধি = শপথ বা বধলাগে (কিরা)
জানি = নাহি।　　শ্রয়শ্রুয় = চির।
আবালবালী = অবলা বালা।　　সিখী = অগ্নি। ইত্যাদি।

দুই চারিটী যুগ্মপদ পাওয়া গিয়াছে, যথা—
গণগর্ব্বিত = (মাননীয় গণনীয়)।
সাঝো-পাছো = (সাঙ্গা—পাঙ্গার অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়, অর্থ লোকজন, কর্ম্মচারী)।
গ্রন্থে শব্দ ব্যবহারের নিয়ম সর্ব্বত্র ব্যাকরণানুযায়ী নহে। কর্ত্তায় সপ্তমী—বহুস্থলে।
বিশেষণ ব্যবহারে বড় গোলযোগ—কোথাও 'স্ত্রীরত্না' আবার কোথাও "অবলা বুড় যুবক রমণী'।
'করি, কহি' স্থলে 'করোঁ' 'কহোঁ'।
অনুজ্ঞার্থে 'করুক, যাউক' স্থলে—'করুকা', 'জাউকা'।
একবচন স্থলে বহুবচন—"পদ্মা বোলন্তি বচন"।
ষষ্ঠীস্থলে প্রথমা বিভক্ত্যন্ত পদ—"কমন কারণে তুমি এথা আগমন।"
তাহাদিগের স্থলে—তাগরে।
উপহাস স্থলে উপহাস্য = "উপহাস্য রহিব তোমার দেবের সমাজ।" ইত্যাদি।

(গ) শাস্ত্রসঙ্গত সামাজিক ক্রিয়া কলাপ শ্রাদ্ধাদি, অথবা বিবাহের স্ত্রী আচারাদিও দেশের তাৎকালিক অবস্থা বর্ত্তমান সময়ের অপেক্ষা বিশেষ বিভিন্ন নহে; রন্ধন, সামাজিক, ব্যবহারিক ও রাজকীয় ভোজনাদির পার্থক্য দেখা যায়। রন্ধনপ্রক্রিয়া কৌতূহল-পূর্ণও বটে। নিম্নে এই গুলির একটু একটু নমুনা দিতেছি :—

"একমুখে জাল (১) দেয় পঞ্চমুখে জলে (১)।
পঞ্চপাতীল চড়াইয়া তৈল ঘৃত ঢালে॥

(১) জ্বাল, জ্বলে।

ভারানি (?) ভাজয়ে কন্যা বাঙ্গন (২) বারমাসি।
বেতআগা ভুনিলেক উদিশা (৩) উর্ব্বশী (?) ॥
পাট-আগা ভুনিলেক থোড় বিস্তর।
পুনশ্ববা ভুনিলেক ঘৃতের উপর ॥
সসিকুমড়া তবে, আনাজ (৪) কাটীবাই (?)।
কিঞ্চিত পিঠালি (৫) দিল দোশরে নাই ॥
পোরলতার গোটা (৬) ভাজে পোরলতার আগা।
মধ্যে মধ্যে দিল তার ধান্য গোটা গোটা ॥
আদা মুলা কাঠালের বিচি ভাজিল সিঙ্গাড়ি (৭)।
দুগ্ধের সর তোলে আর মুগ মুশরি ॥
কাসন্দ দিয়া রান্ধিলেক জালি (৮) কুমড়া।
সজ (৯) বাস দিয়া রান্ধে বেঞ্জন লাবড়া ॥
জিরামরিচ সজ বাটে পরিপাটি।
চিনি দিয়া রান্দিলেক মত্তা আলু (১০) কাটি ॥
কালাই দাইল গোমের আটা সিংহ জাতিফল।
খণ্ডদিয়া রান্ধিলেক মিষ্ট সকল ॥

* * * * *

মুশরির দাইল রান্দে তিল মুগ দিয়া ॥

* * * * *

পরমান্ন পীঠা তবে রান্দয়ে সুন্দরী ॥
কলষে কলষে দুগ্ধ ঘনাব্রত (১১) করি।
রশবাস দিল তাথে মরিচের গুড়ি ॥

* * * * *

পনসের হালি (১২) ভাজে ঘৃতের উপর ॥

* * * * *

মহাশৈল দিয়া তবে রান্ধিল মরিচ ॥ ইত্যাদি।

ভোজনের নিয়ম। যথা :—

(২) বেগুণ। (৩) উচ্ছে। (৪) আনাজ=তরকারী। (৫) পিঠালি=চালবাটা। (৬) পটোল। (৭) পানিফল। (৮) কচি। (৯) মশলার ভাবনা। (১০) মত্তা-আলু বোধ হয় বিলাতি আলু কিংবা মেটে আলুও হইতে পারে। (১১) ঘনাব্রত—ঘনাবৃত্ত অর্থাৎ গাঢ়। (১২) কোষ ?।

"চান্দোর বচনে তেড়া (১৩) চলিল সত্তর।
জনে জনে থাল (১৪) ঝারি দিল গোচর ॥
গামারির পিড়িত বৈশে চম্পকের নাথ।
জেষ্ট কনেষ্ট বুঝি আনি দিল ভাত ॥
তিক্ত কাসন্দ তবে তারে আনি দিল।
শ্রীবিষ্ণু বলিয়া সাধু গণ্ডুষ করিল ॥
প্রথমে আনিয়া দিল তলীল (?) অষ্টদষ।
ভোজন করি সদাগর পায় বড় রষ ॥
তার শেষে আনি দিল সুথত পাচ সাত।
কিছু কিছু খাইয়া শোমাই পাখালিল হাত ॥
তার শেষে আনি দিল মরিচ অষ্টদষ।
*　　*　　*　　*　　*
তার শেষে আনি দিল অম্বল পাচ সাত।
কিছু কিছু খাইয়া শোমাই পাখালিল হাত ॥
তার শেষে আনি দিল পঞ্চবর্ণের পীঠা।
দধি দুগ্ধ চিনী গুড় আর সব মিঠা ॥"
*　　*　　*　　*　　*
"মরিচ অষ্টদশ খায় আযুন পঞ্চসাত ॥" ইত্যাদি।

দুই তিন পদ দ্রব্য ভোজন করিবার পরই হস্ত প্রক্ষালন করিবার রীতি ছিল। ইহাতে বিভিন্ন ভোজ্য দ্রব্যের স্বাদগ্রহণে সুবিধা হইত বোধ হয়।

দ্রব্যবিনিময়ের বিবরণ :—

হল্‌দি বদলে পাইলু কাচা সোণাজাতি।
এক (১৫) নালিয়া পাতে পাইলাম সোণা তের রতি ॥ (১৬)
*　　*　　*　　*　　*
খাসা নেত পাইলাম দিয়া শোনের ধোকড়া ॥
একমোন রসুনে পাইল আসিমণ কড়ি।
চটভুটী বদলে পাইলু সাড়ি আর পড়ী ॥"

আত্মীয়-ব্যবহার দ্রব্যাদি যথা :—

"আসিবার কালে ব্যবহার পাইলাম বিস্তর।
মণিময় হার পাইলু কেয়ুর সুন্দর ॥
সফরিয়া নানা বস্ত্র ভালুক বানর। ইত্যাদি।

বস্ত্রের নাম যথা—

'খুঞীঞা ভুটা', ভুনি গঙ্গাজল, ধোকড়া, দাপুলী।

(১৩) ভৃত্য। (১৪) গাড়ু। (১৫) কচি পাট-পাতা। (১৬) এ বর্ণনা অবশ্যই অতিরঞ্জিত।

বিবাহের যৌতুক দ্রব্য, যথা—

"সাহা রাজা অত বস্তু উৎসর্গে বিস্তর।
বিস্তর মহিশ দেয় ভালুক বানর ॥
* * * * *
নেত কুতরা দিল পাটের পাছড়া ॥" ইত্যাদি।

রাজকীয় কর্ম্মচারী যথা :—

সাজা পাজা, মিরবহর, রাউত, উজির-নাজির, গোপাল, নস্কর ইত্যাদি।

কবিত্বাদি। পূর্ব্বে বলিয়াছি, জগন্নাথের রচনায় অপেক্ষাকৃত ঈষৎ পার্থক্য আছে। তাঁহার রচনা তত সংযত নহে, কিছু উদ্ভট ও তরল রকমের। কিন্তু তাঁহার তরল রচনায় শ্রোতার আসর যে উচ্চহাস্যে মুখরিত হইয়া উঠিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কবিদিগের রচনার কিছু কিছু নমুনা এখানে দিতেছি।

জগন্নাথ—"প্রথমে চলিল জ্বর, জার তাপ ভয়ঙ্কর,
মাথার বিশ চলিল তার সনে।
কেডিনিত (?) শোওার হইয়া, জারি চলিল ধাইয়া,
তিলে তিলে প্রাণধরি টানে ॥
পঞ্চ দাওদে[1] বান্দেগতি, খইস[2] পচাড় মাথার ছাতি,
ধনিকুষ্ঠ গায়ের পাছড়া।
নয়নে শোওার হইয়া, কেত্তর চলিল ধাইয়া,
পিনই চলিল হাজরা হইয়া।
বড় কুষ্ট চলে কোপে, মাছি পড়ে থোপে থোপে,
ঘোড়াবসন্ত চলে ছেছইড় দিয়া ॥ ইত্যাদি

চন্দ্রপতি—"মনসে কায়মনচিত্তে হয়া হরসিত মন।
পদ্মা পূজিলে বিয়খণ্ডে লক্ষি হয়ে পরস[3]ন্ন ॥"
কলিতে থাকে জয় দেবীমনসা, দেবনরে যাহারে বাখানি।
পুরহিতব্রাহ্মণে বেদমঙ্গল পড়ে, সেবকে দেয় ফুলপানি ॥
কেহ দিপতি[4] করে কেহ মিনতি করে, পদ্মা হইয়া হরসিত।
বিসানবাদ্যে পদ্মা আনন্দিত, সমুখে গায়েনে গায় গীত ॥ ইত্যাদি

ইহার বর্ণনায় প্রায়ই ভক্তি, শান্তরস, তবে কোথাও কোথাও হাস্যরসও আছে।

বংশীদাস—কস্তুরি চন্দন রেণু, সুভি আছে অর্দ্ধতনু,
অর্দ্ধ অঙ্গে বিভুতি ভূষণ।

---

(১) দাদ। (২) খোস। (৩) প্রসন্ন। (৪) দীপদ্বারা আরতি করে।

ডুমডুমু ডুমরু বাজে, সিবের দক্ষিণ ভুজে,
বামভুজে সোভিছে কঙ্কণ ॥
বাম অঙ্গে সোভে হর, গৌরি অর্দ্ধ কলেবর,
কোন বিধি করিছে নির্ম্মাণ।
রজত আর কাঞ্চন, কিবা চন্দ্র অরুণ,
অলক্ষিতে পুরিছে সন্ধান॥ ইত্যাদি।

এই উপমাটুকু কি সুন্দর! ইহার রচনা যেটুকু পাওয়া গিয়াছে, সমস্তই এই শ্রেণীর।

হরিদত্ত*—(পদ্মার সর্পসজ্জা)

দুইহাতের সঙ্খ হইল গরল সঙ্খিনী।
কেশের জাত কৈল এ কাল নাগিনী॥
সুতলিয়া নাগে কৈল গলার সুতলি।
দেবিবিচিত্র নাগে কৈল হ্রিদয়ে কাচুলী॥
সিন্দুরিয়া নাগে কৈল সিত্যের সিন্দুর।
কাযুলিয়া কৈল দেবীর কাজল প্রচুর॥
পদ্মনাগে কৈল দেবির সুন্দর কিংকিনী।
বেতনাগে দিয়া কৈলা কাকালিকাচুলী॥
কণক নাগে কৈল কর্ণের চাকিবলি।
বিষতিয়া নাগে দেবির পায়ের পাশুলি॥
হেমন্ত বসন্ত নাগে পৃষ্ঠের থোপনা।
সর্ব্বাঙ্গে নিকলে তার অগ্নি কণা কণা॥
অমৃত নয়ান এড়ি বিশনয়ানে চায়।
চন্দ্রসূর্য্য দুই তারা আড়ে লুকায়॥" ইত্যাদি

ইঁহার রচনাকৌশল বড় সুন্দর। সামান্য বিষয়ের বর্ণনাতেও স্থানে স্থানে ইনি বেশ চমৎকারিত্ব দেখাইয়াছেন।

জানকীনাথ—(পদ্মার বিবাহ)

ব্রহ্মায়ে বেদ পড়ে, পুরন্দরে ছত্রধরে,
দেবগণে বোলে জয় জয়।
সর্গের বিদ্যাধরি, আইল জোকার সুনি,
বাদ্যভাণ্ড বাজে অতিশয়॥

* ইনিই পদ্মাপুরাণের আদিকবি, বিজয় গুপ্তের উল্লিখিত "কাণা হরিদত্ত।" ইনি প্রায় ৬০ বর্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি। সা৹ প৹ প৹ স৹

তবে জয় বিসহরি, দুই হস্ত জোড় করি,
প্রণাম হইল ততক্ষণে।
মুখ চন্দ্রিকা জোগে, কানি অঙ্গুলি আগে,
কাজর দিল মুনির নয়ানে ॥
বর দেখি হৈল তুষ্টি, নানারঙ্গে দুই মুষ্টী,
নিছিয়া[৯] ফালাইল চারি পাসে।
ফুল ছিড়ি বাম হাতে, খট্টা চাপিয়া বৈসে,
তাহা দেখি মুনিবর হাসে ॥

* * * * *

অন্তপ্পট দুর করি, সোবর্ণের ঘটবারি,
কন্যাদান করয়ে শঙ্করে ॥ ইত্যাদি

বলরাম—('পারিজাতহরণ' হইতে)

"নারদের মুখে সুনি সতির মরণ।
সত্যভামা দেখিতে আসিলা নারায়ণ ॥
এক সখির হাতের বিচনি কৃষ্ণ লইয়া।
বাও করে কৃষ্ণ সখির আড় হইয়া ॥
কান্দিতে কান্দিতে সতি কহে সখির স্থানে।
আইজ আমোদিত গন্ধ পাই কি কারণে ॥
রুক্মীনির স্বামি আইল বুঝি অনুমানে।
তথা জাও কৃষ্ণ এথা আইলা কী কারণে ॥
কি কারণে আইলা কৃষ্ণ রুক্মীনি এড়িয়া।
কি রূপে থাকিবা এথা প্রাণে ধরাইয়া ॥" (১০) ইত্যাদি

এই অভিমানে ভর্ৎসনাটুকু কি তীক্ষ্ণমধুর! ইঁহার রচনায় কলা-কৌশল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিশ্বনাথ—"বধুরে দেখিয়া সোনাই হরসিত মনে।
আগিয়া বরিয়া ঘরে নিল সুভক্ষণে ॥
শোবর্ণের খাটে শোনাই বধুরে বসায়া।
পঞ্চ মানিক্য ফালায় বধুরে নিছিয়া ॥
সরদ পুর্ণিমার সসি নয়ানের ঠান।
নাসিকাতে ফুল শোভে অপুর্ব্ব নির্ম্মাণ ॥

---

(৯) বালাই আপদ্ দূর করা।

(১০) প্রাণ ধরিয়া।

সিন্দুরে মণ্ডিত মুক্তা দশনের যুতি।
কণ্ঠ জিনিয়া শোভে গলে গজমতি (?)॥
কেসরি জিনিয়া মাঝা অতি বড় ক্ষিণ।
ভুরুর ভঙ্গিমা দেখি জেন কামধনুর চিহ্ন॥
ছয়পুত্র হারাইয়া পাইল লক্ষিন্দর।
বধুরে পাইলু আমি তার সমসর (১১)॥" ইত্যাদি।

উপমা যদিও নূতন নহে, তথাপি রচনাভঙ্গী অসুন্দর নহে।

হৃদয়—"পূয়া প্রদিপ নিবাইল কিশে, সর্ব্বাঙ্গ ছাইল বিসে,
প্রহরিগণ চিয়াও (১২) সত্তর।
কিবা গায়ানিদ্রা জাশ, কিবা কর পরিহাস,
নর্য্যায় কিবা না দেও উত্তর॥
রজনী প্রভাত করি, আসিব চম্পকের মারি,
জিজ্ঞাসিব লখাইর কুসল।
তুমি দিবা উত্তর, মৈল প্রভু লক্ষিন্দর,
কাল নাগে লখাই কইল বল॥" ইত্যাদি

গুণাকর—(পদ্মার খেদ)

"কামদেব রূপের অধিকারী, তাহাকে যে বধ কৈল দেব ত্রিপুরারি,
তাহা কেহ না কৈল বিচার।
আমার এক লখাই লইয়া রাজ্য তোলপাড় নী॥
লঙ্কার রাজা আছিল রাবণ, তারে জে বধিল শ্রীরামলক্ষ্মণ,
মন্দোদরী ধরিল চরণে।
তাহাকে না জিআইল শ্রীরামলক্ষ্মণে ল॥" ইত্যাদি

ইঁহার রচনাটুকুর বেশ কৌশল আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইঁহার রচিত মাত্র ৪।৫টী লাচাড়ী এ গ্রন্থে পাওয়া গিয়াছে।

জয়রাম—"বোলে রবির নন্দন, শুনরে লস্করগণ,
কেনে না জাও রণ করিবারে।
স্ত্রীহয়া করে রণ ভঙ্গ দিলা দূতগণ,
কিবা সুখে চাহিআছ রঙ্গ।" ইত্যাদি

নারায়ণ।—সমগ্র গ্রন্থে নারায়ণদেবের রচনাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইঁহার রচনা সংযতমধুর, আবার সময়ানুসারে চটুল-উচ্ছ্বল। যদিও দাশরথি প্রভৃতির ন্যায় তাঁহার পাঁচালীতে

---

(১১) সোসর—সমান, এখানে উপযুক্ত। (১২) জাগাও?

ভাষার চমৎকারিত্ব নাই, তথাপি, তাহার সাধারণবোধ্য প্রচলিত সরলভাষায় সংস্কৃতভাব-সুলভ রচনা, কোন অংশেই অমধুর নহে।

নবজাতা চণ্ডীর—"দিনে দিনে বাড়ে দাঁদ, জেন দ্বিতিয়ার চান্দ।"

শিবকর্ত্তৃক মদন ভস্মীভূত হইলে—

"পতিশোকে কান্দে রতি লোটায় ধরণী

* * * * *

না সম্বরে কুন্তল আর চিত্ত স্থির নয়।

কমল নঞান বাহি জল পড়য়ে॥"

প্রভৃতিতে মহাকবির—'দিনে দিনে সা পরিবর্দ্ধমানা লব্ধোদয়া চান্দ্রমসীব লেখা।' ও 'বসুধালিঙ্গনধূসরস্তনী বিললাপ বিকীর্ণমূর্দ্ধজা॥" ইত্যাদি স্মরণ হয়।

"পাইয়া বাপের আজ্ঞা হেমন্তনন্দিনী।

তপস্যা করিতে তবে চলে তপস্বীনী॥

* * * * *

সেবকবৎসল প্রভু দেব নিরঞ্জন :

তপস্যা করিলা চণ্ডী হরসিত মন॥

ব্রাহ্মণ রূপে আয়া বুঝাইল বিস্তর।

রাজার কুমারী তুমি তপস্যার কোন ফল॥

প্রথম জৌবন তোমার অতি অকুমারী।

তোমার ইসব দুঃখ সহিতে না পারি॥

উন্মতা ভাঙ্গড়া শিব ধুতুরা ভোজন।

বলদে চড়ীয়া বেড়ায় টোলে সর্ব্বক্ষণ॥

ভাঙ্গ খায় ধুতুরা খায় গলে হাড়ের মালা।

কান্ধে ভাঙ্গের ঝুলী পৈরণ বাঘছালা॥

দ্বিজের বচনে চণ্ডী হইল কুপীত।

বিপরিত মুখ করি চাহে চারিভিত॥

না বোল না বোল দ্বিজ অনোচিত বানি।

মহাজন নিন্দা কৈলে মরিবা আপনি॥"

প্রভৃতিতেও 'কুমারে'র ভাব পূর্ণরূপে বিরাজিত। কবি যে শুধু সংস্কৃত হইতে ভাব লইয়াছেন তাহা নহে, সে ভাবগুলিকে প্রচলিত সরলভাষায় কত সুন্দর করিয়া বুঝাইয়াছেন! ইঁহার হাস্যরস ও বীভৎসরসও চমৎকার :—

"ঠেঙ্গা হাতে করিয়া রহিল ধাই দুর্ব্বলী।

ছয়পুত্রের বধু রহিল ঝাটা হাতে করি

সাধুর ঘরের ধাইবেটি বড়ই সিয়ান।
হাতে লইয়া রহিল মুড়া ঝাটাখান ॥
তাহার গুণ যত কহিতে না ফুরায়।
ষোল গজ কাপড়ে তার এক বের পায় ॥" ইত্যাদি এবং
"কুরূপার প্রধান আইয় (১) নাম তার ইছি।
চারি হাতে পায়ে গোদ পড়িয়াছে বিচি ॥
পৃষ্ঠে তার ধান্যের জেন বড় বড় মোচা।
মাথার চুল বেটীর মাঝে মাঝে কাঁচা ॥
*　　*　　*　　*　　*
আনি নামে আইয় তবে সুনহ বৃর্ত্তান্ত।
মুখে হতে বাহির হইছে চারিহাত দন্ত ॥
তানি নামে আইয় তবে চলিলেক ধাইয়া।
মাথা হতে পায়ের তলা দাউধে গিছে খাইয়া ॥
খানদুই ঝাটা লইল দাউধ খাইজাইবার।
গড়িতে না পারে বেটী দারুণ গোদের ভার ॥" ইত্যাদি

স্বাভাবিক সজীবচিত্র অঙ্কনে কবির হস্ত বড়ই দক্ষ।

"স্রোতে কাপড় গীছে সাধু লাঙ্গটা।
জলের ভিতরে জেন উনমর্ত্ত গোটা ॥
কথগুলা নারী আইল জল ভরিবার।
বাফই করিয়া তারা ছাড়িল ডোকার ॥
তাহা দেখি নারি সব উট্য দিল লোড়।
আছাড় খাইয়া জায় ভুমির উপর ॥
তাহা দেখি লোক সব নারিক জিগ্গাষে।
কি কারণে লোড় দিছ কাহার তরাশে ॥
জে কারণে লোড় দিছি তাহা নাহি জান।
জলে হতে উঠীয়াছে একগোটা দান।
জল ভরিতে জে জায় ঘাটের কুলে।
পাতিল হেন মুখ করি ধরি ধরি গীলে ॥" এবং

ধনা-মনার বর্ণনায়—

"আস্তে বেস্তে বেটা গ্রাস দুই খাইল।
ভাঙ্গা বস নয়া বেটা আচাইবার গেল ॥

(১) ধাই—সখী।

ভাঙ্গাবর বেটার দিষল তার গলা।
খড়িকা খাইতে নিল ঝড়ুনের সলা ॥
আস্থেবেস্থে বেটা কুলকুলা দুই কৈল।
মার্গে হাত মুছিয়া উঠিয়া লড় দিল ॥" ইত্যাদি

অতঃপর কবির করুণ রস :—

"কোন দোশে প্রভু মোরে হইলা অদৃশন।
তোমার মরণে আমার বিফল জীবন ॥
কোপে নিদ্রা যাও প্রভু কোন দোষ পাইয়া।
বারেক বোলন দেও অভাগিনীর মুখ চাইয়া ॥
কোন দোষে প্রভু মরে করিলা অনাথ।
অভাগিনী বিফুলাক সমর্পিলা কাত ॥

* * * *

মোর প্রভু উঠ উঠ মোর প্রভুরে, প্রভুরে তুলিয়া চাও নয়ন।
ইহেন সুন্দর তনু প্রভুরে, প্রকাশিত রজনী,
চন্দ্রসূর্য্য জিনিয়া রূপ প্রভুরে, হেনরূপ হরিল নাগিনীরে ॥
চিরিমো পৈরন খুলি প্রভুরে, হাতের সঙ্খ করিমু চুর।
মুছিয়া ফালাইমু অভাগিনি প্রভুরে, আমার সিথ্যের সিন্দুর রে ॥
ছোট হইয়া আইল নাগ প্রভুরে দেখিতে সুন্দর।
মরি প্রভু খাইয়া নাগ আরে প্রভুরে হইলা অজাগর রে ॥
তোমা লইয়া যাইমু আমি প্রভুরে দেব বিদ্যমান।
পূর্ব্বে নি সুনিছ তুমি প্রভুরে সাবিত্রি সত্যবান্ রে ॥
কাইল খাইল তোমাক প্রভুরে এ কালনাগিনী।
জাগিয়া না ছিনু কেনে প্রভুরে মুঞি অভাগিনী রে ॥

* * * * *

বিলাপ করে বিফুলা নখাই লইয়া ভরে ॥
পাসান খসিয়া জায় বিদড়ে মেদিনী।
ধারা শ্রাবনে ভবে চক্ষুর পড়ে পানি ॥

এ করুণ ক্রন্দনে বাস্তবিক পাষাণ খসিয়া পড়ে। সুকবি-বল্লভের উপাধি যে বর্ণে-বর্ণে সার্থক, তাহার সন্দেহ নাই।

একাদশ কবির সকল প্রকার রচনাই মনোহর। কোথাও কৃত্তিবাসী ধরণে, উপসংহার। কোথাও সংস্কৃত-ভাব পূর্ণতায় আলোচ্য পদ্মাপুরাণ প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যের সত্যসত্যই এক বহুমূল্য রত্ন। গ্রন্থে কতকগুলি মনোহর উপমালঙ্কারযুক্ত পদ পাওয়াও

যায়, অন্যান্য পুঁথিতে তাহা প্রায়ই পাওয়া যায় নাই। স্থূলতঃ প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্য রচয়িতা অন্যান্য কবিগণের রচিত অপরাপর গ্রন্থের তুলনায় এ পদ্মাপুরাণ কোন অংশেই অল্প মূল্যবান্ নহে। এই গ্রন্থ প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্য ভাণ্ডারে অতি সমাদরে রক্ষণীয়, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র ভুল নাই। আমরা সুকবিবল্লভের অমূল্য কীর্ত্তি প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের অপ্রকাশিত লুপ্তপ্রায় রত্ন এই গ্রন্থখানির প্রতি বাঙ্গালা-সাহিত্যের হিতাকাঙ্ক্ষী সহৃদয় সাহিত্যিকবর্গের এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে দেখিলে পরম আনন্দ লাভ করিব।

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।

মুণ্ডেশ্বরীর খোদিতলিপি

এই খোদিতলিপি আরা জেলার ভাবুয়া মহকুমার অন্তর্গত রামগড় নামক একটি গ্রামের নিকটস্থ পর্ব্বতোপরি মন্দিরে পাওয়া গিয়াছে। রামগড় ভাবুয়া হইতে সাত মাইল ও ইষ্টইণ্ডিয়া রেলপথের ভাবুয়া রোড ষ্টেসন হইতে দশ মাইল দূর। পর্ব্বতটি প্রায় ৬০০ ফিট উচ্চ। পর্ব্বতের পূর্ব্বপার্শ্বে আরোহণ করিলে অল্প দূরে প্রস্তরনির্ম্মিত সোপানাবলী পাওয়া যায়, সোপানের উভয়পার্শ্বে ইষ্টকনির্ম্মিত মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ, প্রস্তরনির্ম্মিত দেবমূর্ত্তি ও পর্ব্বতগাত্রে খোদিত মূর্ত্তি প্রভৃতি প্রাচীন নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। পর্ব্বতগাত্রে অতি প্রাচীন অক্ষরে খোদিত শত শত তীর্থযাত্রীর নাম আছে। মুণ্ডেশ্বরীর মন্দির পর্ব্বত-শিখরে অবস্থিত এবং প্রতি বৎসর চৈত্রমাসে এইস্থানে একটী মেলা হইয়া থাকে। মন্দিরটি বাহির হইতে দেখিলে ভগ্ন প্রস্তরস্তূপমাত্রে পর্য্যবসিত বোধ হয়। মন্দিরের শিখর হইতে পতিত প্রস্তরখণ্ডসমূহে মন্দিরের প্রাচীরগুলি আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছে, কেবল পূর্ব্ব ও দক্ষিণদিকের বাতায়ন ও পূর্ব্বপশ্চিমদিকের দ্বারের সম্মুখে সামান্য ভূমি পরিষ্কার আছে। মন্দিরশিখরের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে কয়েকটি বৃহদাকার বন্যবৃক্ষ জন্মিয়াছে। মন্দিরের পূর্ব্বদ্বারের সম্মুখে কয়েকটি প্রস্তরস্তম্ভ অদ্যাপি বিদ্যমান, এইগুলি সম্ভবতঃ মণ্ডপের ধ্বংসাবশেষ, কিন্তু মন্দিরের ছাদ অদ্যাপি পতিত হয় নাই, মন্দিরটির বহির্দ্দেশ চতুষ্কোণ, কিন্তু ভিতরে ইহা অষ্টকোণ। পূর্ব্বদিকের বাতায়নটি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে এবং ইহার চারিপার্শ্বের খোদিত কারুকার্য্য প্রাচীন গুপ্তসম্রাট্‌গণের সমকালীয় খোদিত কারুকার্য্যের অনুরূপ। মন্দিরের মধ্যে একটি চতুর্ম্মুখ মহাদেব অধিষ্ঠিত আছেন। চতুর্ম্মুখ মহাদেব অধিকাংশ বঙ্গবাসীর নিকট অপরিচিত, কিন্তু বিহারে ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ইহা চৌমুখী মহাদেব নামে খ্যাত। পূর্ব্বে

বৈশালী নামক প্রবন্ধে চৌমুখী মহাদেবের উল্লেখ করিয়াছি (১)। একটি লিঙ্গের চারিপার্শ্বে চারিটি মুখ খোদিত থাকে, এইরূপ লিঙ্গকে চতুর্ম্মুখ মহাদেব বলে। কোন লিঙ্গে একটি মুখ, কোনটিতে বা পাঁচটি মুখ খোদিত থাকে, ইহা একমুখী ও পঞ্চমুখী মহাদেব নামে অভিহিত। বুদ্ধগয়ায় প্রাপ্ত একটি খোদিত লিপিতে চতুর্ম্মুখ মহাদেবের নাম পাওয়া গিয়াছে। কানিংহাম সাহেব মহাবোধি নামক গ্রন্থে ইহা প্রকাশ করিয়াছেন।(২) চতুর্ম্মুখ লিঙ্গটির পার্শ্বে একটি দুর্গামূর্ত্তি আছে, মূর্ত্তিগুলি অধিক প্রাচীন বলিয়া বোধ হইল না। এতদ্ব্যতীত মন্দিরের মধ্যে একটি চতুষ্কোণ প্রস্তরনির্ম্মিত আধার (সিন্দুক) ও কমণ্ডলুর ন্যায় একটি বৃহদাকার জলাধার আছে। মন্দিরের বাতায়ন দুইটিতে প্রস্তরের জাফ্রি আছে এবং বাতায়ন ও দ্বারসমূহের পার্শ্বে অনেকগুলি "কুলুঙ্গী" আছে। পূর্ব্বদ্বারের বামপার্শ্বে তিন পংক্তিতে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর অক্ষরে লিখিত একটী খোদিতলিপি আছে—

শ্রীপরবল গম্ভীর মরুচণ্ড।

ডাক্তার ব্লক ১৯০২ খৃষ্টাব্দে এই স্থান প্রথম দর্শন করেন। তিনি এই স্থানের বিবরণ (৩) পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছেন। পর বৎসর মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বস্থ ধ্বংসাবশেষ সমূহ অপসারণকালে খোদিতলিপিযুক্ত দুইখণ্ড প্রস্তর পাওয়া গিয়াছে, এই দুইখণ্ডের প্রতিলিপি ডাক্তার ব্লকের নিকট মন্দিরাধ্যক্ষগণ দ্বারা প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্তু উহার অক্ষরগুলি অত্যন্ত অপরিষ্কার থাকায় তৎকালে উহার পাঠোদ্ধার হয় নাই (৪)। এই সময়ে অনেকগুলি প্রস্তরনির্ম্মিত দেবমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। যথা—অগ্নি, শিব, দুর্গা, গণেশ, কার্ত্তিকেয়, অর্দ্ধনারীশ্বর এবং হরিহর। গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে শীঘ্রই এই মন্দিরের জীর্ণ সংস্কার আরম্ভ হইবে।

পূর্ব্বোক্ত দুইখণ্ড খোদিতলিপিযুক্ত প্রস্তরের মধ্যে একখণ্ড একটী সম্পূর্ণ খোদিতলিপির অর্দ্ধাংশ অপরটী কোন এক বৃহদাকার খোদিতলিপির সামান্য অংশমাত্র। প্রথম খোদিত-লিপিটী যেরূপ অক্ষরে লিখিত, সেইরূপ অক্ষরে লিখিত আর একখানি খোদিতলিপি ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে মুণ্ডেশ্বরী হইতে কলিকাতা মিউজিয়মে আনীত হয়। উভয় প্রস্তরখণ্ড একত্র যোজিত হইলে দেখা যায় যে, কলিকাতা মিউজিয়মের খোদিতলিপি নবপ্রাপ্ত খোদিতলিপির অপরার্দ্ধ (৫)। এই খোদিতলিপিটী ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্, এ,

(১) ভারতী মাঘ ও ফাল্গুন।

(২) Cunningham' Mahabodhi, p. 63-4 plate XXXII, fig. 8.

(৩) Annnual Report of the Archaeological Survey Bengal Circle 1902 p. 20 and Annual Report of the Archæological Survey of India New Series 1902-3, p. 42-43.

(৪) Annual Report of the Archaeological Survey Bengal Circle 1903, p. 3.

(৫) Annual Report of the Archaeological Survey Bengal Circle 1903 part I p. 3 and part II p. 9.

পরীক্ষায় প্রশ্নস্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে মুণ্ডেশ্বরী দুই তিনবার বর্ণিত হইয়াছে (৬)। স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইহা ১৯০০ খৃষ্টাব্দে পরিদর্শন করেন এবং ডাক্তার ব্লককে ইহার সংস্কারার্থ অনুরোধ করেন (৭)।

এই খোদিতলিপি শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামচন্দ্র ভাণ্ডারকর কর্তৃক Epigraphia indica পুস্তকে প্রকাশিত হইবে। খোদিতলিপিযুক্ত প্রস্তরখণ্ড পরবর্ত্তীকালে কোন অজ্ঞব্যক্তি কর্তৃক দ্বিখণ্ডিত হইয়া গৃহনির্ম্মাণকালে ব্যবহৃত হইয়াছিল। এই নিমিত্ত প্রত্যেক পংক্তির মধ্যভাগে এক বা ততোধিক অক্ষর নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বপ্রাপ্ত অংশের অষ্টাদশটী পংক্তি বিদ্যমান আছে, কিন্তু নবপ্রাপ্ত খণ্ডার্দ্ধে পঞ্চদশ পংক্তি পাঠ করা যায় ও ষোড়শ পংক্তির দুই একটি অক্ষর বিদ্যমান আছে। খোদিতলিপিটীর অক্ষরগুলি প্রাচীন গুপ্ত সম্রাট্‌গণের খোদিতলিপির অক্ষরের অনুরূপ। Dr. Bühler Indische palaeography গ্রন্থে এইরূপ অক্ষরকে গুপ্ত ও নাগরাক্ষরের মধ্যবর্ত্তী কহিয়াছেন (৮), কিন্তু গুপ্তাক্ষর হইতে এই খোদিতলিপির অক্ষরের ভিন্নতা অতীব সামান্য। গুপ্তাক্ষর হইতে নাগরাক্ষর উৎপন্ন হইতে ৪০০ শত বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। এই পরবর্ত্তীকালে গুপ্ত ও নাগরাক্ষরের মধ্যবর্ত্তী বহু বিভিন্ন অক্ষর ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ব্যবহৃত হইয়াছে। গুপ্তসাম্রাজ্যের ধ্বংসের অব্যবহিত পরেই এইরূপ অক্ষর ব্যবহৃত হইত। প্রাচীন দশপুরে প্রাপ্ত মহারাজ যশোধর্ম্মদেবের খোদিতলিপি (৯) (মালবস্থিত্যব্দ ৫৮৯ খৃষ্টাব্দ ৫৩২) ও বলভীপতি মহারাজ ধ্রুবসেনের তাম্রশাসনত্রয় (১০) (গুপ্তসংবৎ ২১৬ খৃঃ ৫৩৫, গুপ্তসংবৎ ২১৭ ও ২২১) প্রভৃতি ইহার উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। মুণ্ডেশ্বরীর খোদিতলিপির অক্ষর গঞ্জামে প্রাপ্ত মহারাজাধিরাজ শশাঙ্ক-নরেন্দ্রগুপ্তের তাম্রশাসন (১১) ও খৃষ্টীয় সপ্তমশতাব্দীর নেপালে প্রাপ্ত মহাসামন্ত অংশুবর্ম্ম

(৬) Martin's Eastern India, Vol 1 p. 456-7.

List of Ancient Monuments in Bengal (Published by the Publie Works department 1895) p. 370-71 mentions "district Shahabad Mundeswari—This temple is situated five miles east of Chaimpur. It is said to have been built by Munda daitya whose abode was in Garohal."

(৭) Annual Report of the Archaeological Survey Bengal Circle Appendix. A. p. XII.

(৮) Indische Palaeography, p. 46-49.

(৯) Mandasor Inscription of Yasodharman, Corpus Inscrfptionum, vol. III, p. 142 plates xxii.

(১০) Plates Dhruva Sena 1 of Balabhi—Indian Antiquary, vol. iv. p. 105, Journal of the Royal Asiatic Society, 1895, p. 382 and Wiener Zeitschrift (Vienna Oriental Journal) vol. vi, p. 297.

(১১) Epigraphia Indica, vol ii.

দেবের খোদিতলিপিসমূহের (১২) অক্ষরের অনুরূপ। বুদ্ধগয়ায় প্রাপ্ত লঙ্কাবাসী স্থবির মহানামের খোদিতলিপি (১৩) (গুপ্তসংবৎ ২৬৯ খৃষ্টাব্দ ৫৮৮) ও মধুবনে প্রাপ্ত মহারাজাধিরাজ হর্ষবর্দ্ধনের তাম্রশাসন (হর্ষসংবৎ ২৫ খৃষ্টাব্দ ৬২৯।৩০) ও বাঁশখেরায় প্রাপ্ত উক্ত হর্ষবর্দ্ধনের তাম্রশাসনের (১৪) (হর্ষসংবৎ ২২ খৃষ্টাব্দ ৬২৭।৮) অক্ষর পূর্ব্বোক্ত খোদিতলিপিসমূহের অক্ষর হইতে বিভিন্ন। ইহার কারণ এই, অতি প্রাচীনকালে সমগ্র ভারতবর্ষে এক প্রকার অক্ষরই প্রচলিত ছিল। গান্ধার হইতে কামরূপ এবং কিরাত রাজ্য হইতে বর্তমান সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত এক ব্রাহ্মীলিপি প্রচলিত ছিল। পরে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে অক্ষরগুলি ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিতে আরম্ভ করে। পারসীক সম্রাট্‌গণকর্ত্তৃক গান্ধার এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তস্থিত প্রদেশসমূহ বিজিত হইলে, উক্ত প্রদেশসমূহে অরমীয় অক্ষরের অনুরূপ এক প্রকার লিপি প্রচলিত হয়। খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে ভারতে লিপির বিশেষ ভিন্নতা ছিল না, কিন্তু দুই একটি অক্ষরে লিখনপ্রণালীতে ভিন্নতা আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু ইহার ২০০ শত বৎসর পরে এই ভিন্নত্ব স্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়াছে। দক্ষিণভারতেও ভট্টিপ্রলু (১৫) নামক স্থানে প্রাপ্ত প্রস্তরাধারগুলির খোদিতলিপির অক্ষর উত্তরভারতের পভোসা নামক গ্রামের নিকটস্থ প্রাচীন প্রভাস পর্ব্বতের এক গুহার উপরিস্থ খোদিতলিপির (১৬) অক্ষরসমূহ হইতে বিভিন্ন। পভোসা গ্রাম যমুনার উত্তরতীরে অবস্থিত ও প্রয়াগ হইতে ৩১ মাইল দূর। ভট্টিপ্রলু মান্দ্রাজপ্রদেশে অবস্থিত। ইহার পর গুপ্তসম্রাট্‌গণের রাজত্বকালে এই ভিন্নতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া উত্তর ও দক্ষিণদেশীয় লিপিদ্বয়কে দুইটী ভিন্ন লিপি করিয়া তুলিয়াছে। সাঞ্চীতে প্রাপ্ত সম্রাট্ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের খোদিতলিপি ও জুনাগড়ে প্রাপ্ত সম্রাট্ স্কন্দগুপ্তের খোদিতলিপির (১৭) অক্ষর ও গুপ্ত সম্রাট্‌গণের উত্তরভারতীয় খোদিতলিপিসমূহের অক্ষর এক প্রকারের অক্ষর নহে। পরে উত্তরভারতে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে অক্ষরসমূহের আকারের পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়। উত্তরভারতে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে দুই প্রকার লিপি প্রচলিত ছিল। পূর্ব্বভারতে একপ্রকার লিপিব্যবহার হইত ও পশ্চিমভারতে অন্যপ্রকার লিপি ব্যবহার

(১২) Inscriptions from Nepal, Bhagwan Lal Indraji and Bühler, Indian Antiquary, vol. ix and vol. xiv. p. 96. also Prof. Bendal's Journey to Nepal, p. 72.

(১৩) Bodh Gaya Inscription of Mahánáman, Fleet's Corpus Inscr. Indicarum, vol. iii, p. 279-279 plate xii.

(১৪) Madhuban Copper-plate of Harsa Epigraphia Indica, vol I, p. 67, and vol iii.

Banskhera Copperplate of Harsa, Epigraphia Indica, vol iv. p. 240.

(১৫) Bhattiprolu Casket Inscriptions, Epigraphia Indica, vol iv.

(১৬) Pabhosa Inscriptions, Epigraphia Indica, vol. ii.

(১৭) Sanchi Inscription of Chandra Gupta II and Iunagadh Inscription of Skanda Gupta, Corpus Inscriptionum Indicarum, vol iii.

হইত। পূর্ব্বোক্ত গয়াতে প্রাপ্ত শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্তের খোদিতলিপি ও নেপালের ভাটগাঁওয়ে প্রাপ্ত মহারাজ শিবদেব ও মহাসামন্ত অংশুবর্ম্মের খোদিতলিপি পূর্ব্বভারতীয় অক্ষরের উদাহরণস্বরূপ এবং হর্ষবর্দ্ধনের বাঁশখেরা ও মধুবনেপ্রাপ্ত তাম্রশাসনদ্বয় পশ্চিমভারতীয় অক্ষরের উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী অতিবাহিত হইলে পূর্ব্ব-ভারতীয় লিপি দুই অংশে বিভক্ত হইয়া বঙ্গাক্ষর ও নাগরাক্ষরে পরিণত হয়। বর্ত্তমান বৎসরে বুদ্ধগয়ার মন্দিরশিখর হইতে পতিত ইষ্টকসমূহ মধ্যে খোদিতলিপিযুক্ত কতকগুলি ইষ্টক পাওয়া গিয়াছে। এই গুলির একপার্শ্বে বঙ্গাক্ষরে ধর্ম্মসিংহ নামক এক ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়, অপরপার্শ্বে ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় কয়েকটি অক্ষর খোদিত আছে। অন্যান্য খোদিতলিপি হইতে জানা যায় যে, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধে ব্রহ্মরাজ শ্রীধর্ম্মরাজগুরু নামক এক কর্ম্মচারীকে মহাবোধি-বিহার সংস্কারার্থ প্রেরণ করেন (১৮)। ইহার পর প্রায় অষ্টমশতাব্দী পরে ব্রহ্মদেশীয়গণ রাজাদেশে পুনরায় মহাবোধিবিহার সংস্কারের নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছিলেন। শেষোক্ত কর্ম্মচারিগণ ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে বুদ্ধগয়া দর্শন করেন। ইহার মধ্যে আর কখনও ব্রহ্মদেশীয়গণকর্ত্তৃক উক্ত মন্দির সংস্কৃত হয় নাই। ব্রহ্মদেশের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ Mr. Taw-sein-ko লিখিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত ইষ্টক-গাত্রস্থ ব্রহ্মদেশীয় অক্ষরগুলি অতি প্রাচীন। ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বভাগে পূর্ব্বভারতে নাগরাক্ষর ও বঙ্গাক্ষর উভয়ই প্রচলিত ছিল, কারণ পালরাজগণের খোদিতলিপি ও তাম্রশাসনাদিতে নাগরাক্ষরই ব্যবহৃত হইয়াছে।

মুণ্ডেশ্বরীর খোদিত লিপিটির ভাষা সংস্কৃত, ইহা গোমিভট নামক এক কুলপতি ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক বিনীতেশ্বর নামক এক মঠের নিকটে এক মন্দিরনির্ম্মাণকল্পে বিষ্ণুমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা ও বিগ্রহের সেবার নিমিত্ত প্রত্যহ দুই প্রস্থ তণ্ডুল ও একপল তৈল ও পঞ্চাশৎ সংখ্যক দীনারের বন্দোবস্ত করণের স্মরণার্থ উৎকীর্ণ। খোদিত লিপিটীর প্রথম পংক্তিতে "সংবৎসরের ত্রিংশতিতমে" উৎকীর্ণ আছে, কিন্তু এই সংবৎসর কোন্ সংবৎসর? ইহা বিক্রমসংবৎ বা শকাব্দ হইতে পারে না, কারণ অক্ষরগুলি ঐ সময়ের বহু পরে প্রচলিত ছিল। গুপ্তসম্রাট্‌গণ কর্ত্তৃক ৩১৯ খৃষ্টাব্দে যে অব্দ স্থাপিত হয়, তাহা গুপ্তাব্দ নামে খ্যাত। এই সংবৎ যদি গুপ্তসংবৎ হয়, তাহা হইলে ইহা মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে খৃষ্টীয় ৩৪৯ অব্দে খোদিত হইয়াছিল। কিন্তু গুপ্তসম্রাট্ স্কন্দগুপ্ত ও দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের খোদিতলিপির অক্ষরগুলি ইহাপেক্ষা প্রাচীন, এই হেতু ইহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে যে মুণ্ডেশ্বরীর খোদিত লিপির সংবৎ গুপ্তসংবৎ নহে। ইহার পর স্থাণ্বীশ্বরের হর্ষবর্দ্ধন ৬০৬ খৃষ্টাব্দে যে অব্দ প্রচলন করেন, তাহাই পূর্ব্বভারতে প্রচলিত ছিল জানা যায়। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এই খোদিত লিপির অক্ষরগুলি হর্ষবর্দ্ধনের বাঁসখেরা ও মধুবন তাম্রশাসনের অক্ষরাপেক্ষা প্রাচীন। অথচ ইহার অক্ষরগুলি নেপালের মহাসামন্ত

(১৮) Report of the Archaeological Survey, vol iii and Cunningham's Mahabodhi, p. 70-77.

অংশুবর্ম্মার খোদিত লিপিসমূহের অক্ষরের অনুরূপ। অংশুবর্ম্মার অনেকগুলি খোদিতলিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে একটীতে সংবৎ ৩১৬ ও অপর গুলিতে ৩৪ হইতে ৪৫ পর্য্যন্ত সংবৎসর সমূহের উল্লেখ আছে। স্বর্গগত পণ্ডিত ভগবান্‌লাল ইন্দ্রজী (১৯) স্থির করিয়াছেন যে সংবৎ ৩১৬ গুপ্ত সংবৎ অর্থাৎ খৃষ্টাব্দ ৬৩৫, অতএব অন্যান্য সংবৎগুলি হর্ষসংবৎ অর্থাৎ খৃষ্টাব্দ ৬৩৯, ৬৪০, ৬৪৪ ও ৬৫০। সুতরাং ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, মুণ্ডেশ্বরীর শিলালিপির সংবৎ হর্ষসংবৎ ব্যতীত অন্য কোন অব্দ হইতে পারে না। হর্ষসংবৎ সম্বন্ধে আর একটী আলোচ্য বিষয় আছে। খৃষ্ট ৬৩৭ অব্দে চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউয়েন-চিয়ং নেপাল সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে নেপালরাজ অংশুবর্ম্মা বা অং-শু-ফু-মো পরলোকগত হইয়াছেন। হিউয়েন-চিয়ং স্বয়ং নেপালে গমন করেন নাই। তিনি কান্যকুব্জে জনশ্রুতিতে অবগত হন যে তাঁহার আগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বেই অংশুবর্ম্মার মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অংশুবর্ম্মা তাহার পর চতুর্দ্দশবর্ষ জীবিত ছিলেন। . . .

মুণ্ডেশ্বরীর খোদিতলিপি।

১। ওঁ সংবৎসরে ত্রিংশতি(তমে) কার্ত্তিকদিবসে দ্বাবিংশতিমে
২। অস্মিন্ সম্বৎসরমাস (দিব)স পূর্ব্বায়াং শ্রীমহাসামন্ত
৩। মহাপ্রতীহার মহারাজো(দ)য়সেন রাজ্যে কুলপতি ভাগুদলন-
৪। স্স দেবনিকায়ং দণ্ড(না)য়ক গোমিভটেন প্রার্থয়িত্বা
৫। মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পু(ণ্যা)ভিবৃদ্ধয়ে বিনীতেশ্বর মঠসমা-
৬। বেশং মঠমেতং কারিতকং শ্রী (শ্রী) নারায়ণদেবকুলস্য।
৭। শ্রীমণ্ডলেশ্বর স্বামি (পাদা) য়া কোষ্ঠিকাতঃ আচন্দ্রার্ককৃসম
৮। কালীয়মক্ষয়ং প্রতি(দিনং) নৈবেদ্যার্থং তণ্ডুলপ্রস্থদ্বয়ং
৯। দীপতৈল পলস্য চো(পনি)বদ্ধঃ কারিতঃ শ্রীমণ্ডলেশ্বর
১০। স্বামিপাদানাং বিচ্ছি(ত্তিবি)শ্রান্ততন্ত্রসাধারণং পঞ্চাশতাং
১১। দীনারাণাং শোব (* *) জ ভক্তাদ্যুপকরণানি
১২। দেবনিকায়স্য দত্ত(মেত)দেবং বিদিত্বা যথা কাল্যাধ্যাসিতি
১৩। বাপো বর্ণিকৈর্ব্বাম (থা) নিবদ্ধস্য বিদ্যাতোকার্য্য
১৪। এবমভিশ্রাবিতো যো(ন্যেথা) কুর্য্যাৎ স মহাপাতকৈ স্সহ
১৫। নরকে বসেৎ এবং (সর্ব্বস্য) ধারণায়াং অধ্য
১৬। ভ তমিতি। উক্তঞ্চ

(১৯) Indian Antiquary, vol, xiii.

মুণ্ডেশ্বরীর খোদিত-লিপি

১৭। (স্বদত্তাং পরদত্তাং বা) যত্নাদ্রক্ষ যুধিষ্ঠির
১৮। মহীং মহীভৃতাং (শ্রেষ্ঠ) দানাচ্ছ্রেয়োঽনুপালনং

(বঙ্গানুবাদ)

১। ওঁ সম্বৎসর ত্রিংশতি কার্ত্তিকের দ্বাবিংশতি দিবস
২। পূর্ব্বোক্ত বর্ষমাস ও দিনে মহাসামন্ত মহাপ্রতীহার মহারাজ
৩। উদয়সেনের রাজ্যে কুলপতি ভাগুদলন
৪। দণ্ডনায়ক গোমিভটের দ্বারা দেবতুল্য শরীর রাজার নিকট প্রার্থনা করাইয়া
৫। নিজের ও তদীয় মাতা পিতার পুণ্যবৃদ্ধ্যর্থে বিনীতেশ্বর নামক মন্দিরের
৬। নিকটে এই মন্দির নারায়ণের নানাবিধ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।
৭। শ্রীমণ্ডলেশ্বর স্বামিপাদের নিমিত্ত চিরকাল যতদিন চন্দ্র সূর্য্য উদয় হইতে থাকিবেন,
৮। প্রত্যহ নৈবেদ্যের নিমিত্ত দুই প্রস্থ তণ্ডুল এবং একপল তৈলের বন্দোবস্ত করা হইল।
৯। এবং শ্রীমণ্ডলের স্বামিপাদের নিমিত্ত সীমান্ত বিশ্রান্ত প্রজা সাধারণের মধ্যে (প্রচলিত)
১০। পঞ্চাশদীনারের (সূদ হইতে) অন্ন ও অন্যান্য ভোজ্য উপকরণাদিরও (বন্দোবস্ত করা হইল)
১১। ১২। ইহা রাজদত্ত জানিয়া সাময়িক অধ্যক্ষগণ
১৩। ও আগন্তুক বণিকৃগণ এই বন্দোবস্তের বিঘ্ন উৎপাদন না করে
১৪। ইহা শুনিয়া যে কেহ অন্যথা করিবে সে মহাপাতকযুক্ত হইয়া
১৫। নরকে বাস করিবে
১৬। কথিত আছে
১৭। হে ভূপালশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! স্বদত্ত বা পরদত্ত ধন বা ভূমি যত্নের সহিত রক্ষা করা
১৮। উচিত, কারণ দানাপেক্ষা রক্ষণ অধিকতর শ্রেয়ঃ।

এই খোদিতলিপির ভাষা শুদ্ধ সংস্কৃত নহে। প্রথম পংক্তিতে সংবৎসর শব্দে অন্তঃস্থ 'ব' স্থানে বর্গীয় "ব" ব্যবহৃত হইয়াছে। এইরূপ ভ্রম মহারাজাধিরাজ হর্ষবর্দ্ধনের মধুবন তাম্রশাসনে প্রথম দেখা যায়। Dr. Biihlerএর মতে এইরূপ ভ্রম উচ্চারণজনিত দোষে আরম্ভ হয়। এইরূপ "কারিতকং" "স্বামিপাদানাং" "বণিকৈঃ" প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ ব্যাকরণদুষ্ট। পঞ্চদশ পংক্তির শেষাংশের অসম্পূর্ণতাহেতুক কোন অর্থ হয় নাই। দান-সংক্রান্ত তাম্রানুশাসন বা খোদিত লিপিমাত্রেই এক বা ততোধিক শ্লোক উক্ত থাকে। এই সমুদয় প্রায়ই নিষেধার্থক। মুণ্ডেশ্বরীর খোদিতলিপিতে এইরূপ একটি শ্লোকের দ্বিতীয় চতুর্থচরণ বিদ্যমান আছে।

মুণ্ডেশ্বরীর খোদিতলিপির সময়ে ভারতের অবস্থা

গৌতমবুদ্ধের মহাপরিনির্ব্বাণের পর হইতে মুসলমান বিজয় পর্য্যন্ত কাল চারিভাগে বিভক্ত হইতে পারে—১ম শিশুনাগ ও মৌর্য্যবংশীয়গণের অধিকারকাল। ২য় শকাধিকার-কাল ;

৩য় প্রাচীন গুপ্তসম্রাট্‌গণের অধিকার-কাল। ৪র্থ স্থাণ্বীশ্বরের হর্ষবর্দ্ধন প্রমুখ রাজপুত রাজগণের অধিকারকাল। খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৪৩ বা ৪৭৭ হইতে খৃষ্টপূর্ব্ব ২০০ পর্য্যন্ত মৌর্য্যাধিকার কাল। ইহার পর পূর্ব্বভারতে মিত্র বা শুঙ্গবংশীয় ও পরে কণ্ববংশীয় রাজগণ ও ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে যবনরাজগণ রাজত্ব করিতেন। খৃষ্টপূর্ব্ব ৭২ হইতে ৩১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শকাধিকার কাল। এই সময়ের ইতিহাস শতাধিক খোদিতলিপির অস্তিত্ব সত্ত্বেও অন্ধকারাচ্ছন্ন। বারান্তরে শকাধিকার সম্বন্ধে কতকগুলি নূতন তত্ত্ব পাঠকদিগের সমক্ষে উপস্থিত করিবার চেষ্টা করিব। খৃষ্টাব্দ ৩১৯ হইতে ৫৩০ পর্য্যন্ত গুপ্তাধিকারকাল। প্রাচীন গুপ্তসম্রাট্‌গণের পূর্ব্বপুরুষ মহারাজ শ্রীগুপ্ত যে শকজাতীয় সম্রাট্‌গণের সামন্তরাজ ছিলেন, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। তাহার পুত্র ঘটোৎকচগুপ্তও সামান্য করপ্রদ ভূপতি ছিলেন। ঘটোৎকচগুপ্তের পুত্র চন্দ্রগুপ্ত (প্রথম) পাটলীপুত্রের পরাক্রান্তা লিচ্ছবিবংশের এক কুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহাদের সহায়তায় স্বাধীন রাজপদে উন্নত হইয়া স্বনামে মুদ্রাঙ্কণ আরম্ভ করেন ও স্বীয় অভিষেকের বর্ষ হইতে এক অব্দ প্রচলন করেন, ইহাই গুপ্তসংবৎ বা গুপ্তবলভী সংবৎ নামে খ্যাত। তাঁহার পর সমুদ্রগুপ্ত কাবুল হইতে বঙ্গ পর্য্যন্ত ও নেপাল হইতে কাঞ্চী পর্য্যন্ত সমস্ত রাজগণকে পরাজিত করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। সমুদ্রগুপ্তের পুত্র চন্দ্রগুপ্ত (দ্বিতীয়) সম্ভবতঃ মথুরা ও পঞ্জাবের শকজাতীয় রাজগণকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের রাজ্য অধিকার করেন ও পরে মালব ও গুর্জ্জরদেশের শকরাজ্য অধিকার করেন। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র কুমারগুপ্ত (১ম) দীর্ঘকাল শান্তিতে রাজ্যভোগ করেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র স্কন্দগুপ্ত রাজ্য-প্রাপ্ত হন। এই স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালে ভারতের প্রথম হূণাক্রমণ সংঘটিত হয়, হূণযুদ্ধের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ মহারাজাধিরাজ স্কন্দগুপ্ত স্বনামাঙ্কিত সুবর্ণমুদ্রায় অর্দ্ধাধিক তাম্র মিশ্রিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বারংবার হূণ-আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে করিতেই তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। যে জাতি প্রবল পরাক্রান্ত রোমকসাম্রাজ্যের ধ্বংসের কারণ, সেই জাতিকর্ত্তৃকই প্রাচীন গুপ্তসাম্রাজ্যের ধ্বংস সংসাধিত হইয়াছিল। স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতা স্থিরগুপ্ত বা পুরগুপ্ত উত্তরভারতে রাজ্য করিতে থাকেন। মালবে তাঁহাদিগের আর এক বংশ নামমাত্র করপ্রদ রাজারূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন। গুর্জ্জরে তাঁহাদের প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। পঞ্চনদ ও অন্তর্ব্বেদী সম্ভবতঃ হূণগণের করতলগত হইয়াছিল। পুরগুপ্তের পুত্র নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য মগধে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার সময়ে হূণজাতীয় তোরমাণ উত্তরপশ্চিমভারতে এক প্রবলপরাক্রান্ত সাম্রাজ্য স্থাপন করেন, নরসিংহ গুপ্ত বালাদিত্য গুর্জ্জরাধিপতি ভটার্ক ও অন্যান্য সামন্ত-রাজগণের সাহায্যে তোরমাণকে সিন্ধুনদের পশ্চিমপারে দূর করিয়া দেন, কিন্তু তোরমাণের পুত্র মিহিরগুল বা মিহিরকুল পুনরায় সিন্ধুপারে আসিয়া পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন। নরসিংহ গুপ্ত বালাদিত্য যশোধর্ম্মদেব-প্রমুখ সামন্তরাজগণের সাহায্যে মিহিরগুলকে কোরুরের মহাযুদ্ধে পরাজিত করেন, এই ঘটনা সম্ভবতঃ ৫২৮ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হয় ও মিহিরগুল ধৃত হন, কিন্তু

নরসিংহ গুপ্তের মাতার অনুগ্রহে মুক্তিলাভ করিয়া কাশ্মীরে আসিয়া নবরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পর তিনি মাতৃগুপ্ত নামে পরিচিত হন। নরসিংহগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত অল্পদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর যশোধর্ম্মদেব স্বাধীনতাবলম্বনপূর্ব্বক পরমেশ্বর পরম ভট্টারক নামে পরিচিত হন। দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পর তৎপুত্র বিষ্ণুগুপ্ত চন্দ্রাদিত্য তাঁহার মগধের রাজত্ব প্রাপ্ত হন, ইনি সম্ভবতঃ যশোধর্ম্মদেবের সামন্ত রাজা ছিলেন। ইহার পর সম্রাট্ প্রথম কুমার গুপ্তের বংশলোপ হয় ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণগুপ্ত বা গোবিন্দগুপ্তের বংশোৎপন্ন প্রথম জীবিতগুপ্ত মগধের আধিপত্য লাভ করেন। কোশলে ও কাশীতে সম্ভবতঃ ইহাদের অন্য একশাখা-সম্ভূত রাজগণ রাজত্ব করিতেন। ইহাদিগের দুই জনের নাম পাওয়া গিয়াছে যথা—বালাদিত্য ও প্রকটাদিত্য। (২০)

গুর্জ্জরে ভটার্কের বংশধরগণ স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। মালবে স্কন্দগুপ্ত ও নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্যের সমসাময়িক সামন্তরাজ বুধগুপ্ত ও ভানুগুপ্তের বংশধরগণ স্বাধীন হইয়াছিলেন। কান্যকুব্জে মৌখরিবংশীয় রাজপুত রাজগণ সম্রাট্ উপাধি গ্রহণ করেন। মৌখরিগণের সহিত মগধের গুপ্তরাজগণের বংশানুক্রমিক বিবাদ ছিল। এই সময়ে স্থাণীশ্বরের রাজপুত রাজবংশ ক্রমশঃ পরাক্রান্ত হইয়া উঠে। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে ঐ বংশের প্রভাকরবর্দ্ধন নামক একজন নরপতি সিন্ধুতীরস্থ হূণগণকে ও রাজপুতনার গুর্জ্জরদিগকে পরাজিত করিয়া পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন। ইনি মগধের রাজা মহাসেনগুপ্তের ভাগিনেয়। প্রভাকরবর্দ্ধনের দুই পুত্র, রাজ্যবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধন। ৬০৪ খৃষ্টাব্দে প্রভাকরবর্দ্ধন তাঁহার সাম্রাজ্যের উত্তরপশ্চিমসীমান্তবাসী হূণগণকে জয় করিবার নিমিত্ত তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যবর্দ্ধনকে প্রেরণ করেন। রাজ্যবর্দ্ধনের অনুপস্থিতিকালে প্রভাকরবর্দ্ধনের মৃত্যু হয়। এই সংবাদ রাজ্যবর্দ্ধনের নিকট প্রেরিত হইলে তিনি দিগ্‌বিজয়ের আশা পরিত্যাগ করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই সংবাদ আসে যে, তাঁহার ভগিনীপতি কান্যকুব্জরাজ গ্রহবর্ম্মা মালবরাজকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন ও তাঁহার ভগিনী রাজ্যশ্রী সামান্য তস্করপত্নীর ন্যায় শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া কারাগারে বাস করিতেছেন। রাজ্যবর্দ্ধন তৎক্ষণাৎ যুদ্ধযাত্রাপূর্ব্বক মালবরাজকে পরাজিত করেন, কিন্তু তিনি মালবরাজের আত্মীয় গৌড়ের রাজা শশাঙ্ককর্ত্তৃক নিহত হন। শশাঙ্ক রাজ্যবর্দ্ধনকে সন্ধির নিমিত্ত নিজ শিবিরে আহ্বানপূর্ব্বক বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া হত্যা করেন। অল্পদিন মধ্যেই এই সংবাদ রাজ্যবর্দ্ধনের কনিষ্ঠ হর্ষবর্দ্ধনের নিকট উপস্থিত হয়। হর্ষবর্দ্ধন ৬০৬ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। পরে তিনি তাঁহার অভিষেক বর্ষ হইতে এক অব্দ প্রচলন করেন। তাহাই পরে হর্ষ-

---

(২০) এই অংশ নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি হইতে সংগ্রহ করিয়াছি—

V. A. Smith's Early History of India, Haraprasad Sastri's History of India and Bhitari Seal of Kumar Gupta II, Journal Asiatic Society of Bengal (Vol Lviii, pt. I for 1889.)

সংবৎ নামে খ্যাত হইয়াছে। সিংহাসন আরোহণ করিবার পর হর্ষবর্দ্ধন তাঁহার ভগিনী রাজ্যশ্রীর উদ্ধারের জন্য ব্যাপৃত হন। তিনি অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে, রাজ্যশ্রী কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া বিন্ধ্যপর্ব্বতে লুক্কায়িতা আছেন। বহু চেষ্টার পর অসভ্য বনবাসিগণের সাহায্যে তিনি রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হন। এই সময়ে স্থাণ্বীশ্বরের রাজপুত সাম্রাজ্য সিন্ধুনদীর তট হইতে প্রয়াগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু দিল্লী হইতে প্রয়াগ পর্য্যন্ত ভূমি তাঁহাদের রাজ্যভুক্ত ছিল না। ইহা তাঁহাদিগের অধীনস্থ মৌখরিবংশীয় রাজগণের অধীন ছিল। দক্ষিণে উজ্জয়িনীতে প্রাচীন গুপ্ত সম্রাট্‌গণের বংশধরগণ তখনও বিদ্যমান ছিলেন। পূর্ব্বে মগধে ও বঙ্গেও ঐ প্রাচীন রাজবংশসম্ভূত নৃপতিগণ রাজ্য করিতেছিলেন। উত্তরে বর্ব্বর হূণজাতির ক্ষমতা তখনও বিলুপ্ত হয় নাই। রাজ্যশ্রীর উদ্ধারের পর হর্ষবর্দ্ধন সমুদয় ভারত জয় করিবার কল্পনা করেন। প্রমাণ পাওয়া যায় যে, পঞ্চত্রিংশ বর্ষব্যাপী যুদ্ধে তিনি কামরূপ হইতে সপাদলক্ষ ও নেপাল হইতে গুজরাট্ পর্য্যন্ত সমুদয় আর্য্যাবর্ত্ত স্বীয় পদানত করেন। তাঁহার দিগ্বিজয়ের বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে তাঁহাকে বহুকষ্টে মগধ জয় করিতে হইয়াছিল ও তিনি তাঁহার ভ্রাতৃঘাতী শশাঙ্কের বিশেষ ক্ষতি করিতে পারেন নাই। আর্য্যাবর্ত্ত বিজিত হইলে হর্ষবর্দ্ধন দক্ষিণাপথবিজয়ের চেষ্টা করেন, কিন্তু চালুক্যবংশীয় দ্বিতীয় পুলিকেশির দ্বারা তিনি নর্ম্মদাতটে পরাজিত হন। হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্যকালীন ঘটনাসমূহের প্রধান ইতিবৃত্তলেখক চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউয়েন-চিয়ংএর বর্ণনা স্বর্গগত রজনীকান্ত গুপ্ত তাঁহার আর্য্যকীর্ত্তি নামক পুস্তকে অনুবাদ করিয়াছেন। হিউয়েন-চিয়ং অতি অল্প সময়ের মধ্যে হর্ষবর্দ্ধনের বিশেষ অনুরাগভাজন হইয়া উঠেন। প্রত্যাগমনকালে হর্ষবর্দ্ধন তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য একজন সামন্ত রাজাকে ভারতের সীমান্ত পর্য্যন্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন। হিউয়েন-চিয়ংএর বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, সেনাপতি ভটার্কের বংশোদ্ভূত বলভীরাজগণ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। হিউয়েন-চিয়ং লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, শশাঙ্ক বৌদ্ধদ্বেষী। মধুবন ও বাঁশখেরা তাম্রশাসনদ্বয় হইতে জানা যায় যে, রাজ্যবর্দ্ধন "পরম সৌগত" বা বৌদ্ধ ও হর্ষবর্দ্ধন "পরম মাহেশ্বর" বা শৈব ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের পিতা ও পূর্ব্বপুরুষগণ "পরমাদিত্যভক্ত" বা সূর্য্যোপাসক ছিলেন। হিউয়েন-চিয়ং হর্ষবর্দ্ধন সম্বন্ধে একটি আশ্চর্য্য আখ্যান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। হিউয়েন-চিয়ং যখন তাঁহার সভায় অবস্থান করিতেছিলেন, তখন হিন্দু জৈন প্রভৃতি নানা মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ এই বিদেশী শ্রমণের সহিত বিচার করিতে আসিতেন। সম্ভবতঃ হিউয়েন-চিয়ং দুই একবার পরাস্ত হইয়াছিলেন, কারণ ইহার পর হর্ষবর্দ্ধন এক আজ্ঞা প্রচার করেন যে, চীনপরিব্রাজকের বিরুদ্ধে যিনি কোন কথা বলিবেন, রাজাদেশে তৎক্ষণাৎ তাঁহার জিহ্বা কর্ত্তিত হইবে। হিউয়েন-চিয়ংএর জীবনীলেখক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, ইহার পর ভিন্ন মতাবলম্বী কোন ব্যক্তিই বিচারার্থ আসিত না। বৌদ্ধ ইতিহাসকার লামা তারানাথ এইরূপ একটী ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে হর্ষবর্দ্ধন মূলতানের নিকট এক কাষ্ঠের সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করান। তিনি এই স্থলে নানা দিগ্‌দেশ হইতে বিধর্ম্মী পণ্ডিতগণকে

নিমন্ত্রণ করিয়া আনয়নপূর্ব্বক কয়েক মাস ধরিয়া তাহাদের পরিতৃপ্তি সাধন করিতেন, শেষে তিনি এ সংঘারামে অগ্নিসংযোগ করিয়া তাঁহাদিগকে বিনাশ করেন। এইরূপে দ্বাদশ সহস্র ভিন্ন মতাবলম্বী পণ্ডিত বিনষ্ট হন। কথিত আছে, এই ঘটনার পর পারসীক ও শকগণের ধর্ম্ম প্রায় এক বৎসর খোরাসানবাসী কয়েকজন তন্তুবায়কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছিল।

হর্ষবর্দ্ধন চীনসাম্রাজ্যের সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি এক ব্রাহ্মণকে দূত স্বরূপ চীনদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঐ দূত ৬৪৩ খৃষ্টাব্দে চীন সম্রাট্কর্ত্তৃক প্রেরিত অন্যান্য দূতগণের সহিত ভারতে প্রত্যাগমন করেন। চীন দূতগণ দুই বৎসরকাল ভারতে বাস করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ৬৪৬ খৃষ্টাব্দে চীনসম্রাট্ পুনরায় ত্রিংশ সংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্যের সাহায্যে আরও কয়েকজন দূত প্রেরণ করেন। কিন্তু ইহারা মগধে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় মন্ত্রী অর্জ্জুন সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার আদেশে চীনদেশীয় দূতগণের সম্পত্তি লুণ্ঠিত ও অশ্বারোহিগণ নিহত হয়। প্রধান দূত ও তাহার সহকারী অতি কষ্টে নেপালে পলায়ন করেন। এই সময়ে তিব্বতে প্রবল পরাক্রান্ত স্রোং-সান-গাং-পো অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রধান দূত ওয়াং-হিউয়েন-সে তাঁহার সাহায্যে ৪০০০ তিব্বতীয় অশ্বারোহী ও সপ্তসহস্র নেপালী পদাতিক সংগ্রহ করিয়া তীরভুক্তির প্রধান নগরী বৈশালী অধিকার করেন ও পরে অর্জ্জুনকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাহাকে বন্দিভাবে চীনদেশে লইয়া যান। ইহার পর সম্ভবতঃ হর্ষবর্দ্ধনের বংশধরগণ সিংহাসনে পুনরধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। নেপাল-বংশাবলী হইতে জানা যায় যে, রাজা বিক্রমাদিত্য উক্ত দেশ জয় করিয়া তাঁহার অব্দ ঐ দেশে প্রচলন করেন। এই বিক্রমাদিত্য সম্ভবতঃ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য, কারণ নেপালে গুপ্তসংবৎ ও হর্ষসংবৎ ব্যতীত অন্য কোন প্রাচীন অব্দের ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যায় না ও ইহার মধ্যের দ্বিতীয়টীর প্রচারক, হর্ষবর্দ্ধন বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করেন নাই। নেপাল বংশাবলী ও রাজতরঙ্গিণীতে গুপ্তনামধারী রাজগণের নাম পাওয়া যায়, সম্ভবতঃ ইঁহারাও প্রাচীন গুপ্তসম্রাট্গণের বংশসম্ভূত। হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে মালব ও মগধের রাজগণ তাহার অধীনে করপ্রদ রাজা ছিলেন। মালবরাজগণ হর্ষবর্দ্ধনের পূর্ব্ব হইতেই স্থাণ্বীশ্বরের রাজগণের অধীন ছিলেন, কারণ মহাকবি বাণভট্টের হর্ষচরিতে দেখা যায় যে হর্ষবর্দ্ধনের পিতা প্রভাকরবর্দ্ধন মালবরাজের দুই পুত্র মাধবগুপ্ত ও কুমারগুপ্তকে রাজ্যবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধনের সাহচর্য্যে নিযুক্ত করেন। হর্ষবর্দ্ধন মালব-মগধের গুপ্তরাজগণকে বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করিলেও তাহাদিগকে যথাযোগ্য সম্মানের সহিত স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত দেখা যায় যে তিনি গুপ্তবংশীয় ব্যক্তিগণকে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করিতেন। স্কন্দগুপ্ত নামক এক ব্যক্তি তাঁহার হস্তিশালার অধ্যক্ষ ছিলেন। অপর এক স্কন্দগুপ্ত বাঁশখেরা ও মধুবন তাম্রশাসনে মহাসামন্ত মহাপ্রমাতৃ নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। ঐ বংশীয় ঈশ্বরগুপ্ত নামক অপর একব্যক্তি মহাক্ষপটলিক পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রাজ্যবর্দ্ধনের হন্তা মালবরাজের নাম দেবগুপ্ত। ইহার নাম বাঁশখেরা ও মধুবন উভয়

তাম্রশাসনেই পাওয়া যায়। তাহার পর বোধ হয় মালব আর কখনও গুপ্তবংশীয়গণের অধিকারভুক্ত হয় নাই।

হিউয়েন-চিয়ং এর বিবরণ হইতে বঙ্গের রাজা শশাঙ্কের কতক বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি মহাবোধিবিহার বর্ণনকালে বলিয়াছেন যে উক্ত বিহার পূর্ব্বে সমচতুষ্কোণ ছিল, কিন্তু বৌদ্ধ-বিদ্বেষী গৌড়রাজ শশাঙ্ক বিহারাধিষ্ঠিত বুদ্ধমূর্ত্তি স্থলে তাঁহার মন্ত্রীকে এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিতে আদেশ দেন, কিন্তু বুদ্ধের পরমভক্ত ঐ মন্ত্রী তাঁহার আদেশ প্রতিপালন না করিয়া বুদ্ধপ্রতিমার সম্মুখে উহা গোপনার্থ এক প্রাচীর নির্ম্মাণ করান ও ঐ প্রাচীরের সম্মুখে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রাচীর ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল। মহারাজ শশাঙ্ক বুদ্ধগয়ার বোধিদ্রুম বিনাশ করিয়াছিলেন। ফরিদপুরে ধর্ম্মাদিত্য নামক এক রাজার তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছিল।(২১) এ পর্য্যন্ত শশাঙ্কের দুইটি খোদিত লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। একটী প্রাচীন রোহিতাশ্ব দুর্গের নিকটে পর্ব্বতগাত্রে খোদিত আছে। রোহিতাশ্ব বর্ত্তমান রোহ্ টাস্ গড়। অপর খোদিত লিপিটী মান্দ্রাজের গঞ্জাম জেলায় আবিষ্কৃত একটি তাম্রশাসন। ইহা মহারাজাধিরাজ শশাঙ্কের সামন্তমহারাজ সৈন্যভীতের দানবিষয়ক লিপি। ইহার প্রথম তিন পংক্তি :—

(১) ওঁ স্বস্তি। চতুরুদধিসলিলবীচিমেখলানিলীনায়াং সদ্বীপা-

(২) গরপত্তনবত্যা বসুন্ধরায়াং গৌপ্তাব্দে বর্ষশতত্রয়ে বর্ত্তমানে।

(৩) মহারাজাধিরাজ শ্রীশশাঙ্ক রাজ্যে ইত্যাদি।

এই তাম্রশাসন হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে শশাঙ্ক ৩০০ গুপ্তাব্দে রাজ্য করিতেছিলেন। সুতরাং ইহা দেখা যাইতেছে যে হর্ষবর্দ্ধন রাজ্যবর্দ্ধনের হত্যার ত্রয়োদশ বর্ষ পরেও শশাঙ্কের বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারে নাই। শশাঙ্ক ও নরেন্দ্রগুপ্ত এক ব্যক্তি কি না এ বিষয়ে অনেকেই সন্দেহ করিয়াছেন। নরেন্দ্রগুপ্ত যে শশাঙ্কের অপর নাম ইহার দুইটি প্রমাণ আছে (১) Dr. Buhler বলেন যে কাশ্মীরে একখানি হর্ষচরিতের পুঁথিতে তিনি শশাঙ্কের অপর নাম নরেন্দ্রগুপ্ত এই কথার উল্লেখ দেখিয়াছিলেন। (২) শশাঙ্কের মুদ্রা, ইহার কোনটিতে শ্রীশশাঙ্ক কোনটীতে নরেন্দ্রগুপ্তস্য খোদিত আছে। এই মুদ্রাগুলি অভিন্নাকার। প্রাচীন গুপ্ত সম্রাট্-গণের মুদ্রায় এইরূপ উদাহরণ পাওয়া যায়। সম্রাট্ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের স্বর্ণ মুদ্রার কোন কোনটীতে রাজার সম্পূর্ণ নাম ও উপাধি খোদিত দেখা যায় যথা :—

নাম—দেবশ্রী মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্রগুপ্ত

উপাধি—শ্রীবিক্রম

কোন কোন মুদ্রায় রাজার নাম নাই, কিন্তু মুদ্রার আকার দেখিলে চন্দ্রগুপ্তের অন্যান্য মুদ্রা হইতে ভিন্ন বলিয়া বোধ হয় না। খোদিত লিপি—

(২১) Indian Antiquary, vol, XXI p. 43.

জয়তু জয়　　সিংহবিক্রম নরেন্দ্র

ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে রাজ্যবর্দ্ধনের হত্যাকারীর নাম নরেন্দ্রগুপ্ত ও তাঁহার উপাধি শ্রীশশাঙ্ক।

হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য তাহার সামন্তগণের মধ্যে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। মগধে প্রাচীন গুপ্তবংশীয় আদিত্যসেন ও পশ্চিমে সেনাপতি ভটার্কের বংশীয় শিলাদিত্য উপাধিধারী রাজগণ সম্রাট্ উপাধি গ্রহণ করেন। এই সময় হইতেই ভারতের অবনতি আরম্ভ হয়। সামান্য প্রাদেশিক ভূপতিগণ পরম ভট্টারক পরমেশ্বর মহা-রাজাধিরাজ প্রভৃতি দীর্ঘাকার উপাধি গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। হূণাক্রমণের পর হইতেই গজনীর সুলতান্ মামুদকর্ত্তৃক পঞ্চনদাক্রমণ পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত্তকে পঞ্চশতাব্দী ব্যাপিয়া বিদেশীয় আক্রমণ সহ্য করিতে হয় নাই। কিন্তু এই ৫০০ শত বৎসরে ভারত অবনতির শেষ সীমায় উপনীত হয়। হিন্দুস্থান ষোড়শটি রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পরস্পর গৃহ বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া ভবিষ্যৎ দাসত্বের বীজ রোপণ করিতেছিল। এই সময়ে অতি প্রাচীন জৈন ধর্ম্মের লোপ হয়। বঙ্গে মগধে ও মথুরায় কয়েক ঘর শ্রেষ্ঠী মাত্র এই মতাবলম্বী থাকে। এই সময় হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি আরম্ভ এবং হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়। হর্ষবর্দ্ধন স্বয়ং বৌদ্ধ ছিলেন, এবং হিন্দু বা জৈনগণকে তাদৃশ শ্রদ্ধা করিতেন না, তবে তিনি তাহাদের প্রতি কখনও অত্যাচার করেন নাই। মুণ্ডেশ্বরীর খোদিত লিপির বর্ষ শ্রীহর্ষ সংবৎসরের ৩০ অর্থাৎ খৃষ্টাব্দ ৬৩৫-৩৬। হিউয়েন-চিয়ংএর সহিত হর্ষবর্দ্ধনের সাক্ষাতের অব্যবহিত পূর্ব্বে ইহা খোদিত হইয়াছিল। উত্তর ভারতে গুপ্ত-সংবৎ শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্তের তাম্রশাসনে শেষ ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহার পর ৩০০ বৎসর পর্য্যন্ত ইহা নেপালের পার্ব্বত্যভূমিতে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। পরে তথায় শ্রীহর্ষ সংবৎসর ও নব প্রচলিত নেওয়ার বা নেপালী সংবৎসর ইহার স্থান অধিকার করে। পশ্চিমে বলভীরাজগণ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়াছেন দেখা যায় এই সংবৎ খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতেও ইহা কিছুকাল বলভীসংবৎ নামে প্রচলিত ছিল। (২২)

অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ

অদ্ভুতাচার্য্য সপ্তকাণ্ড রামায়ণ রচনা করেন। উহার মধ্যে অযোধ্যা, অরণ্য ও উত্তর-কাণ্ড আমাদের হস্তগত হইয়াছে। বাকী চারিকাণ্ড পাওয়া যাইতেছে না। উক্ত কাণ্ডত্রয় একত্র করিলে উহা কৃত্তিবাসের সমুদয় রামায়ণ অপেক্ষা অনেক বড় হয়। উত্তরকাণ্ড অতি বৃহৎ। উহাতে বিস্তর অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের উল্লেখ হইয়াছে। কবির প্রকৃত নাম,

(২২) এই খোদিত লিপির লুপ্ত অক্ষরগুলি ডাক্তার ব্লক, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদের সাহায্যে উদ্ধার করিয়াছি।

বাসস্থান ও সময়ের কথা জানিতে পারি নাই। আদি, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দর ও লঙ্কাকাণ্ড হস্তগত হইলে হয় ত ঐ সকল বিষয় জানিতে পারিব। "অদ্ভুতের কণ্ঠে বসে আপনি সরস্বতী" এই কবিতাংশ পাঠ করিলে "অদ্ভুত" যে কবির নাম তাহা স্পষ্ট বোধ হয়। স্থানে স্থানে "অদ্ভুত নরসিংহ বলে" "অদ্ভুত মাধব ভণে" "নীলমাধব ভণে" ইত্যাদি ভণিতা দৃষ্ট হয়। ইহাতে কবির নাম নির্ণয়ে গোল উপস্থিত হয়। মালদহ জেলায় একটী রীতি আছে, ওস্তাদ্ নিজে গান রচনা করিয়া কখন কখন শিষ্যদিগের নামের ভণিতা দিয়া থাকেন। এস্থলে যদি তাহা হইয়া থাকে, তবে কবির প্রকৃত নাম অদ্ভুত। নরসিংহ, নীলমাধব ও মাধব অদ্ভুতের শিষ্য।

কবি এমন অনেক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, যাহা অদ্যাপি এতদ্ অঞ্চলে প্রচলিত আছে, তজ্জন্য কবিকে মালদহ জেলার লোক বলিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু তিনি যে মালদহ জেলারই লোক ছিলেন, ইহা সাহস করিয়া বলা যায় না। মালদহ জেলার ভাষায় রাঢ়, বঙ্গ ও বেহারের ভাষার শব্দ প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। সুতরাং ভাষা দেখিয়া অদ্ভুতাচার্য্যের বাসস্থান নির্ণীত হইতে পারে না। কবি স্ত্রীলোকদিগকে কোচা দিয়া কাপড় পরাইয়াছেন। সীতাদেবী কোচা দিয়া কাপড় পরুন আর না পরুন, কবির দেশের সম্রান্ত মহিলাগণ যে তদ্রূপ কাপড় পরিতেন, ইহা অনুমান করিতে পারা যায়। বঙ্গদেশের কোন্ অংশের স্ত্রীলোকেরা কোচা দিয়া কাপড় পরিয়া থাকেন, তাহা জানি না। "এবাই এবাই বুলি পালায় নারীগণ", "পানাই পাএ দিয়া রাম আসিলা মন্দিরে" এই দুইটী পদ্য দেখিয়া কেহ কবির বাসস্থান নির্ণয় করিতে পারিবেন কি না জানি না। রচনা দেখিলে বোধ হয় অদ্ভুতাচার্য্য কৃত্তিবাসের পরবর্ত্তী লোক। আমরা যে তিন কাণ্ড পাইয়াছি, উহার মধ্যে অযোধ্যাকাণ্ড ১১৮২ সালে, অরণ্যকাণ্ড ১২১৮ সালে ও উত্তরকাণ্ড ১১৫০ সালে হস্তলিখিত হইয়াছে। কবি যে, তাঁহার অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহাতে সন্দেহ নাই। "করিলেন, শুনিলেন" প্রভৃতির স্থানে "করিলেন্ত, খাইলেন্ত" প্রভৃতি এবং "করিলাম, শুনিলাম" প্রভৃতির স্থানে "করিলাঙ, শুনিলাঙ" প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। ইহাতে আমাদের অনুমান হয়, কবি চৈতন্যদেবের নিকটবর্ত্তী সময়ের লোক।

কবিত্বাংশে তুলনা করিলে অদ্ভুতাচার্য্যের অপেক্ষা কৃত্তিবাসকে উচ্চ আসন প্রদান করিতে হয়। অদ্ভুতাচার্য্যের শব্দাড়ম্বর বড় বেশী, কিন্তু রচনায় প্রসাদগুণের অভাব দৃষ্ট হয়। কৃত্তিবাসের রচনায় প্রসাদ ও মাধুর্য্য গুণ যেন উথলিয়া পড়িতেছে। কান্দাইবার ও হাসাইবার ক্ষমতা কৃত্তিবাসের প্রধান গুণ। আমরা অদ্ভুতাচার্য্যের গ্রন্থের কোন কোন স্থান উদ্ধৃত করিতেছি।

"রাজা বোলে লেহ মোকে শ্রীরামের ঘরে। কেকয়ী দেখিঞা মুঞি কাঁপিছো অন্তরে॥
প্রিয়পুত্র রাম মোর নয়নের তারা। পাপিনী ডুবাইলে মোর মাণিকের তারা॥
প্রাণটী থাকিবে মোর কার প্রাণে চাঞা। ধূলিতে পড়িলা রাজা চৈতন্য হরিঞা॥

দেখি মহাদেবীগণে বেড়িল গিঞা পাশে। কেহো জল দেয় কেহ করএ-বাতাসে ॥
শোকেতে কৌশল্যাদেবী কান্দে উচ্চস্বরে। ক্রোধ করি রাজাকে লাগিল গর্জ্জিবারে ॥”

অন্যত্র

“সীতা সীতা বুলি রাম ডাকেন উচ্চস্বরে। হাহাকার শব্দ হৈল অমরনগরে ॥
রাম বোলেন শুন ভাই প্রাণের লক্ষণ। ফল আনিবারে গেলা সীতা হেন লয় মন ॥
নগড় দিঞা বনে গেল ভাই দুইজন। চতুর্দ্দিকে বন প্রভু করে নিরীক্ষণ ॥
সীতাকে না দেখেন প্রভু বনের ভিতর। গোদাবরীর তীরে গেলেন দুই সহোদর ॥
চতুর্দ্দিকে নদীর ঘাট করে নিরীক্ষণ। সীতাকে না দেখি প্রভুর আকুল জীবন ॥
রাম বোলেন গোদাবরী কর অবধানে। তুমি জান সীতা আমার নিল কোন্ জনে ॥
রাম শুদ্ধি করেন নদী না দেয় উত্তর। গল্যাগলি ধরি কান্দে দুই সহোদর ॥
তরুলতা আদি পশুপক্ষীক শুদ্ধি করি। তোমরা জান কোথা গেল জনক-ঝিয়ারি ॥
রামচন্দ্র পুছেন কেহ না দেয় উত্তর।

ইহার সঙ্গে যদি কৃত্তিবাসের

“বিলাপ করেন রাম লক্ষণের আগে। ভুলিতে না পারি সীতা সদা মনে জাগে ॥”

ইত্যাদির তুলনা করা যায়, তাহা হইলে কৃত্তিবাসকে কবিত্বের উচ্চ আসন দিতে হয়।

অন্যত্র

নাচাড়ি বরাড়িরাগ—একতালী

সীতার বিলাপ

মোর প্রভুর বেথিত ভাই, লক্ষ্মণ হের রে ঝাট আই,
ঝাট আয় লক্ষ্মণ আগবাড় ঝাট।
দুরাচার নারীচোর, কলঙ্ক রাখিল মোর,
তুমি বেড়িঞা রাবণার মুণ্ড কাট ॥
তুমি বুলিলে যত বোল, মুই না কৈমু উতরোল,
না শুনিমু তোমার মন্ত্রণা।
ঘরহনে বাহির হইতে, তুলিঞা লইল রথে,
মোকে চুরি করি নিঞা যায় রাবণা ॥

এই রামায়ণের সর্ব্বাংশ বরাড়ি, পঠমঞ্জরী, কামোদ প্রভৃতি রাগে গীত হইত। গায়নের মুখে না শুনিলে ইহার মাধুর্য্যের উপলব্ধি হইতে পারে না। গ্রন্থে পয়ার, ত্রিপদী, একাবলী প্রভৃতির নাম নাই, তৎপরিবর্ত্তে দীর্ঘচ্ছন্দ, দোতালী, একতালী প্রভৃতি নাম আছে। নাচাড়ি গীত কাহাকে বলে তাহা জানি না। অনেক প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থেই নাচাড়ির নাম দৃষ্ট হয়।

দোতালীছন্দ—

পালাইল কালরাতি, সলিল হইল চন্দ্রজ্যোতি
পর্ব্বতের নিকটে গাছের তলা, জাগিঞা আকুল বিরহজ্বালা
জগতমাতা জনকদুহিতা, অরণ্যে আসিয়া হারাইনু সীতা
করুণা করেন লক্ষ্মণকোলে রঘুপতি, অদ্ভুতাচার্য্যের মধুরভারতী ॥

রামচন্দ্রের শয়নমন্দিরে গমন—

চান্দোয়া টানায় তারা ঘরের ভিতর। বিচিত্র পালঙ্ক পাড়ে অতি মনোহর ॥
পালঙ্কের উপরে বিচিত্র বিছানে। নেতের বালিস দিল সিতানে পৈথানে ॥
ঝাপাতে হীরা শোভে উত্তম খোপনা। গজমুকুতা তাতে লাগিয়াছে ঝন ঝনা ॥
নানাবিধ পুষ্প ফেলে শয্যার উপর। পুষ্পের মধ্যে ক্রীড়া করে লুব্ধ ভ্রমর ॥
কর্পূর তাম্বুল থুইল কস্তূরী চন্দন। পকান্ন সন্দেশ সখী থুইল ততক্ষণ ॥
সুবর্ণ ভৃঙ্গারে থুইলেন সুশীতল জল। শর্করা সহিত থুইলা মিঠা নারীকল ॥
ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ থুইলেন কটোরা পূরাণ। ভক্ষণ করিবেন আসি লক্ষ্মীনারায়ণ ॥
সজ্জা নির্ম্মাইয়া সখী দিলেন সাদরে। পানাই পাত্র দিঞা প্রভু আইলা মন্দিরে ॥

ন্যূনপদতা ও অধিকপদতার সংখ্যা অনেক। এই রামায়ণ যখন গীত হইত, তখন ন্যূনপদতা ও অধিকপদতা দোষের মধ্যে গণ্য। স্থানে স্থানে অমিল পদ্যের সংখ্যাও বিস্তর। যথা—

রাম বলিলেন শুন জনকঝিয়ারি
তোমার মনোহিত পুরী নির্ম্মাইলাঙ আমি।

মনের ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা ভাষার যত বাড়িবে, ভাষারও তত উন্নতি হইবে। পুরাতন বাঙ্গালার মনের ভাব প্রকাশের ক্ষমতা যেন এখনকার বাঙ্গালার অপেক্ষা অল্প ছিল না।

(ক) "শুনি আনন্দিত রাজা আপনে পাসরে।"

"আপনে পাসরে" এইরূপ ভাব এখনকার পদ্যগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না।

(খ) "তারা মনধরিলে মোর নাহিক নিস্তার।"

"মনধরিলেন" কথাটীর অর্থ বোধ হয় মনে মনে অসন্তুষ্ট হওয়া।

(গ) "প্রজার কুক্কার শব্দ উঠিল গভীর।"

এই "কুক্কার" শব্দটী কান্দিশীক শব্দের ন্যায়। ইহার অর্থ এই যে, কি করিব, কোথায় যাইব এইরূপ ক্রন্দন ধ্বনি।

(ঘ) আমার বাপ তোর ঘরের করেন পালন।
তে কারণে তোর-ঘরের রহেত্ত জীবন।

এই পদটী পাঠ করিয়া আমার মনে হইয়াছে, প্রাচীন বাঙ্গলার আদি "ঘর" শব্দ হইতেই যেন "দিগের" বিভক্তির উৎপত্তি হইয়াছে। সুধীগণ এ বিষয়ে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

(৬) "তা সভাকে শুদ্ধিকরে রাজা দশানন।
　　কহ কহ নারীগণ স্বরূপ উত্তর॥"

অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণের বহুস্থলে "জিজ্ঞাসা করে" অর্থে "শুদ্ধিকরে" কথাটী ব্যবহৃত হইয়াছে। এই শুদ্ধিকরে কথা হইতেই বিভিন্নকাল ও পুরুষে "সুধায়" "সুধাইল" প্রভৃতি ক্রিয়া পদের উদয় হইয়াছে। এ গ্রন্থের অনেক স্থলে সমোসর, ত্বরাত্বরি শব্দের ব্যবহার আছে। এই দুই শব্দ হইতে আধুনিক বাঙ্গলার সোঁসর ও তাড়াতাড়ি কথার উৎপত্তি হইয়াছে।

কবির সময়ে যেন মুসলমানেরা বলপূর্ব্বক হিন্দুদিগের জাতি লইতে চেষ্টা করিত। এমন স্থলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জাতিতে উঠিবার ব্যবস্থা না থাকিলে হিন্দুর সংখ্যা নিতান্ত কমিয়া যাইত। কবি বলিতেছেন।—

"বল করি জাতি যদি লএত যবনে।
ছয়গ্রাস অন্ন যদি করাএ ভক্ষণে॥
প্রায়শ্চিত্ত করিলে জাতি পাএ সেইজন।
মুনির কথা শুনি হাসেন দেব নারায়ণ॥
ছয় পুরুষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মতেজ নাহিছাড়ে।
নিবেদন কৈনু প্রভু তোমার নিয়ড়ে॥
ব্রহ্মতেজ সমতেজ নাহি ত্রিভুবনে।
ব্রহ্মতেজ নাহি থাকে গোমাংস ভক্ষণে॥"

কবির শাস্ত্রজ্ঞান অতি গভীর ছিল। রামায়ণের মধ্যে তিনি তাহার প্রচুর পরিচয় দান করিয়াছেন। অনেক লোকপ্রচলিত কথাও শাস্ত্রের পরিচ্ছদে সজ্জিত করিয়া রামায়ণে প্রবেশ করাইয়াছেন। কয়েকটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল।

(১) ইন্দ্র বৃত্রবধ করিলে তাঁহাকে ব্রহ্মহত্যা স্পর্শ করে। ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যাকে তিন অংশ করিয়া জলে, বৃক্ষে ও রজস্বলা নারীতে স্থাপন করেন।

"তিন ঢেউনা দিয়া যদি ঘরে আনে জল।
এক অংশ ব্রহ্মহত্যা প্রবেশে তার ঘর॥
তিন ঢেউ দিঞা জল আনিতে উচিত হয়।
গঙ্গাজলে না দিবে ঢেউ কহিলাও নিশ্চয়॥
উত্তম জনকে গাছে চড়িতে উচিত না হয়।
তবে যদি গাছে চড়ে আছে তার নির্ণয়॥
উঠিতে নাম্বিতে করে ছয় নমস্কার।
প্রদক্ষিণ করি গাছেক করে আগুসার॥
দম্ভ করিয়া যেবা গাছের উপর চড়ে।
এক অংশ ব্রহ্মহত্যা ধরে তার ঘাড়ে॥"

(২) কবি বলিতেছেন, গরুড় যখন স্বর্গ হইতে অমৃত আনয়ন করেন, তখন মুহূর্ত্তকাল সরোবর তীরে বাস করিয়াছিলেন, সে জন্ত কদম্ব বৃক্ষ মরে না।

"মুহূর্ত্ত রহিলা পক্ষী সরোবর তীরে।
তথির কারণে কদম্ব বৃক্ষ নাহি মরে ॥"

(৩) শূদ্র তপস্বী শম্বুককে বধ করিবার সময় রাম তাহাকে বরদান করিতেছেন।

"রাম বোলেন তপস্বী তোকে দিলাঙ বরদান।
আহীড়ি হঞা রাঢ়দেশে হউক উপাদান ॥"

(৪) রামের বনবাসের পর দশরথ বিংশতি দিন পর্য্যন্ত অনাহারে থাকিয়া প্রাণত্যাগ করেন, ইহা কোন্ পুরাণের অভিমত জানি না।

"বিংশতি দিন পর্য্যন্ত বাপ ছিলা অনাহারে।
রাম সীতা বুলি তনু ছাড়িলেন এহি ঘরে ॥"

(৫) কবির বিশ্বাস ছিল, অশ্বমেধ যজ্ঞে যে অশ্ব নিহত হইত ঋষিগণ তাহার জীবন দান করিতেন।

"ঘোড়ার অস্থির উপরে ব্রহ্মা কৈল জল সুপ্রোক্ষণ।
পুনরপি ঘোড়া জিঞা উঠে ততক্ষণ ॥"

(৬) কাকপা নগরে বিকট দৈত্য বাস করিত, লক্ষ্মণ সেই দৈত্যকে বিনষ্ট করিয়া লক্ষ্ণৌনগর স্থাপন করেন। কবি বলেন লক্ষ্ণৌ গণ্ডকী নদীর তীরস্থ।

"গণ্ডকী নদীর তীরে স্থান মনোহর।
লক্ষ্ণৌ করি বলে তাকে সকল সহর ॥"

(৭) সতী যজ্ঞ দেখিতে গেলে প্রথমে প্রস্থতিই সতীকে অবজ্ঞা করেন। কবি কোথায় এই কথা পাইলেন, কেহ কি ইহা বলিতে পারেন।

(৮) কবি সীতার বনবাসের কারণ এইরূপ বর্ণনা করেন।

"এইমত সভা করি বসিলা নারায়ণ। হেনকালে বোলেন রাম সভার সদন ॥
রাম বোলেন পাত্র মিত্র শুনিবে বচন। একবাক্য বলি আমি তাথে দেহ মন ॥
আমি লক্ষ্মণ সীতা নিঞাছিলাম বনে। তার নাকি ভাল মন্দ কথা কহে কোন জনে ॥
এতেক বলিলা যদি কমললোচন। হাহাকার করি উঠে যত দেবগণ ॥
প্রজাগণ বলে শুন রাম নারায়ণ। আমা সমকে এত কথা পুছ কি কারণ ॥
ত্রেতাযুগে রাজাপান সত্য সমসর। তোমাকে মন্দবোলে প্রভু কে আছে পামর ॥
রাম বোলেন প্রজা তোমরা আমার দিব্যলাগে। মিথ্যা না কহিও সত্য কহিও আমার আগে ॥
এতেক পুছিলা যদি কমললোচন। বেদগর্ভ ভদ্রমুনি বোলে সভার সদন ॥
সভার ভিতর তার মুখ প্রখর। বলিতে লাগিলা পাপী সভার ভিতর ॥

বারে বারে এই কথা পুছ সভার সদন।　সঙ্কোচ না করে প্রজা শুন নারায়ণ ॥
সর্ব্বলোকে বোলে তোমাক গর্হিত কৈলে কর্ম্ম।　জানিলে না কহিলে হয় পরম অধর্ম্ম ॥
ভাঙিজা বধূ না ছাড়িল পাপিষ্ঠ রাবণ।　দশমাস ছিলা মাতা তাহার সদন ॥
সীতাকে লঞা ঘর তুমি কর নারায়ণ।　তে কারণে মন্দ তোমাক বলে প্রজাগণ ॥

* * * * * * * *

সভা ভঙ্গ হৈল সবে গেলা নিজ ঘরে।　দুঃখী হঞা যান রাম বাজারে বাজারে ॥
রাজপথে দেখা হৈল দোসাদের সনে।　রাম বোলেন দোসাদ শুন আমার বচনে ॥
মিথ্যা না কহিবে কহ স্বরূপ বচন।　সীতার ভালমন্দ নাকি বোলে কোনজন ॥
ভয় পাইঞা দোসাদ বলে করি যোড়হাত।　কি কারণে পুছ মোকে দেব রঘুনাথ ॥
রাম বলেন দোসাদ ভয় না করিহ মনে।　নিশ্চয় কহিবে মন্দ বোলে কোন জনে ॥
আশ্বাস পাইঞা দোসাদ বলে আরবার।　মন দিয়া শুন প্রভু আজিকার সমাচার ॥
এহিগ্রামের বাহির আছে গ্রামের মণ্ডল।　দুই স্ত্রীপুরুষে ত.র লাগিল কন্দল ॥
মণ্ডলে বোলে মাগী তুই না করিস মোর কাম।　মনে ভাবিঞা বুঝ আমি নহি রাম ॥”

ইহার পর ভগিনীদের অনুরোধে সীতা রাবণের মূর্ত্তি অঙ্কিত করেন, সেই মূর্ত্তি না মুছিয়া তদুপরি নিদ্রিত হন। রাম আসিয়া তদবস্থায় সীতাকে দেখিতে পান। সরোবরের ধারে গিয়া রজকের মুখেও শুনিতে পান যে সে তাহার স্ত্রীকে বলিতেছে তুই কি আমাকে রাম পাইয়াছিস্? রাম আর সহ্য করিতে না পারিয়া সীতাকে বনবাসে প্রেরণ করেন। জানি না কবি এত কথা কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন।

(৯) রাম স্বর্ণমৃগের অন্বেষণে গেলে দেবগণ চক্রান্ত করিয়া এই শব্দ করেন যে "লক্ষ্মণ শীঘ্র এস আমার প্রাণ যায়" অন্যান্য গ্রন্থে আছে, মুমূর্ষু মারীচই এই শব্দ করে।

এই রামায়ণের কোন কোন স্থানের ভাষার সহ কৃত্তিবাসের ভাষার সমতা দৃষ্ট হয়। যথা—

(ক) হেন বাক্য হৈল যদি কেকয়ীর তুণ্ডে।
　　আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে দশরথের মুণ্ডে ॥
(খ) শ্রীরামের রাজ্য দিতে পিতার হৈল মন।
　　কৈকেয়ী পাষণ্ড পাড়ি রামে পাঠায় বন ॥

এ গ্রন্থের অনেকস্থলে কর্ত্তৃকারকে এ বিভক্তি হইয়াছে। কে স্থানে ক, তে স্থানে ত এরূপ প্রয়োগও যথেষ্ট।

স্থানে স্থানে নুতন ধরণের ক্রিয়াপদ দৃষ্ট হয়।

(ক) কলসী কলসী ঘৃত যজ্ঞকুণ্ডে হনে
(খ) অঙ্গদেশ যাঞা রাজ্য জিনিতাহ হেলে।
　　রাজ্য বসাইতাও আমি জিনি বাহুবলে ॥

(গ) মুই জদি জানিতু হবে প্রমাদ ঘটন।
তবে মৃগ প্রভুর কাছে চাহিমু কি কারণ॥
(ঘ) মাতা সব বধূসঙ্গে লইতাহু তথা।
কেনে বা রামের হোতা এতেক অবস্থা॥

পুংলিঙ্গের বিশেষণ স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ অন্তর্যামিনী প্রভু জানি না সকল।

হিন্দীর ভাবযুক্ত ক্রিয়াপদ—

"নারদ বোলেন যম ছাড়ি অন্যকে নাহি জিনি।"

হিন্দীর "নাহিজিনা" "নাহিকরণ" যে ভাবে ব্যবহৃত হয়, নাহিজিনিও সেইভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। এখনকার বাঙ্গালায় আর এ ভাব দৃষ্ট হয় না।

পুরাতন বাঙ্গালার শব্দের উত্তর অনাদরে "আ" প্রত্যয় হইত। দেব, হতভাগ, অভাগ, রাক্ষস, অসুর, পামর প্রভৃতি শব্দ অনাদরে দেবা, হতভাগা, অভাগা, রাক্ষসা, অসুরা ও পামরা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এখনকার ব্যাকরণে এই সূত্রটী বসান উচিত।

বাঙ্গালীর যুদ্ধবর্ণনা পাঠ করিলে হাস্যের উদয় হয়। কৃত্তিবাস ও অদ্ভুতাচার্য্য যুদ্ধের যে সজ্জার বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে বোধ হয়, যেন বীরগণ যুদ্ধ করিতে যাইতেছে না, বিবাহ করিতে যাইতেছে। করুণরস বর্ণনায় বাঙ্গালীকবির ক্ষমতা আছে, কিন্তু প্রকৃত উদাত্ত বর্ণনায় বাঙ্গালার কবিগণ সম্পূর্ণ অক্ষম। লোহিততুরঙ্গারোহী সেনাপতি দ্রোণাচার্য্যের শেষদিবসের লোকাতীত বীরত্ব এবং লঙ্কাসমরে রামচন্দ্রের একদিনের যুদ্ধ দেখিয়া বীরকেশরী লক্ষ্মণেরও বিস্ময় জন্মিয়াছিল, সমুদায় বাঙ্গলাগ্রন্থ ঘাটিয়াও তাহার ছায়া পাওয়া যায় না।

যাহা হউক, যাহা নাই তাহার জন্য আক্ষেপ করিয়া কি হইবে। গ্রন্থখানি প্রাচীন সুতরাং রক্ষণীয়। পূর্ব্বে বাঙ্গলার ভাষা কেমন ছিল, তাহা জানার জন্য এ গ্রন্থের উপাদেয়তা আছে।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী

প্রাচীন গ্রন্থোদ্ধার

সূর্য্যের পাঁচালী

নবীনত্বের সর্ব্বপ্রকার গৌরব প্রধানতঃ প্রাচীনত্বের উপরই সুপ্রতিষ্ঠিত। বর্ত্তমানে উন্নতিশীলা বঙ্গভাষার সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিতে হইলে সুদূর অতীতের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ অবশ্যম্ভাবী। তাহার ফলে, কতিপয় শ্রদ্ধাস্পদ মনীষীর ঐকান্তিক চেষ্টায়, অতীতের তমসাবৃত গর্ভাভ্যন্তরস্থ বহুতর বহুমূল্য রত্নরাজির সমুজ্জল দ্যুতি আশু-মেঘ-মুক্ত শশিকলার সুনির্ম্মল প্রভার ন্যায় লোক-চক্ষু-গোচর হইয়াছে ও নিত্য হইতেছে। ইহা অতীব সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই সকল লুপ্তপ্রায় রত্নরাজির প্রাচুর্য্যের তুলনায় এ আবিষ্কার যে নিতান্ত নগণ্য, তাহা স্বভাবতঃই স্বীকার্য্য। সুতরাং এ ক্ষেত্রে মহান্ ও ক্ষুদ্রের সমবেত শক্তি ও চেষ্টা অবশ্য বাঞ্ছনীয়। আমাদের ন্যায় নগণ্য ব্যক্তিও তাই এ পবিত্রতম কার্য্যে ব্যাপৃত আছে। অদ্য আমাদের আংশিক কৃতকার্য্যতার একতম চিহ্ন সহৃদয় পাঠক-সমক্ষে উপস্থাপিত হইল। বিশেষতঃ সূর্য্যের মাহাত্ম্যবিষয়ক গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অতি অল্প, এ কারণও এই গ্রন্থখানি আলোচনার যোগ্য।

সম্প্রতি কবি রামজীবন ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণকৃত "সূর্য্যের পাঞ্চালী" নামক একখানি প্রাচীন গ্রন্থের কয়েকখণ্ড প্রতিলিপি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তন্মধ্যে যে প্রতিলিপিখানি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন (১০৯ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত) তাহাই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমূল সঙ্কলিত হইল এবং অপর পুথিগুলি পাঠ মিলাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

'সূর্য্যের পাঞ্চালী'খানি ১৬১১ শকাব্দে বিরচিত; আজকাল ১৮২৮ শকাব্দ চলিতেছে, সুতরাং এ পুঁথিখানি ২১৭ বৎসর হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। ইহা গ্রন্থের গৌরবের সমূহপরিচায়ক বটে। কবি রামজীবন আনুমানিক ১৫৮৭-১৫৯০ শকে চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী থানার অন্তর্গত 'রাণীগ্রাম' নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৬২৫ শকাব্দে বিরচিত কবিবরের 'মনসা-মঙ্গল' নামক আর একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ দৃষ্ট হয়। উহা পাঠে জানা যায়, কবির পিতার নাম 'গঙ্গারাম' ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম 'নারায়ণ'; এতদ্ব্যতীত কবির অন্য পরিচয় পাইবার উপায় নাই। তাঁহার কোনও বংশধর অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন কি না আমরা অবগত নহি। এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক, 'সূর্য্যের পাঞ্চালী' রচনাকালে কবি 'বিদ্যাভূষণ' উপাধি পান নাই; 'মনসা-মঙ্গল' গ্রন্থেই তাঁহার উক্ত উপাধিযুক্ত ভনিতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

প্রাগুক্ত গ্রন্থখানির পত্রাঙ্ক সংখ্যা দশটী মাত্র। বলা বাহুল্য, সমগ্র পুঁথিখানি অতি প্রাচীন কাগজে অনুলিপিকৃত। তখন যে 'রুল' টানিবার অদ্ভুত প্রণালী 'মিস্তার' প্রচলিত ছিল, তাহার চিহ্ন এখনও গ্রন্থে স্পষ্ট বিদ্যমান আছে। গ্রন্থখানির মধ্যে ঈ, উ, ষ, য, স, এর

ব্যবহার অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। এমন কি উএর ব্যবহার একবারেই নাই। য় এর স্থানে হ, য়া এর স্থানে আ, এবং আমি, তুমি, আমরা, তোমরা শব্দের স্থলে যথাক্রমে প্রাকৃতিক আহ্মি, তুহ্মি, আহ্মরা, তোহ্মরা শব্দ প্রায় সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বিভক্ত্যাদির এমন কতকগুলি অভিনব প্রয়োগ আছে, যাহা বৈয়াকরণগণের অনুধাতব্য।

পাঠান্তর ব্যতীত কোনও প্রাচীন গ্রন্থের বিশুদ্ধতা সম্যক্ রক্ষিত হয় না, কিন্তু গ্রন্থকার অভিন্ন ব্যক্তি হইলেও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিলিপিকারগণের প্রগল্‌ভতায় কোনও প্রাচীন পুঁথির পাঠান্তরসংগ্রহে পরস্পর সামঞ্জস্য বিধান যে কতদূর দুরূহ ব্যাপার তাহা ভুক্তভোগিমাত্রই অবগত আছেন। একে প্রাচীন বঙ্গাক্ষর বর্ত্তমানের তুলনায় বহুলাংশে স্বতন্ত্র, তাহাতে আবার প্রতিলিপিকারগণের এরূপ যথেচ্ছাব্যবহার সাধারণ-ধৈর্য্যের সীমাকে অতিক্রম করে। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থসঙ্কলন কার্য্যেও আমাদিগকে এরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। যাহা হউক, এক্ষণে গ্রন্থখানির দ্বারা প্রাচীন সাহিত্যসেবি-গণের বিন্দুমাত্র সাহায্য হইলেই সকল শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

বিরাম চিহ্নাদির যেখানে যেরূপ ব্যবহার ও আকার দৃষ্ট হয়, তাহাই অবিকল সঙ্কলিত হইল। এক্ষণে গ্রন্থের গুণাগুণবিচারের ভার গুণগ্রাহী সহৃদয় পাঠকের উপর ন্যস্ত করিয়া গ্রন্থখানি উপস্থিত করিতেছি।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

অথ শুর্য্যের পাঞ্চালি।

প্রণমহো শরস্বতি চরণ জুগল।
একে একে প্রণমহো (১) দেবতা শকল॥
ইষ্টদেব প্রণমহো মনে মোহারঙ্গে (২)।
আনন্দে জনক বন্দো জননির শঙ্গে॥
শুরূপদজুগ বন্দো পরম শন্তোশে (৩)।
তান প্রিয়া প্রণমোহ মনের হরিশে॥
করজোরে প্রনমোহ মমাগ্রজ ছাত্র।
ইষ্ট মিত্র প্রণমোহ আছে জথ তত্র॥
কবিগণ প্রণমহো মনে নাই (৪) রূদ্ধ।
অযুদ্ধ দেখিলে পদ করিবেক যুদ্ধ॥

জেষ্ট ভাই প্রণমহো দিজ বয়োশ্রেষ্ঠ।
দিনাধিক (৫) বয়োধিক বন্দোম গরিষ্ট॥
পরম শুরূর পদে বন্দো একলক্ষ।
একমুখে জারগুন বলিতে অশক্ষ (অশক্য)॥
জেই শুরূ শিখাইল ত্রেতিশ (৬) অক্ষর।
শতেক প্রনাম করম চরন উপর॥
জেই শুরূ করাইল জ্ঞান ভাল মন্দ।
তাহান চরণ বন্দোম হইআ আনন্দ॥
আর বহু প্রণমিতে গ্রহস্ত হএ বর।
এবে মুই প্রনমহো (৭) দেব দিবাকর॥
রচিবারে চাহি কিছু তাহান চরিত্র।
এক চিত্তে শুন শাধু হইয়া পবিত্র (৮)॥

১। বন্দম্ মুই—পাঠান্তর। ২। মনের তরঙ্গে—ঐ।
৩। পরম বিশেষে—ঐ। ৪। হৈআ—ঐ।
৫। জ্ঞানাধিক—ঐ। ৬। পঞ্চাশ—ঐ।
৭। তবে সে প্রণাম করম্—পাঠান্তর।
৮। পাঞ্চালি প্রবন্ধে কহি তাহান চরিত্র—২য়

অশুদ্ধেরে শুদ্ধ করিএ কবিগণ।
ইষ্ট-দেবের দোহাই জদি বা না দেএ মন ॥
অল্প বয়শে মুই দিজ কুলে জাত।
পণ্ডিত না হমু মুই কহিনু শভাত (৯) ॥
মনেতে ভাবিআ মাত্র দ্বাদশ আদিত্য।
কবিতা করিতে মোর প্রকাশিল চিত্ত ॥
গুরুগণে আদেশিল (১০) পরম শন্তোশে।
সুর্য্যের চরিত্র কিছু বলিয় বিশেষে (১১) ॥
উত্তম নগর এক সুখ গ্রাম দেশ।
ব্রাহ্মণ শজ্জন তথা আছএ বিশেষ ॥
গ্রামাধিপ পরন্তপ ধর্ম্মে ত্তৎপর।
জ্ঞানেশ্বর (জ্ঞানেশ্বর) গুরুদেব ভকতি বিস্তর
সেই গ্রামে নিবাশ জে দরিদ্র ব্রাহ্মন।
দুই কৈ'ন্তা (কন্যা) নারিশনে পোশে চারিজন

পুঁথি। একচিত্তে শুন ব্রতী হইয়া পবিত্র—৩য় পুঃ —পাঠান্তর।

৯। কহিলাম সত্য—ঐ।

১০। প্রণমোহ—ঐ। ১১। বলিবাম শেষে—২য় পুঁথি; ৩য় পুঁথিতে এই চরণটী নাই, কিন্তু নীচের অংশটী রূপান্তরিত ভাবে বেশী আছে :—
ব্রাহ্মণ সজ্জন তথা বৈসএ বিশেষে ॥
গ্রামাধিপ মহারাজা ধর্ম্মেতে তৎপর।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে সভা আছে নরেশ্বর ॥
সেই গ্রামে নিবসতি শ্রীরাম জীবন।
সূর্য্যের চরিত্র মাত্র করিব রচন ॥
সূর্য্যের চরিত্র ব্রতী শুন এক চিত্তে।
ভক্তিভাবে শুনে যেই বাড়ে ধনে পুত্রে ॥
নানা উপহার দিয়া পূজিবা বিশেষে।
নমস্কার করিবেক পুজার উদ্দেশে ॥
ব্রাহ্মণে করিবে পূজা হইয়া একমন।
জয় জয়কার দিয়া যত ব্রতিগণ ॥
নানা-বাদ্য করিয়া যে মঙ্গল বিধানে।
নমস্কার করিবেক পূজা বিদ্যমানে ॥
শুদ্ধ চিত্ত হৈয়া বৈস যত ব্রতিগণ।
এবে কিছু কহি শুন পুরাণ কথন ॥
পূর্ব্বে এক গ্রামে ছিল দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
দুই কৈন্তা + + + + ইত্যাদি ॥

ভিক্ষ্যা মাগিয়া খাএ জনম অভধি।
দুখিত করিআ তানে স্রিজিআছে বিধি ॥
হেনমতে কথকাল আছে ভিক্ষ্যা করি।
জরাএ পিরিত হইয়া মৈল তান নারি ॥
বহু দুঃখে স্থির কর্ম্ম করি দিজবর।
দুই কৈন্তা শনে দুখ পাত্র নিরন্তর ॥
দুই জন অর্ম্ম পাত্র নগর বেরাইয়া (১২)।
তিন জন খাএ তাহা বাটিআ চুরিআ (১৩) ॥
রুমুনা ঝুমুনা (১৪) নামে দুই কৈন্তা লৈয়া।
গোআইল (১৫) অনেককাল ভিক্ষ্যা মাগি খাইআ ॥
আর দিন গেল দিজ (১৬) ভিক্ষ্যা মাগিবার
রুমুনা ঝুমুনা দুইর (১৭) শুন শমচার ॥
রুমুনাএ বোলে ভৈন (১৮) শুনহ বচন ॥
বনে গিআ শাক আনি (১৯) খাইতে কারন।
এই মতে দুই ভৈন গিআ অটভিতে (২০) ॥
কোমল বনের পত্র আনিল খাইতে।
কথদিন গোআইল এমত করিআ ॥
আর দিন বনে দুই গেলেন চলিআ (২১)।
রম্য-শরবর (সরোবর) দেখে বনের ভিতর ॥
দেব কৈন্তাএ করে ব্রত দেখিতে শেন্দয়(২২)
জয় জোকার দিআ পুজএ আদিত্য ॥
দুই ভৈন গেল তথা (২৩) উদ্দেশিআ ব্রত।
দেখি দুই ভৈনে পুছে জথ দেবনারি (২৪)।
শ্রীরাম জিবনে ভনে শরশ লাচারি ॥

১২। দুই জনের ভিক্ষা পাত্র নগরে মাগিয়া—পাঠান্তর। ১৩। তিন জনে * *বিবাদিত হইয়া—ঐ

১৪। রুমা ঝুমা—২য় পুঁথি; রমুনা যমুনা—৩ পুঁথি—ঐ। ১৫। বঞ্চিল—ঐ। ১৬। যদি—ঐ।

১৭। লইয়া কিছু—ঐ। ১৮। রুমা বোলে ঝুমা ভৈন্—পাঠান্তর। ১৯। তোল—ঐ।

২০। এ বোলি দুই ভৈন্ গেল আটবীতে—ঐ।

২১। আর দিন বনেতে গেলেন্ত চলিয়া—ঐ।

২২। দেব কৈন্তা সনে (সবে?) ব্রত করে নিরন্তর—ঐ। ২৩। কথাএ।

২৪। দুই ভৈন দেখিয়া পুছে জগ দেবনারী—ঐ

ঃ। লাচারি ঃঃ

বোলে জথ দেবনারি, শুন তুই শোন্দরী
কি কারনে ভ্রম এই বন (২৫)।
রূপে জিনি ত্রিলোত্তমা, (২৬) রম্ভাভানু অতি শমা, (২৭)
কি কারণে বিরশ বদন ॥
হও তুই কার নারি, কি কারণে দিছে এরি, (২৮)
অনুমানে বুজিএ দুখিৎ।
অঙ্গে চারু চোর (চীর) হীন, বদন বিরাগনিল,
এইরূপে হইছ কুশ্চিৎ ॥ (২৯)
এ ঘোর অটভি মাজে, ভ্রমশি কেমন কাজে, (৩০)
নখি (ভালুক) শ্রিঙ্গি (মহিষ) ভয় শব এরি।
আহ্মার বচন ধর, আদিত্যের ব্রত কর,
বর (৩২) শুখ পাইবা শোন্দরি ॥
জেই বর মনে আছে, মাগ এই পুজার কাছে,
শম্পুন্ন করিবা দিবাকরে। (৩৩)
শুনি দেবকন্যার বানি, তারা দুই ভৈনে পুনি, (৩৪)
নিবেদন করে করোজোরে ॥
শুন মাতা ঠাকুরানি, আহ্মি দুই ভৈনের বানি (৩৫)
হই আহ্মি দিজের দুহিতা।

২৫। দেব কৈন্যা বোলে বাণী, শুন তুই সুবদনী,
কি কারণে ভ্রমহ কানন। —ঐ। ২য় পুঁথির পাঠ।
বোলে জয় দেব নারী, তোরা দুটী কার নারী,
কি কারণে বিরস বদন। —৩য় পুঁথি —ঐ

২৬। রূপ জিনিল তিলত্তমা—ঐ।

২৭। রম্ভা বলি শশী সমা—২য় পুঁথি ; রম্ভা ভানুমতী সমা—৩য় পুঁথি— ঐ।

২৮। কি কারণে ছাড় বাড়ী—ঐ।

২৯। অঙ্গের বসনহীন, কেবল দুঃখিত চিন্,
এ কারণে হইছ কুচ্ছিত্ ॥—ঐ

৩০। ভ্রম তোমরা কোন কাজে—পাঠান্তর।

৩১। ব্যাঘ্র ভালুক ভয় ছাড়ি—ঐ। ৩২। বহু—ঐ।

৩৩। পূর্ণ করি দিব দিবাকর—ঐ। ৩৪। তারা দুই ভগিনী—ঐ।

৩৫। আমরা দুই ভৈনের বাণী—পাঠান্তর।

ভ্রমিয়া জে দেশে দেশে, ভিক্ষা করি বাপে পোশে,
শিশুকালে পরলোক মাতা ॥
পাই আহ্মি জথ ক্লেশ, কি কহিব বিশেষ, (৩৬)
এক শন্ধ্যা খাই প্রতিদিন।
আহ্মারে নি বিধাএ, (৩৭) শদয় হইব তাএ,
দুর করিবেক দুঃখ চিন ॥
শ্রীরামজিবনে ভনে, আদিত্য ভাবিয়া মনে,
করোজোরে প্রণতি অপার।
দুই কন্যার বাক্য শুনি, দেবনারিগনে পুনি, (৩৮)
শুবচনে বোলে আরবার ॥

॥ পয়ার ॥

দুই কৈন্যার বচন শুনিয়া জথ নারি (৩৯)।
পুনরপি প্রকাশিল বচন মাধুরি (৪০) ॥
এইব্রত কর তুহ্মি মনে করি দৃঢ় (৪১)।
ধন সম্পদ দিব দেব দিবাকর ॥
দুই ভৈনে শুনি তবে এথেক বচন।
ভক্তি করি পুজিলেক আদিত্য চরণ ॥
শদয় হইআ তবে দেব দিনমনি।
বর দিআ অন্তরিক্ষ হইলা আপনি (৪২) ॥
বানাইয়া দিলা তাকে বিচিত্র মন্দির।
ধনে জনে পরিপুর্ণ্য হইল শুস্তির (৪৩) ॥
পুজা করি দুই ভৈন আদিত্য চরণ।
আপনার নিজ গ্রিহে (গৃহে) করিল গমন ॥
চিনিতে না পারে ঘর বিশ্বয় তথাৎ
হেনকালে দৈববানি হৈল অকস্মাৎ ॥
শুর্য্যদেবের বরে গ্রিহ হইল আপনি।
আনন্দে গ্রিহেতে জাএ দুইত ভগিনী ॥
মহোৎশব করি দুহে (৪৪) গ্রিহে প্রবেশিল।
হেনকালে ভিক্ষা করি (৪৫) ব্রাহ্মন আসিল
দুই ভৈনে ব্রাহ্মনেরে আনিলেক ঘরে।
কহিলা শম্পদ হৈল শ্রীশুর্য্যের (৪৬) বরে ॥
শ্নান করাইয়া দিল শমঙ্গল চুর্ণ্য।
শুর্জ্য বরে ব্রাহ্মন হইল পরিপুর্ণ্য (৪৭) ॥
প্রতিদিন (৪৮) শুর্য্যপুজা করে এই মতে (৪৯)
বর মাগ পিতা এবে বিবাহ করিতে (৫০) ॥

৩৬। আমরা পাই যত ক্লেশ,
কি কহিমু বিশেষ—পাঠান্তর।
৩৭। আমারারে বিধাতাএ—ঐ।
৩৮। দেবকন্যা বোলে পুনি—ঐ।
৩৯। দেবনারী—ঐ। ৪০। চাতুরী—ঐ।
৪১। দড়—ঐ ॥
৪২। তুষ্ট হইআ আশীর্ব্বাদ দিলেক আপনি—ঐ।
৪৩। বনেতে দিলেক জে মন্দির বিচিত্র।
ধনধান্যে পরিপুর্ণ হৈল সর্ব্বত্র ॥—২য় পুঁথি।
* * * *
বানাইয়া দিল তথা বিচিত্র মন্দির।
ধন ধান্যে সম্পদ জে হইল সুস্থির ॥—৩য় পুঁথি,
৪৪। এথশুনিদুইভৈন—পাঠান্তর।
৪৫। হোতে—ঐ। ৪৬। সুর্য্যদেবের—ঐ।
৪৭। বাপেরে করাইল স্নান গঙ্গার জল পুণ্য।
সুর্য্যের প্রসাদে ধন হইল পরিপুর্ণ ॥—২য় পুঁথি
* * * *
স্নান করি দ্বিজবর কৈলা দেবার্চ্চন।
পঞ্চাশ ব্যঞ্জনে দ্বিজ করিলা ভোজন ॥—৩য় পুঁথি।
৪৮। প্রতি রবিবারে—পাঠান্তর।
৪৯। বিধিমতে—ঐ।
৫০। বর মাগে জনকের বিবাহ নিমিত্তে (নিমিত্তে) ঐ।

এখানে রহুক মন শুর্য্যের বচন (৫১)।
ভুপতি লইয়া কিছু শুনহ কারন ॥
একদিন নরাধিপ নিজ অন্তস্পুরে।
বিবাহের জুগ্য (যোগ্য) কৈন্যা দেখিলা
গোচরে (৫২) ॥
দেখিআ রাজাএ কৈলা প্রতিজ্ঞা রহশ্য।
কালু এই কৈন্যা বিহা দিবম্ অবশ্য (৫৩) ॥
রজনি প্রভাতে জেই মিলে মোর দ্বারে।
নিশ্চএ কহিনু কৈন্যা বিহা দিমু তারে ॥
এথেক জানিআ তবে দেব দিবাকর।
কৈন্যারে কহিতে শপ্ন চলিলা শর্ত্তর (৫৪) ॥
উঠ উঠ দুইকৈন্যা শুনি লও বাত (কথা)।
ব্রাহ্মনেরে রাজদ্বারে পাঠাও প্রভাত ॥
রাজার প্রতিজ্ঞা হৈছে কৈন্যা বিহা দিতে।
জেই শেই জন মাত্র মিলএ প্রভাতে (৫৫) ॥
এই শপ্ন দেখি দুই আনন্দিত হৈআ (৫৬)।
ব্রাহ্মনেরে রাজদ্বারে দিল পাঠাইআ ॥
রজনি প্রভাতে রাজা দেখিআ ব্রাহ্মন।
প্রতিজ্ঞা স্মরিআ কৈন্যা কৈল শমর্পন ॥
জথাজুক্ত রাজাএ দিলেন শানন্দিতে।
নারিশনে দিজবর আশিলা ঘরেতে (৫৭) ॥

এথা দুই ভগিনিএ আনন্দিত হৈআ।
পিতামাতা ঘরে নিল আনন্দ করিআ ॥
এইমতে হরশিতে আছে কথ কাল!
রাজকৈন্যা পুজা দেখি পাতএ জঞ্জাল (৫৮)॥
ব্রাহ্মনের তরে তবে প্রকাশে উত্তর (৫৯)।
বনবাশে দুইকৈন্যা দেয়ত শত্তর ॥
নও মুই চলিজাম বাপের আলএ।
এথেক শুনিআ দিজ চিন্তিত হ্রিদএ (হৃদয়) ॥
কোনরূপে দুই কৈন্যা বনবাশে দিমু।
কোন মতে রাজকৈন্যা ভারিয়া রাখিমু ॥
এথেক ভাবিয়া দিজ জুক্তি কৈলা সার।
দুই কৈন্যা ডাকিআ বোলএ শমাচার (৬০)॥
মাশির বারিত্তে (বাড়ীতে) জাইতে করহ গমন
এথ শুনি আনন্দিত বর (বড়) ভৈনের মন ॥
ছোট ভৈনে বোলে কেনে কর রঙ্গহাশ(৬১)
শতাইর বোলে বাপে দিব বনবাশ ॥

৫১। চরণ—পাঠান্তর।
৫২। নগরে—ঐ।
৫৩। কৈন্যা দেখি নৃপতির প্রতিজ্ঞা প্রতি রহস্য (?)
কালুকা এই কৈন্যা বিবাহ দিবাম্ অবশ্য ॥
—২য় পুঁথি।
* * * *
দেখিয়া রাজাএ কৈলা প্রতিজ্ঞা বচন।
কালু এই কন্যা মুই করিম্ সমর্পণ ॥—৩য় পুঁথি
৫৪। ব্রাহ্মণ কৈন্যারে স্বপন কহিলা বিস্তর—পাঠান্তর।
৫৫। কালুকা প্রভাতে জেবা মিলএ সাক্ষাতে—পাঠান্তর।
৫৬। স্বপ্ন দেখি দুই কৈন্যা সানন্দিত হৈয়া—ঐ।
৫৭। জথা বিধি জতুক (যৌতুক) দিলেক সানন্দিতে
নারী সমে (সনে) দ্বিজ আইল আপন
পুরীতে ॥—ঐ।

৫৮। রাজার কৈন্যাএ ব্রত দেখি ভাবএ জঞ্জাল—পাঠ
৫৯। ২য় ও ৩য় পুঁথিতে এখানে কয়েকটী চরণ এইরূপ বেশী পাওয়া যায়—
রাজার কৈন্যাএ ব্রাহ্মণে কহিল নির্ভিতে (নিভৃতে
তোর কৈন্যাএ কি পূজএ আমার গৃহেতে ॥
তে কারণে মোর ঘরে না হয় সন্তান।
নিত্য অমঙ্গল পূজা করে দুই জন ॥
বনবাসে দুই কৈন্যা দেঅ পাঠাইআ।
তবে সে সন্তান মোর হইব আসিআ ॥
বনবাসে দুই কৈন্যা না পাঠাও জবে।
বাপের বারিতে মুঞি চলি জাইমু তবে ॥
এথেক শুনিআ * * * * ইত্যাদি।
৬০। দুই কৈন্যা ডাকি আনি লাগে কহিবার—পাঠান্তর।
৬১। ২য় ৩য় পুঁথিতে নিম্নোদ্ধৃত চরণ অধিক আছে :—
ছোট ভৈনে বোলে বাপু করি নিবেদন।
কপট বচন তোমার কিসের কারণ ॥
মাত্রি (মাতৃ) বর্ত্তমানে মসি না ছিল আমার।
সতমাএর দিনে মসি পাবে কথাকার ॥
কপট বচন তোমার বুঝিলাম সাহস।
সতমাএর বাক্যে তুমি দিবে বনবাস ॥—ইত্যাদি

বাপ শঙ্গে দুই ভৈন বনবাশে চলে।
শুর্য্য পুজার জথ দ'ব্য বান্ধিআ অঞ্চলে (৬২)
পন্থশ্রমে (৬৩) দুই ভৈন আকুল হইআ।
সুতিলেক (শুইলেন) দুইভৈন আঞ্চল
পাতিআ (৬৪)॥
দুই ভৈন হৈল জদি নিদ্রাএ অচেতন।
নিজগ্রিহে দিজবর করিলা গমন॥
এথা দুই কৈন্যাএ তবে চৈতন্য পাইআ।
বিস্তর ক্রন্দন কৈল পিতা না দেখিআ (৬৫)
(৬৬) স্নান করিবারে দুই জলেত নামিলা।
আচম্বিত শোন্ন (স্বর্ণ) ঘট আশিআ মিলিলা ৬৭
শো'ন্ন ঘট পাই দুই হৈলা আনন্দিং।
পুনি চলি গেলা দুই বাপের বারিৎ
(বাড়ীতে)।
শো'ন্ন ঘট এরিলেক পালঙ্গি (৬৮) উপরে।
ভক্তি করি দুই ভৈন বন্দিলা শতাইরে॥
দেখি রাজকৈন্যাএ বোলে কঠোর বচন(৬৯)
মন দুর্খে দুই পুনি চলি গেলা বন॥
বির্থ (বৃক্ষ) তলে বসি দুই করএ ক্রন্দন।
শ্রীরামজিবনে ভনে শুদ্ধ শুরচন (৭০)॥

:। লাচারি :॥

দুই কৈন্যা বনে গিআ,　　কান্দএ আকুল হৈআ,
ঘন কর ঘাও পাশারিআ (৭১)।
অএ প্রভু দিননাৎ,　　কি করিলা অকশ্মাৎ,
বনবাশে দিলা কি লাগিআ॥
আম্মি দুই শিশুমতি,　　বনে হৈল নিবশতি,
শঙ্গতি (সঙ্গে) নাইক মাতাপিতা।
বাপে দিল বনবাশ,　　জিবনের নাহি আশ,
বোল বিধি চলি জাইমু কথা (কোথা) (৭২)॥

৬২। বাপের সঙ্গে দুই কৈন্যা বনেতে চলিল।
সূর্য্য পুজার দৈর্ব্বর (দ্রব্য) বান্দিয়া লইল॥
—পাঠান্তর।
ইহার পর এই দুই পংক্তি বেশী আছে (২য় ও ৩য় পুঁথি):—
বিষাদ ভাবিআ দুই চলিল পশ্চাতে।
উপনীত হৈল গিআ ঘোর অটবীতে॥
৬৩। জলতিষ্ণাএ—পাঠান্তর।
৬৪। শুইতে লাগিল কৈন্যাএ অচল পাতিআ—ঐ।
৬৫। বনে তথা দুই ভৈন চৈতন্য পাইয়া।
বিস্তর কান্দিল কৈন্যাএ বাপ না দেখিয়া॥ ঐ
৬৬। ইহার পূর্ব্বে এই দুইটী চরণ পাওয়া যায়:—
কান্দিতে কান্দিতে কৈন্যার তিতিল শরীর।
স্নান করিবারে গেল সরোবরের তীর॥
(২য় ও ৩য় পুঁথি)
৬৭। সোণার ছিগলে আসিআ পাত্রতে বেড়িল
—২য় পুঁথি।
আচম্বিতে স্বর্ণঘট তথাএ পাইল—৩য় পুঁথি।
৬৮। আঙ্গিলা—২য় পুঁথি; আঙ্গিনা—৩য় পুঁথি।
৬৯। দুই কৈন্যা দেখি সতাই কুপিত হইয়া।
কঠোর বচন বোলে তর্জ্জিআ গর্জ্জিআ॥ পাঠান্তর
৭০। শ্রীরামজিবন দ্বিজ আদিত্যের দাস।
বিলাপ করএ কৈন্যা হইয়া হতাশ॥—ঐ।
৭১। কপালেতে কর ঘাও দিআ—২য় পুঁথি;
ভালে কর ঘাও প্রহারিয়া—৩য় পুঁথি।
৭২। বল মোর কি হবে বিধাতা—পাঠান্তর।

এই ঘোর বনমাঝে (৭৩) বাঘ্রি বার্লুক আছে,
কোনদিন (৭৪) আক্কা ধরি খাএ।
অটভিতে ঘোর নিশি, কেমতে গোআইমু বশি,
হাহা বিধি কি হৌব (৭৫) উপাএ ॥
জর্ম্মান্তরে কৈনু পাপ, তেকারনে পাম তাপ (৭৬)
শেষ্ট হেতু দেখি (ডাকি ?) নারায়ন (৭৭)।
অএ (ওহে ?) অখিলের পতি, কর দুর্খ অব্যহতি,
দেয় মোরে চরনে স্মরন ॥
শ্রীরামজিবনে ভনে, আদিত্য ভাবিয়া মনে,
করোজোরে করি পরিহার (৭৮) (?)।
দআ কর দিনকর, দুর্খ দশা পরিহর,
বর মাগি চরনে তোমার (৭৯) ॥

:॥ পয়ার :॥

এই মতে দুই কৈন্যা কান্দিআ বিস্তর।
ভক্তি করি পুজিলেক দেব দিবাকর ॥
তবে দেব প্রভাকর (৮০) শদয় হইআ।
দির্ব (দিব্য) এক টঙ্গি তথা দিল বানাইআ ৮১
টঙ্গিতে রহিল দুই বিশাদিত মন।
প্রতি রবিবারে করে আদিত্ত পুজন (৮২) ॥
এইমতে বনে আছে দুইত ভগিনি।
ভুপতি লইআ কিছু শুনহ কাহিনি ॥
পার্বতি পুরের রাজা অনঙ্গ শেখর।
শর্ন্য (সৈন্য) শনে আসি আচে বনের ভিতর
জলের ত্রিষ্টাএ (তৃষ্ণায়) শব ৮৪ আকুল হইআ।
শর্ন্য (সৈন্য) শনে ধাই জাএ জল ৮৪ উদ্দেশিআ ॥
বনের ভিতরে ৮৬ দেখে টঙ্গি মনোহর।
দুই কৈন্যা বসিআছে টঙ্গির উপর ॥
তারা বোলে শুন মাতা কর অবধান।
ভুপতি শন্তোশ কর দিআ জল দান ॥
দুই কন্যাএ বোলে জল নেয় গারু ভরি। ৮৭
শর্ন্য শনে থাই জল দিবা আনি ফিরি ॥

৭৩। এ ঘোর অটবী মাঝে—পাঠান্তর।
৭৪। কোন বা—ঐ।
৭৫। হউক—ঐ।
৭৬। তেকারণে পাইলুম তাপ—ঐ।
৭৭। সেই হেতু বিধি বিরম্বন—ঐ।
৭৮। প্রণতি অপার—ঐ।
কেন নিদারুণ নারায়ণ—ঐ।
৭৯। তোমার চরণে গতি, অন্য নাহি লএ মতি।
একবার করএ উদ্ধার।—ঐ।
৮০। দিবাকর। ৮১। নির্ম্মাইয়া।
৮২। ইহার পর আর দুইটী চরণ আছে :—
ওথাতে ব্রাহ্মণ গৃহ সব নষ্ট হইয়া।
পুনরপি ব্রাহ্মণ জে খাএন্ত মাগিয়া ॥
২য় ও ৩য় পুথি।

৮৩। সসৈন্তে মৃগয়া করে বনের ভিতর—২য় পুঁথি।
সৈন্য সহ চলি আইল বনের ভিতর—৩য় পুথি।
৮৪। রাজা—পাঠান্তর। ৮৫। টঙ্গি—ঐ।
৮৬। মৈদ্ধেতে—ঐ।
৮৭। নিম্নোদ্ধৃত কয় পদ ২য় পুথিতে এইরূপ আছে :—
এথেক শুনিয়া কৈন্যা হরষিত মন।
গারু (গাড়ু) ভরি দেয় জল বলিলা বচন ॥
এক ভৈনে দিল জল ঝারি এক ভরি।
আর ভৈন তাম্বুল দিলক বাটা ভরি ॥

গারু ভরি দিল জল রাজার গোচর।
জল খাই শন্তোশ হইল নৃপবর ॥
শন্য শনে খাই জল শন্তোশ হইল।
ভরিআ রহিল জল কিছু না টুটিল ॥
রাজাএ বোলে এই জল পাইলা কথাএ
(কোথায়)
তারাএ বোলে জল দিঅ দুইত কৈন্যাএ ॥
নৃপে আশি টঙ্গিতে দেখএ দুই নারি।
আনন্দিত হৈআ নিল আপনার পুরি ॥
জেষ্ট ভৈন ভুপতিএ করিল গ্রহণ।
শান্দিকি (শালী ?) কনিষ্টা ভৈন নিলেক
শদন ॥
আনন্দিত হৈলা পাই বনুআ (বন্যা ?) কুমারি
রতিশুখে দুইজন হৈলা গর্ভবতি (৮৮) ॥

বিধির নির্বন্ধ কভো (কভু) না জাএ খণ্ডন।
ভুপতি লইআ কিছু শুনহ কারণ ॥
আরদিন পুজে ধনি শুর্য্যের চরন।
অন্তম্পুরে নৃপতিএ (নৃপতিএ) দেখিল তখন
রাজা বোলে শুন প্রিয়া পুজশি কাহারে।
এ বলিআ পাএ (পায়) পুজা ঠেলিলা
সত্তরে ॥(৮৯)
শে দিন অবধি রাজার অর্ভাগ্যে ধরিল।
ধন জন পুরি রাজার শকলি মজিল ॥
হস্তিশালে হস্তি মৈল ঘোরাশালে ঘোরা।
ছারখার হৈল পুরি গেল সুয়াপুরা (?) (৯০)
তথাএ শাঙ্কিকির ঘরে পুজার কারন।
দিগুন শম্পদ হৈল কি কৈব কথন ॥
ছারখার হৈল পুরি দেখিআ ভুপতি।
শাঙ্কিকিরে বোলে রাজা কোপ হৈআ অতি ॥
বনবাশ কৈন্যা আনি হৈনু ছারখার।
তুই আলি (আইলি ?) ধন জন পাইলি অপার
এই স্ত্রির রক্ত লৈআ করিমু জে স্নান (৯১)।
বারে বারে বোলে রাজা কোটাআল
স্তান (স্থান) ॥

জল আর পাণ দিয়া কহিল ডাকিয়া।
সকলে খাইলে পুনি আনিঅ ফিরিয়া ॥
জল আর তাম্বুল দিল রাজার গোচর।
জল তাম্বুল খাইআ সন্তোষ নৃপবর ॥
সৈন্য সমে জল পান সন্তোষ হইয়া।
না টুটিল জল পান রহিল ভরিআ।
রাজাএ বোলে জল পান পাইলে কথাএ।
তারা বোলে দিল দির্ব্ব (দিব্য) দুইত কন্যাএ ॥
রাজাএ আসিআ তবে দেখি দুই নারী।
আনন্দ করি দুই কন্যা নিজ নিজ বারি (বাড়ী) ॥
৮৮। রতিসুখ করে দুহে হইয়া কুতুহলী—পাঠান্তর।
ইহার নীচে এই কয়টী পদ বেশী আছে :—
এই মতে দুইকৈন্যা হরসিত মন।
প্রতি রবিবারে করে সূর্য্যের পূজন ॥
কায়মনে সূর্য্যপদে করএ ভকতি।
সূর্য্যবরে দুইকৈন্যা হইল গর্ভবতী ॥
*　*　*　*
আদ্য মহাদেবী বোলে শুন নৃপবর।
বনুআ কুমারীএ কি করে অথান্তর (?) ॥
প্রতি রবিবারে এক ঘট বসাইয়া।
অমঙ্গল পূজা করে তোহ্মার লাগিয়া ॥
এথেক শুনিআ রাজা বিস্ময় হইল মন।
অন্তস্পুরে গেল রাজা জানিতে কারণ ॥

*　*　*　*
সকল কহিবা তুমি আমার গোচরে ॥
কৈন্যা বোলে শুন রাজা করি নিবেদন।
প্রতি রবিবারে পূজি সূর্য্যের চরণ ॥
ক্রোধ হইয়া রাজা বলিলা কৈন্যারে।
সূর্য্য পূজা না করিঅ আমার মন্দিরে ॥
২য় ও ৩য় পুঁথি।
৮৯। এ বোলিআ পূজার ঘট ঠেলি ফেলে পাএ।
সেইক্ষণে রাজার অঙ্গের লক্ষ্মী ছাড়ি জাএ ॥ ঐ
৯০। ছারখার হইল রাজা পুড়ি গেল গোলা—২য় পু:
ছারখার হৈল পুরি দেখি পুয়া পুরা—৩য় পু:
ইহার পর নিম্নোদ্ধৃত দুই পদ বেশী আছে :—
বনুয়াকুমারী তবে ব্রত পাসরিল।
সূর্য্যপূজা পাসরিআ অভাজ্ঞ (অভাগ্য) ধরিল ॥
২য় ও ৩য় পুঁথি।
৯১। এহার রুধির আমি করিবাম পান—পাঠান্তর ॥

নৃপতির বচন শুনি আলিশিখর (৯২)।
কৈন্সা লৈআ চলি গেলা বনের ভিতর ॥
বনৈতে রাখিলা কৈন্সা পরম অস্তনে (যতনে)
পশু কাটি রক্ত দিল নৃপতির স্থানে (৯৩)॥
এই মতে কথো কাল জদি নির্বাহিলা।
তথাএ বসুআ কৈন্সার পুত্র প্রবেশিলা
(প্রসবিল ?)
আর এক পুত্র হৈল শাস্কিকির ঘর।
দিনে দিনে বারে (বাড়ে) বালা (বালক)
আদিত্তের বর (৯৪)॥
দুই জনের নাম থুইল দুঁখ শুখ রাজ।
এইরূপে বসুআ কৈন্সা আছে বনমাজ ॥
বহু দুঁখ পাএ কৈন্সা বনের ভিতর।
বিস্তর শম্পদ হৈল কোটোআলের ঘর (৯৫)
পঞ্চ বছর হৈল কুমার বনের ভিতরে।
বনে বনে ভ্রমে নিত্ত (নিত্য) ধনু লইআ করে॥
আরদিন গেল শেই গহন কানন।
পক্ষিরূপে শুর্জ্য তথা মিলিল তখন ॥
পক্ষি দেখি আনন্দেতে গোলাল (গোলা-শর)
মারিল।
কুপিত হইআ পক্ষি বলিতে লাগিল (৯৬)॥
জর্ম্ম শুদ্ধ নহে তোর নাহি চিন বাপ (৯৭)।
এথ শুনি কুমারে পাইল মনস্তাপ ॥
এই কথা কৈল আশি জননির পাশ।
পিতার উদ্দেশ (উদ্দেশ) তানে কৈল
কুটভাশ (কুটভাষ)॥

৯২। নিশীথর—পাঠ।

৯৩। ইহার পর এই দুই পংক্তি বেশী আছে :—
সেইত রুধিরে স্নান করিল রাজন।
আনন্দে রহিল কৈন্সা গহন কানন ॥

৯৪। পরম সুন্দর শিশু দিনে দিনে বাড়ে—পাঠান্তর।

৯৫। ৩য় পুঁথিতে ইহার পর নিম্নোদ্ধৃত পদ অধিক আছে :—
নিত্য নিত্য স্মরে কন্সা দেব দিবাকর।
* * * *
সদয় হইয়া তবে দেব দিনমণি।
কুমারের অস্ত্রশস্ত্র শিখাইল পুনি ॥
অস্ত্রশিক্ষা পাই শিশু হরিস অন্তর।
বাটুল লইয়া করে ভ্রমে নিরন্তর ॥
আর দিন * * * । ইত্যাদি।

৯৬। পক্ষী দেখি মোহানন্দে ধনুতে দিল গুণ।
পক্ষী বধিতে শর ক্ষেপিলা দারুণ ॥
পরিলেক শরগোটা পক্ষী এরাইয়া।
কহিতে লাগিল পক্ষী কোপিত হইআ ॥
পাঠান্তর।

৯৭। তাত—ঐ। ইহার পর কয়েক চরণে বহু বৈলক্ষণ্য পরিদৃষ্ট হয়। যথা :—
তোর শরে মোর অঙ্গে না হইল ক্ষেত (ক্ষত)।
* * * *
এথেক শুনি শিশু লজ্জিত বদনে।
কান্দিতে কান্দিতে গেল জননীর স্থানে ॥
পক্ষী হইয়া জন্দ মোরে বোলে কি কারণে।
পিতা না থাকিলে আমি হইলাম কেমনে ॥
পুত্রের বচনে মাএ দুঃখিত হইল।
আদি অন্ত বিবরণ পুত্রেরে কহিল ॥
পুনরপি কহে মাএ পুত্রের গোচর।
এথ দুঃখ পাইব আমি কানন ভিতর ॥
তোমার এক মাসি আছে সান্দিষের স্থানে।
তথা গিয়া কিছু ধন আনহ যতনে ॥
এ বোলিয়া শ্রিরি (অঙ্গুরী) দিলেক শিশুরে।
সন্ধি উপদেশ কথা কহে বারে বারে ॥
অঙ্গুরী লইআ শিশু করিলা গমন।
আপনার রাজ্যে আসি দিলা দরশন ॥
জননীর উপদেশ বুঝিবার তরে।
সেই মতে রহে গিয়া পুষ্করিণীর পারে ॥
দাসী সব জল নিতে আসিআছে ঘাটে।
কুম্ভেতে অঙ্গুরী শিশু দিলেক কপটে ॥
দাসী সব জল নিআ কৈন্সার স্থানে দিল।
স্নান করিতে কৈন্সা অঙ্গুরী পাইল ॥
অঙ্গুরী পাইআ কৈন্সা চিনিল তখন।
ভগিনীর শোকে কৈন্সা করএ ক্রন্দন ॥
ক্ষেণেক ব্যাজে কৈন্সা স্থির করি মন।
দাসীগণ ডাকিআ জে বোলিলা বচন ॥
জল আনিতে তোরা কে রাহিল ঘাঠে।
সিগ্রহ (শীঘ্র) করি ডাকি আন আমার নিকটে ॥

শেই মতে রৈল আশি পাথরির (?) পারে।
দাশির শঙ্গতি চলি গেল মশির (মাসির) ঘরে
কথদিন আছে তথা আনন্দ করিআ।
মাএর (মায়ের) নিকটে শেই গেলেন চলিআ॥
বহুবিধ দর্ব্য (দ্রব্য) মশি দিল শানন্দিতে।
লোক শবে বহি নিল কুমার শহিতে॥
কথদুর নিআ তবে থুইল দর্ব্যজাৎ (দ্রব্যজাত)
লোক শব বিদায় করিল শহশাৎ (অকস্মাৎ?)
তবে শুর্য্যদেবে বিদ্ধ (বৃদ্ধ) বয়শ (৯৮) হইয়া।
দর্ব্যজাত হরি নিল কুমার মারিয়া (৯৯)॥

দাসীগণে ডাকি তারে সত্বরে আনিল।
কুমার দেখিআ কৈন্স্যা কোলেতে লইল॥
ভগিনী কুশলবার্ত্তা জিঙ্গাসে (জিজ্ঞাসে) শিশুরে।
দুঃখ সুক্ষ (সুখ বা শোক?) কথা শিশু কহিল মাসীরে॥
ভগিনীর তনয় কৈন্স্যাএ স্নান করাইআ।
ঘরেতে নিলেন শিশু মঙ্গল করাইআ॥
এই মতো আছে শিশু আনন্দিত মন।
মাএর কারণে শিশু হইল স্মরণ॥
করজোরে মাসীর স্থানে করে নিবেদন।
মায়ের কারণে মোর সদাএ পোড়ে মন॥
এসব শুনিআ কৈন্স্যা হরসিত হইআ।
বহুবিধ দৈর্ব্ব (দ্রব্য) দিল ভগিনীর লাগিআ॥
লোক সব সঙ্গে নিল বারাইয়া (বাড়াইয়া) দিতে।
আপনার গৃহে শিশু জাএ হরষিতে॥
কতদুর গিয়া * * * ইত্যাদি। ২য় পুঁথি।

৯৮। ব্রাহ্মণ পাঠান্তর। ৯৯। শিশুরে মারিআ দৈর্ব্ব নিলেক কারিআ—ঐ। ইহার পর ২য় পুঁথিতে কিয়দ্দূর বিস্তৃত রচনা পাওয়া যায়। যথা—

প্রাণে না মারিল শিশু রাখিল জীবন।
কান্দিতে কান্দিতে শিশু কহে মাএর চরণ॥
বহু দৈর্ব্ব দিল মাসি তোমার লাগিয়া।
বাড়াইআ দিল মোরে লোক সঙ্গে দিআ॥
দৈবযোগে লোক মুই করিলুম বিদাএ।
হেনকালে ব্রাহ্মণ এক আইল তথাএ॥
আমারে মারিআ দৈর্ব্ব নিলেক কারিআ।
কিস্তমাত্র (কিছুমাত্র?) না রাখিল তোমার লাগিআ॥

কান্দিতে কান্দিতে কৈল মাএর চরনে।
পুনি চলি গেলা দুই মালিনি পুস্পবনে॥
নানা বর্ণ্যে (বর্ণে) পুস্পশব ফুটিছে বিস্তর।
চৈক্ষু (চক্ষু) মেলি মালিনিএ দেখিল গোচর॥
মালিনির ঘরে দুই রৈল শানন্দিতে।
তথা হৈতে চলি গেলা শাঙ্খিকি ঘরেতে॥
দুই ভৈন এক হৈয়া রৈলা শানন্দিতে।
আদিত্য পুজন করে হৈয়া শানন্দিতে॥

পুত্রের বচনে মাত্র নিশ্বাস ছাড়িয়া।
শান্ত করিলা শিশু কোলেতে লইআ॥
পুনি দুই চলি গেলা ভগিনী উদ্দেশে।
পুস্পবনে রহে গিআ মালিনী সম্পাশে॥
বহুবিধ পুস্প সব ফুটিলে বিস্তর।
চক্ষু মেলি মালিনীএ দেখিল গোচর॥
হরষিত হইয়া তবে মালিনী সুন্দরী।
নানাবিধ পুস্প সব তোলে সাঝি ভরি॥
পুস্প তোলে মালিনীএ হরষিত মনে।
কৈন্স্যার শিশুর দরশন পাইল পুস্পবনে॥
কৈন্স্যা দেখি মালিনীএ জিঙ্গাসে (জিজ্ঞাসে) বচন।
তোমরা দুইজন কেনে রহিছ পুস্পবন॥
মালিনীর বাক্যে কৈন্স্যা পদ উত্তর দিল।
আদি অন্ত বিবরণ সকল কহিল॥
এক ভৈন আছে মোর সাঙ্খিবের স্থানে।
তোমার কৃপা হইলে পারি তান দরশনে॥
এথ শুনি মালিনী সদয়া উপরজিল (উপজিল)।
কৈন্স্যা শিশু দুইজন গৃহেতে আনিল॥
এ বোলি মালিনীর ঘরে রহে সানন্দিতে।
মাল্যানীর উপদেশে জাএ সাঙ্খিরের ঘরে॥
দুই ভৈন একত্র হইল সানন্দিতে মন।
সানন্দি (সানন্দে?) পূজএ দুই সুর্য্যের চরণ॥
মিত্তিকার পিষ্টক * * * ইত্যাদি।
* তথা গিয়া পুস্পবনে রৈলা দুই জন।
অপুস্পিত বৃক্ষ ছিল কি কব কথন॥
নানাবর্ণ পুস্পসব ফুটিছে বিস্তর।
চক্ষু মেলি দেখে পুস্প নয়ান গোচর॥
মাল্যা মালিনী দুই ছিল চক্ষুহীন।
প্রকাশ হইল চক্ষু গেল দুঃখ চিন॥
পুস্পবন বিচরিতে পাইল দুইজন।
আনন্দে মালিনী ঘরে নিলেক তখন॥ ৩ পুথি॥

মিত্তিকার (মৃত্তিকার) পিষ্টক শেই ভৈক্ষন
করিল।
তবে শুর্য্যেদেবে তানে শদয় হইল ॥
শুর্য্যের কৃপায় হৈল রাজার স্মরন।
কোটোআল ডাকি রাজা বলিলা বচন ॥
বণুআ কৈন্তা আনি দেয় (দেও) জদি চাহ ভাল
নহে তোরে শর্বংশে কাটিআ দিমু শাল ॥
এথ শুনি কোটোআল অশস্তোশে (১০০)
হইআ।
কহিল সকল কথা নারি স্থানে গিয়া ॥
স্ত্রিএ বোলে তার লাগি চিন্তা কি কারণ।
ভুপতি আনিআ এথা কর নিমন্ত্রন (১০১) ॥
এথ শুনি কোটোআলে নিমন্ত্রন আরম্বিল১০২
একে একে রাজশন্য (রাজসৈন্য) বাত্তিয়া
(নিমন্ত্রন করিয়া) আনিল ॥

তবে রাজা বশিলেক করিতে ভোজন।
নিজ পুত্র পরিকর (পরিচয় ?) চিনিল তথন ॥
জায়া পুত্র বারিতে (বাড়ীতে) জাইতে
করিলা গমন।
পন্থে জাইতে অমঙ্গল দেখিল তথন ॥
এথ দেখি নরাধিপ কুপিত হইল।
হারিরে কাটিতে রাজা আদেশ করিল ॥
ভুপতির বাক্য কভো (কভু) না জাএ খণ্ডন।
একে একে কাটিলেক হারি শতজন ॥
আপনা পুরিতে রাজা হৈলাউপনিৎ (উপনীত)
শ্রীরামজিবনে ভনে আদিত্য চরিৎ (১০৩) ॥
শ্রীরামজিবন ভনে আদিত্ত ভাবিয়া।
কান্দএ হারির মাও (মাতা) বিশাদ
ভাবিয়া (১০৪) ॥

ঃ লাচারি ঃ

কান্দএ হারির মাও, বুকেতে হানিআ ঘাও,
অতি শোকে হৈআ শোকাকুলি।
অএ (ওহে) প্রভু দিনাৎ (দিননাথ), কি করিলা অকস্মাৎ,
শাত গোটা পুত্র নিলা হরি ॥
কথা (কোথা) হৈতে দুর্বাদিনি (দুর্ভাগিনী ?), ভুপতি পুরতে আনি,
ধনে জনে পুরী মজাইল (মজাইল)।

১০০। চিন্তিত—পাঠান্তর।
১০১। রাজারে আনিআ তুমি করাইয় নিমন্ত্রণ—ঐ
১০২। এস্থান হইতে কয়েক পদ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়।
এথ শুনি কোতআল হরষিত মন।
নানাবিধ দৈর্ব্ব আনি কৈল নিমন্ত্রণ ॥
কোতআলে কহে গিয়া ভুপতির চরণ।
আমার ঘাড়ীতে তুমি করিবা ভোজন ॥
ভুপতিরে বার্ত্তন করিআ নিশীশ্বর।
আপনা পুরীতে আইল হরষিত অন্তর ॥
আমন্ত্রণ শুনি রাজা সৈন্য সমূদিতে।
সাদিঘের ঘরে গেল ভোজন করিতে ॥
তবে রাজা বসিলেক করিতে ভোজন।
বমুআ কৈন্যাএ অন্ন দিলেক্ তখন ॥
চিনিআ আপন নারী হরিষ ভুপতি।
কোতোয়ালের তরে রাজা করিলা পিরীতি ॥
সপুত্র সহিত নারী পাইয়া রাজন।
হরিণির সাতপুত্র কাটিলা তখন ॥
ভুপতির বাক্য * * * ইত্যাদি।
১০৩। সূর্য্যের প্রসাদে ধন হইল পূর্ণিত—পাঠান্তর।
১০৪। বিলাপ করিআ—ঐ

সেই হেতু নরপতি,　　বনে দিল নিবশতি,
　পুনি আনি মোরে নাশ কৈল (১০৫) ॥
বাদি হইল বিধাতাএ,　　জথ দুর্খ দিল তাএ, (১০৬)
　একে নীচ ঘরে হৈল জর্ম্ম।
বিশাদ ভাবিআ মনে,　　থাকি নিজ পুত্র শনে,
　প্রতিনিত্তি (প্রত্যহ) করি রাজকর্ম্ম ॥
আর দেখ পাপবিধি,　　দুর্খ জর্ম্ম অবধি, (১০৭)
　শত পুত্র নিলেক হরিয়া।
কেমতে ঘরেতে জাইমু,　　কার মুখ চাহিমু,
　কেমতে ধরাইমু পাপ হিয়া ॥
শত বধুর ক্রন্দনে,　　শহিমু জে কেমনে,
　মোর প্রান না জাএ কি কারন (১০৮) ॥
অএ (ওহে) অখিলের পতি,　　কর দুর্খ অভ্যাঅতি,
　দেয় (দেও) মোরে চরনে স্মরন। (১০৯)
শ্রীরামজিবনে ভনে,　　আদিত্ত ভাবিআ মনে,
　ন কান্দিয় হারির জননি।
ভকতি করিয়া মন,　　কর শুর্য্য পুজন, (১১০)
　নিজ পুত্র পাইবা আপনি ॥

ঃ॥ পয়ার ঃ॥

এই মতে কান্দে জদি হারির জননি।
রাজপত্নি (১১১) মৈয়া কিছু শুনহ কাহিনি ॥
আর দিন পুজা করে পুরির ভিতর।
হারির জননি চলি (১১২) গেলেন শত্তর ॥
রাজপত্নি বোলে বেটি কর অবধান।
পুত্র বর মাগ এই (১১৩) পুজার বিদ্দমান ॥
এথ শুনি হারির মাও গলে পাশ (বাস-বস্ত্র?) দিয়া (১১৪)।
পুত্র বর মাগে শেই (১১৫) ভকতি করিয়া ॥

১০৫। বনচারী কৈল্যা দুষ্ট;　　আনি রাজা হইল নষ্ট।
　ধন জন পুরি মরি মর্জ্জাইল।
ভুপতি বুঝিআ সার　　বনে দিল পুনর্ব্বার,
　আমার অভাঙ্গে (অভাগ্যে) পুনি আইল ॥—পাঠান্তর।

১০৬। বিধাতা বিমুখ হইল, মোরে জথ দুঃখ দিল,-ঐ
১০৭। আর দেখ দারুণবিধি, দুঃখ দিল জর্ম্মাবধি,-ঐ
১০৮। কি লাগিয়া—ঐ
১০৯। রাখ মোরে পদ ছায়া দিআ—পাঠান্তর।
১১০। ভক্তি করিআ মনে, কর সূর্য্য আরাধনে—ঐ
১১১। রাজপুর—ঐ। ১১২। হারিনী চলিআ তথা—ঐ
১১৩। তুমি—ঐ। ১১৪। এথশুনি হারানিএ গলবস্ত্র হৈআ—ঐ।
১১৫। মাগএ জে—ঐ।

তবে দেব প্রভাকর (১১৬) প্রশর্ণ্য (প্রসন্ন)
তথাৎ (তখন ?)।
দৈববানি সেইকালে হৈল অকস্মাৎ ॥
হারিগনের কন্দ (স্কন্ধ) মুণ্ড একত্র করিয়া।
এই জে পুজার জল তথাএ দেহ নিআ (১১৭)।
শুনি শিগ্র (শীঘ্র) গতি তথা করিল গমন ॥
পুজার জলে জিয়া উঠে হাড়ি শাতজন ॥
পুত্র দেখি হারির মাও হৈল আনন্দিত।
ভক্তিকরি দিবাকর পুজে প্রতিনিৎ ॥
হারিগন চলি গেল রাজার দুআর।
তা দেখি মোহারাজি বিস্ময় অপার ॥
কালু কাটিনু (১১৮) হারি দেখিনু নয়নে।
আজি হারিগণ এথা আইল কেমনে ॥
জিজ্ঞাসা করিয়া রাজা জানিলা কারন।
পন্থিকে কুপিত রাজা বলিলা বচন ॥
মরা জদি জিআএ (জিয়াও-বাঁচাও) তুহ্মি
(১১৯) আছে হেন জ্ঞান।
মরা বাপ মাও মোর আন (১২০) বিদ্যমান ॥
এথ শুনি অশোন্তোশ হৈল রাজরানি (১২১)
ততক্ষনে শুর্য্যে শপ্ন দেখাইল পুনি ॥
ভক্তি করি রাজাএ জদি করএ শুজন।
জিব তার বাপ মাও কহিনু বচন ॥
এথ শুনি রাজপত্নি শন্তোশ হইয়া।
আনন্দে কহিল তবে ভুপতিরে গিয়া (১২২) ॥
তবে রাজাএ করিলেক শুর্য্যের পুজন।
মরা বাপ মাও রাজা দেখিলা তখন ॥
সূর্য্য-পুরে গেল রাজা মাও বাপ লৈয়া।
জুরাজ (যুবরাজ ?) পুত্রে সম্তানে রার্য্য
শমর্পিয়া (১২৩) ॥
এইমতে শুর্য্য-পুজা করে জেই জন।
সর্ব্বক্ষন রক্ষা তানে করএ তপন ॥
শ্রীরাম জিবনে ভনে আদিত্ত ভাবিয়া।
তুআ (তুয়া-তোমার) পাদপর্দ্দে (পদ্মে)
মন বৈক অলি হৈয়া (১২৪) ॥
মোহানন্দে শুরুগনে করিছে আদেশ ১২৫।
এই হেতু করিলাম কবিতা বিশেশ ॥(১২৬)
কবিগন চরনেত শত নমস্কার।
অশুদ্ধ দেখিলে পদ করিবা শুশার (সুসার) ॥
(গুরুজন ?) মুখে শুনি এই কথার চিগলি ?
শুর্য্যদেব অনুশারে রচিনু পাঞ্চালি।

১১৬। প্রভু সূর্য্যদেব—পাঠান্তর।

১১৭। মাথাএ থাকাএ ? হারির একত্র করিআ।
পুজার ঘটের জল তার গাত্র দিআ।—২য় পুঁথি।
* * * * * *
স্কন্ধক সহিতে মুণ্ড একত্র করিয়া।
এই পূজার জল তথা ছিটি দেও নিয়া ॥
পুত্র দেখি হারির মাও গলে বাস দিয়া।
দণ্ডবত হইয়া পড়ে পূজা উদ্দেশিয়া।—৩য়পুঁথি।

১১৮। কালুকা কাটিলা—পাঠান্তর।

১১৯। মরা জীআইতে তোমার—পাঠান্তর।

১২০। দেখ—ঐ।

১২১। নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটীচরণ এইরূপ পরিদৃষ্ট হয়—
এথ শুনি সন্তোষ হইআ রাজরাণী।
ভকতি করিআ দেবী সূর্য্য পুজে পুনি ॥
ততক্ষণে সূর্য্য স্বপন দেখাইলা আপনি।
আমাকে পুজএ জদি দণ্ড নৃপমণি ॥
আমা যদি পুজে রাজা ভাবি একমনে।
জীবেক তার বাপ মাও দেখিব নআনে ॥
এথশুনি রাজরানী * * প্রভৃতি। ২য়ও ৩য় পুঁথি

১২২। ইহার পর কয়েকটী পদ বিস্তৃত ভাবে আছে—
সূর্য্য পূজা কর রাজা ভক্তি ভাবি মনে।
মরা বাপ মাও তুমি দেখিবা নআনে ॥
তবে রাজা বন্দিলেক মাও বাপ চরণ।
সূর্য্যের প্রসাদে মুক্ত হইল রাজন ॥—২য় পুথি।

১২৩। যুবরাজ পুত্রেরে তান রাজ্য সমপ্রিয়া—ঐ

১২৪। তুআ পাদপদ্মে মন রহুক লাগিয়া—পাঠান্তর

১২৫। শরীর আরোগ্য পুত্র শুরুগণে করএ আদেশ ঐ

১২৬। এখানে ২য় পুঁথি শেষ হইয়াছে। ৩য় পুঁথিতে তৎনিম্নে এই কয়টী পদ আছে :—
ধনে পুত্রে পড়এ জে ঐশ্বর্য্য অপার।
বিঘ্ননাশ হএ তার আপদ নিস্তার ॥
আদিত্যের পুজা জেই করে একমতি।
অন্তিমকালেতে তার হএ স্বর্গগতি ॥
ইন্দুরাম * * * প্রভৃতি।

পূর্ব্বে আছিল এই ব্রতের জে কথা।
পরম হরিশে কৈনু (প্রকাশ কবিতা ?)॥
জেই জনে শুনে ভনে শুর্য্যের চরিত্র।
মন বাঞ্ছা শিদ্ধি হএ শরির পবিত্র॥
ইন্দু-রাম-ঋতু-বিধু শক নিয়োজিৎ।
শ্রীরামজিবনে ভনে আদিত্ত চরিৎ (১২৭)॥

ইতি শ্রীশুর্য্যের পাঞ্চালি শমাপ্ত। ইতি শন মঘি ১১৫৮ তারিথ ১১ আগ্রনশু (অগ্রহায়ন) পুস্তিকা লিক্ষতে, এই পুস্তিকা এক অধিকার শ্রীশিবচরণ সিংহ শ্রীকৃষ্ণ শীং দাশ দেয়শু।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

জয়পুরের জ্যোতিষিক যন্ত্রালয়

২

আমরা বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে দক্ষিণোত্তরভিত্তি যন্ত্রের (Meridianal Wall) বিষয় বর্ণনা করিব। এই যন্ত্রের দ্বারা জ্যোতিষ্কগণের যাম্যোত্তর অতিক্রমকালীন (Transit on the meridian) উন্নতাংশ, সূর্য্যের মহত্তম ক্রান্তি (greatest declination) এবং স্থানীয় অক্ষাংশ (latitude) নির্ণীত হয়। বর্ত্তমানকালে Mural Circle নামক যন্ত্রের দ্বারা য়ুরোপ প্রভৃতি স্থানে ঐ সকল উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাকে। পর্য্যবেক্ষণিকা ভূমির উত্তরভাগে একটী প্রাচীর দৃষ্ট হইবে। এই প্রাচীরটী সম্পূর্ণরূপে যাম্যোত্তর রেখায় অবস্থিত। প্রাচীরের পূর্ব্বগাত্রে ২০ ফুট্ ব্যাসার্দ্ধবিশিষ্ট দুইটী বৃত্তপাদ (Quadrant) অঙ্কিত আছে। এবং পশ্চিম গাত্রে ১৯ ফুট্ ১০ ইঞ্চ ব্যাসার্দ্ধ বিশিষ্ট একটি বৃত্তার্দ্ধ চিত্রিত আছে। পরিধিগুলি মর্ম্মর-প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং অংশ (Degree), কলা (Minute) প্রভৃতিতে বিভক্ত। প্রস্তর খোদিত করিয়া তাহার মধ্যে সীসক প্রবিষ্ট করাইয়া বিভাগের রেখাগুলি অঙ্কিত হইয়াছে। বৃত্তের কেন্দ্রস্থানে একটী কীলক প্রোথিত আছে। তাহাতে সূতা বাঁধিয়া সমস্ত বিভাগাংশের উপর সেই সূতার অগ্রভাগ ঘুরাইতে পারা যায়। যখন কোন জ্যোতিষ্কের উন্নতাংশ নির্ণয় করার আবশ্যক হয়, তখন তাহার যাম্যোত্তর রেখা অতিক্রম করিবার সময়ের প্রতীক্ষা করিতে হয়। বুঝিতে সুগম হইবে বলিয়া পাঠকগণকে যন্ত্রের পশ্চিম গাত্রের চিত্রের প্রতি মনোযোগ করিতে অনুরোধ করি। যখন জ্যোতিষ্কটি যাম্যোত্তর রেখায় উপস্থিত হয়, তখন সূত্রের অগ্রভাগটী যে বিভাগাংশে ধরিলে কীলক এবং ঐ জ্যোতিষ্ক সমসূত্রপাতে অবস্থিত দৃষ্ট হইবে, তখন ঐ বিভাগাংশ

১২৭। অর্থাৎ ১৬১১ শকাব্দ।

বৃত্তার্দ্ধের নিকটস্থ সীমা হইতে কয় অংশ দূরে আছে দেখিয়া লইবে। ঐ অংশ সংখ্যা উক্ত জ্যোতিষ্কের উন্নতাংশদ্যোতক।

নিম্নলিখিত উপায়ে জয়পুরের অক্ষাংশ নির্ণীত হইয়াছে। প্রতিদিন মধ্যাহ্নকালে যাম্যোত্তর রেখা অতিক্রমকালীন সূর্য্যের উন্নতাংশ দেখিয়া লইতে হয়। ৯০ অংশ হইতে সেইটী বাদ দিলে খস্বস্তিক হইতে দূরত্ব অর্থাৎ নতাংশ (Zenith distance) পাওয়া যায়। কয়েক মাস ধরিয়া এইরূপ নতাংশ নির্ণয় করিতে করিতে সর্ব্বাপেক্ষা যেটি কম এবং সর্ব্বাপেক্ষা যেটি অধিক এই উভয়ের অন্তর লইয়া তাহার অর্দ্ধ গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই বিষুবরেখা এবং রাশিবলয়ের অন্তর্গত কোণের (Obliqnity of ecliptic) পরিচায়ক অর্থাৎ বিষুবরেখা সূর্য্যের লঘুতম নতাংশে অবস্থিত এবং মহত্তম নতাংশে অবস্থানের মধ্যবিন্দু দিয়া গিয়াছে। ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে মহারাজ জয়সিংহ জয়পুরের রবিপরমাক্রান্তি (Obliquity of the ecliptic) ২৩ ডিগ্রী ২৮ মিনিট নির্ণয় করিয়াছেন। ঐ সময়ে উহা প্রকৃত পক্ষে ২৩ ডিগ্রী ২৮ মিনিট ২৯ সেকেণ্ড (বিকলা) ছিল। অতএব ইহা গণনার সামান্য ব্যতিক্রম মাত্র জানিতে হইবে। পরমাক্রান্তিতে সূর্য্যের লঘুতম নতাংশ যোগ করিলে জয়পুরের অক্ষাংশ (latitude) পাওয়া যায়। লঘুতম নতাংশ কিঞ্চিদধিক সার্দ্ধতিন অংশ মাত্র। এই জন্য জয়পুরের অক্ষাংশ ২৭ ডিগ্রী। ইহাতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, সূর্য্য জয়পুরের খস্বস্তিকে অর্থাৎ মাথার উপর কখনই উপস্থিত হন না। তাহার চূড়ান্ত উত্তর প্রবৃত্তি জয়পুরের খ মধ্য হইতে ৩॥০ ডিগ্রী দক্ষিণেই থাকিয়া যায়। অতএব জয়পুর সমকটিবন্ধে (Temperate zone) অবস্থিত।

এইখানে বলিয়া রাখি, যে স্থান উষ্ণ কটিবন্ধে অবস্থিত, সে স্থান হইতে ঈদৃশ যন্ত্রদ্বারা গণনা করিতে গেলে সূর্য্যের উভয় নতাংশের বিয়োগফল না লইয়া যোগফল লইয়া তাহার অর্দ্ধেক করিলে সূর্য্যের মহত্তম ক্রান্তি (Maximum declination) পাওয়া যায়। ইহাই obliquity বা the ecliptic এর পরিমাণ। উষ্ণকটিবন্ধের কোন স্থানের অক্ষাংশ নির্ণয় করিবার সময় সূর্য্যের মহত্তম ক্রান্তি হইতে লঘুতম নতাংশ বিয়োগ করিতে হয়।

ভিত্তিযন্ত্রের উচ্চতা প্রায় ১৪ হস্ত, এবং দৈর্ঘ্য উহার দ্বিগুণেরও কিঞ্চিদধিক। অতএব পর্য্যবেক্ষণের সুবিধার জন্য সমস্ত বৃত্তপরিধির পার্শ্বে সিঁড়ী গাথা আছে। ঐ সিঁড়ি দিয়া উপর পর্য্যন্ত উঠিতে পারা যায়।

এই প্রবন্ধে কতকগুলি সংস্কৃত জ্যোতিষিক শব্দের ইংরেজী অনুবাদ বন্ধনী মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। জয়পুরের জ্যোতিষিক যন্ত্রের সমগ্র উপযোগিতা বুঝিতে হইলে সংস্কৃত জ্যোতিষিক শব্দের এবং তাহাদের প্রত্যেকের ইংরেজী অনুবাদের একটি বৃহৎ তালিকা সম্মুখে রাখা উচিত। অধুনা কাশীস্থ নাগরী-প্রচারিণী সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক কোষান্তর্গত জ্যোতিষিক পরিভাষা দ্বারা সে কার্য্য অনেকটা সংসাধিত হয়।

* ভিত্তিযন্ত্রের পূর্ব্ব গাত্রস্থিত চিত্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা না দিলে আমরা প্রবন্ধ সমাপ্ত মনে

৭

জয়পুরের জ্যোতিষিক যন্ত্রালয়স্থ ভিত্তিযন্ত্র

সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা ১৩শ ভাগ, ৮০ পৃষ্ঠা।
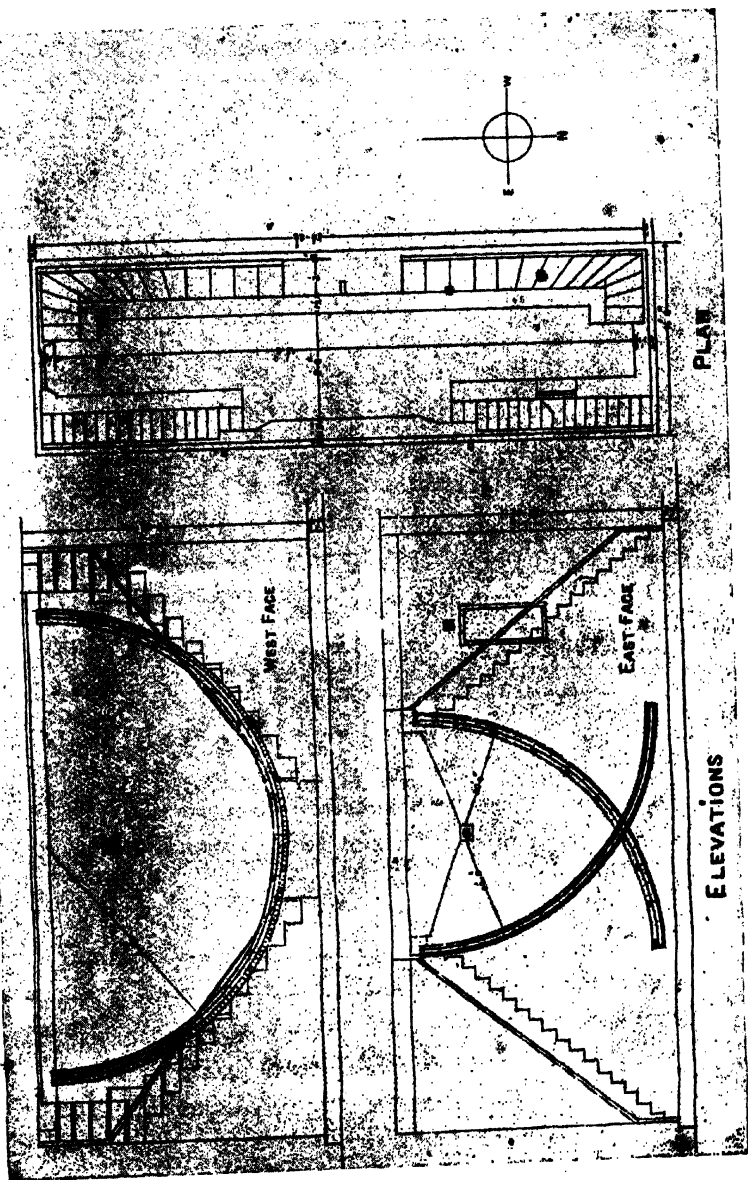
করিতে পারি না। অতএব তাহাও পাঠকদিগের গোচর করিতেছি। পূর্ব্বগাত্রে দুইটী বৃত্তপাদ আছে। উত্তরের কেন্দ্রদ্বয় এক ব্যাসার্দ্ধ পরিমিত দূরে অবস্থিত। চিত্রটী ইউক্লিডের ১ম অধ্যায়ের ১ম প্রতিজ্ঞার অনুরূপ। উত্তর বৃত্তপাদের দ্বারা দক্ষিণাকাশের গ্রহ নক্ষত্রগণের উন্নতাংশ নির্ণীত হইয়া থাকে। দক্ষিণ বৃত্তপাদের দ্বারা উত্তরাকাশের জ্যোতিষ্কগণের উন্নতাংশ জানিতে পারা যায়। দুইটী জ্যোতিষ্কের যাম্যোত্তর কালীন উন্নতাংশের বা নতাংশের অন্তর বা সমষ্টি স্থির করিতে হইলে পূর্ব্বগাত্রের চিত্রের উপযোগিতা অধিক। কারণ, তাহাতে পর্য্যবেক্ষককে অধিক নড়িতে চড়িতে হয় না।

স্থানীয় অক্ষাংশ একবার নির্ণীত হইয়া গেলে বৎসরের যে কোন দিনের হউক, সূর্য্যের ক্রান্তি সহজে নির্ণীত হয়। জয়পুরের পক্ষে, প্রস্তাবিত দিনে সূর্য্যের কতটা নতাংশ দেখিয়া লইতে হইবে। জয়পুরের অক্ষাংশ হইতে তাহা বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই সূর্য্যের সেই দিনের ক্রান্তি।

মহারাজ জয়সিংহ কর্তৃক ইন্দ্রপ্রস্থে (দিল্লীতে) স্থাপিত ভিত্তিযন্ত্রদ্বারা সেখানকার অক্ষাংশ ২৮ ডিগ্রী ৪৯ মিনিট নির্ণীত হইয়াছিল।

রমাই পণ্ডিত ও ময়নাপুরের যাত্রাসিদ্ধি

আজ প্রায় আট বৎসর অতীত হইল, যখন আমি কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির অধীনে প্রাচীন পুস্তকাবলীর অনুসন্ধানের জন্য ময়নাপুরে যাই, তখন সেখানে যাত্রাসিদ্ধি নামক এক ধর্ম্ম ঠাকুরের সম্বন্ধে কিছু তত্ত্ব সংগ্রহ করি। নানা কারণে তাহা এতদিন পুরাতন কাগজ পত্রের ভিতরই পড়িয়া ছিল। সম্প্রতি একদিন সেই সব পুরাতন কাগজপত্র ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে সেই অনেকদিনকার সংগৃহীত যাত্রাসিদ্ধির তত্ত্বসম্বলিত খাতাখানি হাতে পড়ে ও তাহা পাঠ করিয়া মনে হয়, ইহা প্রকাশিত হইলে ধর্ম্মঠাকুরের বার্ত্তায় যাঁহাদের কিছু কৌতূহল আছে, তাহাদের কিছু না কিছু পরিতৃপ্তির উপায় হইতে পারে। তাই এতদিন পরে এই প্রবন্ধটী পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইল।

ধর্ম্মঠাকুর যে কি, তাহা আর বলিবার আবশ্যক নাই; তাহা মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রি-মহাশয়ের প্রসাদে আজ কিছুদিন ধরিয়া আমাদের দেশে অনেকেই অবগত হইয়াছেন। এখন কেবল তাঁহারই পদাঙ্কানুসরণ করিয়া কোথায় কি ভাবে সেই ধর্ম্মঠাকুর বিরাজ করিতেছেন, তাহা দেখাইয়া তাঁহারই আবিষ্কৃত ধর্ম্মঠাকুরতত্ত্বের অঙ্গ পুষ্টি করিতে অগ্রসর হইলাম।

আজিকার এ প্রবন্ধে উল্লিখিত যাত্রাসিদ্ধি নামক ধর্ম্মঠাকুর ময়নাপুরে বিরাজ করেন, তাই এ প্রবন্ধের নাম দিয়াছি "ময়নাপুরের যাত্রাসিদ্ধি"।

এই যাত্রাসিদ্ধি সম্বন্ধে নিম্নে যাহা কিছু লেখা হইয়াছে, তাহা ময়নাপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন পণ্ডিতের নিকট হইতেই প্রাপ্ত। ক্ষেত্রমোহন ঐ যাত্রাসিদ্ধির পূজক ও ধর্ম্ম-ঠাকুরের সিদ্ধ ডোম জাতীয় যশাই পণ্ডিতের বংশধর। ক্ষেত্রমোহন ইহার জন্য আমার বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

ময়নাপুর বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর মহকুমার প্রায় ১৩।১৪ মাইল পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী। গ্রামটী একটী গণ্ডগ্রাম, এখানে কামারের বাসই অধিক। কামারেরা পিতল কাঁসার ঢালাই করে এবং ঘটী গাড়ু প্রভৃতি তৈজসপাত্র প্রস্তুত করিয়া থাকে। বিষ্ণুপুর-রাজবংশের যখন সমৃদ্ধি ছিল, স্বাধীন রাজার ন্যায় যখন তাঁহাদের প্রজাপালন করিতে হইত, মুসলমানের অধীন থাকিলেও যখন তাঁহারা হিন্দু নৃপতির ন্যায় ধর্ম্মনিষ্ঠ ও শাস্ত্রপরায়ণ ছিলেন, তখন একজন ব্রাহ্মণ তাঁহাদের দেওয়ান পদে নিযুক্ত ছিলেন। হিন্দুরাজের মন্ত্রিত্বকার্য্যে চিরদিনই ব্রাহ্মণের অধিকার, তাই বিষ্ণুপুররাজও একজন ব্রাহ্মণের উপর রাজকার্য্য নির্ভর করিয়া দিয়াছিলেন। দেওয়ান ব্রাহ্মণ রাঢ়ীশ্রেণীর শুদ্ধ শ্রোত্রিয়। বিষ্ণুপুরের মহারাজ রাজধানীর নাতিদূরবর্ত্তী ময়নাপুরে জায়গীর দিয়া তাঁহাকে বাস করাইয়াছিলেন। সেই অবধি ময়নাপুরে ব্রাহ্মণের বাস। এখনও দেওয়ান বাবুদের বংশধরগণ সেখানে বাস করেন। আর কতিপয় কুলীন ব্রাহ্মণেরও বাস আছে। ইঁহারা দেওয়ান বাবুদেরই দ্বারা আনীত এবং তাঁহাদেরই প্রদত্ত ভূসম্পত্তিতে সম্পত্তি-শালী। এখন দেওয়ান বাড়ীর আর সে অবস্থা নাই, কুলীন বাবুরাই এখন কতক শ্রীমান্। হাইকোর্টের প্রধান উকিল ৺জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাস এই ময়নাপুরেই ছিল। তাঁহার বংশধরগণ এখন আর এখানে কেহ না থাকিলেও এখনও এ ঘর বজায় আছে। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রেরা এখনও ময়নাপুর সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীমান্ অকলঙ্কচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সর্ব্বদাই বাড়ী থাকেন। আমরা যখন ময়নাপুরে যাই—তখন এই মহাত্মাই আপনার নির্ম্মল-স্বভাবে আমাদিগকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। ইঁহারই সাহায্যে আমরা ময়নাপুরের গৃহে গৃহে পুস্তক অনুসন্ধান করিতে পারিয়াছিলাম।

এই ময়নাপুরে যে ধর্ম্মঠাকুর আছেন, তাঁহার নাম যাত্রাসিদ্ধি। ইনি এ প্রদেশে বিশেষ প্রতিষ্ঠিত, ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত ইঁহাকে দেবতা ভাবিয়া মান্য করে। এমন গৃহস্থ নাই যে, ইঁহার পূজা না দেয়; তমলুকের ময়নাগড়ের ধর্ম্মঠাকুর অপেক্ষা ইঁহার সম্মান অধিক। এ প্রদেশের লোক ইঁহাকে বিষ্ণুমূর্ত্তি বলিয়াই মনে করে। স্থানীয় লোকে ইঁহাকে প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়া মানিয়া থাকে। ইঁহার এত দেবত্ব এত সম্মান থাকিলেও ঠাকুরটীর পূজা করিয়া থাকে কিন্তু ডোম। ইঁহার পূজকদিগকে পণ্ডিত বলে। ময়নাগড়ের ধর্ম্মঠাকুরের পূজকদের মত এখানকার পূজক ডোমেরাও পণ্ডিত পদবীতে সুশোভিত। এ পণ্ডিত ডোমেরা অপণ্ডিত ডোমের বাড়ী জলগ্রহণ পর্য্যন্ত করে না। ইহারা এক প্রকার স্বতন্ত্র জাতি হইয়া

পড়িয়াছে। কবে কোন্ বিপ্লবের সময় ইহারা একদিন ব্রাহ্মণের সঙ্গে টেক্কা দিয়াছিল বলিতে পারি না, আজও কিন্তু ইহারা ব্রাহ্মণের যাজকতাবৃত্তির অংশীদার হইয়া বসিয়াছে। ইহাদের এক বৃত্তি যাজকতা, অপরাপর অপণ্ডিত ডোম ইহাদের যজমান, শ্রাদ্ধে বিবাহে ও অপরাপর কার্য্যে ইহারাই তাহাদের পুরোহিত। আর ধর্ম্মপূজা ও পৌরাহিত্য ইহাদেরই একচেটিয়া। কি ব্রাহ্মণ, কি কায়স্থ কি অপর জাতি যিনিই মানত করিয়া ধর্ম্মঠাকুরকে বাড়ী আনিয়া পূজা দিবেন, এ পণ্ডিত ডোম তখন তাঁহাদের আদরের পুরোহিত। যে ডোম অস্পৃশ্য সে তখন তাঁহাদের গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া কোশাকুশি নাড়িয়া ফুলচন্দন তুলসী পত্র দিয়া ধর্ম্ম-ঠাকুরের পূজা করিবে। ডোম অস্পৃশ্য হইলেও ধর্ম্মঠাকুরের পাদোদক সকলেই পান করিবে। পূজান্তে নৈবেদ্য প্রসাদ ভগবৎপ্রসাদ বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিবে। কতকালের পর কোন্ বিপ্লবের পর আজও ডোম হিন্দুসমাজে—ব্রাহ্মণসমাজে এইরূপে সম্মানিত হইল। ভয়ে কি সমাদরে সম্মানিত! তাহা কে বলিবে? ইহারা এখন শুধু ব্রাহ্মণদিগকেই আপনাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া মনে করে, আর কোন জাতিকে নহে, আর কোন জাতির অন্নগ্রহণ করে না। তবে ব্রাহ্মণের অন্নে আপত্তি নাই। এ প্রদেশে এ পণ্ডিত ডোমের একটি শ্রেণীই আছে, ইহাদের আদান প্রদান তাহারই মধ্যে হইয়া থাকে। ইহাদের তাম্র হয়; ব্রাহ্মণের যেমন উপনয়ন, ইহাদেরও তেমনি তাম্র হয়। তাম্র হইলেই ইহারা ধর্ম্মঠাকুরের পূজায় অধিকারী হইয়া থাকে। দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনীতে একটী তাম্রময় অঙ্গুরীয়ক ধারণ করারই নাম তাম্র হওয়া, ইহারা বলে যে সে ডোম ইচ্ছা করিয়া তাম্রধারণ করিলেই পণ্ডিত হইতে পারে না, যাহারা সেই রমাই পণ্ডিতের বংশসম্ভূত, তাহারাই তাম্র ধারণ করিবে এবং তাহারাই পণ্ডিত হইবে। রমাই পণ্ডিত নাকি প্রথম ধর্ম্মঠাকুরের পূজাপ্রবর্ত্তক, তিনি যে পদ্ধতি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, সেই পদ্ধতি অনুসারেই ধর্ম্মঠাকুরের পূজা হইয়া থাকে। প্রথম পণ্ডিত রমাই স্বপ্রণীত পদ্ধতিতে আপনার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। পদ্ধতির ভাষা বাঙ্গালা, তিনি বাঙ্গলা ভাষাতেই আপনার পরিচয় দিয়াছেন। এ প্রবন্ধে সে পরিচয় বাক্যগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া পুঁথি বাড়াইবার প্রয়োজন না থাকিলেও পাঠকগণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য দিতে হইল। ইহা পাঠকগণ দেখুন। যিনি ধর্ম্মঠাকুরের পূজা করিয়া প্রথম পণ্ডিত হইলেন তিনি ব্রাহ্মণ সন্তান, কিন্তু ধর্ম্মঠাকুর আসিয়া তাঁহার উপনয়ন দিতে দিলেন না, অমন যে স্বয়ং ভগবান্ ঠাকুর, আজও স্থানে স্থানে হিন্দুগণ যাঁহাকে ধর্ম্মরূপী বৈকুণ্ঠনাথ বলিয়া ভক্তি করিতেছেন, প্রথম অবস্থায় তিনি স্বয়ং আসিয়া দেখাইলেন, আমার পূজককে ব্রাহ্মণ করা হইবে না। হিন্দুর সমাজ ব্রাহ্মণের, ব্রাহ্মণই হিন্দুসমাজের সর্ব্বস্ব, এ ঠাকুরটীর প্রথমেই কিন্তু সেই ব্রাহ্মণের উপরই দ্বেষ। এমন তো দ্বেষ নহে। তিনি আসিয়া ব্রাহ্মণের উপর জুলুম করিয়া তাঁহার সন্তানটীকে উপনীত করিতে দিলেন না, বেদমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বেদবিহিত কর্ম্ম করিয়া পণ্ডিত হইতে দিলেন না। তিনি বলিলেন, ব্রাহ্মণ হওয়া হইবে না, যজ্ঞসূত্র ধারণ

করা হইবে না, এই তাত্রধারণ কর, আর আমার উপাসনা কর, শূন্যমূর্ত্তির উপাসনা কর, পণ্ডিত হইবে, আমি সকল বেদ জানিয়া দেখিয়াছি উহাতে কিছুই নাই, আমার ধ্যান কর—

"যঃ শান্তমনাদিমধ্যং নচ করচরণং নূনাদং নিরাকারং
নাধিরূপং শূন্যমূর্ত্তিং সকলদলগতং সর্ব্বসঙ্করহীনং।
তত্রাদিকোপঅমরবরদপার্থিব নিরঞ্জনায় নমঃ॥"

বলিয়া সর্ব্বদা আমারই ধ্যান কর, তুমি প্রকৃত পণ্ডিত হইবে, তোমার ঐ বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি লইয়া পণ্ডিত হইলে মুক্তি পাইতে পারিবে না।

পাঠকগণ এখন একবার রমাই পণ্ডিতের জন্মবিবরণ শ্রবণ করুন—

"নম দ্বারিকাপুরী জয় বিজয় করতারে।
বিশ্বনাথ ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের পূজা করে॥
নানামতে পূজা করে লয়ে আয়োজন।
প্রত্যাবধি পূজা করে ধর্ম্মের চরণ॥
চামর ঢুলাতে অঙ্গে লাগিল তরাস।
ধর্ম্মশাপে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী বনবাস॥
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী তখন হাহাকার করে।
কি হেতু অভিশাপ প্রভু দিলেন আমারে॥
ধর্ম্ম বলে কর তুমি পূজায় তরাস।
এই হেতু তব কার্য্য যাহ বনবাস॥
দ্বাদশ বৎসর কর পূজা বিষ্ণুর চরণ।
তবে তব পুত্র হবে বিদিত ভুবন॥
ধর্ম্মশাস্ত্র বেদবিধি করিবে প্রকাশ।
এই হেতু করিলাম তোমার বনবাস॥
সাম ঋগ্ যজু অথর্ব্ব নিবে চুম্বক সারে।
আয়ুর্ব্বেদ মিশাইয়া পঞ্চম করে॥
পঞ্চমবেদে পঞ্চ প্রবর রাখেন সদাই।
পুত্র হ'লে রেখ' নাম পণ্ডিত রমাই॥
আমি অনুবল তব না কর ভাবনা।
পুত্র হলে স্বর্গধামে যাবে দুই জনা॥
গোলোকে গমন করি থাকিবে আহ্লাদে।
না হবে মানব জন্ম আর পৃথিবীতে॥
এতেক শুনিয়া দ্বিজ ধর্ম্মের বচন।
দুইজনে বিপিনেতে করিল গমন॥

অগম বিপিনে দোঁহে প্রবেশন করে।
প্রথমে উত্তরিল গিয়া সরযূর তীরে ॥
দ্বিতীয়াতে নর্ম্মদার কূলে দরশন।
তৃতীয়ে পুষ্করে পূজে ধর্ম্মের চরণ ॥
চতুর্থেতে চারিকূল পূজে সরস্বতী।
পঞ্চমেতে ভ্রমে সদা যমুনায় স্থিতি ॥
এইরূপে এগার বর্ষ করে কালযাপন।
বারবর্ষে গর্ভবতী ব্রাহ্মণী তখন ॥
মুনির আশ্রম বন নামে রম্ভাবতী।
সেই বনে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী অবস্থিতি ॥
মাসে বাড়ে গর্ভ শুনহ ভারতী।
চিন্তাযুক্ত হয়ে বলে ব্রাহ্মণের প্রতি ॥
দশমাস পরিপূর্ণ হৈল সেইখানে।
ভূমিষ্ঠ হইল পুত্র শুভক্ষণ দিনে ॥
রথোপরে ধর্ম্মরাজ আনন্দিত মনে।
উপনীত হৈলা প্রভু ব্রাহ্মণী যেখানে ॥
ধাত্রী মাতা আসি তখন নাভীচ্ছেদ করে।
নাভীচ্ছেদ করি স্নান করাইল নীরে ॥
বনের পঞ্চ কাষ্ঠ আনি জ্বালে হুতাশন।
অর্ক খদির ঔদম্বরু সাঁই আর চন্দন ॥
একুশ দিনের হয় ব্রাহ্মণ সন্তান।
পঞ্চঋষি আনি ধর্ম্ম তার বিদ্যমান ॥
অঙ্গিরা ভৃগু ভরদ্বাজ লোমশ ব্রহ্ম ঋষি।
বসিলেন পঞ্চজন শ্রীধর্ম্ম অগ্রে আসি ॥
জ্যোতিষাদি নানামত করিয়া বিচার।
পৃথিবীতে নাহি দেখি এমন কুমার ॥
ধর্ম্মের লক্ষণ দেখি বালক শরীরে।
শ্রীধর্ম্মপদচিহ্ন আছে মস্তক উপরে ॥
সুন্দর বরণ তার সদা দেখিতে পাই।
বিচার করিয়া নাম রাখেন রমাই ॥
হিমালয় মধ্যে জন্ম ব্রাহ্মণ কুমার।
বৈশাখীর শুক্লপক্ষে জনম তাহার ॥

পঞ্চমীর তিথি ছিল নক্ষত্র ভরণী।
রবিবার শুভদিনে প্রসব হইল ব্রাহ্মণী ॥
ধর্ম্মপূজা প্রচার যাহ'তে হইবে।
সেই প্রভু জন্মিলেন পূজার অভাবে ॥
দেবগণ শিশু আগে আসিয়া তখন।
ছয়মাসে তাহার করিল অন্নাশন ॥
অন্ন দিতে সকলে করিল শুভদিন।
পঞ্চমীর তিথি আর নক্ষত্র অশ্বিন ॥
দশদণ্ডে অন্নপূর্ণা অন্ন দেন মুখে।
শুভদিন গুরুবারে দেবকীর্ত্তি রাখে ॥
দেবগণ চলি গেল আপনার স্থানে।
শ্রীধর্ম্ম রহিল মাত্র রক্ষার কারণে ॥
স্বর্গের কপিলা আসি করায় দুগ্ধপান।
বালকের কাছে প্রভু সদা অধিষ্ঠান ॥
শ্রীরমাই হইল যখন পঞ্চম বৎসর।
তার পিতা মাতা তখন ভাবিল অন্তর ॥
পূর্ব্বকালে শ্রীধর্ম্মের অভিশাপ ছিল।
এই হেতু পিতা পরাণ ত্যাজিল ॥
সেই কায়াতে করে মৃত্তিকা অর্পণ।
পিতৃকার্য্য রমায়ে করাল নিরঞ্জন ॥
ধর্ম্ম সাক্ষাতে মৃত্যু হয় ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী।
দশদিন অশৌচ বলেন চক্রপাণি ॥
দশদিন গতে করে শ্রাদ্ধাদি তর্পণ।
বিমানে চড়িয়া গেল বৈকুণ্ঠভুবন ॥
বিষ্ণু অনুচর হয়ে থাকেন গোলোকে।
সদা সর্ব্বদা দোহে বিষ্ণুরূপ দেখে ॥
সেই বালকে প্রভু দেন অন্ন জল।
ব্রাহ্মণের বেশে ধর্ম্ম করেন সকল ॥
পূজার পদ্ধতি হেতু ভাবেন গোসাঞি।
যজ্ঞসূত্র দিলে পূজা কলিকালে নাঞি ॥
কোলে করি লয়ে গেল ব্রাহ্মণের বেশে।
বালকে লইয়া প্রভু রহে গঙ্গা পাশে ॥

সাত বৎসরের তথন হইল কুমার।
আভ্যোতি চূড়াকরণ না হোল তাহার॥
ব্রাহ্মণের চূড়াকরণ চারি বৎসর চারি মাস।
এই বিধি প্রজাপতি করেন প্রকাশ॥
নয় বৎসরে উপনয়ন ব্রাহ্মণের বিধি।
বেদ মতে ব্যবস্থা আছয়ে অন্থাবধি॥
ন্থায় স্মৃতি আগম বেদ করিয়া বিচার।
ভেদাভেদে তাম্র দিতে বিধি করেন তার॥
এই সব নিরঞ্জন ভাবি মনে মনে।
তাম্র দিতে বিধি তথন বিচারিল মনে॥
পনর বর্ষে বয়ঃক্রম হইল ছার জন্ম।
চূড়াকরণ সংযোগে সারি তাম্র দেন ধর্ম্ম॥
গঙ্গার কূলেতে আসি যত দেবগণ।
গণেশাদি নানা দেব করিয়া পূজন॥
পঞ্চঘট নিয়মেতে করিয়া স্থাপন।
চূড়াকরণ আভ্যোতি বেদের নিয়ম॥
বার তিথি নক্ষত্র করি নিরূপণ।
শুভদিনে শুভ কার্য্য বেদের নিয়ম॥
গ্রীষ্ম বসন্ত ঋতু বিচার করি মনে।
শ্রীরামায়ের তাম্র দিলেন শুভক্ষণে॥
পঞ্চশত হোম করে যজ্ঞের নিয়ম।
মার্কণ্ড মুনি আসিয়া করেন সব ক্রম॥
এই পঞ্চম বেদে পণ্ডিত হবে সর্ব্বজন।
গঙ্গার কূলেতে করে কার্য্য সমাপন॥
নিজ দেশে যাত্রা করে শ্রীরমাই পণ্ডিত।
মার্কণ্ড সমভিব্যারে চলিল ত্বরিত॥
স্থিতি হ'য়ে বসিলেন পিতার ভবনে।
শিক্ষা করে নানা শাস্ত্র শুনি বিগুমানে॥
রমাই পণ্ডিত ধর্ম্ম-পূজা করে নিরন্তর।
তথন বয়স হইল পঞ্চাশ বৎসর॥
তারপর দিকে দিকে রমাইর গমন।
সসাগরা পৃথিবী মধ্যে ধর্ম্মের স্থাপন॥

ছত্রিশ জাতির ঘরে ধর্ম্মের স্থাপন।
সবার পূজাতে তুষ্ট হন নিরঞ্জন॥
ধর্ম্মপূজা করে রমাই অনেক যতনে।
সসাগরা পৃথ্বী মধ্যে ধর্ম্মের স্থাপনে॥
ছত্রিশ জাতির ঘরে ধর্ম্মের স্থাপন।
সবার পূজাতে তুষ্ট হন নিরঞ্জন॥
ধর্ম্মপূজা করে রমাই অনেক যতনে।
এই হেতু অহঙ্কার হইল তার মনে॥
করিলাম আমি শ্রীপাদ-পদ্ম স্থজন।
এই হেতু অভিশাপ দেন নিরঞ্জন॥
তব জল বিষতুল্য হইল আজি হৈতে।
এই কথা শুনি রমাই লাগিল কান্দিতে॥
অপরাধ মার্জ্জনা কর জগত গোসাঞি।
তুমি না তারিলে আমার আর কেহ নাই॥
ধাং ধীং ধুং বলি চরণে পড়িল।
শান্তমূর্ত্তি হয়ে প্রভু সেবকে বলিল॥
পালট হইবে যেহ জাহ্নবী তরঙ্গে।
সে দিন আসিবে আমার শ্রী অঙ্গে॥
পঞ্চম বেদ কর তুমি বেদের প্রমাণ।
তব কীর্ত্তি রহে যেন কলিতে সমান॥
কলিকালে হবে যখন পূজার পদ্ধতি।
রামায়ের মতে পূজা করে নিরবধি॥
আশী বৎসর হইল রামাই বলে।
আর পূজা কে করিবে তব চরণকমলে॥
দাসদাসী কেহ নাহিক প্রেয়সী।
কেবা সেবা করে ধর্ম্ম আমি তো সন্ন্যাসী॥
বৃদ্ধ দশা হ'লো জীর্ণ শরীর।
আপনার কায়ভরে আপনি অস্থির॥
তব সেবা আয়োজন কেবা করি দিবে।
বিচার করিয়া রামাই মনে মনে ভাবে॥
চরণে মিনতি এই প্রভু নিরাকার।
কেমনে করিব পূজা চরণে তোমার॥

স্তবে তুষ্ট হয়ে তখন বলে চক্রপাণি।
হাঁসিয়া ঈষদ্ বাক্য বলিলেন তিনি॥
কি মানস তব বাছা বলহ সত্বর।
যাহা চাহ তাহা দিব না হব কাতর॥
শ্রীরমাই পণ্ডিত বলে শুন মোর বাণী।
এই সময় সেবাযোগ্য পাত্র দেহ আনি॥
এত শুনি ধর্ম্মরায় ভাবিল অন্তরে।
দক্ষিণ চরণে এক কন্যা জন্ম করে॥
জন্মমাত্রে কন্যা বলে জুরি দুই কর।
কি কার্য্য করিব বল সংসার ভিতর॥
ধর্ম্ম বলে কেশবতী নাম যে তোমার।
ধর্ম্মে মতি রবে তব সাধ্য সতী সার॥
রমাইয়ের সেবা কর যাবৎ জীবন।
অন্তকালে মম পদে মিশিবে তখন॥
দাসী দিয়া প্রভু গেল বৈকুণ্ঠ ভুবন।
দাসী পেয়ে রামায়ের হরষিত মন॥
রামাই বলে কোলে লহ তুমিত জননী।
ধর্ম্ম-সেবার আয়োজন দেহ সব আনি॥
ফলফুল যোগায় কন্যা মনে আনন্দিত।
যাহার কৃপায় হয় পুরাণ সংজাত॥
তখন রমা'য়ের বয়স একশত পঁচিশ।
শুদ্ধচিত্ত করে পূজা জীবন উদ্দিশ॥
কেশবতী বলে আমি করি নিবেদন।
করিলাম তোমার সেবা যাবৎ জীবন॥
এক নিবেদন করি তব শ্রীচরণে।
তোমার তুল্য চাই পুত্র সদা ভাবি মনে॥
শ্রীধর্ম্ম বলিয়া রমাই কন্যার গর্ভে হস্ত দিল।
সেই গর্ভে তবে এক বালক জন্মিল॥
দশমাস দশদিন হইল তাহার।
প্রসবিল সেই কন্যা উত্তম কুমার॥
ধাত্রী আসি নাড়ীচ্ছেদ করিল তাহার।
বটবৃক্ষ তলে শিশু ব্রাহ্মণ আকার॥

দ্বিজের লক্ষণ দেখি বালক শরীরে।
করিবেন ধর্ম্মপূজা অবনি ভিতরে॥
ধর্ম্মদাস নাম তবে রাখিল তাহার।
করিবে শ্রীধর্ম্মপূজা পঞ্চমবেদ সার॥
দশবর্ষ বয়ঃক্রম হইল তাহার।
দিনে দিনে বাড়ে শিশু অতি চমৎকার॥
তাম্র দিবে মম পুত্রে শুনিলাম এখন।
ধর্ম্মপূজা পদ্ধতি কঠিন কেমন॥
শ্রীরমাই পণ্ডিত বলে শুন কেশবতি।
শিক্ষা দিব তব পুত্রে পূজার পদ্ধতি॥
স্থায় স্মৃতি আগম করিয়া বিচার।
ভেদাভেদে তাম্র দিতে বিধি করেন তার॥
চৌদ্দবর্ষ চৌদ্দদিন উর্দ্ধ সংখ্যা তার।
বারবর্ষ বারদিন সংখ্যা করি আর॥
এই তিনি বিধি করি ধর্ম্মপণ্ডিত প্রতি।
এই রহে গেল কলিকালে আদি॥
অন্য জাতি পণ্ডিত হবে ধর্ম্ম মানে নাই।
গ্রহ কাজে রত হয় ফেটে মরে তাই॥
পণ্ডিত হইয়া যেবা শূদ্রান্ন খাবে।
কলিকালে প্রভু তারে অভিশাপ দিবে॥
এই শুন কেশবতি বিচার তাহার।
শুদ্ধ হয়ে করিবে পূজা তোমার কুমার॥
এই মতে পণ্ডিত করি তোমার নন্দনে।
শিখিবেক ধর্ম্মশাস্ত্র বেদের বিধানে॥
ছত্রিশ জাতিকে তাম্র দিবে আমার বচনে।
গুরু পণ্ডিত নাম তার ঘুষিবে ভুবনে॥
শুনিলে কেশবতী পূর্ব্ব বিবরণ।
তাম্র ধারণ কার্য্য করে সমাধান॥
বটবৃক্ষ তলে এক কুটীর বান্ধিল।
তিনপদ ভূমে দিয়া গৃহ প্রবেশিল॥
কুটীরেতে ব্রহ্মচারী থাকে তিন দিন।
দুগ্ধ রম্ভা ভক্ষণ করে অন্ন যে বিহীন॥

ছয় দণ্ড বেলা গতে সূর্য্য দেখাইল।
মঙ্গলাদি হস্তে সূতা তখন তুলিল॥
ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা দিল শ্রীরমাই পণ্ডিত।
করিল শ্রীধর্ম্ম পূজা হয়ে হরষিত॥
ধর্ম্মদাস বলে গোসাঞি করি নিবেদন।
কিরূপেতে বংশ মোর হইবে এখন॥
এন্ত শুনি ক্রোধে বলে রমাই পণ্ডিত।
কলিকালে হবে তুমি ডোমের পুরোহিত॥
শক্তিবলে কন্যা বিভা করিবে যে দিনে।
সেই হ'তে বংশ বৃদ্ধি হবে দিনে দিনে॥
করিতে সকল কর্ম্ম শ্রীধর্ম্ম সহায়।
হরষিত হয়ে তখন ধর্ম্মদাস শুধায়॥
কালিন্দী নাহিক চিনি কেমন আকার।
কি প্রকারে হল বল জনম তাহার॥
শ্রীরমাই পণ্ডিত বলে জন্মবিবরণ।
শ্রীধর্ম্ম ঘামেতে জন্ম শাস্ত্রে নিরূপণ॥
স্মরণ নিলেন শ্রীধর্ম্ম পদতলে।
সদাবলি নাম তার রাখিল সকলে॥
কালবর্ত্তী কন্যা ছিল কালিন্দীর কূলে।
তাহাকে করিল বিভা কাল সন্ধ্যাকালে॥
সেই কন্যার হৈল তবে চারিটী নন্দন।
মাধব সনাতন শ্রীধর সুলোচন॥
চারিপুত্র এক কন্যা জন্মিল সদার।
সেই হতে বাড়িল কালিন্দী পরিবার॥
একদিন ধর্ম্মদাস সদার মন্দিরে।
উপনীত হল সেই পুষ্প তুলিবারে॥
ধর্ম্মপূজা করে সদা অতি ধীর মন।
সদাকে মন্ত্র বলান ধর্ম্মদাস তখন॥
মন্ত্র বলাতে ডোমের পুরোহিত হইল।
এই কীর্ত্তি কলিকাল পর্য্যন্ত রহিল॥
ধর্ম্মদাস হৈতে ধর্ম্মপণ্ডিত জন্মিল।
এইরূপে পণ্ডিত বংশ বাড়িতে লাগিল॥

সদার বংশেতে ডোমের উৎপত্তি হয়।
ডোমেতে পণ্ডিতে প্রভেদ আছয়ে নিশ্চয়।”

এইত রমাই পণ্ডিতের জন্মবিবরণ। সর্ব্বত্র ইহার অর্থবোধ ঘটিয়া উঠে না। ইহাতে শুধু রমাই'রই জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত নহে, পড়িলে বোধ হয়, কতক তাহার পরবর্ত্তী বংশেরও বর্ণনা আছে। আর আছে—“ডোমেতে পণ্ডিতে প্রভেদ আছয়ে নিশ্চয়।” বলিয়া জাতিগত গ্লানি পরিহারার্থ সম্প্রদায়বিশেষের মুখে হস্তার্পণ।

এখন পাঠক মহাশয়গণ বোধ হয় জানিতেই পারিলেন যে, ধর্ম্মঠাকুরের পূজার পদ্ধতিখানি পঞ্চমবেদ, আর তাহার কর্ত্তা রমাই ব্রাহ্মণসন্তান হইয়াও অনুপনীত, ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মবিবর্জ্জিত। কিন্তু ধর্ম্মের প্রসাদে “পণ্ডিত”। ধর্ম্মের এত প্রসাদ সত্ত্বেও রমাই তাঁহার স্বজাতি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত। অতি শৈশবে পিতামাতার মৃত্যু হওয়াতে খাটি ধর্ম্মের এলাকায় থাকিয়া তাঁহারও মতিগতি স্বতন্ত্র হইয়াছে। তিনিও বলিতেন,—

“অন্য জাতি পণ্ডিত হবে ? ধর্ম্ম মানে নাই।
গ্রহ কাজে রত হয় ফেটে মরে তাই॥”

যাহাই হউক, রমাই'র জন্মবৃত্তান্ত পাঠে জানিতে পারা যায়,ধর্ম্মঠাকুর যে সম্প্রদায়ের দেবতা, ঋগ্ যজু সাম অথর্ব্ব সে সম্প্রদায়ে নগণ্য। তুমি শত সহস্র বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কর, গুরুর গোলাম হইয়া ত্রয়ীর শ্রাদ্ধ কর, তবে হয়তো পণ্ডিত হইবে, আর যে সম্প্রদায়ে ধর্ম্মঠাকুর দেবতা সে সম্প্রদায়ে তুমি ডোম “ধাং ধীং ধুং ধর্ম্মায় নমঃ” বলিয়া পূজা কর, আর অনায়াসে পণ্ডিত হও। রমাই'র মুখে রমাই'র জন্মবৃত্তান্তশ্রবণ করিয়া প্রবন্ধলেখকের ইহাই ধারণা।

কালক্রমে সবই বিকৃতরূপে বা রূপান্তরে পরিণত হয়, ধর্ম্মঠাকুর সম্বন্ধেও তাহাই হইয়াছে। ধর্ম্মঠাকুরের পূজক ডোম পণ্ডিতেরা ব্রাহ্মণকে “গ্রহকাজে রত হয় ফেটে মরে তাই” বলিয়া বিদ্বেষপূর্ণ নয়নে আর দেখে না, ব্রাহ্মণেরাও আর ধর্ম্মঠাকুর কি বলিয়া অনুসন্ধান করেন না। এখন আর সর্ব্বত্র ধর্ম্মঠাকুরের প্রচার নাই, যেখানে যেখানে আছে, তথায়ও আর কেহ ইঁহাকে আমাদের দেবতা নহেন বলিয়া মনে করেন না। তমলুকের ময়নাগড়ে যে ধর্ম্মঠাকুর আছেন, তাহা অপেক্ষা ময়নাপুরের এ ধর্ম্মঠাকুর আরও একটু বিখ্যাত এবং সাধারণের নিকট আরও একটু বিশেষরূপে সম্মানিত। এখানে এ ধর্ম্মঠাকুরের এ সম্মান সম্বন্ধে একটী গল্পও শুনিতে পাওয়া যায়। শুনা যায় এখানে এই ধর্ম্মঠাকুরের পূজক ডোম পণ্ডিতদিগের পূর্ব্বপুরুষ যশাই পণ্ডিত ধর্ম্মঠাকুরে বড় সিদ্ধ ছিল। যশাই যখন ধর্ম্মপূজা করিত, তখন এ প্রদেশে (বাঁকুড়া জেলায়) আরও নানাস্থানে অনেকগুলি ধর্ম্মঠাকুর ছিলেন, তাঁহারাও জাঁকজমকে পূজা পাইতেন, তাঁহাদেরও ভিন্ন ভিন্ন পূজক ছিল; কিন্তু যশাই পণ্ডিতই বিশেষ বিখ্যাত, কেন না যশাই সিদ্ধ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত। আপনার সিদ্ধপণা দেখাইবার জন্য যশাই একদিন দেশের সমগ্র ঠাকুর আপন গ্রামে (ময়নাপুরে) আনিয়া জমা করিল। যশাই একটা কি করিবে বলিয়া চারিদিক্ হইতে বহুসংখ্যক লোক ময়নাপুরে জমায়েত হইল। যশাই তখন সেই সমগ্র ঠাকুরগুলি

লইয়া একটী প্রকাণ্ড পুষ্করিণীর ধারে যাইল এবং এক এক করিয়া সমগ্র ঠাকুরগুলিকে সজোরে তীর হইতে পুকুরের গভীর জলে ছুঁড়িয়া ফেলিল। তখন বিস্মিত লোক সমবায়কে যশাই ডাকিয়া বলিল "এই আমি সমগ্র ঠাকুরগুলিকে জলে ফেলিয়া দিলাম, এখন আপনারা দেখুন আমি এই তীরে বসিয়া জলে হাত পাতিয়া প্রত্যেক ঠাকুরের নাম গ্রহণপূর্ব্বক ডাকিতে থাকিব, যিনি প্রকৃত ঠাকুর হইবেন তিনি আপনি ঐ গভীর জল হইতে আমার হাতে উঠিয়া আসিবেন। যশাই তাহাই করিল, লোকে স্তম্ভিত হইয়া দেখিতে লাগিল। দ্বাদশটী ঠাকুর নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে সত্য সত্যই কেবল যাত্রাসিদ্ধি আসিয়া তাঁহার হাতে উঠিলেন, লোকে আনন্দে যশাইর জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। কিন্তু যশাইর তাহাতে তৃপ্তি হইল না, তিনি যে ঠাকুর পূজা করিতেন তাঁহার নাম ছিল বাঁকুড়া রায়। যশাই ভাবিল এতদিন আমি যাঁহার পূজা করিলাম, কই তিনি যে উঠিলেন না; যশাই ক্রোধভরে বাঁকুড়ারায়কে ডাকিতে লাগিল, অনেক পরে বাঁকুড়ারায় ধীরে ধীরে জলের নিকটে আসিয়া দেখা দিলেন, কিন্তু হাতে উঠিলেন না, যশাই আরও রাগিয়া উঠিল। তখন ক্রোধভরে যশাই একগাছি লাটী লইয়া রায়জীকে এমন প্রহার করিল যে, সেই তাঁহার কূর্ম্মমূর্ত্তির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদদ্বয় ভাঙ্গিয়া শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল! সকলে মিলিয়া যশাইর ক্রোধ শান্তি করিতে লাগিল। যশাই আপন ঠাকুরের উপর ক্রোধ করিয়া তাঁহাকে আর জল হইতে তুলিল না, যাত্রাসিদ্ধিকেই লইয়া মন্দিরে আসিল এবং তদবধি যশাই যাত্রাসিদ্ধিকেই পূজা করিতে লাগিল। লোকেও যাত্রাসিদ্ধিকে প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়া জানিতে পারিল; সম্মানের আর সীমা রহিল না। তদবধিই ময়নাপুরের এই যাত্রাসিদ্ধি পরম সম্মানিত। এ ঘটনাটী খুব অধিক দিনের নহে। যশাইপণ্ডিত এখনকার বর্ত্তমান পণ্ডিত ক্ষেত্রমোহনের উর্দ্ধতম সপ্তম পুরুষমাত্র।

তুমি আমি যাহাই বিবেচনা করি, ব্রাহ্মণসন্তান রমাই পণ্ডিতের অনুপনয়ন বৃত্তান্ত শুনিয়া এবং রমাইর নিজমুখে "গ্রহকাজে রত সদা ফেটে মরে তাই" শুনিয়া আমরা মনে মনে যাহাই ভাবিনা কেন, সেদিনকার যশাই কিন্তু ওসব কিছু বুঝিত না, রমাই পণ্ডিতের সেকাল তখন ছিল না, তখন যশাইর ধর্ম্মঠাকুর—দেশের ধর্ম্মঠাকুর, সম্প্রদায়বিশেষের নহে। হিন্দু সমাজপূজ্য ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মঠাকুরের পূজক পণ্ডিতদিগেরও শ্রদ্ধাস্পদ। যশাই পণ্ডিত নাকি বড় ব্রাহ্মণভক্ত ছিল, তাই কথিত আছে যশাই যখন মৃত্যুশয্যায় শয়িত, তখন তাহার সন্তানগণকে সে আদেশ করিয়া যায় যে "আমি মরিলে আমায় পোড়াইও না, আমার মৃতদেহ ধর্ম্মঠাকুরের মন্দিরের সম্মুখ ভূমিতে প্রোথিত করিয়া রাখিও। আমার উপর দিয়া ব্রাহ্মণগণ যাত্রাসিদ্ধির মন্দিরে প্রবেশ করিবেন, আমি তাহাতেই তাঁহাদের পদরেণু পাইয়া কৃতার্থ হইব।" তাহাই হইয়াছে, যাত্রাসিদ্ধির মন্দিরে উঠিতে হইলেই যে সিঁড়ি তাহার সম্মুখবর্ত্তী, সেই ভূমিতেই তাহাকে পুঁতিয়া রাখা হইয়াছে। আমরাও দেখিলাম যেখানে যশাই প্রোথিত, সেইখানে সেই মাটীর উপর একখানি মনুষ্যপ্রমাণ একখণ্ড কাঁকুরে পাথর লম্বালম্বি পড়িয়া আছে, যেন তাহা দিয়াই যশাইকে চাপা দেওয়া হইয়াছে।

যে পুষ্করিণীতে দেশের সব ধর্ম্মঠাকুর নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, সে পুকুরটী আজও বেশ আছে। যশাই মরিয়া যাইলে তাহার নাকি একবার পঙ্কোদ্ধার হয়, তখন অনেকগুলি ধর্ম্মঠাকুর পাওয়া যায়, এখন সেগুলি এই যাত্রাসিদ্ধির মন্দিরেই অবস্থিতি করিতেছেন। যশাইর হাতে স্বরূপদ বাঁকুড়ারায়ও এখন এইখানেই আছেন। এখন এ মন্দিরে সর্ব্বসমেত নয়টী ধর্ম্মঠাকুর আছেন। যাত্রাসিদ্ধির সহিত এখন স্বরূপনারায়ণ, শঙ্খাসুর, দলুরায়, বাঁকুড়ারায়, কালুরায়, জগৎরায়, চাঁদরায় ও ক্ষুদিরায়, ইঁহারা সকলেই পূজা পাইয়া থাকেন এবং সকলেই কচ্ছপাকৃতি। ৬ আঙ্গুল ৮ আঙ্গুলের উপর কেহই বৃহৎ নহেন। পূজা রীতিমতই হইয়া থাকে। পণ্ডিত স্নানাদি সমাপন করিয়া অতি বিশুদ্ধভাবে পূজা আরম্ভ করে। "যঃ শান্তং অনাদিমধ্যং ন চ করচরণং" ইত্যাদি বলিয়া ধ্যান পড়িয়া থাকে। তাহার পর পাদ্য অর্ঘাদি যথাবিধি প্রদান করিয়া "ওঁ নিরঞ্জনায় বিদ্মহে অনিলপুরুষায় ধীমহি তন্নো ধর্ম্মঃ প্রচোদয়াৎ" বলিয়া ধর্ম্মের জপ করে, ইহাই ধর্ম্মের গায়ত্রী। তাহার পর স্তব—

"নিরঞ্জনং নীলেন্দীলোচনং দয়াতিনন্দনং বন্দে ধর্ম্ম শ্বেতরূপিণং।

স্ফুরদ্বর্হদলোদ্বদ্ধলীনকুঞ্চিতমূর্দ্ধজং। কদম্বকুসুমদ্বদ্ধবনমালাবিভূষিতং।
গণ্ডমণ্ডলসংসর্গি-চলৎ-কাঞ্চনকুণ্ডলং। স্থূলমুক্তাফলদরে হরেং শোভিতবক্ষসং॥
হেমাঙ্গদতুলাকোটী-কিরীটোজ্জ্বলবিগ্রহং। মন্দমারুতসংক্ষোভাদ্বল্লিতাম্বরসঞ্চয়ং॥
রুচিরোষ্ঠপুটন্যস্তশঙ্খমধুরনিস্বনৈঃ। ললদ্গোপাঙ্গিকাচেতো মোহয়ন্তং মুহুর্মুহুঃ॥
বল্লবীবদনাম্ভোজমধুপানমধুব্রতং। ক্ষোভয়ন্তং মনস্তাসাং সস্মেরাপাঙ্গবীক্ষণৈঃ॥
যৌবনোদ্ভিন্নদেহাভিসংসভক্তিপরম্পরং। বিচিত্রাম্বরভূষাভিঃ কামিন্যাদিভিরাবৃতং॥
প্রভিন্নাঞ্জনবল্লুকাজলকেলিকলোৎসুকং। যোধয়ন্তং বিহারস্তং চক্রং কাচিদ্গোপান্॥ (?)

বল্লুকাজলসংসর্গি শীতলানিলকুম্পিতে।
কদম্বপাদপচ্ছায়ে স্থিতং বৈকুণ্ঠবাসসং।

রত্নভূধরসংলগ্নরত্নাসনপরিগ্রহং। কল্পপাদপমধ্যমহেমমণ্ডপিকাগতং॥
বসন্তকুসুমামোদসুরভীকৃতদিঙ্মুখে। শঙ্খবাদ্যমহোল্লাসকৃতহুঙ্কারনিস্বনৈঃ॥
ধর্ম্মদেবং জগতং ব্যাক্ষিতং ত্রিসন্ধ্যাং তস্য তুষ্টোহসৌ দদাতি বরমিপ্সিতং।

ইতি গৌতমীয় মহাতন্ত্রে শ্রীশ্রীধর্ম্মস্তোত্ররাজসমাপ্তম্।

স্তবেত ঠাকুরটী একেবারে শ্রীকৃষ্ণ। বিশেষের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ বাঁশি বাজান আর ইনি "রুচিরোষ্ঠপুটন্যস্তশঙ্খমধুরনিস্বনৈঃ। ললদ্গোপালিকাচেতো মোহয়ন্তং মুহুর্মুহুঃ॥" শ্রীকৃষ্ণ যমুনার জলে কেলি করেন আর ইনি—"প্রভিন্নাঞ্জনবল্লুকাজলকেলিকলোৎসুকং" যাঁহাকে আপনার দেবতা করিতে হয়, যাহার প্রতি প্রবল সম্প্রদায় বিশেষের ভক্তি আকর্ষণ করিতে হয়, তাঁহাকে বুঝি এমনি করিয়া সাজাইতে হয়। শুনিলাম এ স্তবটী রমাইর পদ্ধতিতেই আছে। স্তবটীতে যথেষ্ট সৌন্দর্য্য আছে, তবে অশিক্ষিত পূজকের মুখ হইতে শুনিয়া লিখিত বলিয়া ইহার অঙ্গ অনেক বিকৃত, তাহাতে যাহা কিছু শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে। "ইতি

গোতমীয় মহাতন্ত্রে শ্রীশ্রীধর্ম্মস্তবরাজসমাপ্তম্” বলিয়া স্তবকর্ত্তা ভবিষ্যতের জন্য যথেষ্ট চতুরতা দেখাইয়াছেন সন্দেহ নাই।

ইহার পর ধর্ম্মের প্রণাম। একটি নহে আটটী, ইহাকে ধর্ম্মাষ্টক নামেও অভিহিত করা হইয়াছে। এই অষ্টক কয়টী বলিয়াই প্রণাম করিতে হয়। যথা—

গম্ভীরা ধীরং নির্ব্বাণশূন্যং খকর্ণরিতং সুরকর্ম্মমোদকং।
দেবাদিদেবং মম চিত্র নিত্যং পাপৈ খণ্ডনং শ্রীশ্রীধর্ম্ম প্রণমাম্যহং ॥১
নচ পঞ্চভূতং নচ সর্গসাগরং দেশাদিদেশং নচ নিত্যমানং
ন ধাতইন্দ্রং নচ বিষুরূপং নৈবগ্রহং তারকং নচ মেঘমালা।
পাপং খণ্ডনং শ্রীশ্রীধর্ম্ম প্রণমাম্যহং ॥২

নম শ্বেত না পীতং রক্ত না শ্বতং হেম না স্বরূপং চন্দ্রার্ক্কং রজনীহং উদয় না অস্তং সন্ধ্যা না শতং মন্ত্র না বীজং পুষ্প না গন্ধং ফল ন ছায়া পাপং খণ্ডনং শ্রীশ্রীধর্ম্ম প্রণমাম্যহং ॥৩

নম ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডং মরুং কি তেজং কালা কি কালবীজং নচ গুরুশিষ্যং গৃহী কি রাজেন্দ্রং ধারা কি ধীরং পাপখণ্ডনং শ্রীশ্রীধর্ম্ম প্রণমাম্যহং ॥৪

নম বৃক্ষ না মূলং বীজ না অঙ্কুরং স্বাকার আকারং বায়ু না বসন্তং হীম না নীরং পাপখণ্ডনং শ্রীশ্রীধর্ম্ম প্রণমাম্যহং। ৫।

নম আদি অনাদি সৃষ্টি কি স্থিতি দিবা কি রাত্রি নিদ্রা কি জাগে চলাচল কি স্থায়ী অন্তে অন্ত না পাই নানাপাপং হরং দেবং পাপখণ্ডনং শ্রীশ্রীধর্ম্ম প্রণমাম্যহং। ৬।

নম শ্রুত সত্য করতার নীল শব্দে নিরাকার যঃ শব্দে জগত সংসার ফাটিকের মণ্ডপে ধর্ম্মের চারিদ্বার ক্ষণে বায়ু পণ্ডিতের অন্তে যেন পাই হও জীবিত বাহন শ্রীশ্রীধর্ম্ম দ্বারে বান্ধিলাম গোলাম। দণ্ডবৎ পূজাসার শ্রীশ্রীধর্ম্মচরণে কোটি কোটি প্রণাম। ৭। ইতি ধর্ম্মাষ্টক সমাপ্ত।

এই সাতটী মন্ত্রেতেই অষ্টক হইল। এ মন্ত্রগুলির বাক্যবিন্যাসগত অর্থের মাথামুণ্ড কিছুই নাই তবে ইহার অন্তরে সেই এক “তুমিই সব” পদটী বিরাজ করিতেছে এই মাত্র।

এইতো পূজাপাঠের ব্যাপার। তমলুকের ময়নাগড়ের ধর্ম্মঠাকুরের পূজাপাঠের ব্যাপার ইতি-পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা হইতে ইহার মন্ত্রাদি কিছু স্বতন্ত্র। বোধ হয় যেখানে যেখানে ধর্ম্মঠাকুরের একটু বিশেষ প্রাদুর্ভাব, সেইখানেই সন্ধান করিলে এ পার্থক্য লক্ষিত হইবে। তাহার যে কি অন্তর্ভূত কারণ, তাহা সহৃদয় পাঠক মহাশয়গণই বিবেচনা করিয়া লইবেন।

তাহার পর গাজনশিবেরই গাজন হয়। ধর্ম্মঠাকুর বিষ্ণুমূর্ত্তি তথাপি ইহার গাজন হইয়া থাকে। হইবারই কথা, হরিহর ব্রহ্মের সহিত সমাহৃত না হইলে কি আমাদের মন উঠে? ইহাকে ত্রিমূর্ত্তি করিতে হইবে, তবে না আমরা “নমচিত্রমূর্ত্তয়ে তুভ্যং” বলিয়া বিষ্ণুমন্ত্ররূপে দর্শন করিব, আর বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে থাকিব। ধর্ম্মঠাকুরকে সব করা চাই তবে না আমরা তাঁহাকে আমাদের দেবতা ভাবিব। তাই ধর্ম্মঠাকুর কূর্ম্মমূর্ত্তি বিষ্ণু অবতার, ধর্ম্মঠাকুর আমাদের দেবাদিদের মহাদের হইয়াছেন, তবে আর গাজন না হইবে কেন?

ইহার গাজনে খুব সমারোহ হইয়া থাকে। শিবের গাজনে যেমন ব্রাহ্মণ ভিন্ন সমস্ত জাতি সন্ন্যাস করে, ইহার গাজনেও তাই। গাজনের আর অধিক পরিচয় কি দিব, এ গাজনের সমস্ত ব্যাপারই প্রায় শিবের গাজনেরই মত। ময়নাপুরে গাজন আরম্ভ হয় অক্ষয় তৃতীয়ায় আর পূর্ণিমায় শেষ হইয়া যায়। এই গাজনের কয়দিন এ ধর্ম্মঠাকুরের পূজা করেন ব্রাহ্মণে, ব্রাহ্মণ-কন্যাগণ ভোগ রাধেন, তাহাতে ঠাকুরের ভোগ হয়। গাজন ব্যতীত অন্য সময়ে তিনি ডোম পণ্ডিতের হাতে থাকেন বলিয়া আমান্নেই পরিতৃপ্ত থাকেন, ডোমের হাতের পকান্ন গ্রহণ করেন না। এখন পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন এ ঠাকুরটিকে আমরা কত আপনার করিয়া লইয়াছি।

এই দুর্ভিক্ষের কালে এখন আর ইহার পণ্ডিতদিগের পূজারীগিরিতে চলে না, তাই এখন ইহার পূজারীরা তাঁতের কার্য্য চালাইতেছে। এখন যে পণ্ডিত আছে, তাহার নাম ক্ষেত্রমোহন পণ্ডিত। তাহার তাঁত আছে, যজমানি আছে, বৈদ্যগিরিও আছে, ডোম হইলেও সে পাঁচজনের একজন; তবে বৈদ্যগিরির জন্য সর্ব্বত্র যাতায়াত আছে, সব যায়গায় বসা আছে। তবে ব্রাহ্মণের সহিত এক বিছানায় বসে না, এখনকার সমাজে তাহার সম্প্রদায়েরা ব্রাহ্মণের কাছে আপনাকে নিকৃষ্ট জাতি বলিয়া মনে করিতে কুণ্ঠিত হয় না। এই অবস্থায় এখন মিলে মিশে বেশ এক রকম কাটিয়া যাইতেছে। ক্ষেত্রমোহন পণ্ডিত বলে যে তাহারা সেই রমাই পণ্ডিতেরই বংশধর এবং পুরুষানুক্রমে ধর্ম্মের আসল সেবায়েত। কিন্তু যশাই পণ্ডিত পর্য্যন্ত পরিচয় দিতে পারে, তাহার উপর আর জানে না।

শ্রীবিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ

বাঙ্গালা-নাম-রহস্য *

আজকাল বাঙ্গালাভাষার শব্দসম্পদ্ বড় অল্প নহে; কিন্তু সে সম্পদ্‌রাশি সমস্ত বাঙ্গালীর নিজস্ব নহে। বাঙ্গালার বাহিরের যে কোন জাতির সহিত বাঙ্গালী মিশিয়াছে বা যে কোন ভাষার সহিত বাঙ্গালীর পরিচয় হইয়াছে, বাঙ্গালী তাহাদের মধ্য হইতেই শব্দসম্পদ্ আহরণ করিয়াছে। আজকাল বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ নানা বিষয়ে পরিভাষা-সঙ্কলনে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, কাজেই বাধ্য হইয়া পরিষৎকে এখন এই শব্দসম্পদ্‌রাশি বাছাই করিতে হইতেছে। বাঙ্গালাভাষায় বৈদেশিক শব্দ কি কি প্রবেশ করিয়াছে, জয়পুর-কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য, বি, এ, হাইকোর্টের উকীল রিপণ-কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্ প্রমুখ সদস্যগণ তাহা নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সংস্কৃত, পারসী, আরবী, হিন্দী, ইংরাজী প্রভৃতি ভাষার শব্দমালা ব্যতীত বাঙ্গালাভাষায় বাঙ্গালীর নিজস্ব শব্দ কতগুলি আছে, তাহা স্থির করিবার জন্য বহু ভাষাবিৎ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজকুমার বেদতীর্থ প্রভৃতি সদস্যেরা বিশেষ যত্ন প্রকাশ করিতেছেন। এই সময়ে এই বিষয়ে আমি দুটা কথা বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

বাঙ্গালাভাষার শব্দসম্পদ্ যেমন বিভিন্ন ভাষার শব্দমালা দ্বারা পুষ্ট হইয়াছে, বাঙ্গালীর ব্যক্তিগত নামমালাও সেইরূপ বিভিন্ন জাতির নামমালা হইতে গৃহীত হইয়াছে, তবে নামবাচক শব্দগুলির মধ্যে আর্য্যজনোচিত সংস্কৃতশব্দের সংখ্যাই অধিক, এমন কি খাঁটি বাঙ্গালী নামবাচক শব্দ অতি বিরল। এদেশে বাঙ্গালী-আর্য্যজাতি ব্যতীত, বাঙ্গালী-অনার্য্যজাতিও অনেক আছে। এই সকল অনার্য্যজাতির অনেকে আর্য্য-সংসর্গ প্রভাবে আপনাদের ব্যক্তিগত নামেও সংস্কৃত শব্দমালা গ্রহণ করিয়াছে। যে সকল অনার্য্যজাতি কালপ্রভাবে আর্য্য-সমাজে মিশিয়া গিয়াছে, তাহাদের তো আর কথাই নাই। অনেকের মতে, আর্য্য-সমাজ চারিটি বর্ণে বিভক্ত হইলেও, আর্য্যজাতির মধ্যে চারিটি বর্ণ ছিল না; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ই প্রকৃত আর্য্যজাতি, আর শূদ্রেরা আর্য্য-জাতীয় লোক নহে; তাহারা ভারতের নানা জনপদবাসী বিজিত অনার্য্য জাতি, এই জন্য তাহারা দাস বা দস্যু নামে অভিহিত। যাঁহারা একথা বলেন, তাঁহারা প্রমাণস্বরূপ ইহাও বলেন যে, দ্বিজ-বর্ণত্রয় বৈদিক স্তুতিগীতে আপনাদের আত্মীয় স্বজন, গোধন, যজ্ঞ, ক্ষেত্র প্রভৃতির রক্ষা, বৃদ্ধি ও পুষ্টি প্রার্থনা করিয়াছেন, কিন্তু কোথায়ও দাসগণের জন্য প্রার্থনা করেন নাই; যদি

* বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ১৩১২ সালের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

দাস বা শূদ্রবর্ণ আর্য্যজাতীয় হইত, তাহা হইলে, আপনাদের সজাতীয় দাসগণের জন্ত উক্তরূপ প্রার্থনা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না অথবা বিজিত দাসবর্ণ হইতে আর্য্য শূদ্রবর্ণকে পৃথক্ রাখিবার জন্তও অন্ততঃ কোন না কোন ব্যবস্থা করিতেন। আবার অনেকে বলেন, আর্য্যজাতির মধ্যে একদল দ্বিজাতি-সেবাপর আর্য্যজাতীয় শূদ্র নিশ্চয়ই ছিল; পরে বিজিত অনার্য্যজাতির কতকগুলি এবং উত্তরকালে এই দ্বিজাতি ও মূল আর্য্য শূদ্রজাতির সহ-যোগে উৎপন্ন একদল বর্ণসঙ্কর এবং আর্য্য ও অনার্য্য সহযোগে উৎপন্ন, অপর একদল বর্ণসঙ্কর উক্ত আর্য্য শূদ্রজাতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া, বর্ত্তমান এই বিরাট শূদ্র বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছে। অধুনা শূদ্রের মধ্যে সৎ-শূদ্রাদিভেদই তাহার প্রমাণ। এই সকল মতামতের সত্যাসত্য প্রমাণ করিবার জন্ত এ সকল কথার উল্লেখ করিতেছি না; কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে, বাঙ্গালীর মধ্যে হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি জাতিগুলি বাস্তবিক যদি অনার্য্যমূলক হয় তবে উহাদের নামমালা এবং রাজবংশী, কোচ, আহম প্রভৃতি আর্য্যসংসর্গপ্রাপ্ত অনার্য্য জাতির নামমালা এত সংস্কৃত শব্দসম্পন্ন হইয়াছে যে, আর এখন তাহাদের জাতীয় অসংস্কৃত নাম খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

বাঙ্গালীর নামে যে সকল সংস্কৃত শব্দ গৃহীত হইয়া থাকে, তাহার প্রকৃতি অন্তান্ত ভারতীয় প্রদেশের নাম হইতে স্বতন্ত্র। হিন্দী, মহারাষ্ট্রীয়, উড়িয়া প্রভৃতি সংস্কৃতমূলক নাম সংস্কৃত শব্দ হইতে গৃহীত; কিন্তু তাহাদের নামমালার সহিত বাঙ্গালার নামমালার প্রকৃতির বিভিন্নতা স্পষ্ট বুঝা যায়। বৈদিককালে বা পৌরাণিক যুগে বাঙ্গালা নাম কিরূপ ছিল, তাহা বুঝা যায় না। বেদে যে সকল দেবতার নাম ও মন্ত্রকারক ঋষির নাম পাওয়া যায়, সে নামগুলি আদৌ ভারতীয় নাম কি না, একদল প্রত্নতত্ত্ববিদের সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। যাঁহারা বলেন, আর্য্যজাতি ভারতের বহিঃপ্রদেশ হইতে এদেশে আসিয়া বাস করিয়াছেন, তাঁহারা অনুমান করেন যে, আদিম আর্য্য ঋষিগণ এদেশে প্রবেশ করিয়া এদেশের স্থান, কাল, জল, বায়ু ও বাসের সুবিধা অসুবিধার কথা এবং নূতন দেশের অধিবাসীর সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহাদির কথা লইয়া, দেবতার স্তুতিগীতি রচনা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নিজেদের নাম অথবা উপাস্ত দেবতার নাম বদ্‌লাইবার কোন কারণ পাইয়াছিলেন, এরূপ বোধ হয় না; সুতরাং বলিতে হয় যে, বৈদিক মন্ত্রকারক আর্য্য-ঋষিগণের নাম এবং বৈদিক দেবতাদিগের নাম ভারতীয় কোন ভাষার শব্দ নহে, তাহা ইরাণীয় প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার শব্দ হওয়াই সম্ভব। আদিম আর্য্যগণ ভারতের প্রথম উপনিবেশ ব্রহ্মর্ষিদেশ ও ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশ হইতে কালে যখন আর্য্যাবর্ত্তের নানা স্থানে বিস্তৃত হইয়া আপনাদের নানা গোত্র ও ক্ষেত্র স্থাপন করিতে লাগিলেন, তখন নাম-মালারও প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। ঋগ্বেদের ঋষিনামের সহিত পৌরাণিক ঋষিনামের তুলনা করিলে, তাহা কতকটা উপলব্ধি হইবে। বঙ্গে যখন প্রথম আর্য্যাবাস স্থাপিত হয়, তখন এদেশে কোন্ কোন্ ঋষি আসিয়াছিলেন, তাহা গোত্রকারক ঋষিগণের

নামমালা হইতে আর এখন বাছিয়া বাহির করিতে পারা যায় কি না জানি না। গোত্রকার ঋষিদিগের মধ্যে কাহারা বাঙ্গালী হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা বাছাই করিবার প্রবৃত্তি আজিও কোন বাঙ্গালীর হৃদয়ে জাগরিত হয় নাই। বন্ধুবর কুলতত্ত্বান্বেষী নগেন্দ্রনাথ বসু, তাঁহার বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে দেখাইয়াছেন যে, ব্রাহ্মণগণের মধ্যে পঞ্চ গৌড় বিভাগ স্থাপিত হইবার পর এদেশে সারস্বত ব্রাহ্মণদিগকে বাস করিতে দেখা যায়। ইঁহারাই কালে সাতশতী নামে আখ্যাত হইয়াছেন, কিন্তু পঞ্চগৌড় নামক বিভাগ-স্থাপনের পূর্ব্বে এদেশে কোন্ কোন্ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বাস করিতেন বা কোন্ কোন্ গোত্রকারক ঋষি এদেশে বাসস্থান স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার কোন সংবাদ তিনি দিতে পারিবেন কি না বলিতে পারি না।

বৈদিক মন্ত্রকারক ও আদিগোত্রকারক ঋষিগণের নামমালা আমরা যতদূর পাইয়াছি, তাহা এখনকার বাঙ্গালা নামের প্রকৃতিবিশিষ্ট নহে বলিয়া সে সকল ব্রহ্মর্ষি প্রজাপতি, ঋষি, বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠাদি ঋষি এবং আশ্বলায়ন, কাত্যায়ন, লাট্যায়ন, শাকটায়ন প্রভৃতি ঋষিগণের কটবিকট নামমালা লইয়া এখন কোন আলোচনা করিতে চাহি না।

বৈদিক দেবতাদিগের মধ্যে ইন্দ্র, চন্দ্র, রুদ্র প্রভৃতি কয়েকটি নামের ব্যবহার আধুনিক বাঙ্গালা নামমালায় বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন ঋষিদিগের নাম যে একবারেই নাই, তাহা নহে. যেমন কাত্যায়ন ঋষির নাম হইতে কাত্যায়নী নামটির উৎপত্তি স্বীকার করিতে পারা যায়। কাত্যায়নী শব্দের অর্থ ভগবতী, কিন্তু কাত্যায়ন শব্দে "শিব" অভিধানে পাওয়া যায় না।

এই সকল বৈদিককালের নামমালার কথা ছাড়িয়া দিলে, পৌরাণিকযুগে বাঙ্গালা-প্রদেশের কয়েকটি ক্ষত্রিয়নাম ভিন্ন আর কোন নাম পাওয়া যায় না। মহাভারতে বঙ্গেশ্বরের নাম সমুদ্রসেন, কলিঙ্গরাজের নাম শিখিধ্বজ বা ময়ূরধ্বজ, তাঁহার পুত্রের নাম তাম্রধ্বজ, মণিপুরেশ্বরের নাম চিত্রভানু, বভ্রুবাহন, অঙ্গরাজের নাম কর্ণ, মগধেশ্বরের নাম জরাসন্ধ, সহদেব, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরপতির নাম ভগদত্ত প্রভৃতি দশকুড়িটা নাম পাওয়া যায় এইমাত্র। পুরাণে যে সকল ঋষিনাম পাওয়া যায়, তাঁহারা একপ্রকার সর্ব্বত্রগামী, সকল রাজসভায় তাঁহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। সেকালের এই সকল ভট্টাচার্য্য মহাশয় একপ্রকার একপত্নী ছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে কাহার কোন্ দেশে আশ্রম ছিল, তাহা নির্ণয় করা যায় না; সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে কাহারা বাঙ্গালী ছিলেন, তাহা জানা যায় না। পুরাণে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ভিন্ন আর কোন জাতির একটিও উপাখ্যান পাওয়া যায় না, সুতরাং সেকালে বৈশ্য-শূদ্রের নামই বা কিরূপ ছিল তাহাও জানিবার উপায় নাই। রামায়ণে এক শূদ্রতপস্বীর মস্তক রামকর্ত্তৃক ছিন্ন হওয়ার কথা আছে, সেই তপস্বীর নামটা বাল্মীকি অনুগ্রহপূর্ব্বক লিখিয়া গিয়াছেন, তাই ত্রেতাযুগের একটা শূদ্র নাম পাই, তাহার নাম শম্বুক। আর চণ্ডীতে এক বৈশ্যবৈরাগীর নাম পাওয়া যায় তাহার নাম সমাধি। ত্রেতা-

যুগের আরও একটী শূদ্রনাম পাওয়া যায় তাহার নাম শবরীশ্রমণা; এই নামটিকে ঠিক নামও বলা যায় না, শবরী শব্দে শবররমণী এবং শ্রমণা অর্থে ভিক্ষুকী বা সন্ন্যাসিনী যদি এই অর্থ ধরা হয় তবে ইহাকে নাম বলা যায় না। কৈকেয়ীর সখী বা দাসী মন্থরা কোন্ জাতীয়া ছিল, তাহা লেখা নাই। কিষ্কিন্ধ্যার বানরগণ ও লঙ্কার রাক্ষসগণ বোধ হয় শূদ্র নহে, আর্য্যও নহে, কারণ তাহাদের রাজসভায় কোন ব্রাহ্মণের উপস্থিতি দেখা যায় না। এইজন্য আমি ইহাদিগকে অনার্য্যজাতি বলিতেছি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই বানর ও বানরী নামমালা হইতে, দধিমুখ, সুষেণ ও তারা এবং রাক্ষস ও রাক্ষসী নামমালা হইতে মেঘনাদ, অক্ষয়কুমার, তরণী, প্রমীলা প্রভৃতি নাম বাঙ্গালীরা গ্রহণ করিয়াছে। এই সকল বানর ও রাক্ষস নামের নামমালা সংস্কৃত শব্দ হইতে গৃহীত। মহাভারতে শূদ্রনাম ঐরূপ দুই তিনটি পাওয়া যায়। যথা—সূতজাতীয়-পুরাণবক্তা লোমহর্ষণ ও উগ্রশ্রবা, ইঁহারা জাতিতে সূত হইলেও ঋষিকল্প ব্যক্তি। ব্যাসজননী ধীবর বা দাসরাজকন্যা সত্যবতী ও বিদুরমাতা দাসী। হরিবংশ, শ্রীমদ্ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ হইতে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার সঙ্গী ও সঙ্গিনী গোপগোপীগণের অনেকগুলি নাম পাওয়া যায়। গোপগোপী বলিয়া ইহাদিগকে উক্ত পুরাণকারেরা শূদ্র বলিয়া কোথাও বর্ণনা করেন নাই। আমার যেন স্মরণ হয়, শ্রীমদ্ভাগবতকার গোপরাজ নন্দ ও যদুবংশীয় বসুদেবকে একই বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দিয়া গিয়াছেন এবং এই গোপবংশ ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যাহা হউক, পুরাণাদি আলোচনা করিয়া বাঙ্গালাপ্রকৃতিবিশিষ্ট নাম পাইবার বিশেষ সম্ভাবনা দেখি না, তবে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার সঙ্গী ও সঙ্গিনীগণের অনেক নাম বাঙ্গালা নামমালায় গৃহীত হইয়াছে বটে।

বাঙ্গালীর বর্ত্তমান নামমালার প্রকৃতি এইবারে আলোচনা করা যাক্। বাঙ্গালা নামের পনরআনা তিনপাই নামে দুইটী শব্দ থাকে। প্রথম শব্দটিকে আমি 'নামপদ' ও দ্বিতীয় শব্দটিকে নামাংশ শব্দে অভিহিত করিতেছি, যেমন—হরিদাস, প্রসন্নকুমার, রামনাথ, শিবচন্দ্র, কানাইলাল প্রভৃতি নামে হরি, প্রসন্ন, রাম, শিব ও কানাই এই শব্দগুলিকে নামপদ ও দাস, কুমার, নাথ, চন্দ্র ও লাল এই শব্দগুলিকে 'নামাংশ' বলিয়া অভিহিত করিতেছি। এই নাম ও নামাংশের প্রকৃতি বিবেচনায় বাঙ্গালা নামগুলিকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা—

(১) কতকগুলি খাঁটি সংস্কৃত নাম এই নামগুলি বিভিন্ন সংস্কৃত শব্দের সহযোগে সমাস ও সন্ধিদ্বারা নিষ্পন্ন এবং অসংখ্য। সুবিধার জন্য আমি এক রাম নামের সহিত কত প্রকার শব্দের অর্থাৎ নামাংশের সমাস ও সন্ধি হইতে পারে, তাহার উল্লেখ করিতেছি। এইরূপ নামগুলির নামপদ ও নামাংশ উভয়ই সংস্কৃত শব্দ বলিয়া এগুলিকে খাঁটি সংস্কৃত নাম বলিয়া বাছিয়া লইতেছি যথা—রামকান্ত, রামকালী, রামকিশোর, রামকুমার, রামকৃষ্ণ,

রামগতি, রামগোবিন্দ, রামচন্দ্র, রামচরণ, রামচৈতন্য, রামজয়, রামজীবন, রামতনু, রামতারক, রামতারণ, রামতোষ, রামত্রাণ, রামদাস, রামদেব, রামধন, রামনাথ, রাম-নারায়ণ, রামনিধি, রামপদ, রামপ্রসন্ন, রামপ্রসাদ, রামপ্রাণ, রামপ্রিয়, রামবন্ধু, রামবল্লভ, রামবিষ্ণু, রামভদ্র, রামমোহন, রামযদু, রামযাদব, রামরত্ন, রামরাঘব, রামরাম, রামরেণু, রামলোচন, রামশরণ, রামশশী, রামসখা, রামসন্তোষ, রামসুন্দর, রামসেবক, রামহর, রামহরি, রামহৃদয়, রামানন্দ, রামেন্দু, রামেন্দ্র। রামেন্দু ও রামেন্দ্র নামের সহিত নাথ, চন্দ্র, প্রসাদ, সুন্দর, নারায়ণ প্রভৃতি বিভিন্ন নামাংশ যোগে আবার কতকগুলি নামের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সংস্কৃত নামমালায় এইরূপ নামই অধিক। বাঙ্গালা নামমালায় কতপ্রকার নামাংশ ব্যবহৃত হয়, এই তালিকা হইতে মোটামুটী তাহারও একটা আভাস পাওয়া যায়। সংস্কৃত নামমালায় যে কোন দুই বা তিন শব্দে সমাস বা সন্ধি হউক না কেন, সমস্ত নামটী দ্বারা কোন দেবনাম বা দেবতার অনুগ্রহ সূচিত হইয়া থাকে। হিন্দুর একটা পবিত্র আশা, পুত্র কন্যার নাম গ্রহণচ্ছলে সর্ব্বদা দেবদেবীর নামগ্রহণ করিবে, তাই এইরূপ নামে হিন্দুর পক্ষপাত ও আগ্রহ দেখা যায়। প্রথম প্রথম বোধ হয় শিব, হরি, বিষ্ণু, গণেশ, কার্ত্তিক, কৃষ্ণ, রাম ইত্যাদি বিমিশ্র দেববাচী নামগুলিই রাখা হইত। পরে দেব-মহিমা কীর্ত্তনের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া যখন বাঙ্গালী নাম রাখিতে আরম্ভ করিল, তখন হইতেই বিমিশ্র দেবনামের সহিত ভাববিশেষে শব্দ-বিশেষ যোগ করিয়া সন্ধিসমাস-নিষ্পন্ন নামের উৎপত্তি হইল। এই যুগেই বিভিন্ন ভাবের বশে রামদাস, রামকান্ত, রামপ্রসাদ, রামপ্রাণ, রামচরণ প্রভৃতি বিভিন্ন অর্থবোধক নাম সৃষ্ট হইল। এইরূপে প্রথম প্রথম পুংদেবতার নামে পুরুষের ও স্ত্রী দেবতার নামে স্ত্রীলোকের নামকরণ হইত। শেষে আকাঙ্ক্ষা আরও একটু বাড়িলে, স্ব স্ব উপাস্য দেবীর নামে পুত্রের নাম-করণ করিবার জন্য দেবীভক্তের আগ্রহ জন্মিল, তখন হইতে দেবীনামের সহিত নানাবিধ নামাংশ যোগ করিয়া পুরুষ নাম কল্পিত হইতে লাগিল, যেমন কালীচরণ, লক্ষ্মীপ্রসাদ, উমাপতি, রাধানাথ, সীতানাথ, প্রভৃতি। ঠিক এই সময়েই ইহারই প্রতিপক্ষে দেবী-ভক্তির দিক্ হইতেই দেবনামের সহিত নানাবিধ স্ত্রীবাচক নামাংশ জুড়িয়া স্ত্রীনাম রাখা হইতে লাগিল, যথা হরমোহিনী, শিবসুন্দরী, বিষ্ণুপ্রিয়া, কৃষ্ণ-ভাবিনী ইত্যাদি। সাম্প্রদায়িক উপাসনার সামঞ্জস্যের দিক্ হইতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবদেবীর নাম যোগ করিয়া আবার কতকগুলি নাম গঠিত হয়, যেমন হরিহর, হরকালী, রামকৃষ্ণ, গৌরহরি, সূর্য্যনারায়ণ ইত্যাদি। দেবদেবীর যুগলরূপের প্রতি প্রীতির ভাব হইতে কতকগুলি নামকরণ হইয়া থাকে, যথা—হরগৌরী, গৌরীশঙ্কর, রাধাকৃষ্ণ, সীতারাম, লক্ষ্মী-নারায়ণ, কালীশঙ্কর ইত্যাদি। সাম্প্রদায়িক উপাসনামূলক ভক্তি ও দ্বেষাদ্বেষী হইতে কতক-গুলি নামের উৎপত্তি হয়, যথা—বৈষ্ণবেরা নাম রাখিলেন, কৃষ্ণনাথ, হরিনাথ; শৈবেরা নাম রাখিলেন হরনাথ, শিবনাথ; শাক্তেরা নাম রাখিল কালীনাথ, দুর্গানাথ, হরমোহন। কোন

সম্প্রদায়ই কোন সম্প্রদায়কে ঠকাইতে পারেন নাই। ক্রমশঃ দেবভক্তিমূলক নামগুলির অনুকরণে মহাপুরুষ-ভক্তিপ্রকাশক কতকগুলি নামের উৎপত্তি হয়, যথা—নিতাইচরণ, উদ্ধবচরণ অক্রূরচন্দ্র, মুনীন্দ্রনাথ, সাধুচরণ, বৈষ্ণবদাস, সিদ্ধেশ্বর, যোগজীবন ইত্যাদি। ইহার পর এই সকল ভক্তির ভাব যখন পর্য্যুদস্ত হইয়া উঠিল, তখন নামমালায় কাব্যরস প্রবেশ করিল, এবং নূতন ধরণের নানাবিধ নামের উৎপত্তি হইতে লাগিল, যথা—পদ্মলোচন, রাজীবলোচন, নলিনীভূষণ, বিজয়নাথ, বিনয়ভূষণ ইত্যাদি। বাঙ্গালীর স্ত্রীবাচক নামের সংখ্যা এই শ্রেণীতেই অধিক যথা, নয়নতারা, নীরদকেশী, চম্পকলতা, পদ্মমুখী, বিধুমুখী, সরলা, সুশীলা, শান্তিমণি, ক্ষমাসুন্দরী, বিলাসবতী, সরোজিনী, কিরণময়ী, হিরণ্ময়ী, সরোজকুমারী, প্রাণকুমারী ইত্যাদি। পৌরাণিক ক্ষত্রিয়গণের যে সকল নাম এই শ্রেণীভুক্ত অর্থাৎ দশরথ, ভীমসেন, কৃতবর্ম্মা, শতানীক, চক্রপাণি, শূলপাণি প্রভৃতির ন্যায় নামবাচক শব্দ বাঙ্গালীর নামমালায় নাই। অস্ত্রনামের সহিত অন্য শব্দের সমাসবদ্ধ দু' একটা নাম যাহা পাওয়া যায়, তাহাও আবার যোগরূঢ় দেববাচী শব্দ, যথা—গদাধর, হলধর। হিন্দুদিগের প্রথমাবস্থায় বিমিশ্র দেবনামগুলির ন্যায় ইংরাজেরাও প্রথমে তাহাদের মহাপুরুষগণের নামমালা অর্থাৎ John, Peter, Adam, Abraham, Mathew, প্রভৃতি নামমালাই ব্যক্তিগত নামরূপে গ্রহণ করিত, পরে তাহাদিগের মধ্যে যেমন Shakespear, Longfellow, Wordsworth, Woodburn, Laidlaw, Johnston, Kirkpatrick, Playfair, Broomfield প্রভৃতি সমাসবদ্ধ নিরর্থক নামেরই প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। কালে বাঙ্গালীর সংস্কৃত নামমালার মধ্যেও সেইরূপ কতকগুলি সমাসবদ্ধ নিরর্থক নাম প্রচলিত হইয়াছে, যথা—নিবারণচন্দ্র, অখিলচন্দ্র, প্রতুলচন্দ্র, নলিনচন্দ্র, অশোককৃষ্ণ, বিনয়কৃষ্ণ, সমরেন্দ্রনাথ, নীতীন্দ্রকৃষ্ণ, নিত্যগোপাল, হেমেন্দ্রপ্রসাদ, হীরেন্দ্রনাথ, কেবলরাম, কান্তমোহিনী ইত্যাদি। এই সংস্কৃত নামমালার মধ্যে আবার একটি রহস্য দেখা যায়। কতকগুলি পুংলিঙ্গ শব্দ, স্ত্রীলোকের নামের জন্য অবাধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা—রাসবিলাসী, হরমণি, গৌরমণি, "হরকালী" নামটি স্ত্রীলিঙ্গ হইলেও স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের নামার্থ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। খাঁটি সংস্কৃত নাম সম্বন্ধ এই পর্য্যন্ত।

(২) কতকগুলি নামের নামপদ সংস্কৃত শব্দ, কিন্তু নামাংশগুলি বাঙ্গালা যথা—রামচাঁদ, শ্যামচাঁদ, রূপচাঁদ, মোহনচাঁদ প্রভৃতি "চাঁদ" শব্দ যুক্ত কতকগুলি নাম। চাঁদ শব্দটী সংস্কৃত চন্দ্র শব্দের অপভ্রংশ হইলেও ইহা যখন বাঙ্গালা ভাষায় এই আকারে স্বতন্ত্র একটী শব্দরূপে বর্ত্তমান, তখন আমরা ইহাকে বাঙ্গালা শব্দ বলিয়া ধরিতে পারি। মোহনবাঁশী, নীলরতন, রামকানাই, নীরদবরণ প্রভৃতি নাম এই শ্রেণীর অন্তর্গত। "শ্রীমন্ত" নামটিকে আমরা এই শ্রেণীতে ফেলিতে পারি। শ্রী শব্দের উত্তর অস্ত্যর্থে মতুপ্ প্রত্যয় করিলে শ্রীমৎ পদ হয়। শ্রীমৎ শব্দের প্রথমার এক বচনে শ্রীমান্ আর বহুবচনে শ্রীমন্তঃ পদ হইয়া থাকে, কিন্তু বাঙ্গালায় একবচনেই শ্রীমন্ত পদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে বলিয়া আমি

ইহাকে মিশ্র বাঙ্গালা নাম বলিতে চাহি। এরূপ পদ বাঙ্গালাভাষায় আরও আছে। বুদ্ধিমন্ত, জীবন্ত, জলন্ত, পয়মন্ত, অঙ্কুরন্ত প্রভৃতি বাঙ্গালা পদগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই শ্রীমন্ত শব্দটী সম্বন্ধে আমাদের যুক্তির সত্যাসত্য লক্ষিত হইবে। এইখানে শ্রীশব্দযুক্ত আর কয়টী নামের উল্লেখ করিব, শ্রীশ, শ্রীদাম, শ্রীনিবাস এই তিনটি নাম শুদ্ধভাবে লিখিত হইলে ইহারা খাঁটি সংস্কৃত নাম থাকে, কিন্তু বাঙ্গালাভাষায় ইহাদের জন্য তিনটী বাঙ্গালা সংস্করণ আছে যথা—শিরীষ, ছিদাম, চিনিবাস, এই আকারেও ইহাদের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। এই শ্রেণীতে বৃন্দারাণী, নন্দরাণী, প্রভৃতি রাণী যুক্ত স্ত্রীবাচক নাম দেখিতে পাওয়া যায়। পুংবাচক "চাঁদ" ও "রতন" এবং স্ত্রীবাচক "রাণী" শব্দ যেমন বাঙ্গালায় অবিকৃত-ভাবে ব্যবহৃত হয়, হিন্দীতে সেইরূপ হইলেও, আমি ইহাদিগকে কেবল হিন্দী বলিয়া ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নাই, বরং বিশুদ্ধ বিমিশ্র বাঙ্গালাই বলিতেছি।

(৩) কতকগুলি নামের নামপদ সংস্কৃত শব্দ এবং নামাংশ হিন্দী যথা—রামলাল, শ্যামলাল, রূপলাল, মোহনলাল, মাণিকলাল, জহরলাল প্রভৃতি "লাল" শব্দযুক্ত। "লাল" শব্দটিকে আমি হিন্দী বলিয়াই ধরিতেছি। এই সকল নামের "লাল" শব্দের অর্থ আনন্দদায়ক। সংস্কৃত নন্দ্ ধাতুর অর্থ যাহা, হিন্দী লাল শব্দের অর্থও তাহাই, সেই জন্য নন্দলাল শব্দের অর্থ নন্দনন্দন। "মাণিক" শব্দটি "রতন" শব্দের ন্যায় বাঙ্গালা ও হিন্দীতে অবিকৃতভাবেই যখন ব্যবহৃত হয়, তখন বাঙ্গালা বলায় ক্ষতি নাই। মাণিক্য-বোধক জহর শব্দটী পারসী "জওহর" শব্দের বাঙ্গালারূপ, পারসীতে আর একটি জহর শব্দ আছে, তাহার অর্থ বিষ। এই শ্রেণীতে একটিমাত্র স্ত্রীনাম আছে—রামপ্যারী বা রামপিয়ারী। রাণী শব্দ হিন্দী ও বাঙ্গালায় সমানভাবে ব্যবহৃত হয়, সুতরাং নন্দরাণী, বৃন্দারাণী নামগুলিকে এই শ্রেণীতেও ধরা যাইতে পারে।

সংস্কৃত শব্দমিশ্রিত নামগুলির আর বেশী রকম পাওয়া যায় না, কারণ বাঙ্গালা নামাংশ "চাঁদ", "রতন" ও "রাণী" এবং হিন্দী নামাংশ এক "লাল" শব্দ ব্যতীত আর বেশী কিছু আমার দৃষ্টিপথে পড়ে নাই।

(৪) কতকগুলি খাঁটি বাঙ্গালা নাম অর্থাৎ যে সকল নামের নামপদ ও নামাংশ উভয়ই বাঙ্গালা শব্দ যোগে নিষ্পন্ন, যেমন—নদেরচাঁদ (বা নদীয়ারচাঁদ), বলাইচাঁদ, কানাইচাঁদ, নিমাইচাঁদ, নিতাইচাঁদ, গোরাচাঁদ, কালাচাঁদ, প্যারীচাঁদ, রাখালচাঁদ, পরাণচাঁদ, ফটিকচাঁদ, রতনচাঁদ, এককড়ি, দুকড়ি (দোকড়ি), তিনকড়ি, পাঁচকড়ি, ছকড়ি, সাতকড়ি, আটকড়ি, নকড়ি, কানাইবাঁশী। ইহার মধ্যে "নদেরচাঁদ" নামটি যেমন অস্থিমজ্জা লইয়া পূর্ণমাত্রায় বাঙ্গালা নাম হইয়াছে, এমন আর একটি দ্বিতীয় পাইলাম না। ইহাতে সমাসের ব্যাসবাক্যটি, কারকের বিভক্তিটি পর্য্যন্ত বর্ত্তমান, অথচ দুইটি বিচ্ছিন্ন পদে একটি আস্ত নাম হইয়াছে। ভগবানের বাঙ্গালী অবতার নবদ্বীপচন্দ্র চৈতন্য যেমন প্রেমভক্তির অদ্বিতীয় অবতার, তাঁহার বাঙ্গালা নামটিও সেইরূপ বাঙ্গালাভাষায় একটি

অপূর্ব্ব অদ্বিতীয় শব্দ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাঙ্গালায় "চাঁদ" ব্যতীত নামাংশ বড় বেশী নাই, কাজেই নামাংশযুক্ত সম্পূর্ণ বাঙ্গালা নামের সংখ্যাও অল্প। নামাংশ ছাড়িয়া দিলে, পূর্ব্বোক্ত নামগুলি ব্যতীত ভিখারী, ননী, হারাণ, পরাণ প্রভৃতি আর গুটিকয়েক মৌলিক বাঙ্গালা নাম পাওয়া যায়, কিন্তু এই সকল নামের উপযুক্ত অর্থাৎ ভাষায় ব্যবহৃত নামাংশগুলি প্রায় বাঙ্গালা নহে, কাজেই এগুলি মিশ্রনামের তালিকায় ফেলিতে হইতেছে। প্যারীচাঁদ শব্দের প্যারী নামটি হিন্দী পিয়ারী শব্দ হইতে উৎপন্ন। রাঢ়ীয় উচ্চারণে ইহা প্যাইরী, বঙ্গীয় উচ্চারণে পেয়ারী হয়, কিন্তু সর্ব্বত্র প্যারী লিখিত হইয়া থাকে। কবি-ওয়ালাদের আমল হইতে যে প্যারী চলিয়া আসিতেছে, আজ আমি তাহাকে পিয়ারী রূপে লিখিতে গেলে ভাষা মানিবে কি? "কড়ি শব্দ" যুক্ত নামগুলির মধ্যে এককড়ি নামে "এক" শব্দটি সংস্কৃত ও বাঙ্গালাভাষাতেই ব্যবহৃত হয়। সুতরাং এককড়িকে বাঙ্গালা শব্দ ধরা হইল। "দুকড়ি" শব্দটি হিন্দীতেও আছে, তখন উহার "দোকড়ি এই আকার হয়। "কড়ি" যুক্ত নামগুলিতে বাঙ্গালীর একটি রহস্যময় সামাজিক প্রথার আভাষ নিহিত আছে, তাহা পরে বলিতেছি। এই শ্রেণীতে স্ত্রীবাচক নাম নাই। খাঁটি বাঙ্গালায় নামাংশযুক্ত সম্পূর্ণ স্ত্রীবাচক নাম আমি পাই নাই, কেবল একটিমাত্র আছে চাঁপা। এই নামটিতে কোন নামাংশই ভাল মানায় না।

(৫) কতকগুলি নামের নামপদ বাঙ্গালা, কিন্তু নামাংশগুলি সংস্কৃত যথা—কেনারাম, বেচারাম, ফেলারাম, কুড়রাম, খেলারাম, মুচিরাম, ঘটিরাম, লোহারাম, বাবুরাম, সন্নারাম, গুয়িরাম, রাখালচন্দ্র, রাখালদাস, নেপালচন্দ্র, বাদলচন্দ্র, হারাণচন্দ্র, ভজহরি, থাকহরি, রাখহরি, বাঁশীমোহন, সজনীমোহন, সজনীকান্ত, ঠাকুরদাস, গোসাঁইদাস, হারাধন, রাইমোহন, রাইকিশোর, রাইবিলাস, ননীগোপাল, কাঙ্গালীচরণ, পরাণচন্দ্র, পরাণকৃষ্ণ, খেলচন্দ্র। রাখালদাস, কেনারাম, বেচারাম, কুড়রাম ও ফেলারাম এই কয়েকটি এবং কড়িযুক্ত নামগুলিতে বাঙ্গালীর যে একটি রহস্যময় সামাজিক প্রথার ব্যাপার নিহিত আছে, তাহা এইস্থলে বিবৃত করিতেছি।

রাঢ়দেশে রাখালরাজ নামে এক গ্রাম্যদেবতা আছেন, তিনি প্রসন্ন হইলে, বন্ধ্যা রমণীরা পুত্রমুখদর্শন করেন। রাখালরাজের বরপুত্রেরাই প্রায়শঃ রাখালদাস, রাখালচন্দ্র ইত্যাদি নাম পাইয়া থাকে। এ বিষয়ের ব্যতিক্রমও হয়, রাখাল নাম-ধারী বাঙ্গালীমাত্রই দেবানুগ্রহলব্ধ সন্তান নহে। কয়েকটি খাঁটি সংস্কৃত নামেরও ঐরূপ ইতিহাস আছে, সেগুলিও এইখানে উল্লেখ করিতেছি। ক্ষেত্রনাথ, ক্ষেত্র-পাল, ক্ষেত্রমোহন, ধর্ম্মদাস, পঞ্চানন প্রভৃতি নামধারী অধিকাংশ ব্যক্তিরা ক্ষেত্র-পাল, ধর্ম্মরাজ, পাঁচুঠাকুর, বাবাঠাকুর, পঞ্চানন্দ প্রভৃতি গ্রাম্যদেবতার অনুগ্রহে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রচলিত ভাষায় এই সকল সন্তানকে তত্তৎ দেবতার "দোর ধরা ছেলে" বলে। কেনারাম, বেচারাম এবং "কড়ি" যুক্ত নামগুলি প্রায়ই মৃতবৎসার

জীবন্ত-সন্তানের নাম হইয়া থাকে। মৃতবৎসা প্রসূতি সন্তান প্রসবকরামাত্র অপর কোন রমণীকে "তোমার পুত্র" এ বলিয়া দান করে এবং এক হইতে নকড়া কড়ি মূল্য দিয়া তাহার নিকট হইতে সদ্যঃপ্রসূত সন্তানটিকে কিনিয়া লয়। এই কেনা বেচা হইতে কেনারাম বা বেচারাম নামের উৎপত্তি এবং মূল্যের কড়ির পরিমাণ হইতে এককড়ি দুকড়ি প্রভৃতি নাম হইয়া থাকে। কোথাও কোথাও এমনও প্রথা আছে, বর্ত্তমান সন্তানের পূর্ব্বে প্রসূতির যে কয়টি সন্তান মারা গিয়াছে, মূল্যের পরিমাণে ততগুলি কড়ি দিতে হয়। কোন কোন মৃতবৎসা প্রসূতি প্রসবমাত্র পুত্রটিকে কোন দেবালয়ে দেবতার বা কোন ব্রাহ্মণের পদপ্রান্তে ফেলিয়া দেয় এবং পূজাদি দানের পর দেবপ্রসাদ বা দ্বিজপ্রসাদ স্বরূপ পুত্রটিকে কুড়াইয়া লয়। এই ফেলা-তোলার ঘটনা হইতে ফেলারাম ও কুড়রামের উৎপত্তি হয়। মৃতবৎসা বা বহুমৃতপুত্রিকার পুত্রের নাম হরিশরণ, ভজহরি, থাকহরি বা রাখহরি রাখা হয়। এই সকল কারণ ব্যতীত যে এই সকল নাম কাহারও রাখিতে নাই, এমন নহে। খেলচন্দ্র নামটি বাঙ্গালা ভাষার অতি চমৎকার রহস্যময় শব্দ। খেল্ এই বাঙ্গালা ধাতুতে সংস্কৃত শতৃপ্রত্যয় করিয়া খেলৎ পদ হইয়াছে, তাহার পর চন্দ্র শব্দের সহিত সন্ধিসূত্রে খেলচ্চন্দ্র পদ হইয়াছে—কিন্তু অর্থ কি? যেমন বাঙ্গালা শব্দ তেমনি একটি বাঙ্গালা অর্থই মনে আসিতেছে অর্থাৎ ঢলঢলে চাঁদ। এই শ্রেণীতে "নকুড়চন্দ্র" নামটি গ্রহণ করা যাইতে পারে, কিন্তু একটু গোল আছে, নকুড় শব্দের এক কোন্ উকার দেওয়া হইবে? দীর্ঘ ঊকার দিলে নকূড়চন্দ্র শব্দটি খাঁটি সংস্কৃত শব্দ হইয়া যায় এবং "ডলয়োরভেদঃ" নিয়মে নকুলচন্দ্র শব্দের সহিত একার্থ হইবে; কিন্তু হ্রস্ব উকার দিলে নকুড় (কুড়—কুঠীর, আশ্রয়) কুড়হীন এই অর্থ হইতে পারে। এই বানানে এই শব্দটি এই শ্রেণীতে থাকিতে পারে। এই শ্রেণীতে স্ত্রীবাচক নাম অনেকগুলি আছে,— ফুলমণি, রাইমণি, রাই-কিশোরী, রাই-বিলাসী, আতরমণি, সোণামণি, ফুলকুমারী, ডালিম-কুমারী, গোসাঁইদাসী, রাখালদাসী, ঠাকুরদাসী, এলোকেশী, রাণীসুন্দরী, কদমকুমারী, থাকভাবিনী, প্যারীমণি, গোলাপসুন্দরী, আন্নাকালী (আর-না-কালী) এই সকল নামের মধ্যে আতর, গোলাপ ও প্যারী কথাগুলিকে হিন্দী বা পারসী বলিতে পারা যায় না। আতর ও গোলাপ পারসীত যথাক্রমে "ইৎর্" এবং "গুলাব" হয় ও প্যারী হিন্দীতে পিয়ারী হয়। নদেরচাঁদ নামটি যেমন খাঁটী বাঙ্গালী পুংনাম, "আন্নাকালী" নামটি ঠিক সেইরূপ না হউক তবে প্রায় ততটাই খাঁটি বাঙ্গালা স্ত্রী নাম। ইহাতেও একটী বাক্যাংশ "আর-না" পুরা-মাত্রায় বর্ত্তমান, সঙ্গে সঙ্গে একটী দেবীর নিকট প্রার্থনা পর্য্যন্ত সূচিত হইতেছে; ইহার একটু দোষ এই যে ইহার নামাংশটুকু খাঁটী সংস্কৃত শব্দ। "হরে কৃষ্ণ" নামটি কোন্ শ্রেণীর, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তবে যদি দুইটী পৃথক্ পদে নাম কল্পনা করা যায়, তবে হরি ও কৃষ্ণ শব্দ সম্বোধনে হরেকৃষ্ণ হইয়া ইহা একটী খাঁটি সংস্কৃত নামই হয়। এরূপ বিভক্তি-যুক্ত দুইটি বিশুদ্ধ সংস্কৃত পদে একটী নাম হইতে আর দেখা যায় না। নামটি কিন্তু

একমাত্র বাঙ্গালা দেশেই চলিত, হিন্দীতে ঐ অর্থে হরিকিষণ হয় নতুবা 'হরকিষণ'ই অধিক চলিত।

(৬) কতকগুলি খাঁটী হিন্দী নাম যথা,—হীরালাল, পান্নালাল, চুনিলাল, মতিলাল, বনওয়ারীলাল। হীরা চুনি পান্না এবং মতি (মুক্তা) প্রভৃতি রত্ন নামগুলি আসলে হিন্দী শব্দ, এক্ষণে বাঙ্গালায় চলিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত রতন ও মাণিক শব্দ লাল শব্দের যোগে রতনলাল ও মাণিকলাল নাম হয়, ইহাদিগকেও বিশুদ্ধ হিন্দী নাম বলিলে কোন দোষ হয় না। 'বনওয়ারী' সংস্কৃত 'বনবিহারী' শব্দে হিন্দী অপভ্রংশ শব্দ।

(৭) কতকগুলি নামের নামপদ হিন্দী ও নামাংশ বাঙ্গালা যথা—লালচাঁদ, দুলালচাঁদ। মাণিকচাঁদ ও রতনচাঁদ নাম দুটিকেও এ শ্রেণীতে ধরা যাইতে পারে।

(৮) কতকগুলি নামের নামপদ হিন্দী ও নামাংশ সংস্কৃত যথা—লাড্‌লীমোহন, জগবন্ধু জগমোহন জগজীবন। জগৎ অর্থে জগ শব্দ প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষায় কাব্যাঙ্গে ব্যবহৃত হইয়াছে; কিন্তু এই শব্দটীতে কোথাও বাঙ্গালা কারকের বিভক্তি লাগে না, কাজেই ইহাকে বিশুদ্ধ হিন্দী শব্দ বলাই উচিত।

(৯) কতকগুলি নামের নামপদ বাঙ্গালা ও নামাংশ হিন্দী যথা—প্যারীলাল, মাখনলাল, কানাইলাল।

(১০) কতকগুলি নামের নামপদ আরবী ও পারসী এবং নামাংশ সংস্কৃত, বাঙ্গালা বা হিন্দী যথা,—(আ)ফকীরচাঁদ, (আ)ফিকিরচাঁদ, (আ)আমীরচাঁদ, (আ)কবীরদাস, (পা)নফরলাল (পা)নফরচন্দ্র ও (পা)গোলামকৃষ্ণ। বাঙ্গালী হিন্দুর "রক্ষাকালী" বা 'রাখ হরি' নামের ন্যায় বাঙ্গালী মুসলমানেরা আজ কাল "আল্লা রাখা" নাম রাখিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

বাঙ্গালীর নামমালা সম্বন্ধে আমার আর অধিক বক্তব্য নাই। বাঙ্গালী উপাধিগুলি সম্বন্ধে অনেক রহস্য আছে। সমস্ত বাঙ্গালা উপাধির মধ্যে কতকগুলি উপাধি হিন্দু রাজার আমলে প্রদত্ত বিদ্যা ব্রহ্মণ্যের উপাধি, কতকগুলি হিন্দুরাজ দত্ত রাজকার্য্যজনিত পদোচিত সম্মানের উপাধি, কতকগুলি মুসলমানরাজদত্ত উপাধি, আর কতকগুলি বংশপরিচয়-প্রকাশক উপাধি। এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে, তাহা বারান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

আর একটা কথার আংশিক উল্লেখ করিয়া আজ এই অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধের উপসংহার করিব। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙ্গালা কৃৎতদ্ধিতের আলোচনাকালে বাঙ্গালা নামের আলোচনায় তাহাদের সম্বোধন পদে যে সমস্ত পরিবর্ত্তন হয়, তাহা লক্ষ্য করিয়া পরিষৎ-পত্রিকায় বাঙ্গালীকে ঐ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিতে অনুরোধ করেন। নামরহস্যের আলোচনায় আমিই উহার সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছি। তাহাতে দেখিয়াছি, বাঙ্গালা সম্বোধন পদে নামবিশেষ নানারূপ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। এই পরিবর্ত্তন মধ্যে বক্তার ইচ্ছাকৃত উচ্ছৃঙ্খল ব্যবস্থা নাই, ব্যাকরণের সুসঙ্গত বাঁধা বাঁধি নিয়মই বর্ত্তমান

আছে। যথাসাধ্য এই সকল নিয়ম আবিষ্কার করিতেও চেষ্টা করিয়াছি। সে সমস্ত বিষয় পরে আলোচনা করা যাইবে। এক্ষণে এই সকল অমূল্য বাবু প্রমুখ ভাষাবিদ্‌গণের গ্রহণীয় হইলেই শ্রম সফল হইবে।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী।

চট্টগ্রামী ছেলে-ভুলান ছড়া

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর*)

চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থান হইতে এরূপ বিস্তর ছড়া সংগৃহীত হইতে পারে। চট্টগ্রামে ভাল জিনিসেরই আদর করিবার লোক নাই ; এরূপ আপাতমন্দ জিনিসের আদর কে করিবে ? ব্যক্তিগত চেষ্টায় যাহা সাধ্য, আমরা তাহাই করিয়া যাইতেছি। দুঃখের বিষয় যে, অদ্যাপি আমাদের কার্য্যের প্রতি কাহারো সুদৃষ্টি পতিত হইল না। একের চেষ্টায় এরূপ কাজ সুসম্পন্ন হওয়ার নহে বলিয়াই আমরা আক্ষেপ করিতেছি ; নতুবা মাতৃভূমির পুরাকীর্ত্তির সমুদ্ধারে আমাদের এই তুচ্ছ জীবন ত উৎসৃষ্টই হইয়াছে। কাহারো উৎসাহে বা অনুৎসাহে আমাদের উদ্যম ভঙ্গ হওয়ার নহে। যাহা হউক, অদ্য 'পরিষদের' পাঠকবর্গকে আরো কতকগুলি ছড়া উপহার দিলাম।

চট্টলী ভাষা সম্বন্ধে পূর্ব্বে প্রায় সব কথাই বলা গিয়াছে, এখানে নূতন আর কিছু বক্তব্য দেখিতেছি না। নি‌ে এই প্রবন্ধান্তর্গত নূতন শব্দগুলির অর্থ প্রদান করিলাম। কোন কোন শব্দের অর্থ পূ[illegible] শদত্ত হইয়াছে বলিয়া এখানে আর পুনরুল্লিখিত হইল না।

[illegible] জমিনের পার্থক্য সূচিত করিবার জন্য বা জল বাঁধিয়া রাখার জন্য [illegible]ই 'আইল' বলে।

বুড়ী গোল মরিচর্ গুাম,
ঘরর্ কথা বাহারে কৈলে,
দিয়ম্ পাওর মুড়ি।

ঘুঙ্গ্যা উন্দর ঘুঙ্গ্যা উন্দুর,
নল বনেতে বাসা
আমার গোলার ধান খায়,
হেমা লোচা লোচা।

দ্রব্যাদি রাখ[illegible] বেড়্ কাড়িল,
সুতরাং তাহার তলরাইতে কাড়ি নিল

[illegible]ড়াইয়া (আগুবাড়িয়া)
তিন ও গোদে যুক্তি করের্, [illegible]
বৈদ্য বাড়ীত্ যাই।
উঠ উঠ বৈদ্য রে, ভাত দেওরে খাই।
শীতল পাটী বিছাই দেও, গোদারে নাই॥

১৫৬

ও বোলাএ ন খায় খোলা ইঁচা।
ও বোলার গরুএ ন খায় ধান।
ও বোলা তুই পাক্কা মোছলমান॥

* সাহিত্য-পরিষৎ-প[illegible]ত্রের রাত্রি সোণা।

কুণ্ডর=কুকুর; কুচ্যা=কুচিয়া; জলজীব বিশেষ। কুটনী=কুট্টিনী, দূতী; কেঁয়রা=কাঁকড়া; (স্ত্রীলিঙ্গে 'কেঁয়রী'); কেঁয়া মল্যা=একপ্রকার মাছ; কোঁয়রা=কুমড়া।

খারাঝি=বিজুলী; খিল=অনাবাদ; খোলা ইচা=ইচা মাছের ভাজা বিশেষ।

গাতর=গর্ত্তের; গোদ বা গোদা=যাহার গোদ আছে।

ঘন্থা=সরিষা বিশেষ।

ছাম্মান=সাম্পান নৌকা; ছুয়ান=(জাহাজের) সুখান।

জারি দেওয়া=কাঁচা (কিন্তু বাতি) কলা কাটিয়া পাকিবার জন্য কিছুদিন ঘরে রাখা হয়; ইহাকে 'জারি দেওয়া' বলে। কোন বিষয়ে অযোগ্যকে যোগ্য করার চেষ্টা হইলে বলা হয়, 'আবাতি কলা জারিৎ দেওয়া মাত্র।'

জালালী কৈতর=একপ্রকার বৃহৎকায় কবুতর। ইহারা শ্রীহট্টের পীর সাহা জালাল হজরতের আনীত বা পালিত কবুতরের বংশ বলিয়া ঐ নাম হইয়াছে। এ গুলি কেহ প্রতিপালন করে না এবং ভয়ে খায় না।

জোয়ার=জয়কার? হুলুধ্বনি।

ঝলী='আবরু' রক্ষার জন্য বাড়ীতে বাঁশের নির্ম্মিত যে বেড়া দেওয়া হয়।

টেন্‌টেয়ালী=একপ্রকার পতঙ্গ; টেঁয়া=টেঁকা=টাকা; টেঁয়রা='খেত' ঘিরিবার জন্য চতুর্দ্দিকে বাঁশের যে বেড়া দেওয়া যায়।

ঠাঠারী=যাহারা তামা পিতলের কাজ করে।

ডাগুউয়া=ডগা, ডাল; যেমন—খেজুর গাছের 'ডগা'। ডেয়া=ডেকা; গোবৎস। অথবা, ডেয়া=দেবা (দেব)। ডেহরি=চট্টগ্রামে বাহির বাড়ীকে 'ডেহরি' বা 'চতুরা' বলে। ডোঁয়রে=ডোঁকরে, শব্দ করে।

তহ=তও=তবুও; তারা=একপ্রকার তরকারি; তালত—ভ্রাতার বা ভগিনীর শ্বশুরকে 'তালই' বলে; সুতরাং তালত=তালই-পুত্র। তেল্যাচোরা—আরশুলা। কথায় বলে—'সবরেজেষ্টরও হাকিম নয়, তেল্যাচোরাও পাখী নয়।' তেল্যাচোরা [illegible] বটে, কিন্তু সবরেজেষ্টরেরা এখন বিলক্ষণ হাকিম হইয়া [illegible]

দলা—ইংরেজী 'Lu[illegible]'

কতক [illegible] কতকগুলি বংশপরিচয়- [illegible] কথা বলিবার আছে, তাহা বারান্তরে বলিবার

দয়লা—[illegible]

আর একটা কথার আংশিক উল্লেখ করিয়া আজ এই অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধের উপসংহার করিব। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙ্গালা কৃৎতদ্ধিতের আলোচনাকালে বাঙ্গালা নামের আলোচনায় তাহাদের সম্বোধন পদে যে সমস্ত পরিবর্ত্তন হয়, তাহা লক্ষ্য করিয়া পরিষৎ-পত্রিকায় বাঙ্গালীকে ঐ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিতে অনুরোধ করেন। নামরহস্যের আলোচনায় আমিই উহার সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছি। তাহা— [illegible] বাঙ্গালা সম্বোধন পদে নামবিশেষ নানারূপ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। এই বড় ভগিনীকে বক্তার ইচ্ছাকৃত উচ্ছৃঙ্খল ব্যবস্থা নাই, ব্যাকরণের সুসঙ্গত বাঁধা বাঁধি

ভাডইয়া=এক রকম তৃণ বিশেষ, যাহাকে 'পথের বন্ধু' বলে। 'ভাডই' নামে পক্ষীও আছে।

মাইল=অমঙ্গল! গালি দেওয়ার সময় ইহার ব্যবহার হয়, যথা,='মাইল্যা গরু' মাইল্যা দেবাএ এত বৃষ্টি কেয় করের্ (কেন করিতেছে)'? মাল্যা বা মাইল্যা পীড়া—ওলাউঠা প্রভৃতি সংক্রামক ও সদ্যঃপ্রাণহর রোগ। ইংরাজী Malariaর Mal এর সহিত সাদৃশ্য বর্ত্তমান।

মুড়া—পাহাড় ; মুতনী—মূত্রত্যাগকারিণী।

রাইত=রাত=রাত্রি।

লাই=লাগি ; লাগতি=নাগায়ৎ ; লাত্তাই গৃহের 'বারাণ্ডা' বিশেষ·

লাত্উয়া=লাতুরিয়া, খোকা।

হকুন=শকুন ; হঁাইছ=গৃহের বাহিরে চালের নিম্ন-স্থান ; হাঙ্গা=সাঙ্গা, (মুসলমানের) নিকা; হাওলা=সাফলা, হালুক=শালুক।

হোঁতে=স্রোতে ; হোয়াদ=স্বাদ ; হিরা=বুক।

(৫৩ সংখ্যক ছড়ার পাঠান্তর।)

১৫১

টুক্যা নাচের্ আইলর্ কাছে,
আইল্ ভাঙ্গিল্ ছুছুম মাছে।
ছুছুম মাছ তুলাইলুম্।
গাছর্ তেতুল পাড়াইলুম্।
ধেয়ন গাইটী দোহাইলুম্,
চিকন চৈল্গুণ্ কাড়াইলুম্,
টুক্যা ভোজন করাইলুম্।

১৫২

বুড়ী গেল মরিচর্ গুরি,
ঘরর্ কথা বাহারে কৈলে,
দিয়ম্ পাওর মুড়ি।

১৫৩

ঘুঙ্গ্যা উন্দুর ঘুঙ্গ্যা উন্দুর,
নল বনেতে বাসা
আমার গোলার ধান খায়,
হেমা লোচা লোচা।
আড়্ কাডিল বেড়্ কাডিল,
এক্কৈ রাইতে কাড়ি নিল
তের রাত্তি সোণা॥

১৫৪

ভেরন্ গোটা পান্থা গোটা,
ভাই ভাইএ যুক্তি করের্,
বৈদ্য বাড়ীত্ যাই।
তেল দেওরে স্নান করি,
ভাত দেওরে খাই।
শীতল পাটী বিছাই দেও,
বউঅরে নাচাই॥

১৫৫

(পাঠান্তর।)

এরন্ গোটা ভেরন্ গোটা,
তিন গোদর ভাই।
তিনও গোদে যুক্তি করের্,
~~বৈদ্য বাড়ীত্ যাই।~~
উঠ উঠ বৈদ্য রে, ভাত দেওরে খাই।
শীতল পাটী বিছাই দেও, গোদারে নাই॥

১৫৬

ও বোলাএ ন খায় খোলা ইচা।
ও বোলার গরুএ ন খায় ধান।
ও বোলা তুই পাক্কা মোছলমান॥

১৫৭

শ্রাবণ মাসেত প্রভু
হাওলা খাইলা কই।
খাইতে হোয়াদ্ লাগ্যে হাওলা,
আরো আন গৈ॥

১৫৮

ও আমার জাদু বাছা কন্ বনেতে যায়।
পিঁজরাতে বসি ময়না চিকণ দানা খায়।
উড়িয়া যাইতে ময়না ফিরিয়া ন চায়।
(৭২ সংখ্যক ছড়ার ৬ষ্ঠ চরণের পর)
পাঠান্তর :—
বৈলে ধৈর্‌গ্যে থোবা থোবা।
চিলে মার্‌গ্যে এক্কে ছোপা।
কেয়া রে চিল ছোপ্ মারিলি।
সোণার ছুআ গোট ভাঙ্গিলি।
সোণা নয় রূপার দলা।
বাণ্যা বাড়ীর টেঁয়ার ছালা॥

১৫৯

ও বুড়ী বুড়ী কুটনী।
আহ্ল্যা ভরি মুতনী।
আহ্ল্যা নিল হেঁাতে,
তহ বুড়ী মুতে।

১৬০

ঝোঁটা বান্ধে কোঁটা দি,
জাত মরিচর্ আগা দি;
যদি ঝোঁটা লড়িবি,
পাখীর হাতত্ পড়িবি,
পাইথ বেটা জোলাইয়া,
ঝোঁটা নিল উড়াইয়া।

১৬১

নাচনী গেইএ কাচনি পাড়া,
দে আএ আন্তে ঝড়।
কেয়া রে নাচনী ভিজর্ কেয়া,
চিকন ডালা ধর্।
চিকন ডালা ভাসি যায়,
সোণার ডালা ধর্।

১৬২

হুড়্ হুড়াই চুড়্ চুড়াই ন আনিও ঝড়।
মারে বন্‌বাস দিই পুত যায়্ ঘর।

১৬৩

জয়কালীর হাটর্ কলা লালা হাটর্ তেল্।
টুন্নার লাই একগুআ সুন্দর বউ
আন্‌তে সারা রাত্‌খান্ গেল্।

১৬৪

উত্তরে ঢুন্ ঢুন্ পূবে বিয়া,
ভাগিনা লক্ষ্মণ ঘোড়া দিয়া।
লাত্‌উয়ার মা বুড়ী,
হাঁইছত্ বই ঝুরি।

১৬৫

পহরে পহরে পেঁচা ডেঁায়রে,
দৈয়লার পোঁদে খারা ঝি মারে,
লাত্‌উআ নাচে উয়া কাল্ দি,
ঘরত্ আইয়ে দৌড়ি দৌড়ি।

১৬৬

রাজার বেটা জগন্নাথ ঘোরাত্ চড়ি যায়।
পথত্ পাইয়ে লাল কেঁয়রা,
সীতারে হরি নিয়ে রাজা ভোম্ রায়।

১৬৭

টেন্ টেয়ালি কচুর লতি,
বড়্‌দিদি মোরে কোলত্ লতি,(লইতি)
বড়্ পোইরর্ বড়্ ভাডইয়া,
জামাই আইএর টুন টুনাইয়া,
ও জামাই ফিরি চা,
খুৎ মিলানি মিলাই যা।

১৬৮

এক্কা নাচের্ বেক্কা নাচের্
আলু কচু খাই।
সোণা পাগলা নাচন করের্
সুন্দর বউ পাই॥

১৬৯

আম পাতা কাঁঠাল পাতা,
তেল চিবিলে পড়ে;

তোওার আওার জাদুমণি,
হিলে বিলে দৌড়ে।

১৭০

ভাক্রুম্ ভাক্রুম্ কোঁয়রা,
মৈষে ভাঙ্গের্ টেঁয়রা,
মৈষ মারতুম্ গেলুম্ যে,
কেঁটা কুটি মৈলুম্ রে,
ভাইয়া আইলে কৈয়া দিয়ম্,
পেয়াদা আইলে ধরি দিয়ম্।

১৭১

মা মানা কৈর্‌গ্যে শতক্ষণ,
বাপে মানা কৈর্‌গ্যে শতক্ষণ,
পাওর পাইৈস কুণ্ডুরে লৈ যায়্,
ন মাতি থাক্যম্ কতক্ষণ ?

১৭২

কাউয়া কা কা, বৈল্ বিচি বা থা।
সুন্দরীরে বিয়া করি, ঢাকা চলি যা॥

১৭৩

চালে ধৈর্‌গ্যে চাল কোমড়া
বেড়াএ ধৈর্‌গ্যে ঝিঙ্গা।
রাঙা বুড়ীর হাঙ্গা হর্ যে,
বেঙ্গে বাজায়্ শিঙ্গা॥

১৭৪

আঙার দেয়র্‌গ্যা কৈলগাতার চাকর্‌গ্যা
ময়ূরে পেখম ধরে।
তার উপর জালালী কৈতর,
পাক্রুম্ পাক্রুম্ করে॥

১৭৫

ধান খাইল ধায়্যা পোকে,
গরু খাইল জোঁকে।
আর বছরের খাজানা দিয়ম্,
চড়ইয়ার বউঅরে॥

১৭৬

পোইরর্ পারত্ বার্গ্যা ভুয়া
ধুঁয়াই ধুঁয়াই জ্বলে।
বাপর বাড়ী থুন্ কন্যা যাইতে,
ফোঁকাই ফোঁকাই কান্দে॥
ন কান্দরে মা বাপ ন ভাঙ্গ হিয়া।
তোওার ঘরত্ জর্ম্মিয়াছি পরবাসী হৈয়া॥
মারে কৈও রে ভাই দি পাঠাইত ধাই।
পালিয়া পুষিয়া লইত তাহারার জামাই॥
বাপরে কৈও রে ভাই দি পাঠাইত গাই।
ক্ষীর লবনী খাই যৌবন হৈত,
তাহারার জামাই॥

১৭৭

তাল তুউনীর বিয়া।
উন্দুরে কাটে গুয়া॥
বাত্যা তুলায় পান।
চোর গোটা আইয়ের্ জান॥
গাতর্ কুচ্যাএ ছাতি ধর্গ্যে।
কেঁয়রী মাদল বায়॥
তেল্যা চোরা বেরা (বেহারা) হইয়া,
পাল্কী লইয়া যায়॥

১৭৮

নিদ্রালী মা মুই (মুসী) আমার মাথা খাইও
আসন দিতাম শক্তি নাই পাগলার,
চোখে বইও॥
উত্তরথুন্ আইয়ের্ অলি চান্দ্যা ঘোড়াত্ চড়ি
দক্ষিণথুন্ আইয়ের্ অলি লাল্যা ঘোড়াত্ চড়ি
পূবথুন্ আইয়ের্ অলি কাল্যা ঘোড়াত্ চড়ি
পশ্চিমথুন্ আইয়ের অলি সাদা ঘোড়াত্ চড়ি
জাদুর মা কুতা কাটে ডিঁয়লে ডিঁয়লে নাল
জাদু গেইএ ঘোড়া দৌড়াইত,
ডিঘির উত্তরপার॥
এক ঘোড়া কালা, এক ঘোড়া ধলা,
এক ঘোড়া কপালে চান (চান্দ)।
জাদুর মারে জিজ্ঞ্যাস্ কর কন্ ঘোড়া,
করিব দান॥

১৭৯

রৈদ (রৌদ্র) দে রৈদানি।
চান্দার মা পুতানি॥

চান্দারে কাটি।
সাত ঘর বাঁটি॥
চান্দার হাতত্ বৈল ফুল।
চির্ চিরাইয়া রৈদ তুল॥ *
রৈদ ন দি ন দি ঘরত্ যাস্।
চন্দ্র সূর্য্যোর মাথা খাস্॥
বাড়ীর পিছে কলার ডেম্।
কলা কাটি জারিত্ দেম্॥
কলা হইয়ে বাতি।
গোঞাইর মাথাত্ ছাতি॥
ডেয়ার মাথাত্
সাত কুড়ি সাত্ গুআ লাগি॥

১৮০

ফকিরর্ মা ফুতা কাটে,
ফুতা বড় সরু।
বিলর মাঝে মৈর্গ্যো হকুন,
উপর দি উড়ের্ গরু॥

১৮১

বাঁওনে বাঁওন বিলাইয়া,
হাড় ভাঙিল কিলাইয়া।
হাড়র্ তলে ছকুড়ি বেঙ॥
বাঁওনে খাইল গরুর ঠেং,
গরুএ মার্ল্য লেঞ্জর বাড়ি,
বাঁওনা ধাইল চীৎকার ছাড়ি॥

১৮২

আইএর্ রে হরণে,
লক্ষ্মী দেবীর চরণে।
লক্ষ্মী দেবী দিয়ে বল,
হেডর চড়ি পড়ে কহল॥
তার মাঝে সোণার দানা,
সোণা নয় রূপা নয়,
মধ্যে এক্ গুআ টেঁয়ার ছালা।
এক্ গুআ টেঁয়া পাইলাম্ রে,
বাগ্যা বাড়ীত্ গেলাম্ রে;
বাগ্যা বাড়ীর কন্ ঘাঁটা,
পূব দুয়ার্গ্যা মাদার কেঁড়া;
মাদার কেঁড়া হেট করি,
মত্যা আইএর্ বেইট করি,
আইবা মত্যা যাইবা করি (বা'কই')
ঘাঠ পেলাইতা যাওরে,
ঘাঠর তলে বাঘর ছা,
হুম্মুর হাম্মুর কারে রা;
ও বাঘা খাইম্ রে,
বনে বসি খাইম্ রে,
বনেতে নিবাস বনেতে নির্ম্মূল,
মাথা ভরণ তেল,
সহর বানু মিলাই গেল্॥

১৮৩

ও বাচা ন কান্দ্য রে ন ভাঙ্গ্যরে গলা
বাপে কান্দের দর্গ্যার হুকুম,
দর্গ্যাও লড়ে।
ভাইএ কান্দের্ বেলকি তলে,
বেল পাতা পড়ে।
চক বাজারর দখিণ দি,
জমিলা বু কান্দের্ যে
চিকণ চিকণ গলা;
একখান ছাম্পান যার্ রে
নৌকা কাঁড়ি দি,
হিন্দু বেটা ছুয়ান ধৈর্ গ্যে
গোদে আঙুল দি।
ঢুম্ ঢুম্ তালস্থ ভাই,
যমুনা কান্দের্ কিঅর লাই॥

১৮৪

অছিরদ্দি বাপর চিকণ ধুতি,
বলদে নিল শিঙ্গত্ তুলি,
অ যমুনা যমুনা উঠ উঠ,
তিনটা বাইঅন কুট,

* ইহার পর পাঠান্তরঃ—
আধন মাস্তা করুয়া তেল,
তেলইন ফুটি সুর্কা গেল্,
রোহাঙ্গ্যা বেটা ডাক দিয়ে,
ঢাক ফাটি রৌদ দিয়ে।

জামাইর পাতত্ সুর্কা নাই,
চির্ চিরাইয়া মুত।
মাইলর তোতা মরর্ কেয়া,
চলুয়ে তোতা পোইরত্ যাই,
ভুট্যাই ভুট্যাই হালুক খাই,
এক্গুআ হালুক মথুরা,
জামাইর দেশ খান চতুরা॥

১৮৫

খাঁঠার দুয়ারত্ আই (আসি)
জামাই আগকুলা পাইল।
বাহার ডেহরিত্ আই জামাই,
ফুলর্ ছাতি লৈল॥
উঠানেতে আই জামাই পঞ্চ,
জোয়ার পাইল।
গোঞাইর ঘরত্ গিয়া জামাই,
গোঞাইর নজর দিল॥
ঝলীর ভিতর আই জামাই,
বেদীর লাগত্ পাইল।
লাত্যাইত্ উঠি জামাই লাখ,
টাকা পাইল॥
হাতিনাত্ যাইয়া জামাই,
হাতীর লাথি খাইল।
পাক ঘরত্ যাইয়া জামাই,
পঞ্চ বেজন পাইল॥
উপুর তলে যাইয়া জামাই,
বিলাইর লাথি খাইল।
বাড়ীর পিছে গিয়া জামাই,
গুড়ের ভাণ্ড পাইল॥

১৮৬

(৮৪নং ছড়ার পাঠান্তর।)
হাম্গুড়ি আইয়ে হামগুড়ি যায়,
কালা তুলসীর তলে।
বিজলী ছটকে শ্রীহরি দেখিলুম্,
কন্ তপস্যার ফলে॥

১৮৭

পোইরর্ চারিপারে লাগাইয়াছম্ তারা।
আজ লাগতি এড়ি যামর্ মা বাপর পাড়া
কলা গাছে গুয়া গাছে মেলি দিছে খোল।
আজ লাগতি এড়ি যামর্ মা বাপর কোল
কলা গাছে গুয়া গাছে মেলি দিএ ডাগউআ
আজ লাগতি এড়ি যামর মাবাপর বুকউআ।

১৮৭

পড়ঙ্গা চরঙ্গা খোলঙ্গ পাতা।
মধুর বউঅরে কৈয়ম্ যে কথা॥
মধুরো বউঅর চিকনা ধুতি।
বলদে নিল শিঙ্গত্ করি॥
আন্ধা গরু বান্ধা দিলুম্ ভুঁই গেল্ খিল।
যমুনারে বিহা দিলুম্ গঙ্গার কুল॥
উঠ উঠ যমুনা একটী বাইঅন কুটনা।
জামাইর পাতত্ ঝোল নাই,
চর্চরাইয়া মুতনা॥

১৮৮

হাড়ি চুর্ চুর্ পাতিলা চুর্ চুর্
হরা (সরা) হৈয়ে কাইতু।
সকলর বাটা সকলে খাইয়ে,
ও আমার পাগলার বাটা কই?
পাগলার বাটা বিলাইএ খাইয়ে,
ও আমার পাগলার আপদ বলাই লই॥

১৮৯

হাটত্ ও ন গেলাম্ খাঠত্ ও ন গেলাম্
জলত্ ও ন গেলাম্ সাজে।
কন্ কুণ্ডারে দিয়ে কোঁটা,
কালা ঝাঁটার মাঝে॥

১৯০

বৈদ্যারে বৈদ্যা কি কর বৈদ্যা,
ঢেউএ শিং লড়ে।
আমি ত মরি বাদ বিবাদে,
পক্ষিণী কি হালে তরে॥
ফল খাইলাম্ ফুল খাইলাম্
ভজিয়া ভরাইলাম্ কায়া।

সুজনর সঙ্গে পিরীত্ করি,
মরণে ন ছাড়ে দয়া ॥

১৯১

ধান খাঁঠ খাঁঠ সুন্দরীরে পিঠত্ পড়ে কেস
আমিত কুঙার হাটত্ যাইর্
কি কি হারা (সারা) দেস্ ॥
পানির আনিবা চটক্ মটক্ হাতীর,
আনিবা দাঁত।
রূপার আনিবা পঞ্চ কলিকা,
সোণার আনিবা পাত্ ॥

১৯২

ছড়ক ফড়ক নেহালি গাওত্।
ভাত নাই ঘরত্ জুতা পাওত ॥

১৯৩

বড় পোইরর্ কেঁয়া মল্যা
কোদালে ভাঙ্গম্ কেঁড।
বড় বেটিবার গাঅর জ্বর,
ভাকুয়া বেঙে দোলাত্ চড়

১৯৪

বাঙনী বাদি বিসর্জন

ঠৌঁসী ঠেঁঠ করলী আঠার বিলে চরে,
তহত ঠোঁঠীর পেটনভরে,
চোমর বিলাস করে ॥

১৯৫

ঠাঠারী করে ছাপ ছেয়তি,
কামারে করে কাম ছেয়তি,
কুমারে বানায় হাড়ি।
বার বছরর্ যে ভৈন্ আন্লাম্
সে ভৈন্ও হৈল্ রাঁড়ি ॥

১৯৬

ও উকুণ বিবি মরি গেইয়ে,
বকা সাতদিন উয়াস রৈয়ে,
গাঙ্গর পানি কেনা হইয়ে,
হাল্যা ময়নার চোখ কাণা হৈয়ে,
মুজুরর হাতত্ কাচি বাঝি রৈয়ে,
খন্তা চোবা হৈয়ে,
বাঁদিনীর হাতত্ ঝাটা বাঝি রৈয়ে,
শাশুড়ীর হাতত্ পিছা বাঝি রৈয়ে,
বউঅর হাতত্ ভাতকাঠি বাঝি রৈয়ে
ময়না আয়রে আয়।
মোর জাদুর সোণা মুখে,
চুম্ দিয়ে যা ॥

১৯৭

বেল মালতী বলার মা
মলা খাবিনি।
দেখ্তে মলা লাল্ লাল্
খাতে মলা পোড়ের গাল ॥

১৯৮

কি কথা? বেঙের মাথা।
কেমন বেঙ? সুরু বেঙ।
কেমন সুরু? বামন সুরু।
কেমন বামন? ভাট বামণ।
কেমন ভাট? ঘোড়ার চাট।
কেমন ঘোড়া? আচ্ছা ঘোড়া।
কেমন আচ্ছা? বাঁদর বাচ্ছা।
কেমন বাঁদর? মুড়ার বাঁদর।
কেমন মুড়া? পাতা মুড়া।
কেমন পাতা? মিছা কথা ॥

☞ ১০১নং ছড়ায় নিম্নের পংক্তিটি বাদ পড়িয়া গিয়াছে :—

'খুন্তা পোকে দুয়ার কাটে। ঝাঁঅাঁত।'

'ঝাঁঅাঁত' শব্দ উচ্চারণ করিয়া দুই হাতে কাণ ঢাকিতে হয়। পুনঃ পুনঃ ঐরূপ করিলে 'ঝাঁঅাঁত' শব্দ হয়।

শ্রীআবদুল করিম

কবিকঙ্কণ

ও

তাঁহার চণ্ডী-কাব্য

চণ্ডীকাব্যের সময় নির্ণয়-সম্বন্ধে অধুনা অনেকেই অনেক কথা বলিয়া থাকেন, তন্মধ্যে সর্ব্বাগ্রেই চণ্ডীকাব্যের একটী শ্লোকের প্রতি আমাদের চিত্ত ধাবিত হয়। শ্লোকটী এই—

"শকে রস-রস-বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা॥"

এই শ্লোকটী কিরূপে কোথায় পাওয়া যায়, অগ্রে তাহাই বলা কর্ত্তব্য। কলিকাতা বট-তলার মুদ্রাকরগণ, এদেশে মুদ্রা যন্ত্র প্রচলিত হইবার পর হইতে অনেকগুলি বাঙ্গালা পুঁথি মুদ্রিত করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা ইংরাজি ১৮২০ অব্দে যে চণ্ডীকাব্য সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত করেন, তাহাতেই এই শ্লোকটী দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পর বটতলায় চণ্ডীকাব্যের পুনঃ পুনঃ যে সকল সংস্করণ হইয়া আসিতেছে, তাহা প্রথম সংস্করণেরই পুনরাবৃত্তি মাত্র, তবে শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় চণ্ডীকাব্যের যে একটী সংস্করণ প্রচারিত করেন, তাহার পাঠ অনেকটা নির্ভর-যোগ্য বটে, সেরূপ অনেক পুঁথিই আমরা এতদঞ্চলে দেখিয়াছি। তৃতীয় সংস্করণ গ্রন্থখানি বঙ্গবাসীর পূর্ব্বতন স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুজ মহাশয় দ্বারা-প্রকাশিত, তাহা দামুন্যা গ্রামের একখানি পুঁথির আদর্শে মুদ্রিত। তদ্ব্যতীত আর কোথাও কেহ চণ্ডীকাব্যের কোন সংস্করণ প্রচারিত করিয়াছেন কি না বলিতে পারি না, করিলেও তাহা যে সমধিক নির্ভর-যোগ্য হইয়া আসিবে, এরূপ মনে হয় না। আমরা দামুন্যা গ্রামের তিন মাইল দূরে অবস্থিতি করি, এ অঞ্চলে অনেকেরই বাড়ীতে হস্তলিখিত চণ্ডী দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় পঞ্চাশ-ষাট খানি পুঁথি আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহাদের কোনখানিতে বা অক্ষয় বাবুর ও বঙ্গবাসীর মুদ্রিত পুস্তকে আমরা উপরি উক্ত শ্লোক দেখিতে পাই নাই। অধিকন্তু কবির জন্মভূমি দামুন্যা গ্রামস্থ বর্ত্তমান বংশধরগণের নিকট তাঁহার স্বহস্তলিখিত যে পুঁথি-খানি আছে ও কবির আশ্রয়দাতা মেদিনীপুর জেলার আরড়া ব্রাহ্মণভূমির নরপতি ৺রঘুনাথ দেব রায়ের বর্ত্তমান বংশধরগণ কবির হস্তলিখিত বিশ্বাসে যে পুঁথিখানি যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, এতদুভয়ের কোন খানিতেই উক্ত কাব্যের শেষাংশ না থাকায় ঐ শ্লোকের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারা যায় না। তথাপি উহার ভিত্তি কতদূর সুদৃঢ়, তাহার আলোচনা না করিয়া একবারে উহাকে পরিত্যাগ করা যায় না।

বটতলায় মুদ্রিত যে সকল পুস্তকে ঐ শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার পরেই উহার অর্থ-বোধক ১৪৬৬ শক লিখিত আছে। ইহাতে ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দ হয়। তখন পাঠান-কুলতিলক সেরশাহ দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। কিন্তু কেবলমাত্র দামুন্যা গ্রামে যে কবির স্বহস্ত-লিখিত পুস্তক খানি দেখিয়াছি, তাহা ব্যতীত সমস্ত মুদ্রিত ও অমুদ্রিত পুস্তকে "গ্রন্থোৎপত্তির কারণ" শীর্ষক যে একটী প্রবন্ধ প্রকটিত হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায় যে, রাজা মানসিংহের বঙ্গদেশ শাসনকালে মামুদ-সরিফনামা জনৈক ডিহিদারের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া জন্মভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়নকালে তেউড়ি নামক গ্রামের "আড়া" পুষ্করিণীর তীরে নিদ্রা যাইবার সময়ে দেবী ভগবতী দ্বারা প্রত্যাদিষ্ট হইয়া কবি চণ্ডীকাব্য প্রণয়ন করেন। ১৪৬৬ শক বা ১৫৪৪ খৃষ্টাব্দ মানসিংহের রাজত্বারম্ভের ৪৫ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী। মানসিংহ খৃঃ ১৫৮৯ হইতে খৃঃ ১৬০০ অব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ শাসন করেন। অতএব মানসিংহের বঙ্গদেশ শাসনকালে ১৪৬৬ শকে চণ্ডীকাব্যের রচনা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? গ্রন্থোৎপত্তির কারণশীর্ষক প্রবন্ধের পাঠান্তরও এত অধিক যে, তাহা হইতে সত্যাবধারণ করিতে হইলে বিষম বেগ পাইতে হয়। অমুদ্রিত পুঁথির কথায় কাজ নাই। এ পর্য্যন্ত যে কয়খানি চণ্ডীকাব্য মুদ্রাযন্ত্রে অঙ্গরাগ প্রাপ্ত হইয়াছে এবং পণ্ডিত ৺রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার "বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা-সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" নামক গ্রন্থে আরড়ার পুঁথি হইতে যে প্রবন্ধটীর উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাদের পাঠান্তর উদ্ধৃত করিলেই পাঠকগণ অনেকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। "শকে রস রস বেদ" এই শ্লোক এবং "গ্রন্থোৎপত্তির-কারণ" শীর্ষক প্রবন্ধ অবলম্বনে চণ্ডীকাব্যের রচনকাল নির্ণীত হইতে পারিবে বলিয়া আমাদিগকে উহার বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইল। কবির পলায়নকালে পন্থাবর্ণনায় যে পাঠান্তর আছে, তাহা যথাস্থানে উল্লিখিত ও আলোচিত হইবে।

১। বটতলার মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ,—

সে মানসিংহের কালে, প্রজার পাপের ফলে,
হৈল রাজা মামুদ সরিফ।

২। অক্ষয় বাবুর পুস্তকে,—

রাজা-মানসিংহের-কালে, প্রজার পাপের ফলে,
ডিহিদার মামুদ সরিপ॥

৩। বঙ্গবাসীর পুস্তকে—

সে মানসিংহের কালে, প্রজার পাপের ফলে,
ডিহিদার মামুদ সরিপ।

৪। আরড়ার পুঁথির পাঠ—

অধর্ম্মী রাজার-কালে,　　　প্রজার পাপের ফলে,

মিদাৎ পায় মহম্মদ সরিফ ॥

৫। দামুন্তা ও তাহার নিকটবর্ত্তী গ্রামের অধিকাংশ পুঁথির পাঠ—

সে মানসিংহের কালে,　　　প্রজার পাপের ফলে,

ডিহিদার মামুদ সরিফ ॥

এই প্রবন্ধে উপরি উক্ত শ্লোকের প্রথম চরণের পাঠ সর্ব্বত্র প্রায়ই একরূপ যথা—

ধন্য রাজা মানসিংহ,　　　বিষ্ণু পদাম্বুজ ভৃঙ্গ,

গৌড়-বঙ্গ উৎকল অধিপ।

এই জন্য প্রত্যেক স্থলে উহা উদ্ধৃত হইল না।

পাঠকগণের বোধসৌকর্য্যার্থ দামুন্যা ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের পুঁথিতে এই প্রবন্ধের যেরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়, তাহাই প্রামাণিক বোধে নিম্নে সমুদায় অংশ উদ্ধৃত হইল—

"শুন ভাই সভাজন,　　　কবিত্বের বিবরণ,

এই গীত হৈল যেই মতে।

উরিয়া মায়ের বেশে,　　　কবির শিয়র দেশে,

চণ্ডিকা বসিলা আচম্বিতে ॥

সহর সেলিমাবাজ,　　　তাহাতে (১)সুজনরাজ,

নিবাস নিয়োগী গোপীনাথ।

তাহার তালুকে বসি,　　　দামুন্যায় চাস চসি,

নিবাস পুরুষ ছয় সাত (২) ॥

ধন্য রাজা মানসিংহ,　　　বিষ্ণুপদে যেন ভৃঙ্গ,

গৌড়বঙ্গ উৎকল অধিপ।

সে মানসিংহের কালে,　　　প্রজার পাপের ফলে,

ডিহিদার মামুদ সরিফ (৩) ॥

উজির হইল রায়জাদা,(৪)　　　ব্যাপারীরে দেয় খেদা(৫)

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হল্য অরি।

১। সেলিমাবাজ বর্দ্ধমান-সহরের ছয় ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্ব-দিকে দামোদর নদীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। আইন আকবরীতে দেখা যায়, ইহা একটী "সরকার।"

২। দামুন্তার পুঁথিতে কবির বংশ-পরিচায়ক যে একটী প্রস্তাব লিখিত আছে, তাহাতে এই ছয়-সাত পুরুষের প্রত্যেকের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। পশ্চাৎ তাহা উদ্ধৃত হইবে।

৩। হুগলী জেলার আধুনিক আরামবাগ থানার মায়াপুর গ্রামে এই সময়ে মামুদ সরিফ নামে এক জন ডিহিদার ছিল। অদ্যাপি সেই ডিহিদারবংশীয় মুসলমানেরা মায়াপুর গ্রামে বাস করিতেছে।

৪। রায়জাদা ব্যক্তি বিশেষের নাম—ইহার অর্থ সুসজ্জিত রাজপুত্র। ৫। খেদা=তাড়া।

মাপে কোণে দিয়া দড়া, পনর কাঠায় কুড়া, (৬)
নাহি মানে প্রজার গোহারি (৭) ॥
সরকার হৈল কাল, খিল (৮) ভূমি লিখে লাল, (৯)
বিনা উপকারে লয় ধুতি।
পোদ্দার হইয়া যম, টাকায় আড়াই আনা কম,
পাই লভ্য (১০) লয় দিন প্রতি ॥
ডিহিদার আরোজ খোজ, (১১) টাকা দিলে নাহি রোজ, (১২)
ধান্য গোর কেহ নাহি কিনে
প্রভু গোপীনাথ নন্দী, (১৩) বিপাকে হইল বন্দী,
হেতু কিছু নাহি পরিত্রাণে ॥
পেয়াদা সবার নাছে, (১৪) প্রজারা পলায় পাছে,
দুয়ার চাপিয়া দেয় থানা। (১৫)
প্রজা প্রাণে ব্যাকুলী, বেচে রথকুটুদী, (১৬)
টাকার দ্রব্য হয় দশ আনা ॥
সহায় শ্রীমন্ত খাঁ, (১৭) চণ্ডীবাটী যার গাঁ,
যুক্তি কৈল গরিব খাঁর সনে।

৬। কুড়া—বিঘা। ৭। গোহারি—কাতরোক্তি। ৮। খিল—নিকৃষ্ট, অনুর্ব্বর।

৯। লাল—উৎকৃষ্ট, অত্যন্ত উর্ব্বর। ১০। লভ্য—সুদ।

১১। আরোজখোজ—সৈনিক কর্ম্মচারীর উপাধিবিশেষ। যিনি ডিহিদার, তাহার আরজখোজ এই সৈনিক উপাধি ছিল।

১২। রোজ—পারস্যভাষার শব্দ, অর্থ দৈনিক খাদ্য। টাকা দিয়াও দৈনিক খাদ্য মিলিত না।

১৩। গোপীনাথ নন্দী জনৈক তিলি, দামুন্যা গ্রামের মহাজন ছিল, অভাবের সময় গ্রামবাসীরা তাহার নিকট টাকা কর্জ্জ ও ধান বাড়ি লইত। ধান বাড়ি লওয়া হয় ত অনেকে বুঝিবেন না। ধান ধার লওয়া, রাঢ় অঞ্চলের কৃষকেরা আষাঢ় শ্রাবণ ও ভাদ্র আশ্বিন মাসে খোরাকী ধান ফুরাইলে মহাজনের নিকট ধান ধার লইয়া থাকে, পৌষ মাঘ মাসে আপনার জমিতে ধান জন্মিলে সিকি বৃদ্ধি বা সুদ-স্বরূপ দিয়া তাহা পরিশোধ করে, বৃদ্ধি শব্দের অর্থ বাড়ি।

১৪। নাছে—বাড়ীর দ্বারে। ১৫। থানা—আডডা।

১৬। কাটারী, কাস্তে, কুড়ুল, খন্তা ইত্যাদি গৃহস্থালীর জিনিষপত্র।

১৭। শ্রীমন্ত খাঁ চণ্ডীবাটীর তালুকদার, গোতান গ্রামের দক্ষিণপাড়ায় শ্রীমন্তা নামে যে একটী পুষ্করিণী আছে, তাহা শ্রীমন্ত খাঁর খনিত এবং তাঁহারই নামানুসারে উহার নাম শ্রীমন্তা হইয়াছে। দক্ষিণপাড়ার পূর্ব্বনাম চণ্ডীবাটী।

দামুন্যা ছাড়িয়া যাই,　　সঙ্গে রমানাথ ভাই,
　　পথে চণ্ডী দিলা দরশনে ॥
তেলিয়া (১৮) গাঁয়ে উপনীত,　রূপরায় (১৯) নিল বিত্ত,
　　যদুকুণ্ডু (২০) তিলি কৈল রক্ষা।
দিয়া আপনার ঘর,　　নিবারণ কৈল ডর,
　　দিবস তিনের দিন ভিক্ষা ॥
বাহিলুঁ গড়াই নদী, (২১)　　সর্ব্বদা সঙরিয়া বিধি,
　　কেঁউটায় হইলুঁ উপনীত। (২২)
দারুকেশ্বর তরি,　　পাইনু মাতুল (২৩) পুরী,
　　গঙ্গাদাস (২৪) বহু কৈল হিত ॥
নারায়ণ পরাশর, (২৫)　　পার হৈলুঁ আমোদর, (২৬)
　　উপনীত (২৭) তেউটা নগরে।
তৈল বিনা কৈলুঁ স্নান,　　উদক করিলুঁ পান,
　　শিশু (২৮) কান্দে ওদনের তরে ॥
আশ্রয়ি পুকুর আড়া,　　নৈবেদ্য শালুক পোড়া,
　　পূজা কৈনু কুমুদপ্রসূনে।
ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমে,　　নিদ্রা যাই সেই ধামে,
　　চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে ॥
হাতে লৈয়া পত্রমসী,　　আপনি কলমে বসি,
　　নানা ছন্দে লিখেন কবিত্ত।

১৮। তেলিয়া গ্রাম দামুন্যার একক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে মুণ্ডেশ্বরী নাম্নী সরিত্তীরে অবস্থিত। আরড়া ব্রাহ্মণভূমি ও দামুন্যার দক্ষিণপশ্চিমবর্ত্তী ন্যূনাধিক ১৮ ক্রোশ অন্তর হইবে।

১৯। রূপরায় জনৈক রাজপুত দস্যু।

২০। যদু কুণ্ডুর বংশধরগণ অদ্যাপি তেলিয়ার সমীপবর্ত্তী নারায়ণপুর গ্রামে অবস্থিতি করিতেছে। তাঁহাদের মধ্যে একজনের নাম অক্ষয়কুমার কুণ্ড।

২১। মুড়াই—মুণ্ডেশ্বরীর অপভ্রংশ। ২২। কেঁউটা—কেঁউটা পাঁইটা বর্দ্ধমান থানার অন্তর্গত।

২৩। মাতুলপুরী—হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার সদর ষ্টেসনের দারুকেশ্বর নদের পরপারবর্ত্তী কালীপুরের সংলগ্ন গ্রাম। ২৪। গঙ্গাদাস—কবির মাতুলপুত্র।

২৫। নারায়ণ ও পরাশর দুইটী ক্ষুদ্র নদী, অধুনা বিলুপ্ত। ২৬। আমোদর, এই আমোদরনদই বঙ্কিমবাবুর দুর্গেশনন্দিনীর আমোদর, গড়মান্দারণের মধ্য দিয়া প্রবাহিত।

২৭। তেউটার আধুনিক নাম তেউড়ী। গড়মান্দারণগ্রামের দক্ষিণে অবস্থিত।

২৮। এই শিশু কবির পৌত্র অভিরাম।

যেই মন্ত্র দিলা দীক্ষা, সেই মন্ত্র করি শিক্ষা,
মহামন্ত্র জপি নিতি নিত ॥
দেবী চণ্ডী মহামায়া, দিলেন চরণ ছায়া,
আজ্ঞা দিলা রচিতে সঙ্গীত।
চণ্ডীর আদেশ পাই, শিলাই (২৯) বাহিয়া যাই,
আরড়ায় (৩০) হইনু উপনীত ॥
আরড়া ব্রাহ্মণভূমি, ব্রাহ্মণ যাহার স্বামী,
নরপতি ব্যাসের সমান।
পড়িয়া কবিত্ব বাণী, সম্ভাষিনু নৃপমণি,
দশ আড়া (৩১) মাপি দিলা ধান ॥
সুধন্য বাঁকুড়া (৩৩) রায়, ভাঙ্গিল সকল দায়,
সুতপাশে কৈলা নিয়োজিত।
তাঁর সুত রঘুনাথ, রূপে গুণে অবদাত,
গুরু করি করিলা পূজিত ॥
সঙ্গেতে দামাল(৩৪) নন্দী, যে জানে স্বপ্নের সন্ধি,
অনুদিন করিত মন্ত্রণ।
নিত্য দেন অনুমতি, রঘুনাথ নরপতি,
গায়নেরে দিলেন ভূষণ (৩৫) ॥

২৯। শিলাই নদী মেদিনীপুর জেলার মধ্যে প্রবাহিত।

৩০। আরড়া ব্রাহ্মণভূমি মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা নামক তন্তুবায়প্রধান গণ্ডগ্রামের দুইক্রোশ দূরে—ব্রাহ্মণভূমি একটী পরগণার নাম। ৩১। দশআড়া—চল্লিশ মণ।

৩২। বাঁকুড়া রায়—ব্রাহ্মণভূমির অবসরপ্রাপ্ত রাজার নাম।

৩৩। "গুরু করি করিলা পূজিত"—গুরুর ন্যায় সম্মান করিলেন। চণ্ডীকাব্যপাঠে রাজা রঘুনাথ ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী দুই পুরুষের নাম অবগত হইতে পারা যায়। তাঁহার পিতার নাম বাঁকুড়া রায় এবং পিতামহের নাম বীর মাধব, বাঁকুড়া রায়ের নামেরও পূর্ব্বে বীর শব্দ সংযোজিত থাকিতে দেখা যায়—বীর বাঁকুড়া রায়। অনেকে মনে করিয়া থাকেন, বাঁকুড়া বলিতে বাঁকুড়া নামে প্রসিদ্ধ নগর বা জেলা।

৩৪। দামাল নন্দী জাতিতে তন্তুবায়, তাহার নিবাস হুগলী জেলার ধন্যাখালীর নিকটবর্ত্তী আলাগ্রামে, দামাল কবিকঙ্কণের প্রিয় শিষ্য ছিল, গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠাহেতু সে গুরুসেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল, সতত গুরুসহবাসেই কালযাপন করিত। প্রথিত আছে, কবিকঙ্কণ সংস্কৃতভাষায় তাঁহার বাঙ্গলাভাষায় রচিত চণ্ডীকাব্যের অনুরূপ একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, সেই কাব্যখানি দামালের নিকটেই ছিল, বলিয়া সাধারণে প্রচারিত হইতে পারে নাই।

৩৫। গায়নেরে দিলেন—গায়ন চক্রবর্ত্তী মহাশয় স্বয়ং তাঁহাকে "কবিকঙ্কণ" এই ভূষণ দেওয়া হইয়াছিল, যাহাতে তাঁহার নাম শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিল।

বীর মাধবের সুত,　　　রূপে গুণে অদ্ভুত,
বীর বাঁকুড়া ভাগ্যবান্ ।
তাঁর সুত রঘুনাথ,　　　রাজগুণে অবদাত,
শ্রীকবিকঙ্কণ রসগান ॥”

১৪৬৬ শকে বা খৃঃ ১৫৪৪ অব্দে চণ্ডীকাব্য রচিত হইয়া থাকিলে তাহার ৪৫ বৎসর পরবর্ত্তী রাজা মানসিংহের আমলে জন্মভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক মুকুন্দরামের আরড়া পলায়ন যে কোনমতে সম্ভবপর নহে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই অসঙ্গতি পরিহারার্থ কেহ কেহ বলেন যে, রস শব্দের অর্থ যেমন "ছয়" বুঝায়, তেমনি অলঙ্কারশাস্ত্রে নয়টী রসের বর্ণনা হেতু "রস" শব্দের অর্থ "নয়"ও হইতে পারে; তাহা হইলে উক্ত শ্লোকার্থে ১৪৯৯ শক বা ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দ বুঝায়। আরড়া-ব্রাহ্মণভূমির রাজবংশ-তালিকায় দেখা যায় যে, কবিকঙ্কণের প্রতিপালক রাজা রঘুনাথ দেবরায় ১৪৯৫ শক (১৫৭৩ খৃষ্টাব্দ) হইতে ১৫২৫ শক (খৃঃ ১৬০৩ অব্দ) পর্য্যন্ত ৩০ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। ১৪৯৯ শকে রাজা রঘুনাথ রায় বিদ্যমান ছিলেন। আর রাজা রঘুনাথেরই উৎসাহে যে কবি চণ্ডীকাব্য রচনা করেন, তাহার প্রভূত প্রমাণ উক্ত গ্রন্থমধ্যেই আছে। অতএব ১৪৯৯ শকে যে চণ্ডীকাব্যের রচনা আরম্ভ হইয়াছিল, সে বিষয়ে আর সংশয় নাই, আর "শকে রস রস বেদ" শ্লোকেরও সার্থকতা রক্ষা পায়; কিন্তু ১৪৯৯ শকের (১৫৭৭ খৃষ্টাব্দের) দ্বাদশ বর্ষ পরে মানসিংহের রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছিল, সুতরাং ইহাতেও অসঙ্গতি থাকিয়া যায়। ইহার প্রতিকারার্থ তাঁহারা আরড়ার পুঁথির "সে মানসিংহের কালে" স্থলে "অধর্ম্মী রাজার কালে" এই পাঠের উপকারিতা গ্রহণে বলিতে চাহেন যে, "অধর্ম্মী রাজার কালে" অর্থাৎ কোন মুসলমান নবাবের বঙ্গদেশ শাসনকালে ১৪৯৯ শকে (১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে) মামুদ সরিফ নামক ডিহিদারের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া কবি আরড়া ব্রাহ্মণভূমিতে গিয়া ব্রাহ্মণ-নরপতি রঘুনাথ রায়ের সাহায্যে ও উৎসাহে চণ্ডীকাব্যের রচনা আরম্ভ করেন এবং তাহার দ্বাদশ বর্ষ পরে মানসিংহের রাজত্ব আরম্ভ হইলে এখনকার গ্রন্থকারেরা যেমন পুস্তক রচনার পরে তাহার ভূমিকা লিখিয়া থাকেন, "গ্রন্থোৎপত্তির কারণ" শীর্ষক প্রবন্ধও তদ্রূপে লিখিত ও গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকিবে।

এই মতের পোষণ করিতে আমাদের মনে নানা কারণে কুণ্ঠা জন্মে, গ্রন্থোৎপত্তির কারণ জন্মিল কোন্ মুসলমান নবাবের আমলে, সেই প্রবন্ধ লিখিত হইল কিনা রাজা মানসিংহের শাসন সময়ে, তজ্জন্যই কি মানসিংহের সুখ্যাতি এবং মুসলমান নবাবের সুখ্যাতি রটিল? তাহা না হইলে এই প্রবন্ধ মধ্যে মানসিংহের উল্লেখ নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হয়। যে কারণেই হউক, মানসিংহের সহিত এই প্রবন্ধের এবং কবির জন্মভূমি-পরিত্যাগের যে কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, তাহা কেহ না বলিলেও বুঝিয়া লইতে হয়। সেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কটী কি কেবল মাত্র তাঁহার রাজত্বকাল মধ্যে ঐ প্রবন্ধটী

লিখিত হওয়া ভিন্ন আর কিছু নাই? আছে—"অধর্ম্মী রাজা" বলিলে এই বুঝায় যে, যে রাজা ধর্ম্মপালনে পরাঙ্মুখ, সেই অধর্ম্মী রাজা। তাহাতে হিন্দু মুসলমান ভেদ বুঝায় না। এরূপ স্থলে হিন্দু রাজাও অধর্ম্মী হইতে পারেন, এবং মুসলমান রাজাও অধর্ম্মী হইতে পারেন হিন্দু প্রজার পক্ষে মুসলমান বা অন্য ধর্ম্মাবলম্বী রাজাকে বিধর্ম্মী রাজা বলা যাইতে পারে। যদি কোন মুসলমান নবাবের বঙ্গদেশ-শাসনকালে ডিহিদারের অত্যাচারে কবিকে জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে হইত, তাহা হইলে কবিকঙ্কণের ন্যায় সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ সুপণ্ডিত কবি "বিধর্ম্মী" স্থলে কখন "অধর্ম্মী" এই অপ্রযুজ্য বিশেষণ প্রয়োগ করিতেন না। "অধর্ম্মী" বলিতে যদি মুসলমানকেই বুঝাইত, তাহা হইলে "প্রজার পাপের ফলে ডিহিদার মামুদ সরিফ।" একথার সার্থকতা থাকিত না, কারণ "অধর্ম্মী" রাজার রাজত্বে অধর্ম্মী অত্যাচারী ডিহিদারের নিয়োগইত স্বাভাবিক। কবিকঙ্কণের ন্যায় কবির দ্বারা এরূপ শব্দপ্রয়োগ যে কতদূর সঙ্গত, তাহার মীমাংসার ভার সূক্ষ্মদর্শী পাঠক মহাশয়গণের উপর নির্ভর করিয়া আমরা কেবল এই মাত্র বলিতে চাহি যে, মানসিংহের রাজত্বেই অত্যাচারী ডিহিদার মামুদ সরিফের নিয়োগ ঘটিয়াছিল। মানসিংহ হিন্দু রাজা বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ, বিষ্ণুপাদপদ্মে ভৃঙ্গস্বরূপ; এহেন মানসিংহের শাসন সময়ে সুপালনেরই আশা করা যায়, সকল দিকে, সকল রকমে সকলের সুখশান্তিরই সম্ভাবনা; কিন্তু যখন মামুদ সরিফ ডিহিদার নিযুক্ত হইয়া প্রজাগণকে যারপর নাই উৎপীড়িত করিতে লাগিল, তাহার উৎপীড়নে অস্থির হইয়া শেষে ধান আসবাবপত্র বিক্রয় করিয়াও নিষ্কৃতি পাইল না, দেখিয়া তাহারা বহুকালের পৈতৃক ভদ্রাসন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল, তখন চিররাজভক্ত হিন্দু কবি রাজার দোষের কথা বলিতে না পারিয়া তাহাকে প্রজার পাপের ফল বলিয়া মনের দুঃখ মনেই সম্বরণ করিয়া লইলেন, কেবল স্তুতিচ্ছলে নিন্দার জন্য (ব্যাজস্তুতি), "ধন্য" এই শব্দটী মাত্র প্রয়োগ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন। কবি আরড়ার পুঁথিতে যে "অধর্ম্মী রাজার কালে" এপাঠ একবারে লিখেন নাই, আমরা একথা বলিতেও প্রস্তুত নহি। স্পষ্ট ভাষায় মানসিংহকে "অধর্ম্মী" বলিবার জন্যই তিনি প্রস্তুত হইয়াছিলেন অর্থাৎ গৌড়বঙ্গ ও উৎকলের অধিপতি মানসিংহ বিষ্ণুপাদপদ্মে ভৃঙ্গস্বরূপ, কিন্তু রাজা ধর্ম্মপালনে পরাঙ্মুখ; অতএব ধন্য (ব্যাজস্তুতি), ইহা কেবল মাত্র প্রজারই পাপের ফল। বিশেষ বিবেচনার পর মানসিংহকে এরূপ ভাবে "অধর্ম্মী" বলা যখন যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হইল না, তখন কবি আপনিই "অধর্ম্মী" শব্দের প্রত্যাহার করিয়া "সে মানসিংহের" পাঠ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। ইহাতে অর্থও বেশ বিশদ হয়—"ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণুপদাম্বুজভৃঙ্গ" বলায় মানসিংহের বিলক্ষণ গৌরববৃদ্ধি এবং স্তুতিবাদ হইল, আর যে জন্য তিনি মানসিংহকে "অধর্ম্মী" বলিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, সে জন্য "প্রজার পাপের ফলে," কেবল এই মাত্র বলিয়া যথা কথঞ্চিৎ মনঃক্ষোভ ব্যক্ত করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন বলিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন কেবল মাত্র মানসিংহের আমলে "গ্রহোৎপত্তির কারণ" শীর্ষক প্রবন্ধ

লিখিত হইয়াছিল বলিয়া এই প্রবন্ধে মানসিংহের গুণ কীর্ত্তন নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক বই আর কিছু বলা যাইতে পারে না। অতএব সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় যে, মানসিংহেরই শাসনকালে মামুদ সরিফ নামক ব্যক্তি ডিহিদার নিযুক্ত হইয়া যে প্রজাপীড়ন আরম্ভ করিয়াছিল, সেই উৎপীড়নের যাতনায় অস্থির হইয়া কবিকে দামুন্যাগ্রামের ছয় সাত পুরুষের বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রাহ্মণভূমির রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, সম্ভবতঃ তাহা খৃঃ ১৫৯০ বা তাহারও দুই এক বৎসর পরবর্ত্তী সময়ে ঘটিয়া থাকিবে। চণ্ডীকাব্যের রচনা শেষ হইতেও দুই এক বৎসর লাগিয়াছিল, ফলকথা খৃঃ ১৫৯৫ অব্দের পূর্ব্বে কবির জন্মভূমি হইতে পলায়ন এবং চণ্ডীকাব্যের রচনা সমাপ্ত হইতে বাকী ছিল বলিয়া বোধ হয় না। আর এক কথা এই যে, কবির বর্ত্তমান বংশধরেরা তাঁহা হইতে দশম পুরুষ এবং রাজা রঘুনাথ হইতেও তাঁহার বর্ত্তমান বংশধর শ্রীযুক্ত রাজা বৈকুণ্ঠনাথ দেব রায় দশম পুরুষ। পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদেরা গভীর গবেষণা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, পুরুষগণনায় এক এক পুরুষে ২৫ হইতে ৩০ বৎসরের অধিক হইতে পারে না, সুতরাং কবির বর্ত্তমান বংশধরগণ হইতে কবিকে ২৫ বৎসর হিসাবে দশ পুরুষে ২৫০ বৎসর বা ঊর্দ্ধসংখ্যা ৩০ বৎসর হিসাবে ৩০০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের লোক বলিতে পারা যায়, তাহাতে ১৬০৬ খৃষ্টাব্দ হয়, উহা ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দের মত নিকটবর্ত্তী ১৪৯৯ শক বা ১৫৭৭ খৃঃ তত নহে, আরও এক পুরুষ বেশী না হইলে উহাতে কুলায় না। যখন "শকে রস রস বেদ" ইত্যাদি সময়নির্ণায়ক শ্লোক কোন প্রামাণিক মুদ্রিত পুস্তক বা অমুদ্রিত পুঁথিতে পাওয়া যাইতেছে না, তখন কেবল মাত্র দায়িত্বজ্ঞানশূন্য বটতলার মুদ্রাকর বিশেষের উপর নির্ভর করিয়া সত্যকে গোপন করিবার চেষ্টা করা আজি-কালিকার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পক্ষে শোভনীয় নহে। বটতলার মুদ্রাকরগণের কল্যাণেই কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ, কাশীদাস প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের গ্রন্থ হইতে বাঙ্গালা ভাষার সে কালের ক্রিয়াপদগুলি রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। কারণ তাঁহাদিগের দ্বারা মুদ্রিত যাবতীয় প্রাচীন কাব্য সংশোধিত হইবার কথা বলিতে পারা যায়। তাহাতে যে কি বিষময় ফলই ফলিয়াছে, তাহা সাহিত্যামোদী ব্যক্তি মাত্রেই অনুভব করিতেছেন।

যদি খৃঃ ১৫৯৫ অব্দে চণ্ডীকাব্যের রচনাকাল স্থির করা যায়, এবং অন্ততঃ ৪৫ বৎসর বয়সের মধ্যে কোন ব্যক্তির পৌত্রোৎপাদন অসম্ভব না হয়, তাহা হইলে বলিতে পারা যায় যে কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী খৃঃ ১৫৫০ অব্দে বা তাহার দুই এক বৎসর পূর্ব্বে বা পরে বর্দ্ধমান জেলার রায়না থানার অন্তর্গত দামুন্যা গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমাদের দেশে একই নামে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের অস্তিত্ব আছে বলিয়া পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের নামের সংযোগে অনেক গ্রামের পরিচয় হইয়া থাকে, যথা "কেশেড়া বৈকুণ্ঠপুর" "ভাঙ্গামোড়া বৈকুণ্ঠপুর" ইত্যাদি। সেইরূপ দামুন্যা গ্রামের নিকটবর্ত্তী তালা গ্রামের নাম দামুন্যার সহিত সংযুক্ত হইয়া "তালা দামুন্যা" নামে পরিচিত হইয়া থাকে। দামুন্যার দক্ষিণ গায়েই "তালা"। দামুন্যা

বর্দ্ধমান জেলার রায়না থানার অন্তর্গত, এবং তালা হুগলী জেলার আরামবাগ থানার অধীন, অতএব দামুন্যা গ্রাম যে বর্দ্ধমান জেলার দক্ষিণ সীমায় তাহা বুঝা যাইতেছে। এই গ্রামের বর্ত্তমান জমিদার শ্রীল শ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানাধিপতি পত্তনিদার চকদীঘির ৺ভোলানাথ সিংহরায়। দামুন্যা গ্রামে ব্রাহ্মণ, একাদশ তিলি, বাগ্দী, যোগী, গোয়ালা প্রভৃতিতে প্রায় দুইশত ঘর লোকের বাস। রত্নামুনামে একটী সরিৎ দামুন্যার পূর্ব্বদিক্ দিয়া প্রবাহিত ছিল, দামোদরের বন্যায় এখন স্থানে স্থানে ভরাট হইয়া গিয়াছে।

কবিকঙ্কণ চণ্ডীকাব্যে আপনার বাসস্থান এবং বংশপরিচয়সূচক যে একটী প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট করিয়া গিয়াছেন, পাঠকগণের কৌতূহল পরিতৃপ্তি জন্য আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম। ইহা দামুন্যার পুঁথি ভিন্ন অন্য কোন পুঁথিতে নাই। যথা—

"কুলে শীলে নিরবদ্য, (৩৭) ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য, (৩৮)
দামুন্যায় সজ্জনের স্থান।
অতিশয় গুণ বাড়া, সুধন্য দক্ষিণপাড়া, (৩৯)
সুপণ্ডিত সুকবি সমান॥
ধন্য ধন্য কলিকালে, রত্নামু (৪০) নদের কুলে,
অবতার করিলা শঙ্কর।
ধরি চক্রাদিত্য (৪১) নাম, দামুন্যা করিলা ধাম,
তীর্থ কৈলা সেই সে নগর॥
বুঝিয়া তোমার তত্ত্ব, দেউল দিল ধূসদত্ত,
কথো কাল তথায় বিহার।
কে বুঝে তোমার মায়া, সুরকুল তেয়াগিয়া,
বরদান করিলা সঞ্চার॥
গঙ্গাসম সুনির্ম্মল, তোমার চরণজল,
পান কৈনু শিশুকাল হৈতে।

৩৭। নিরবদ্য = নির্ + অবদ্য = সুপ্রসিদ্ধ। দামুন্যা গ্রামের দক্ষিণ পাড়াই কবির বাসস্থান।

৩৮। এক্ষণে দামুন্যা গ্রামে আর কায়স্থের বাস নাই।

৩৯। দক্ষিণপাড়াই কবির জন্ম স্থান।

৪০। রত্নামু অতি ক্ষুদ্র নদী, বর্দ্ধমান জেলার আহারব্যালমা নামক গ্রামের মাঠ হইতে এই নদী বহির্গত হইয়া গোতানের পশ্চিম ও দামুন্যার পূর্ব্ব দিয়া প্রবাহিত হইয়া দামোদরের শাখা বড় কাঁদির সহিত মিলিত হইয়াছে। দামোদরের বন্যায় অধুনা রত্নামু স্থানে স্থানে ভরাট হইয়া গিয়াছে।

৪১। চক্রাদিত্য শিবও এখন দামুন্যায় আছেন, চৈত্র মাসে তাঁহার গাজন হয়। কবি বাল্যকাল হইতে চক্রাদিত্য শিবের পূজা করিতেন। তাঁহার বিশ্বাস এই যে এই শিবপূজার ফলে তিনি কবিত্বশক্তি লাভ করিয়াছিলেন। বাল্যকালে তিনি শিবসংকীর্ত্তন নামে একখানি কবিতাপুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, সাধারণ্যে তাহার প্রচার নাই।

সেইত পুণ্যের ফলে, কবি হই শিশুকালে,
রচিলাম তোমার সঙ্গীতে ॥
হরিনন্দী (৪২) ভাগ্যবান, শিরে দিল ভূমিদান,
মাধব ওঝা (৪৩) ধনাদিকারণ ।
দামুন্যার লোক যত, শিবের চরণে রত,
সেই পুরী হরের ধরণী ॥
কয়ড়ি কুলের অরি, যশোমন্ত অধিকারী,
কল্পতরু নাগ উমাপতি ।
অশেষ পুণ্যের কন্দ, নাগ ঋষি সর্ব্বানন্দ,
সেই পুরী সজ্জন বসতি ॥
কাঁটাদিয়া বন্দ্যঘাটা, বেদান্ত নিগমপাঠী, (৪৬)
ঈশান পণ্ডিত মহাশয় ।
ধন্য ধন্য পুরবাসী, বন্দ্য সে বাঙ্গালপাশী,
লোকনাথ মিশ্র ধনঞ্জয় ॥
কাঞ্জাড়ী কুলের আর, মহামিশ্র অলঙ্কার,
শব্দ কোষ কাব্যের নিদান ।
কয়ড়ি (৪৮) কুলের রাজা, সুকৃতি তপন (৪৯) ওঝা,
তস্য সুত উমাপতি নাম ॥

৪২। হরিনন্দীর বংশধরেরা এখনও দামুন্যা গ্রামে বাস করিতেছে, তাহারা জাতিতে একাদশ তিলি। এই হরিনন্দীই চক্রাদিত্যকে কিছু ভূমি দান করিয়াছিল।

৪৩। ওঝা সে কালের ব্রাহ্মণের সম্মানের উপাধি ছিল, কবি কৃত্তিবাস পণ্ডিতের পূর্ব্ব পুরুষদের এই উপাধি ছিল।

৪৪। যশোমন্ত অধিকারীর সহিত কবির পূর্ব্বপুরুষগণের বৈরতা ছিল, দাতা উমাপতি নাগঋষি সর্ব্বানন্দ প্রভৃতি সজ্জনেরা দামুন্যায় বাস করিতেন। ইঁহারা তৎকালে দামুন্যা গ্রামের প্রধান পক্ষীর ছিলেন।

৪৫। বন্দ্যঘাটী বন্দ্যঘাটা নামক স্থানবাসী, বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের বাসভূমি বন্দ্যঘাটা।

৪৬। যিনি বেদান্ত ও নিগম শাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন, তিনি বেদান্তনিগমপাঠী।

৪৭। বাঙ্গালপাশী=কুলীনের মেল বিশেষ।

৪৮। কয়ড়ি কুলেই কবির জন্ম। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরাও যে ওঝা অভিধানে অভিহিত হইতেন, তাহা এই কবিতাপাঠে বুঝা যাইতেছে।

৪৯। কবি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে তপন ওঝার পর্য্যন্ত নাম জানিতেন, তাঁহার পুত্র উমাপতি ওঝা, তৎপুত্র মাধব ওঝা, তাঁহার নয় সহোদর যথা উদ্ধরণ, পুরন্দর, নিত্যানন্দ, সুরেশ্বর, বাসুদেব, মহেশ, সাগর, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বকনিষ্ঠ জগন্নাথ। জগন্নাথের পুত্র হৃদয় এবং হৃদয়ের পুত্র কবিচন্দ্র ও কবিকঙ্কণ। তপন ওঝা হইতে কবি পঞ্চমপুরুষ। তপনের পূর্ব্ববর্ত্তী দুই এক পুরুষ হইতে তাঁহাদের দামুন্যা গ্রামে বাস করিতেন বলিয়া কবি "গ্রন্থোৎপত্তির কারণ" শীর্ষক প্রবন্ধে বলিয়া গিয়াছেন—"নিবাস পুরুষ ছয় সাত।"

তনয় মাধব শর্ম্মা, সুকৃতি সুকৃতকর্ম্মা,
তার নয় তনয় সোদর।
উদ্ধরণ পুরন্দর, নিত্যানন্দ সুরেশ্বর,
বাসুদেব মহেশ সাগর ॥
সর্ব্বেশ্বর অনুজাত, মহামিশ্র জগন্নাথ,
একভাবে সেবিল শঙ্কর।
বিশেষ পুণ্যের ধাম, সুধন্য হৃদয় নাম,
কবিচন্দ্র তাঁর বংশধর ॥
অনুজ মুকুন্দ শর্ম্মা, সুকবি সুকৃতকর্ম্মা,
নানা শাস্ত্রে নিশ্চয় বিদ্বান্।
শিবরাম বংশধর, (৫০) কৃপা কর মহেশ্বর,
রক্ষ পুত্রে পৌত্রে (৫১) ত্রিনয়ন ॥"

মুকুন্দরাম কয়ড়ী গাঞীর শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ। তাঁহাকে লইয়া ছয় সাত পুরুষ দামুন্যা গ্রামে বাস। কবির পূর্ব্বপুরুষেরা বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। হৃদয়নাথ তাঁহার পিতা এবং মাতা দেবকী ঠাকুরাণী। সাধারণতঃ তাঁহারা পুরুষানুক্রমে কৃষিবৃত্তিধারী, দেবসেবা এবং কৃষিই তাঁহাদের প্রধান জীবিকা ছিল। চক্রাদিত্য নামে গ্রাম্য দেবতা এক শিব আছেন। কবি বাল্যকাল হইতেই চক্রাদিত্যের প্রতি বড়ই ভক্তিমান্। প্রতিদিন তাঁহার পূজা করিয়া চরণোদক পান করিতেন, এই পুণ্যবলে বাল্যকালেই মুকুন্দরামের কবিত্বশক্তি জন্মিয়াছিল এবং ইনি শিবসঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। প্রবাদ এইরূপ যে, কবি বাল্যকালে পাঠশালার পাঠ সমাপন করিয়া দামুন্যার দেড়ক্রোশ দূরবর্ত্তী ভাঙ্গামোড়া গ্রামে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার ও স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তৎকালে এতদঞ্চলে ভাঙ্গা-মোড়া সংস্কৃত চর্চ্চার জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল। এখানকার ভট্টাচার্য্য উপাধিধারী ব্রাহ্মণ-গণের মধ্যে বড় বড় স্মার্ত্ত, পৌরাণিক ও নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহারা নানা দিগ্দেশাগত বিদ্যার্থীদিগকে অন্নদানে অধ্যাপনা করিতেন। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে এখানে ত্রিশ পঁয়ত্রিশটী চতুষ্পাঠী ছিল, অনেকে আদর করিয়া ইহাকে "ছোট নদে" বলিতেন। যে সকল অধ্যাপক দিয়া ভাঙ্গামোড়ার সংস্কৃত চর্চ্চার অবসান হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত ৺কালী-কান্ত চূড়ামণি ও তাঁহার সমসাময়িক কয়েক জনকে আমরা দেখিয়াছি। বর্দ্ধমান জেলার পাড়াতল গ্রামের ৺শ্রীনাথ ন্যায় ভূষণ, হুগলী জেলার সিঙ্গুর গ্রামের ৺ঠাকুর দাস ন্যায়রত্ন প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত পণ্ডিতেরা কালীকান্তের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া গৌরবান্বিত

৫০। শিবরাম বংশধর এই কথা বলায় কবির অন্য পুত্রের অস্তিত্ব কল্পনা করা যাইতে পারে কি ?

৫১। পৌত্র বলিতে এখানে অভিরাম চক্রবর্ত্তী ব্যতীত আর কাহাকেও বুঝায় না।

হইয়াছিলেন। পঠদ্দশাতেই হউক বা তাঁহার শেষেই হউক মুকুন্দরাম কেঁওটা গ্রামে বিবাহ করিয়া রীতিমত সংসারধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তিনি পিতৃপুরুষের অবলম্বিত কৃষিবৃত্তি দ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। শাস্ত্রাধ্যয়নের সার্থকতার জন্য তিনি অধ্যাপনা কার্য্যে অনাবিষ্ট ছিলেন না। এই সময়ে তাঁহার শিবরাম নামে পুত্র এবং যশোদা নাম্নী কন্যার জন্ম হয়। যথাকালে তিনি তাঁহাদের বিবাহ দিয়াছিলেন—বধূ চিত্রলেখা এবং জামাতা মহেশ। মুকুন্দরাম চণ্ডীকাব্যের যেথানে সেথানে দেবী ভগবতীর নিকট তাঁহাদের কল্যাণ কামনা করিয়া গিয়াছেন, যথা—

"উঠিয়া কবির কামে, কৃপা কর শিবরামে,
চিত্রলেখা যশোদা মহেশে।"

এতদ্ব্যতীত তাঁহাকে কুত্রাপি অন্য কোন কল্যাণীয় ব্যক্তির জন্য কল্যাণ কামনা করিতে দেখা যায় না, এই জন্য তাঁহার অন্য কোন অপত্য ছিল বলিয়া বিশ্বাস হয় না। অপর পৃষ্ঠায় কবির বংশতালিকা প্রদত্ত হইল।

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী কবিকঙ্কণের বংশতালিকা।

+ ইঁহার বংশধরেরা বর্দ্ধমান জেলার রায়না থানার অন্তর্গত ছোট বৈনান গ্রামে বাস করিতেছেন। * চিহ্নিত ব্যক্তিগণের বংশ নাই।
সন ১৩১৩ সালের ৫ই বৈশাখ এই বংশতালিকা লিখিত।

গ্রাম্য-গীতি

গান ও ধূয়া

(ঢাকা ও ময়মনসিংহের প্রাদেশিক গ্রাম্য-গীতি)

গান যে ঈশ্বরের কি অমৃত-সৃষ্টি, ইহার মহিমা,—ইহার গুণগ্রাম বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। গানের শব্দরচনা মানুষের, সুর—ঈশ্বর-দত্ত। কাজেই সুরই গান, শব্দ—কেবল হৃদয়ের অভিব্যক্তি। শব্দ সর্ব্বত্র একই ভাবের কার্য্যকর নহে। প্রকৃত সুরের গানে প্রকৃতির যেন উপাসনা হয়, কিন্তু শব্দ বা বাক্যে আঘাত ভিন্ন অন্য কিছুই বাহির হয় না। সুরসংযুক্ত বাক্যই প্রকৃত গান। গানে, ভজনে, দেবতার আরাধনা হয়; মানুষ হর্ষে গায়, দুঃখে গায়, আবার ভয়েও গায়। বিহঙ্গ মধুর কাকলী গানে জীবকে মাতায়, আপনিও মাতে। কীটের সুরেও গানের রেশ আছে। আবার, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক অনাহত ধ্বনিতে বায়ুমণ্ডল মথিত করিয়া নভঃপ্রদেশে ঘুরিতেছে,—সেও এক বিরাট্ গান! গানে আগুণ জলিত, জলদ গলিত। সর্পের মত খল জন্তুও গানে মুগ্ধ হয়। গানে জলচর, স্থলচর, নভশ্চর কে না মুগ্ধ হয়? স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরও যেন আপনি মুগ্ধ হইবার জন্যই গানের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

পৃথিবীতে ভারতই গীতের জন্মস্থান। এইখানেই,—যখন সমগ্র ভুবন তিমির-গর্ভে, তখন (সেই অতি আদি যুগেই) এখানে সামগানের উথলিত সুরে তপোবন—গগন ভরিয়া গিয়াছিল। তাহার পর আর্য্যভূমিতে গীতবিদ্যার কত প্রকারের কত সাধনাই হইয়া গিয়াছে।

সেই ভারতে বঙ্গই যেন অধুনাতনকালে গীতের শ্রেষ্ঠ ভাণ্ডার। কত শত কথকের—কত শত পদকর্ত্তার,—কত শত সাধকের,—কত শত কবিওয়ালার,—কত শত বাউলের গানে বঙ্গের বায়ু আলোড়িত হইয়াছে। আবার, কত কবি সুন্দর মধুর বাছা বাছা কথায় কত গান লিখিয়া আপনি যশস্বী হইয়াছেন, অপরকে মাতাইয়াছেন। কিন্তু তথাপি, দিনে দিনে ক্ষণে-ক্ষণে বঙ্গের ধূলি-মাঝে কত নিরক্ষর কবির হৃদয়ের আবেগ জমাট বাঁধিয়া যে কত গীতের সৃষ্টি করিয়াছে, করিতেছে, কে তাহার সংবাদ লয়? এই সকল গীতে ভাবের উন্মাদনা, প্রাণের ব্যাকুলতা, হৃদয়ের ব্যাকুলতা কত জীবন্তরূপে বাহির হইয়া পল্লী-বায়ুতে পল্লীর প্রান্তর বুকেই লুটাইতেছে, কে তাহার তত্ত্ব করে? ইহাতে সৌন্দর্য্যসাধিত কৃত্রিম সুরের যোজনা নাই, কাজেই এ গান বুঝি অ-সুন্দর! এ গানে ছলাছটাময়ী ভাষা নাই, কাজেই এ গান যেন বর্ব্বরোচিত! কিন্তু কেমন করিয়া বুঝাইব, সৌন্দর্য্য বাঁধিয়া রাখিবার বস্তু নহে, ভাব নগরীর অট্টালিকার গম্ভীর সীমায় আবদ্ধ নহে, কবিত্ব কেবল মাত্র মসীলেখনীরই আয়ত্ত নহে!

আমরা যে গানের কথা বলিতে যাইতেছি, সে গানের ভাষা উন্মুক্তগাত্র সরলহৃদয় কৃষক-কবিরই উপযুক্ত। কবির যেমন অনাড়ম্বর মূর্ত্তি, তাহার ভাষাও তেমনি নিরাভরণা, তাহার সুরও তেমনি বাধাহীন। এ গানের ভাষায় তটিনী তরতর ছুটে নাই, প্রণয়ি-প্রণয়িনী গলিয়া যান নাই, কিংবা গীতের বহ্নিস্ফুলিঙ্গে শত শত কঠোর রাজনীতি ভস্মীভূত হইয়া যায় নাই, কিন্তু নদীবক্ষে, এই ভাষারই—এই সুরেরই দূরাগত মধুর গীতধ্বনিতে ব্যাকুল হইয়া আমি কক্ষীগর্ভ হইতে বাহিরে আসিয়াছিলাম—কেন? তাহা জানি না। গীত বড়ই মধুর লাগিয়াছিল ... সরল প্রাণের সরল ভাষা সমস্ত আবরণ উন্মোচন করিয়া অকপটে তাহার হৃদয়ের অন্তঃস্তলাবা... সমুদায় ভাণ্ডারখানি খুলিয়া—ঢালিয়া দিয়াছিল। মার্জ্জিত ভাষায় এমন সরলতা, এমন অকপটতা বুঝি নাই! তাই আগ্রহাতিশয্যে গান এবং ধূয়াগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। এ সকলে যদিও ভাষা ও ভাবের উন্নত কবিত্ব নাই, কিন্তু স্থানীয় এবং সাময়িক কোন কোন ঘটনার কিছু কিছু ইতিহাস ইহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে, কোনটীতে বা পারমার্থিকের রূঢ় বিজ্ঞান দর্শন অতি মধুর—অতি তরল ও নিতান্ত সরলভাবে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। যখন সুরতানে এই গানগুলি কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন বস্তুতঃই মনে হইয়াছিল, কোন আশীষপ্রাপ্ত অকপট প্রকৃত কবিরচিত মধুময় গান শুনিতেছি। তাঁহার গানে মদিরা ছিল না—ত্রিদিবের অমিয়ভরা আনন্দের মোহ ছিল। যেন, পুঁথি পুস্তকের গণ্ডী, গৃহ অট্টালিকার সীমা লঙ্ঘন করিয়া, সভ্যতাভিমানের সঙ্কুচিত রুচি পদতলে দলন করিয়া, মুক্ত গগনতলে, উদার প্রান্তরে—শ্যাম বিটপীর পত্র দোলাইয়া, শ্যামল শষ্পের শীর্ষ নাচাইয়া, এ গান বঙ্গপল্লীর শ্যামসৌন্দর্য্য পরিপূর্ণভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছে! সে বঙ্গীয় কৃষাণকবির গ্রাম্যগীতি অন্তরের অস্থির অভ্যন্তর হইতে কত ভাবের কত কথা কত সুরেই প্রকৃতির অনন্ত প্রসরতার মধ্যে সুধার ধারে উৎসারিত করিয়া দিতেছিল! তাহা বর্ণনাতীত।

প্রকৃতিকুমার এই কবির এরূপ আভরণ-ভারহীন প্রকৃত সুন্দর গান যদি বঙ্গীয় সাহিত্য-ভাণ্ডারের পবিত্র মুক্ত কক্ষে স্থান না পাইল, তবে বাঙ্গালার প্রকৃত অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতে আর কি রহিল! প্রাচীন পদাবলী, কবির গান, প্রাচীন পুঁথি এসব মণিমাণিক্যের নিকটে এ কাঞ্চন না থাকিলে বঙ্গভাণ্ডারের শোভাপূর্ণ আদৌ হয় না? সে পুষ্পস্তবকের তলে নবোদগত হরিৎপল্লবদলের ন্যায় এ গ্রাম্যগীতি প্রকৃতই পরম-শোভন। শৃঙ্খলাহীন বিলাসলেশশূন্য-ভাব, দীনহীন ও আড়ম্বরশূন্য হইলেও প্রকৃতির প্রকৃত সৌন্দর্য্য—গ্রামে। সেই সৌন্দর্য্যপ্রসূত গ্রাম্যকবির গ্রাম্যভাষার গীতিই কি বঙ্গের প্রকৃত কবিত্বের সৌন্দর্য্য নহে?

বঙ্গপল্লীর প্রকৃত সৌন্দর্য্য দেখিতে হইবে, আর প্রকৃতিকুমার কবিকেও চিনিতে হইবে। তখন আমরা বুঝিব, গ্রাম্য জীবনের এই সব কৃষাণকবি ভগবানের কি সুন্দর সৃষ্টি! কত সংযম, কত সহিষ্ণুতা, কত ত্যাগ, কত প্রেম, কতখানি হৃদয় লইয়া ইহারা সংসারের সহিত যুঝিয়া, পীড়নে, দুর্ভিক্ষে, ঋতুবিপর্য্যয়-তাড়নে, তবু কত শান্তভাবে জীবন যাপন করে। কেবল উপরে চাহিয়াই তাহারা আবার আনন্দের ঢেউয়ের ভিতরও আপনাকে পরিপূর্ণভাবে ঢালিয়া দেয়। এই

সব বুঝিতে হইলে,—এই চিত্র দেখিতে হইলে গান বুঝিতে হয় ; গানের মহিমায় এই চিত্র ফুটিয়া উঠিবে ; কিন্তু এ চিত্রের বর্ণ সুর নহে, বাক্য।—সুর এখানে তুলিকার কার্য্য করিতেছে।

নৈশ নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া যখন গানের একটী সুর তন্দ্রালসিত কর্ণকুহরে বিদ্যুৎতীব্রমধু ঢালিয়া দেয়, তখন কে না চকিত হইয়া সেই সুরগুলির ভিতর হইতে গানের শব্দসম্ভারকে ধরিবার জন্য ব্যাকুল হয়? যখন বিদেশীয় কণ্ঠে পাষাণবিগলন সুরে কোন দুঃখগীতির হৃদয়ভরা আকুল আর্ত্তনাদ ও সহানুভূতি আপনি জাগিয়া ওঠে, তখন কাহার মন না চায় যে, ঐ গানের দুইটী শব্দও যদি বুঝিতাম! তাই গানের সুর সর্ব্বস্ব হইলেও, বাক্য মূল্যহীন নহে। একই সুরে ভক্তসাধকের সাধনসঙ্গীত, আবার প্রণয়ীর প্রণয়গীতি অথবা শোকার্ত্তের শোকগান শুনিয়া হৃদয় বিভিন্ন ভাবে উদ্বেলিত হয়। ইহা বাক্যের কার্য্য। বাক্যের আরও এক ক্ষমতা আছে,—সুরে অবস্থার ছবি ফুটে, হৃদয়ের ছবি ফুটে, কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবটী লইয়া কবির প্রকৃত চিত্র ফুটায় একমাত্র বাক্য।

"আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি, তুমি অবসর মত বাসিও"—

এই গীতাংশটী মার্জ্জিতরুচি শিক্ষিত কবিকে সম্মুখে আনিয়া বসাইয়া দেয় বটে, কিন্তু—

"বাঁশের দোলাতে চড়ে কেহে বটে যাচ্ছ চলে শ্মশানঘাটে"—

গানে সেস্থলে একটী উদারহৃদয় পারলৌকিকের পারমার্থিক ধ্যানে মগ্ন উদাস বাউল কবির ছবি আঁকিয়া ফেলে। পুনশ্চ—

"বলে কুটিলে, ওগো বড় বউ,
আজি কি জন্যে মানিনী হয়েছ?"

গানটী একটী প্রাচীন পদকর্ত্তার স্মৃতিজাগরূক করিয়া দেয়। ঠিক সেই স্থলেই আবার—

"ও কুটিলে তোর বুদ্ধি নাড়ীপেছা,
তোর বুদ্ধিতে তুই দে ঢিপি,
নইলে ছিঁড়্‌বো পেটের জিলিপি,
(ও যেমন নরসিংহে),—
হেঁচ্‌ড়াটানে ছেচ্‌রে আন্‌বো,
ধরে' তোর চুলের গোছা।"

গানটী মুহূর্ত্ত মধ্যে পাল্লাদার ছড়াকার আস্ফালনকারী একজন কবির সরকারকে খাড়া করিয়া দেয়। আমরা আলোচ্য-গানে কবির সমাজ, প্রকৃতি এবং স্বয়ং কবি এ সমস্তই বুঝিতে চেষ্টা করিব। এই জন্যই, যেমন সুরে, তেমনই বাক্যেও সম্পূর্ণ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

১। বাঁশের ছোবে বক পৈরাছে ডাইক (১) ডাহে (২) বিলে।
নয়ান (৩) বন্দু হিনান (৪) করে গো, হারি (৫) থুইয়া টীলে (৬)॥

১। ডাবক। ২। ডাকে। ৩। নতুন। ৪। স্নান। ৫। সাড়ী। ৬। টীলা, উচ্চস্থান।

বন্দুর বারীত (৭) যাবার চাইছিলাম (ও হায়—) পৈষমাহাও (৮) যায়।
কেমন কৈরা হুজাইরে (৯) বন্দু হীতুরী (১০) নাই মার গায় ॥
ইব্যান্ (১১) দুক্ষু রাখমু কনে (১২) (ও হায় রে—) ওরে আমার বন্দু আইল (১৩) কৈ।
মার পুত্তিতে হাইরে (১৪) চীনা, খরায় (১৫) ছুট্‌কী (১৬) চৈ ॥ (রে চৈ) ॥
ওরে আমার বন্দুরে, আর দুক্ষু না সয়,—দিলে ।॥
ওরে ও বগিলা (১৭) তুই পাহা (১৮) দিয়া ডাক (১৯)।
ই বছরডা গেলে হুজ্‌মু (২০) দিয়া নাইলা হাগ (২১) ॥ (রে হাগ) ॥
ওরে আমার বন্দুরে, আর দুক্ষু না সয়,—দিলে ।॥

কি করুণ! পরিচয়হীন দরিদ্র কৃষককবির মন, বাঁশের ঝাড়ে বলাকার ঝাঁক আর বিলের জলে ডাহুক দর্শনে প্রেয়সীর কথা মনে পড়িয়া আকুল হইয়া উঠিয়াছে। এই ডাহুকেরই মত নবপ্রেয়সী তাহার নিত্য এই বিলে স্নান করিত, বাঁশের ঝাঁড়ের নিকটে ওই টীলাটীতেই প্রেয়সী তাহার সাড়ীখানি রক্ষা করিত,—ঐ বলাকাগুলির মত তাহার সাড়ীখানি বাতাসে ফুলিয়া ফুলিয়া দুলিত। আজ প্রেয়সী তাহার পিত্রালয়ে, কতদিন গিয়াছে, নূতন প্রণয়ী আর তাহাকে গৃহে আনিতে পারে নাই, বিরহের ব্যাকুলতা, স্মৃতির আঘাত তাহাকে কতই না অভিভূত করিতেছে। যাই যাই করিয়াও প্রেয়সীকে আনিতে যাওয়া হয় নাই। কেমন করিয়া যাইবে? দেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ, ক্ষেতে এবার শস্যমাত্র হয় নাই, তাহাতে জননীর গায়ে এই দারুণ শীতেও শীতবস্ত্র দিতে পারে নাই। কবি কি ব্যাকুলতায়—কি পরিমাণ ক্ষমাপ্রার্থনার ভাব অন্তরে লইয়া প্রেয়সীর উদ্দেশে বলিতেছে,—বঁধু, কেমন করিয়া বুঝাইব যে, মার গায়ে "শীতুরী"টুকুও দিতে পারি নাই, মাকে কষ্টে ফেলিয়া তাই এই পৌষমাস যায়, তবু তোমাকে আনিতে যাইতে পারিলাম না। কবির দুঃখ রাখিবার স্থান নাই। শীত-দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দরিদ্র কবিকৃষকগৃহে অন্ন নাই, চীনার ভাত, আর রৌদ্রদগ্ধ চৈয়ের ব্যঞ্জনমাত্র উদরে দিয়া জননী-পুত্রে বাঁচিয়া আছে।—প্রেয়সী যে কি ভাবে আছে, তাহার সংবাদটীও লওয়া হয় নাই,—কবির হৃদয় আর কত সহিবে? কবি তাই যাহাকে সম্মুখে দেখিতেছে, তাহারই কাছে দয়া ভিক্ষা করিয়া বলিতেছে।—তাহার প্রেয়সী থাকিলে আজ নিজের সাড়ী দিয়া মায়ের শীত নিবারণ করিত, তাই সেই সাড়ী খানির মত বেণুশিরের বলাকার কাছে কবি প্রার্থনা করিতেছে—মায়ের শীতবস্ত্র নাই, তুই তোর পাখায় ঢাকিয়া মাকে রক্ষা কর,—তুই প্রেয়সীর সাড়ীরই মত সুন্দর, তুই অবশ্যই আমার কথা রাখিবি,—আগামী বৎসরেই আমি তোর ঋণ শোধিব,—দীনের যাহা আছে,—যে পাট একমাত্র সম্বল, তাহার কচিপাতায় ঋণের পরিশোধ হইবে, তবু তুই মাকে রক্ষা কর,—আমার প্রাণে আর যে কষ্ট সহে না।

৭। বাড়ীতে। ৮। পৌষমাস। ৯। বুঝাইরে। ১০। শীতবস্ত্র। ১১। এবা। ১২। কোথায়। ১৩। রহিল। ১৪। খাইরে। ১৫। রৌদ্রে। ১৬। শুষ্ক। ১৭। বক। ১৮। পাখা। ১৯। ঢাকা। ২০। শোধিব। ২১। শাক।

একাধারে জননীর প্রতি,—প্রিয়ার প্রতি,—মাতৃভূমির প্রতি কবির কি অতুল প্রেমের চিত্র। জননীর দুঃখ দূর করিতে না পারিয়া, ও দিকে প্রেয়সীকে আনিতে না পারিয়া কবির হৃদয়ে কি দারুণ কষ্ট—সে কতই অপরাধী। সে আজ বকের অপেক্ষাও দীন, তাহারও করুণা-প্রার্থী, কিন্তু দুর্ভিক্ষপীড়িত হইয়াও কবির মনে ভরসা প্রচুর, যে আগামী বৎসর প্রকৃতি জননী তাহাকে কষ্ট দিবেন না, তাহার ক্ষেত্রে পাটের কচিকচি পাতা বাতাসে নাচিয়া উঠিবে। তাই সে আত্মনির্ভর কৃষক এত দুঃখ কষ্টেও মরিতে চাহে নাই,—বাঁচিতেই চাহিয়াছে। ভগবানের দয়ার উপরেও তার কত বিশ্বাস! উদার সরল প্রাণ গ্রাম্যকৃষককবি নিজের পরিচয় দেন নাই, কিন্তু তাহার গানে তাহার গ্রাম ও তাহার সাময়িক অবস্থাসহ একটী সম্পূর্ণ পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়া পাঠকের হৃদয়ে এ গান তাহার জন্য কতদূর সহানুভূতি জাগাইয়া দিতেছে।

২। না (১) তো ডুইব্‌ল রে, কেত (২) কাল রাইখ্‌ব্যান গুরু এ বারৎত (৩)।
ওরে, কাউয়া কাণ্ডারী অইল (৪) রে, শগুণ (৫) অইল রে বাণ্ডারী (৬);
ওরে বনের শিগালে বলে রে (৭) এই নায়ের অদিহারী (৮)
থাকীর (৯) বানাইছে রে নৌহা, থাকীর দিছের ছাউনী,
ওরে, মোন পবনে (১০) চলেরে নৌহা, বাইচ দিতে মানা ॥

এ কবিও পরিচয়হীন। কিন্তু কবির ভাষায় তাঁহাকে হিন্দু এবং বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের বলিয়া বোধ হয়। এ কবি হয়তো কৃষক না হইতেও পারেন, কিন্তু গ্রাম্যগৃহস্থ বটেন। আজ তাঁহার হৃদয়ে পরলোকের আহ্বান জাগিয়া উঠিয়াছে, তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, জীবনতরী ডুবুডুবু, যাইতে হইবে। তখন এ কষ্ট বহিয়া আর কতকাল সংসারে থাকি? কেন থাকি? আজ মনে পড়িয়াছে 'শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর'—এই জীবনতরণীর কাণ্ডারী হইবে কাক, ভাণ্ডারী হইবে শকুনী, আর বনের শৃগাল আসিয়া এই দেহ অধিকার করিবে। কি পরিণাম! এ দেহ মাটির।—এ দেহতরী মাটির তৈয়ারী,—ইহার ছাউনীও মাটির, এ নৌকা মনরূপ পবন কর্তৃক চালিত হয়; আপনি জোর করিয়া চালাইতে গেলে বিপদ ঘটে।

ঠিক এই ভাবের আর এক কবির আর একটী গীত এই,—

৩। পুঙ্গীর পুয়া (১) কুবাই (২) রইচুইন (৩) বইয়া (৪)।
দিন তো গ্যাল্ (৫) নিত্তাই-উত্তাই (৬) জব্বাতরী (৭) বাইয়া।
পাইয়া হুক্যের (৮) মাচাইঙ্গ (৯) হোতাই (১০) রইচুইন্ চিতাইঙ্গ (১১)
বঙ্গ (১২) পাইবা অবির পুয়ার (১৩) আতে (১৪) ॥

১। নৌকা। ২। কত। ৩। ভারতে। ৪। হইল। ৫। শকুনী। ৬। ভাণ্ডারী। ৭। নাকি। ৮। অধিকারী। ৯। মাটির। ১০। মন-পবন।

১। ফুঙ্গীপুত্র-পুঙ্গীরপুৎ=গালিবিশেষ। ২। কি ভাবে। ৩। রহিয়াছেন। ৪। বসিয়া। ৫। গেল। ৬। নিত্য-প্রত্যহ। ৭। জব্বারূপ-তরী, চরণদ্বয়। ৮। সুখের। ৯। মঞ্চ, পালঙ্ক। ১০। শায়িত। ১১। চিৎপাত। ১২। ভঙ্গ। ১৩। রবিপুত্র, যম। ১৪। হাতে।

হাদুহঙ্গ (১৫) কৈল্লাইন্না, গুরুাইর নাম আর নৈলাইলন্ না,
হারাদিন গ্যাল্ দু (১৬) নৌহা বাইয়া ॥

অতি সরল মুক্তহৃদয় কবি অচেতন ও সুপ্তপ্রায় অজ্ঞানহৃদয়কে পরলোকের জন্য জাগ্রত হইবার নিমিত্ত দারুণ ভর্ৎসনায় চকিত করিয়া তুলিয়াছেন। দেহতত্ত্বের বিজ্ঞান সে ভাষার মধ্যে জলের মত তরল হইয়া গিয়াছে, তীব্র ভর্ৎসনা বাক্যের মধ্যে কবির মহান্ উদ্বোধনভাব কি সুন্দর ভাবে প্রকটিত হইয়াছে। পূর্ব্বের কবি যেন শান্তশিষ্ট ভাবে, উদাস অন্তরে মনকে বুঝাইয়া তুলিতেছেন; ইনি একটী দারুণ চপেটাঘাতে সুপ্ত প্রাণকে উঠাইয়াছেন, তাহার পরই ব্যঙ্গের সুরে ভর্ৎসনা। পূর্ব্বের কবির মন যেন ঠিক বশে নহে, ইহার মন ইঁহার বড় বশ,—বড় আপনার। তাই মনের উপর এত আধিপত্য। মনকে চকিতে জাগাইয়া তুলিয়াই তিনি বলিতেছেন,—আরে মূর্খ পাষণ্ড মন,—কি ভাবে ব'সে আছিস্ রে! চরণতরী বেয়ে বেয়ে দিন যে গেল! সুখের মঞ্চ পাইয়া একেবারে গা ঢালিয়া চিৎপাৎ শুইয়ে রয়েছেন—কি সুখ গো! যখন যম আসিয়া ধরিবে, তখন বুঝ্‌বে মজাটা!—তাহার হাতে এসুখের স্তম্ভ ভাঙ্‌বে বাপ্! আরে কল্লি কি?—সাধুসঙ্গ কল্লি না, গুরুর নাম নিলি না, সারা দিন না দেখি চরণতরী বেয়েই গেল!—হা পাষণ্ড!" এইখানে আমরা কবিকে চিনিলাম।

আবার আর এক কবি গাইতেছেন—

৪। তুই যাইস্ না রে মনপাহী (১) তুই ফিরা আয়।
ওরে, হামহুক (২) নামে পাহী আমার আয় রে ইদির পিঞ্জিরায় (৩) ॥
আমার হিদ্‌পিঞ্জিরায় বৈস্যা পাহী কিষ্ট নাম হুনাইয়া কর সুখী,
প্রেমে অঙ্গ জরজর, হীতল কর মহুরায় (৪)
গোসাই কইছেন দর্‌রে (৫) জালে পালা পাহী উইর‍্যা গেলে,
বনের পাহী বনে গেলে আরনি (৬) তারে দরা যায় ॥

এ রচনায় যেন উৎকর্ষের ভাব বুঝা যায়। বৈষ্ণব কবিগণের গানগুলির সঙ্গে এ গানের নিঃসন্দেহে তুলনা চলিতে পারে। উদ্‌ভ্রান্ত মনকে ঈশ্বরারাধনায় নিয়োজিত করিতে গ্রাম্য কবি তত্ত্বকথায়—আপন ভাষায় আহ্লাদ করিতেছে। গুরুর আজ্ঞা, একাগ্রতা জাল দিয়া মন পাখীকে বাঁধিতে হইবে, কবি তাহাও ভুলেন নাই।

আবার এদিকে এক তরুণ প্রেমিক কবির কণ্ঠ পল্লীবাসিনী জল-কলসবাহিনী নূপুরচরণা তরুণী দর্শনে কেমন আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়াছে, দেখুন :—

৫। ওরে ওরে অসমতি (১) হুন হুন ও! বরা যৈবনে নি নিছুপ (২) থাহন যায়।
উণুর ঝুমুর (৩) কইরা নিছে পরাণ তোমার পায় ॥ (ও কইলজা রে!)

১৫। সাধুসঙ্গ। ১৬। দেখি, আরে দেখি।

১। মন-পাখী। ২। শ্যাম-শুক। ৩। হৃদয়-পিঞ্জরে। ৪। মধুশব্দে। ৫। ধর্‌রে। ৬। কি।

১। রসবতি। ২। নিশ্চেষ্ট। ৩। রুণুঝুণু।

বরা বাদ্দরে স্থাহ গাঙ্গৎ ডাহে বান,
হোলা (৪) ছুক্যায় (৫) কান্দারপাড়ো (৬) বুন্ছি আনুন দান।
আলের (৭) মুঠ্‌ঠি করছি হৈলা (৮) (ওরে হায়)—
আমার, দহীনদারী গর বৈরাছি (৯) বল্‌দের পাহায় (১০) ॥ (ও কইলজা রে !)
আলান্ পালান্ উজার অইল গো—কে হেচিবে পানি ;
আমার, কাইন্দা কাইন্দা নানীর ওগো চহৎ (১১) পর্‌ছে ছানি ॥
(ও কইলজা রে।)

এ নবীন কৃষককবির পূর্ব্বরাগ-গীতি। নবপ্রেমিক বিহঙ্গের প্রথম মধুকাকলি! রসবতী তরুণীর নূপুরের রুণুঝুণু তাহার প্রাণমন কাড়িয়া নিয়াছে, এ ভরা যৌবন আসিয়াছে, আর কি শূন্য গৃহ শোভন হয়? তাহে ভরা ভাদ্রে গাঙ্গে বন্যা ডাকিয়াছে,—হৃদয় ভরিয়াও প্রেমের বাণ উছলিয়া উঠিয়াছে। তরুণি! আর নবীন কৃষকের গৃহ শূন্য রাখিও না! তুমি মনে করিতে পার, তাহার গৃহে তোমার জীবনযাত্রায় অসুবিধা হইবে; কি ভুল! তরুণি! তুমি জান কি, যে, নব প্রেমিক এ বৎসর পাট ধুইয়া উঠিয়াছে, [illegible] তাহার শোলাকাটিগুলি নদীর কিনারায় শুকাইতেছে, তাহাদ্বারা তোমার রন্ধন কার্য্যে [illegible]হায্যই হইবে। সে পাট পাইয়াছে, কাজেই এ বছর কিছু টাকাও পাইয়াছে। ইহা[illegible] পাই[illegible]সে আমনও বুনিয়াছে। তাহার বুনিয়াদি হাল, সেগুলিরও জীর্ণসংস্কার করিয়াছে। [illegible] কি শুধুই তোমার মত সুন্দরীর কাছে বিবাহের প্রস্তাব করিত? হে কবির প্রাণস[illegible]র কি চাও?—এখনও তোমার মন ওঠে নাই?—ওহো, তুমি জান না যে নব [illegible]টীর দক্ষিণদ্বারী ঘরের চালখানি বলদের বন্ধন দড়ায় ভরিয়া গিয়াছে; [illegible]র সুপ্রচুর। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? শুধু অচলা লক্ষ্মীই আছে, একটী জঙ্গমা [illegible]লক্ষ্মী ভিন্ন তাহার বাটীর আলানপালান শুকাইয়া গেল—ঠিক তাহার হৃদয়খানিরই মত,—কে জলসেচন করিবে? তরুণি! এ সকল ঐশ্বর্য্যই তোমার হইবে, তোমার ঐ কলসীবহন করাও সার্থক হইবে। জান না, তরুণি! তাহার বৃদ্ধা দিদিমাটীও একটী গৃহলক্ষ্মীর অভাবে দিবারাত্রি কাঁদিয়া কাটায়, সে নাতিবৌ দেখিয়া গেল না। কিন্তু হায়! তুমি কি ঘরে বুড়া দিদিমা থাকার কথায় ভয় পাইয়াছ? তরুণি! ভয় নাই, সে বুড়ীর চ'কে ছানি পড়িয়াছে, কিছু দেখিতে পায় না,—তুমি তাহাকে যেমন চালাইবে, বুড়ী তেমনই চলিবে। হে কবির প্রাণপ্রিয়! আর নির্দ্দয় হইও না গ্রাম্য কৃষকের নব-যৌবনদীপ্ত তরুণ প্রাণের কি সুন্দর প্রণয়াভিব্যক্তির সুটস্ত ছবি! শুধু তাই নহে; কৃষক সমা-জের,—কৃষক-গৃহের এবং কৃষক-সংসারেরও এ গান একটী উজ্জ্বল চিত্র বর্ণনাগীতি।

৪। পাটশামলি, শোলাকাটি। ৫। শুকায়। ৬। নদীর তীরে। ৭। হালের মুঠি। ৮। সমান, জীর্ণ সংস্কার। ৯। ভরিয়াছি। ১০। বন্ধন করিবার দড়া বিং। ১১। চক্ষে।

৬। ওরে হুং! ওরে হুৎ! ওরে হুং! হুৎ! হুং!
বাইরা বলদের ত্যাজ্ দরিয়া ত্যাশো আইছাল্ বুং! (১)
কাট্ছাল্ জালুন (২) কাট্ছাল্ আমুন সব্ব দেওয়ানা।—
ও হায়, উচ্চুৎ কইবা (৩) গরের মাণিক কর্‌ছ্যাল রে কানা।
ছিন্নিবিন্নি হ্যাতল (৪) গ্যাছাল্ রে—ইকি আচায্যি!—
ওরে হুৎ! হুৎ! হুং!
ও হায় নান্‌কুরিয়া বান্‌কুরিয়া ঠাইস্যা মার ছেনী (৫)
ই হাল (৬) দিমু বাইর করিয়া পেথুনীর (৭) এনী পেনী (৮)।
আরে হুং! হুৎ! হুৎ!

এটী ক্ষেত্রে নিড়ান দিবার সময়ের গান। একদল কৃষাণ যখন ক্ষেত্র নিড়াইতে থাকে, তখন দলপতিরূপে একজন রচক এই প্রকারের গান রচনা [illegible]রিয়া গাইয়া যায়; অপর সকলে ঐ গানের চরণ ফেরতা ধরিয়া গায়। এ বৎসরে নিড়ানে[illegible] খুব 'যুং' ধরিয়াছে, তাই রচক দলপতি কবি সাহসে আস্পর্দ্ধা করিতেছেন,—

হে ভাই সব, খুব দ্রুত নিড়েন চালা[illegible] এইখানে [illegible]ভয়। গত বৎসর দুঃখে গেছে বটে,—বলদগরু সমস্ত পীড়াক্রান্ত হইয়াছিল,—[illegible]ন— [illegible]গকে আশ্রয় করিয়াই দেশে দুর্ভিক্ষ, মড়ক এবং পঙ্গপাল একযোগে উন্মত্ত প্রেতের[illegible]হী (১) তুই[illegible] পড়িয়াছিল। ঘরে ঘরে রোগ ব্যাধিতে কত সংসার নষ্ট হইয়াছিল, ভগবানের মু[illegible]হী আমা[illegible]ফল হইয়াছিল—সে বড়ই আশ্চর্য্য কথা বটে। কিন্তু এবার বড় সুখের বৎসর, লাবণ্[illegible] দিয়া—দেখ, কচি কচি শস্যের অঙ্কুর গজাইয়া উঠিয়াছে, আর গৌণ করিও না, আর শৈথিল্য[illegible] অলস, কুড়ে. স[illegible] আনন্দের সঙ্গে প্রাণের শক্তিতে নিড়েন চালাও। [illegible]হী উইরা ভগবান্ মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন, এবার প্রেত দানার জারিজুরি ভাঙ্গিয়া দিব।

প্রকৃতিকুমারের দুর্দ্দম হৃদয়ের অপার উল্লাসের কি হর্ষচিত্র!—কি সরল— কি আবেগময়!

আর একটী গান শুনুন,—

৭। আল্লা গো!—
তোমার বিছ্‌নার হান্‌কি পাইত্যা নিমক ছালুন (১) খাইতাছি।
তোমার বুহের অক্ত (২) দিয়া বাইচবার করছ ফিহিরী (৩)॥
(ওগো মেহেরবান! ওগো মেহেরবান, মেহেরবান,)
কোন্ হানে বস্‌তি তোমার, যাইবার লাইগ্যা মন উচ্ছান (৪)॥

১। ভূত। ২। জালা, ধান্যাঙ্কুর। ৩। হঠাৎ। ৪। বিফল। ৫। নিড়েন। ৬। এ বৎসর। ৭। পেত্নীর। ৮। নাড়ীভুঁড়ি।

১। ব্যঞ্জন বিশেষ। ২। রক্ত। ৩। ফিকির। ৪। উজান? অথবা উচাটন?

যি (৫) মাট্টিতে বিন্নার ছোবা যি মাট্টিতে বাঁশ বরই (৬)
ওরে, হি মাট্টি চিরিয়া দিছ আম কাঁঠাল নাই ধান কলই ॥ (ওগো মেহেরবান্)
ওরে হায় !—
হেই মাট্টিতে পাঞ্জর চুনা, তেওতো (৭) দোয়া ভজে না।
কোন হানো (৮) থাইকিয়া আল্লা কইরতাছ এই কারহানা ॥

কি অপূর্ব্ব তত্ত্ব জিজ্ঞাসা—কি অপূর্ব্ব সরল কৃতজ্ঞতা! কত উচ্চশিক্ষিত কবির ভাষায় এমন গান শুনিয়াছি, কিন্তু, এমন ব্যাকুলতা, এমন স্পষ্টভাব কোথাও যেন পাই নাই!

"আছ জলদের গায়, বিটপী লতায়,
শশী তারকায় তপনে"

এ সকল কবিতায় কবি সেই মহাসৃষ্টিকর্ত্তার বসতি আবিষ্কার করিয়াছেন, কি, তাহা দেখিতেছেন—কিন্তু গ্রাম্যকবির সরল জিজ্ঞাসায় যে আকুলতা আছে, এ প্রত্যক্ষতায়ও যেন তত নির্ভরতা নাই। সে কৃষক কবির সাধনা যেন পূর্ণনির্ভর বিশ্বাসের অত্যুচ্চ শিখরে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে,—সেখানে কৃতজ্ঞতার মধ্যে অহংভাবের লেশমাত্র নাই,—স্বতন্ত্রতার রেখামাত্রও নাই, অথচ কবি এখনও তাঁহার সন্ধান পান নাই। সন্ধান পাইলে বোধ হয় এ ব্যাকুলতা এত কৃতজ্ঞতাভরা অসীম আকাঙ্ক্ষা থাকিত না। এই পৃথ্বীবক্ষ তোমারি চিরবিস্তৃত—আমাদেরই জন্য বিছানা; এই আস্তরণের উপরে বসিয়া তোমার দেওয়া অন্নব্যঞ্জন—(সেও আবার লবণযুক্ত!)—পাত্রে করিয়া ভোজন করিতেছি।—কিছুরই অভাব নাই, আপন বক্ষরক্তরূপ জলে আমাদের জীবনরক্ষার উপায় করিয়া দিয়াছ।—কি তোমার অতুল করুণা! কি তোমার বলিহারি কৌশল! দয়াল! কি কথায় তোমার দয়ার বর্ণনা করিব? দয়াল! কোথায় কোন্ অপূর্ব্ব স্থানে তোমার বসতি, যদি একটু জানিতাম, তবে গিয়া তোমায় দেখিয়া কৃতার্থ হইতাম।—তোমায় দেখিবার জন্য মন উচাটিত,—প্রাণের সমস্ত আবেগ তোমারি জন্য উজান বহিতেছে। হে দয়াল! কি তোমার আশ্চর্য্য লীলা,—তুমি যে মাটীতে তৃণ গুল্ম, অন্তঃসারহীন বেণু এবং টকস্বাদ বদরী জন্মাইতেছ, সেই মাটি চিরিয়াই আবার অনুপম ফল সমুদয় আম কাঁঠাল তরিতরকারি এবং সর্ব্বোপরি সেই তৃণবৎ উদ্ভিদ হইতেই জীবন ধারণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদান ধান্য ও কলাই দিতেছ। হে প্রভু! কি তোমার অপূর্ব্ব ব্যবস্থা,—সেই মাটিতেই এ দেহকে কবর লইতে হইবে। কিন্তু, দয়াল ঈশ্বর! এ অস্থিপঞ্জর চূর্ণ হইয়া গেলেও তো তোমার দয়ার কণিকামাত্রেরও শোধ যাইবে না। আহা—হা। এমন দয়াল তুমি, এমন মহান্ তুমি,—তুমি কোথায় থাকিয়া প্রভু এ সব লীলা খেলিতেছ?

৫। যে। ৬। বদরি। ৭। তবুতো। ৮। কোথায়।

এ সব ভাব নিরক্ষর কৃষক কবির গ্রাম্য গৃহস্থের হৃদয় হইতে উত্থিত হইয়াছিল,—কয়জন অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষিত ব্যক্তির অন্তর হইতে এমন সব ভাব বাহির হইয়া থাকে? কিন্তু হায়! এই সব কবি সেই সুদূর পল্লী-বুকেই মিশিয়া যায়, তাহাদের পঞ্জর চূর্ণ হইয়া যায়, কেহ তাহাদের নাম পর্য্যন্তও জানে না।

আমরাও এ সব কবির নাম জানিতে পারি নাই। গানগুলিতে নাম প্রায়ই নাই, লোকের মুখে মুখে গীত হইয়া গানগুলি সজীব ভাবে কবিকে রাখিয়াছে মাত্র। নিরক্ষর কবি অক্ষর মাত্র নাম রাখে নাই। কিন্তু 'ধূয়া' গুলিতে প্রতি 'ধূয়া'তেই রচক কবির নাম, এমন কি কোথাও কোথাও ধামের উল্লেখ পর্য্যন্তও আছে। তাহার কারণও আছে।—

এই ধূয়া-রচয়িতা কবি নিরক্ষর (হয় তো কেহ কেহ স্বল্পাক্ষরজ্ঞও থাকিতে পারে) গ্রাম্য লোক। কেহ কৃষক, কেহ গৃহস্থ। কিন্তু তাহা হইলেও, সামান্য কৃষক বা গৃহস্থদের অপেক্ষা ইহার মূল্য কিছু বেশী। সুদুর্লভ কবিত্ব শক্তিতে শক্তিমান্ এই গ্রাম্য কবিগণের সম্মান কৃষককুলে অতি উচ্চ। স্থানীয় কোন ঘটনা যেই ঘটিয়া গেল, অমনি সাধারণে নিশ্চয় জানে, পরদিনেই ধূয়াকার কবির ধূয়া ঘটনাটীকে আবার ধূমায়িত করিয়া তুলিবে। এক এক বিষয়ের ধূয়ারচনা করিতে আবার এক এক কবি বা ধূয়াকার অধিক পারদর্শিতা দেখাইয়া থাকেন।

গ্রাম্য কবিগণের এই ধূয়ার ক্ষমতা অসীম। বর্ষার প্লাবনপ্রারম্ভে কি প্লাবনাকুল শ্রাবণ ভাদ্রে, যখন কোষ্টার ক্ষেত কাটা হয়, যখন সেই কোষ্টার 'জাগ' পচিলে কৃষকেরা তাহা ধুইয়া পাট বাহির করে, তখন এই সকল ধূয়া-গান গাইয়া তাহারা সেই দুঃসহ কষ্ট তুচ্ছ মনে করে; কড়া 'তামুকে' টান দিয়া আগুণের বুঁদা কি আলিসা কদলীবৃক্ষের ভেলায় তুলিয়া ক্ষেতে নামে। নগ্নপ্রায় অর্দ্ধনীরনিমগ্ন সেই শত শত বালক, বৃদ্ধ, যুবা-কৃষকের হাতের 'হাতা' যখন 'শোলা' হইতে পাট ছাড়াইবার জন্য সটাসট্—চটাপট শব্দে সমান ভাবে উঠিতে পড়িতে থাকে, তখন সেই অপূর্ব্ব বাদ্যের তালে তালে মুক্তস্বরে কৃষকেরা এই ধূয়াগীতি গায়। দূরে বা নিকটে ইতর ও ভদ্র পথিক বা নৌকাযাত্রী সেই গানে—সেই সুরে কি এক অপূর্ব্ব ভাবের আনন্দে মুগ্ধ হইয়া যায়! আবার যখন জ্যোৎস্নাভাসিত নিশায় পার্শ্ববাহী তরী আরোহীর উৎকর্ণ কর্ণ-কুহরে এই সুর বাজে, তখন চিত্তে যে কি অব্যক্ত মোহ জন্মে, তাহা বর্ণনায় বলা যায় না। এইরূপে বালককণ্ঠ, যুবাকণ্ঠ ও বৃদ্ধকণ্ঠে এই সকল ধূয়াগীত সারা বর্ষাকাল ধরিয়া তাহারা কখনও একক, কখনও বা একত্র সমবেত হইয়া গান করিয়া থাকে। তখনকার সেই গীতমাধুর্য্যে—সেই কৃষককুলের শ্রমক্লান্তিহারক উল্লাসবিলাসিত মধুরধ্বনিতে বর্ষার কাণায় কাণায় ভরা তটিনীতীর, খালানালার উপকণ্ঠ সকল হর্ষমুখরিত হইয়া উঠে। প্লাবনোচ্ছ্বাসিত তীরে-নীরে সে ধ্বনি কতই মধুর শুনায়, কত—কত দূরে তাহার সুরের ক্ষীণধ্বনি (রেশ) ভাসিয়া ভাসিয়া ছুটিয়া চলে।

১। বাচ্‌তালুকের ধুয়া।

মেছেরালীর দুক্কের কতা (১)
মোনেতে পাইল্যাম বেতা (২) আ-আ-আ—
ত্যারশও আষ্ট সোনেতে—এয়-এহে-এ—
রাগুণমাসো অইল কাইজ্যা (৩)
এ, নক্কীপুরের বাকেতে (৪), হারে বাকেতে ॥
বাচ্‌তালুকের (৫) পরজা আইল গো—ও—ও—
দান্ (৬) কাইট্‌লো মেছের হরকারের ॥
বাবুরাহালি (৭) কয় ওঁনজীর বাই (৮)
আমার তো বিদ্দাবুদ্দি নাই—
বারীত চাচামিয়া নাই—আঁয়-আঁহা-আঁই—।
বাচ্‌তালুকে দান্ কাইট্যা নেয়,
এহন দেইখ্যা পেরাণ আর বাচে না—আরে বাচে না ॥
নোকজনের যোগার হর গো (৯) ও-ও—
দান য্যান্ (১০) নিবার পারে না।
নৈমুদ্দী গোরায় (১১) চৈর‍্যা নোকজনের যোগার করে—এ-এ-এ—
সে দান্ আনে গারিতে (১২) এয়—এহে-এ।—
ওরে, দুইও দারে (১৩) উল্লাউলি, এহন পুলিশে ধইরা নেয় বারীতে ॥
সহর মোল্লার আতে কোদাল গো—
ও, আন হালারে গারি (১৪) ॥
মোকর্দ্দমার নম্বর ভারি,
আসামী দিলাম তারি,
মেছেরালী আছে তদ্দীরী ;
সব নোকে তফন করে, নেহ আল্লা তরায়ে, হারে তরায়ে।
তোমার নামে করমু ছিন্নী গো, ও,—আমার মনে যা দরে (১৫) ॥
মানিকবিবি বৈসা বাবে,
পত্তি তো জেলে যাবে, এ-এ-এ—
আহা রে বাচার সাইদ্দ নাই,—
এহন ছাইলা পাইলা শ্রীকবিলা আরে মৈরা যাবে উতাশে (১৬) আরে উতাশে ॥

১। কথা। ২। ব্যথা। ৩। লড়াই। ৪। বাঁকে। ৫। নাটোরের বাজেতালুক সম্পত্তি। ৬। ধান। ৭। বাবু নামধারী রাখাল,—না বাবুরাখালি শুদ্ধ? ৮। ভাই। ৯। কর গো। ১০। যেন। ১১। ঘোড়ায়। ১২। গাড়ীতে। ১৩। ধারে। ১৪। গোড়ে ফেলি, পুতিয়া ফেলি। ১৫। ধরে। ১৬। হুতাশে।

ফরাজ তালুকদার বৈসা বাবে গো—ও-ও—
আমি থাক্‌মুনা তাশে—
হুন ভাই সর্ব্বজোনা, পুলিশ আর কেউ মাইরোনা,—
দুয়া (১৭) বাধ্‌ছে তারে চিন না—আঁ-আঁ-আঁ।
ছিলিমুদ্দী নামটী দারি, চালাষ গোরাম বস্‌তি—হারে বস্‌তি,
উদীশ কৈল্লে চিন্‌তে পার গো,—হরকের (১৮) উত্ত্‌রের বারী॥

এই ধুয়ার ইতিবৃত্ত একটী জমীর 'কয়চান' বা বিবাদ। বাজে-তালুক রাজসরকার হইতে মেছেরালীর বিবাদী জমীর শস্য কাটা হয়। সেই উপলক্ষে হাঙ্গামা ঘটে। হাঙ্গামায় পুলিশ আসে। পুলিশের লোক মেছেরালীর পক্ষ হইতে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। পুলিশ মেছেরালীকে গ্রেপ্তার করে। মেছেরালির জেল হয়। ইহাই ঘটনা। নৈমুদ্দী, ফরাজ তালুকদার ইহারা মেছেরের স্বগণ-'বিরাদার'। মাণিক বিবি মেছেরের পত্নী। ধুয়ার কবির সহিত আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে নাই; কিন্তু শুনিলাম, তিনি বর্ত্তমান আছেন এবং এখনও তাঁহার কবিত্ব এইরূপ অনেক ঘটনাকে বর্ষের পর বর্ষের জন্য পল্লীর গীতি-ইতিহাসে অমর করিয়া রাখিতেছে। চালাষ গ্রাম টাঙ্গাইলের গোপালপুর থানার অন্তর্গত।

আর এক অন্ধ কবির ধুয়া,—

২। নন্দপুরের ধুয়া।

হুন বাই এ্যাক নতুন দুইয়া কই হবাকারে—এ-এ।
মাঘ মাসে, অবিবারে, হুক্-দশানী (১) মিলন অইয়ে,
তারা এ্যাক মন্ত্রণা করে। এর-এহে-এ॥
সুবনখুলির হ্যামবাবু সে পরগণার জমিদার,
আজচন্দ (২) হরকার তার মুক্তার (৩)
নন্দনপুরের হাটো আইসা তালাই (৪) কিন্‌লো
দশ টাহার—আর-আহা-আর্।
সে আটের ইজাদ্দারে দেহিয়া তালাই—আই—
আমি দুইটী টাহা খাজ্‌না চাই,—
চন্দমনায় হুইনা বলে, এ-এ-
খাজনাতে দিমু নারে বাই—আই-আহা-আই।
আমি কৈলাম কথা বুঝ মাথা, হ্যামবাবুর তালাই—আই—

১৭। ধুয়া। ১৮। সরকের, রাস্তার।
১। সিকি ও দশানী। ২। রাজচন্দ্র। ৩। মোক্তার। ৪। খলপা বা দরমা।

চল নায়েব মশয় কাছে যাই,
ইজাদ্দারে হুইন্যা বলে, চল আর দেরীমাত্র নাই—আই ॥
হে (৫) কাচারীর নায়েব-অ মশয়
তিন জোনের কাছে কয়,
কুঠাইকার (৬) হিমচন্দ্র বাবু, কে চিনে, দেও না পুরিচয়—অয়-অয়-
হুইনা কথা চন্দ্রমশয় আগ (৭) কল্লেন ভারি—ই-ই-
অম্‌নি চৈলা গেলেন আজবারী (৮)
এমুন আজার মান মাইরা যায়, কে করে এমুন চাহুরী—ইয়-ইহী-ইঃ।
হুবনখুলির বয়ষাবু হে পরগণের জুমিদার,
হুইনা আটের হোমাচার—(৯)
দশআনীর সাৎ (১০) মিলন অইয়ে, কর্‌ছে আট বাজার যোগার—
আর-আহা-আর—
হে কাচারীর আজা বাহাদুর
তার আটটা ছিল নুন্দনপুর।
আটের স্থলে উপজদলে (১১) মাটি কিন্‌লে
রুপিন্দ্র বাবুর (১২)
আমিরুল্লা বান্দছে দুইয়া চক্ষে খ্যাহে না—আর-আহা-আ—
আমি আন্দাজী কই রচনা—
কিবা অইছে দুইয়ার মিল বাট, আমার ত ভাল বৈহে (১৩) না ॥

অন্ধকবি পূর্ব্বেও অনেক ধুয়া বাঁধিয়াছেন। এটী তাঁহার সাময়িক নূতন ধুয়া। নন্দনপুর স্থানটী টাঙ্গাইল গোপালপুরের সন্নিকট। নন্দপুনরের হাট এক সময় ঐ প্রদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও বিখ্যাত হাট ছিল। নাটোর, পুটিয়া এবং সুবর্ণখালির (আম্বারিয়ার) জমিদারেরা মিলিয়া এ হাট বসাইয়াছিলেন। সহসা সুবর্ণখালির জমিদার (সিকির জমিদার) মহাশয়ের মোক্তার রাজচন্দ্র সরকার হাটে যে দরমা ক্রয় করেন, ইজারাদারের সহিত তাহা লইয়া বচসা হয়। এই তিল-বিবাদ ক্রমে তালে এবং পরে কাঁঠালে পরিণত হয়, তাহা লইয়াই ধুয়া। বাজে তালুকের কাছারীর নায়েব মহাশয় সিকির জমিদারের প্রতি বোধ হয় কিঞ্চিৎ অবজ্ঞা ভাবের বাক্য প্রয়োগ করেন, রাজচন্দ্রের প্রাণে ইহাতে ধিক্কার, অভিমান এবং আক্রোশের উৎপত্তি হয়। তিনি এই ঘটনা সদরে এত্তেলা করেন। হেমবাবু, তিনি পরগণার জমিদার, দশ আনির সহিত যোগ দিয়া নন্দনপুরের হাটটী ভাঙ্গিবার যোগাড় করিলেন।

৫। সে। ৬। কোথাকার। ৭। রাগ। ৮। রাজবাড়ী অর্থাৎ জমিদার হেমচন্দ্রের সদর বাটীতে। ৯। সংবাদ। ১০। সাথে। ১১। ঠিক বুঝা যায় না, উপস্থিত হইয়া কি উপহাস স্থলে? সম্ভবতঃ শেষেরটী। কবি রাজার উৎকর্ষ দেখাইলেন। ১২। উপেন্দ্র বাবুর। ১৩। ঠেকে না, লাগে না।

বাজে-তালুকের রাজাও কম নহেন, তিনিও নন্দনপুরের নিকটস্থ উপেন্দ্রবাবুর কতকটা স্থান অবহেলে ক্রয় করিয়া সেইটা জুড়িয়া হাট বসাইলেন। ইহাই কবির কথিত বিষয়। নন্দন-পুরের হাটের দুর্দ্দশা হইয়াছে এবং তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য আর একটা হাট বসিয়াছে, ইহা আমরা দেখিয়াছি। যাহা হউক অতি সামান্য কারণ হইতে পল্লীপ্রদেশে কিরূপে এক একটী মহাঘটনা ঘটিয়া যায়, অন্ধ কবি নিরপেক্ষভাবে তাহাই ইতিহাসে ছন্দোবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

এই পল্লী-ঐতিহাসিক অন্ধ কবির আর এক সাময়িক ধুয়া শুনাইব। ধুয়াটী বঙ্গবিভাগ এবং বিদেশী বর্জ্জন লইয়া।—

৩। হুন ছিলিম চাচা আইজ এ্যাক হুকুর হুইয়া কৈবার চাই-আই-আই।

ভাশে এ্যাক বাও (১) যে আইছে

যিবা (২) চন্‌কা (৩) হিবা বইছে

বিলাইতি আর বোলে কিনন নাহি নাই-আঁই-আঁহা আই ॥

কৎজুনা (৪) নাট বাহাদুর দিছে পরাণা (৫)

বেবাক পর্‌জা মুনীর কৈল্ল তালকানা (৬)

এহন, কুম্পুনীর মল্লুক গ্যাল্ কুঠ্‌ঠাইকার কুন্ (৭) আসামো নিয়া

কল্লবো খাজনা—আয়-আহা-আ ॥

বাংলা মুল্লুক বোর (৮) জবর,

এহানো বাপ দাদার হইছে কবর,

খবরা খবর কত বাতশা কর্‌ছে আজিত্তি—ই-ই—

এহন কুম্পুনী সাব কাবু অইয়া

খাজনা কর্‌বো ছত্রান অইয়া (৯)

মোহারাণীর আজিত্তে বাই ইকি বিকিত্তি—(১০)—ইয়-ইহী-ইঃ ॥

জগন্নাথগুঞ্জ জাহাজ গাট আছে, (১১)

হেই জাহাজো যাওন সহরে,—

ছিলট পিল্লিল হিলং মিলং—অং-অং-

কুন্‌ঠাই নিবো আমাগরে—এয়-এহে-এ।

হে যে সহর অইলে গো জর (১২)

---

১) বাতাস, বাতিক, এস্থলে অর্থ—এক অপূর্ব্ব নব স্রোত। (২) যেমন। (৩) চম্‌কা।
(৪) কর্জ্জন? অথবা কতজন? (৫) পরওনা, অর্থাৎ সাকুলার। (৬) বিভ্রান্ত বা উদ্ভ্রান্ত।
(৭) কোথাকার কোন্। (৮) বড়। (৯) ঠাঁই ঠাঁই, বা বিচ্ছিন্ন ভাবে।
(১০) বিকৃতি অথবা বৈচিত্র্য কিংবা বিকীর্ত্তি? (১১) ষ্টীমারষ্টেসন। (১২) জর আছে।

প্যাটে অগ্‌টানা (১৩) দরে (১৪),—এ, এ—
দিকে (১৫), অইল বালা (১৬) ও নাজির বাই, গো—ও—
এ্যাহন নামানী (১৭) হাইল্লো (১৮) ফিলাই (১৯) লইয়া
আইও গো গরে-এয়-এহে-এ ॥
যাত মুন্‌সী মৌলায় করছে কুমুটী (২০)
হুনাহুন্ (২১) হুনলাইম এঠাইতি (২২)
আরাম (২৩) যাত নিমক চিনি কাপইর বিলাইতি—ইহী-ঈ।
তোবা তোবা, ইকি কর্‌ছি,
না জাইনা কি জকমারি—এহ্যান কওছেন (২৪) কি করি—ই-ই—
কিরিস্তানে জাইত মাইরা গ্যায়, মরণ নাই, কইলজা হয় বারী (২৫)
ইয়-ইহী-ঈ ॥
কেয়ামতে কি দিমু জোবাব,—আহায়-আব,—
হাশে বোলে কল অইতাছে,
হে হান থনে (২৬) কাপইর চিনি আইবো হবাকার—আর-আহা-আর ॥
নোয়ার হানুকী খোরা (২৭) আছে যাত,
বাইঙ্গ্যা চুইরা (২৮) ফালাও পথত, (২৯)
মাও বহিন বিরাদার সজন (৩০)
বাৎখাও (৩১) উইন্টা পাতাতো (৩১)—ওহো-ও।
আমিরুল্লা চইক্ষু খাইছ (৩২) তেরশও বার সনেতে—বোর হুক্কু মোনেতে,—এ-এ-হে।
ইসন বোর অইল গো পানি, (৩৩)
গেরাম গেরাম বোরই নামানী—ই-হীঃ।
পানীর তলে উইন্টা গ্যাল গো কুম্পুনীর মুল্লুক—উয়—উহু—উক্।
আমীরুল্লার হোমান (৩৪) দুক্ (৩৫)
দিনে দিনে কি ব্যান্ (৩৬) অইল,
জাইত জমিন জাহান গেল,
এ্যাদ্দিন বুইন্দার (৩৭) আগুণ দিয়া নিজে পুর্‌ছি নিজের মুক্—উক্—উক্—

(১৩) রগটানা। (১৪) ধরে। (১৫) হ্যাদে ও। (১৬) ভালই। (১৭) ওলাউঠা। (১৮) সারিল। (১৯) প্লীহা। (২০) সভা (কমিটী না থাসটি ?)। (২১) পরম্পরায়। (২২) এখানে বসিয়া। (২৩) (হারাম) নিষিদ্ধ। (২৪) বলতো। (২৫) ভারী, পুরু। (২৬) হইতে। (২৭) বাটি। (২৮) ভেঙ্গেচুরে। (২৯) পথে। (৩০) আত্মীয়কুটুম্বাদি। (৩১) ভাত খাও। (৩১) উল্টা পাতায়। (৩২) অন্ধ হইয়াছে। (৩৩) বর্ষা। (৩৪) সমান। (৩৫) দুঃখ। (৩৬) কি রকম বা। (৩৭) খড়ের বেণী, বা দড়ি ইহাতে তামাকু খাইবার আগুণ রাখা হয়।

এ্যাহন ছেত্তুর (৩৮) পুইরা নিমক খাইও, জিন্দিগীৎ (৩৯) না অইব চুক—
উয়-উহু-উহু ॥

এমন মর্ম্মভেদ ভাষায় বোধ হয় এ সম্বন্ধে কোন কবিতা এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। রসিকতার সহিত তীব্র ব্যঙ্গ, আত্মাভিমান ইত্যাদির সংমিশ্রণে এ ধুয়া-গীতি হৃদয়ের আগুণের মত ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। কবি বলিতেছেন,—হে শ্রোতৃবর্গ, আজ বড় দুঃখের ধুয়া শুনাইবার জন্য আসিয়াছি। এই দেশময় এক প্রচণ্ড বাতাস উঠিয়াছে, সে বায়ু যেমন প্রচণ্ড তেমনই বেগবান,—সে বাতাস আর কিছু নহে,—বিদেশী বর্জ্জন। লাটবাহাদুর পরওয়ানা দিয়াছেন, হায় দুঃখের কথা কি বলিব, সকল প্রজা মনিব (সাধারণ কৃষক-বর্গ ও জমিদারগণকেও) দিগকেই উদ্ভ্রান্ত করিয়া কোম্পানীর রাজত্ব লোপ পাইয়া গেল (এই খানে পাঠক কবির হৃদ্গতভাব উপলব্ধি করিবেন)। এখন কোথাকার কোন্ সুদূর আসামে লইয়া গিয়া গবর্ণমেণ্ট দেশের খাজানা আদায় করিবেন! হে আমার শ্রোতৃবর্গ। এই মহামহিমান্বিত বাঙ্গালার পবিত্র অঙ্কে—পবিত্র মৃত্তিকায় আমাদের পিতৃপিতামহের দেহরেণু মিশিয়া আছে,—আমাদের এই পিতৃপৈতামহিক বঙ্গভূমিতে কত বড় বড় বাদশা অভঙ্গভাবে রাজত্ব চালাইয়া গিয়াছেন, আর আজ কি না এই কোম্পানীবাহাদুর নির্জ্জীব শক্তিহীন রাজার মত খণ্ডবিখণ্ড করিয়া বিভিন্ন ভাবে এই রাজ্য, এই চির-একত্র চির অবিভিন্ন রাজ্য ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া শাসন করিতে গেলেন। হায় আমাদের পিতৃপুরুষ! তোমরা কবরেও এতদিনে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছ, আজ আমাদিগকে ছাড়িয়া তোমরাও ভিন্ন হইতেছ।—হায় হায়! পরম পুণ্যবতী রাজরাজেশ্বরী মহারাণীর রাজত্বে একি অপূর্ব্ব বিচিত্র কাণ্ড!

ভাই সব, শুনিলাম, জগন্নাথগঞ্জে যে ষ্টীমার ষ্টেসন আছে, সেই ষ্টেসন উঠিয়া তোমাদিগকে সদর নব-নগরে যাইতে হইবে। হায় হায়, শ্লেটপেনসীল এগুলিতো ইস্কুলবালকদের লিখিবার না পড়িবার জিনিষ বলিয়া জানি, সেই ছিলটে (শ্রীহট্ট?) না কি শিলংমিলং (Shilong) কোথায় কোন সমুদ্রের পারে,—সেই থান আমাদিগকে লইয়া টানিয়া ফেলিবে! এসব কি অদ্ভুত ব্যাপার? আবার শুনিয়াছি, সেই নূতন দেশে নাকি জর হইলে (কালাজ্বর?) পেটের পেশী ফুটিয়া ওঠে!—ওহে নাজির ভাই! হ্যাদে ও! বড় ভালই হইল। তুমিতো বড় মামলাবাজ, সবার আগেই তোমাকে নূতন সদর নগরে যাইতেই হইবে, তা বেশ, এখন আর ওলাউঠায় মরিবার ভয় নাই,—কালাজ্বরের পাল্লায় পড়িয়া এবারে উদরমধ্যে প্লীহানামক আর একটী জীবের (তাই বা কেন? 'পুত্র বল্লেই হয়' বোধ হয় এই ভাব?) সম্ভব লইয়াই আসিবা! আর চাই কি? তুমি তো আঠকুঁড়ো, এইবার ভাই তোমার দুর্নাম ঘুচিবার পথ হইল!! (পাঠক দেখিবেন রসিকতার সঙ্গে কি তীব্র দুঃখের ছুরি!) আবার শুনিলাম, দেশের যত মুন্সী ও মৌলভী সাহেবেরা কমিটী করিতেছেন। আমি অন্ধ নিরুপায়, তবু ভাগ্যে

---

(৩৮) কলাগাছের শুষ্ক খোলা। (৩৯) জীবনে।

কথাটা এখানে বসিয়াই শুনিয়াছি, আরো শুনিলাম, যত বিলাতী লবণ চিনি ও বিলাতী কাপড় এসবই হারাম। তোবা তোবা, না জানিয়া এতকাল কি কুকর্ম্মই করিয়া আসিয়াছি! যাক্, দয়া করিয়া তোমরা খবরটা দিয়া রক্ষা করিয়াছ, কিন্তু বল দেখি, এখন গত পাপের উপায় কি করি? যা-তা হারাম খাওয়াইয়া হারাম পরাইয়া, খৃষ্টান. জাতিতে জাতি মারিয়া গেল, হায় হায় কি পাথর-পরাণ, অন্ধ হইয়া বাঁচিয়া আছি, তবু মরিলাম না! বল, বল, কেরামতে, শেষের সেই ভীষণ বিচারনিকাশের দিনে এ বিষয়ের কি জবাব দিব? আঁ্যা, তাই নাকি? দেশেই কাপড় চিনির কল হইতেছে নাকি? সেখান হইতে বিশুদ্ধ দ্রব্য পাইব? তবে আর কি? তবে যে যথায় থাক, অশুদ্ধ লৌহপাত্র (এনামেল) সকল চূর্ণ করিয়া আস্তাকুঁড়ে, পথে ফেলিয়া দাও, আজ হইতে হে ভাই সব, হে আত্মীয়কুটুম্বস্বজনবর্গ, হে আমাদের সমাজের মাতৃ এবং ভগিনীরূপিণী ললনাগণ, আজ হইতে ঐ অশুদ্ধ হারাম পাত্রাদি দূরে নিক্ষেপ করিয়া আমাদের প্রাচীন সনাতন প্রথায় কদলীপাত্রের নিম্নপৃষ্ঠে অন্ন রাখিয়া আহার কর।

হায় আমিরুল্লা তুমি অন্ধ, কিছু দেখিতে পাও না, কিন্তু তেরশত বারসন বৎসরটায় বড় কষ্ট গেল, এ বৎসর ভীষণ বর্ষণ ও প্লাবন হইয়াছে, গ্রামে গ্রামে ওলাদেবীর আবির্ভাবে বহু গৃহ শূন্য হইয়াছে, তার উপর, যেন সেই বর্ষার জলের নীচেই লোকে চক্ষুর অগোচরে সহসা কোম্পানীর মুল্লুক উলটিয়া গেল, বাঙ্গালা আসাম হইল! অন্ধ আমিরুল্লার রাত্রদিন সমান, তাহার নিজের দুঃখের আর তারতম্য কি? কিন্তু হে ভগবন্! এ কি শুনছি, দিন দিন এসব কি হইতেছে? লোকের জাতি, সম্পত্তি, প্রাণ এমন করিয়া হৃত, বিচ্ছিন্ন এবং নষ্ট হইতেছে কেন? হায় হায়, এতদিন হারাম 'চিজ' সব ব্যভার করিয়া কি পাপই করিয়াছি, বুন্দার আগুণে নিজে নিজের মুখ পুড়িয়াছি, এখন যদি প্রায়শ্চিত্তে একটুও ফল পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে, হারাম ত্যাগ কর, জাঁকজমক ত্যাগ কর, কলার খোলা পোড়াইয়া তাহাই লবণরূপে ব্যবহার কর, তবু হারাম খাইও না, দেখ, জীবনে যা ভুল হইয়া গিয়াছে তার আর 'চারা' নাই; এখন আর কোন চুক যেন পারতপক্ষে কোন মতে করো না।" অন্ধ কবির পক্ষে কি স্বাভাবিক উক্তি! এমন কবির জন্মে শুধু পল্লী নয়, সমগ্র বঙ্গই রত্নগর্ভ। আমরা কবির গৃহের সন্ধান পাই নাই, কিন্তু ইনিও টাঙ্গাইল অঞ্চলের কোন পল্লীর অধিবাসী; নন্দনপুরের ধূয়া হইতে এইরূপই বুঝা যায়। বঙ্গভঙ্গে কবি হৃদয়ে কি আঘাত পাইয়াছেন। আপন আগার ও ধর্ম্মের প্রতিই বা তাঁহার কি গভীর অনুরক্তি। এই ঐতিহাসিক অন্ধ পল্লী-কবি সরলতায়, বৃদ্ধত্বে—প্রবীণতায় সজীবরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছেন, আর মর্ম্মের একটী 'হুবহু' ক্ষত চিহ্নের চিত্র আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। পল্লীর ধূলিমাঝে এই রত্ন কুড়াইয়া পাইয়াছি। কিন্তু এমন রত্নের খনিটীকে দেখিতে না পাইয়া ক্ষুণ্ণহৃদয়ে ফিরিয়াছিলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।

পুঁড়োজাতির বিবরণ

ভারতীয় জাতিমালায় হিন্দুভাবে অনুপ্রমাণিত জাতিসমূহের মধ্যে দুইটি সর্ব্বপ্রধান শ্রেণী আছে। এই শ্রেণীদ্বয়ের প্রথমাংশ অল্পবিধ আচার-ব্যবহারনিরত নিম্নবর্ণের হিন্দু। বস্তুতঃ যতগুলি নিম্নবর্ণের হিন্দু, সাধারণ সমাজমধ্যে গণ্য, মান্য ও পরিচিত আছে—তাহার মধ্যেও আবার দুই শ্রেণী দেখা যায়। এই শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে প্রথমাংশ স্পর্শ-দোষ-দুষ্ট নহে। দ্বিতীয়াংশ একেবারে স্পর্শদোষ দোষে দুষ্ট হইয়া উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজের অতি নিম্নস্তরে অবস্থান করিতেছে।

এই স্পর্শদোষ-দুষ্ট নিম্নবর্ণের হিন্দুগণের মধ্যে অদ্য আমরা পুঁড়ো অর্থাৎ পুণ্ডরিক জাতি সম্বন্ধে সামান্য কিছু আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের সূচনা করিতেছি। দুঃখের বিষয়, আমাদের ভারতের—বিশেষ এই আসমুদ্র-হিমাচলব্যাপী অখণ্ড শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির প্রকৃত জাতীয় ইতিহাস নাই; বর্ত্তমানে দুই একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তির চেষ্টায় কিছু কিছু সংগ্রহ হইতেছে মাত্র। তাই আমাদের এই ক্ষুদ্র আলোচনাটি কেবলমাত্র সাধারণে প্রচলিত গল্প এবং দেশব্যাপী জনপ্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া সামান্য অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ পাঠকবর্গকে উপহার দিতে হইতেছে। সময়ের অনিবার্য্য পরিবর্ত্তন ক্রিয়াতে বর্ত্তমানে আমাদের জাতীয় জীবনে ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব এবং জাতীয় গৌরবকর ক্রিয়ার অনুসন্ধান কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এমন কি সাহিত্যিকগণের মধ্যে উপন্যাসের যুগ শেষ হইয়া ইতিহাসাদির যুগ উপস্থিত হইয়াছে। বিধাতার এই শুভ ইচ্ছার উদ্বোধনে অদ্য আমি যে কাহিনী প্রকাশ করিতেছি, তাহাতে প্রাচীনত্ব, ঐতিহাসিকত্ব এবং মৌলিকত্বের যথেষ্ট অভাব থাকিতে পারে; তবে আশা এই যে, বঙ্গীয় নিম্নবর্ণের সমাজসমূহে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিলে আমার প্রবন্ধ-লেখা সফল হইবে।

প্রাচীন এবং নব্য ঐতিহাসিকগণের মতে প্রাচীন গৌড়নগরের নিকটে "পৌণ্ড্রবর্দ্ধন" বা "পাণ্ডুয়া" বলিয়া যে স্থান আছে, পুঁড়োগণ তাহার আদিম অধিবাসী। ঐতিহাসিক বিপ্লবে এবং সংখ্যাধিক্য গুণে ইহারা বর্ত্তমানে বঙ্গের বহুস্থানের অধিবাসী হইয়াছে। কোন কোন নব্য ঐতিহাসিক এই পাণ্ডুয়া গ্রামের অবস্থিতি লইয়া অনেক বাদ-বিতণ্ডার পর ইহাকে বর্ত্তমান "পাবনাজেলা" বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আবার আর একজন প্রত্নতাত্ত্বিক পাণ্ডুয়া গ্রামের অবস্থিতিকে রাঢ় দেশ মধ্যে নির্দ্দেশ করিতেছেন। ইহাদের কোন দলেরই মীমাংসা পূর্ণ নহে। কেহ সামান্য দুই একটি প্রমাণের বলে নিজ মত দৃঢ় করিয়াছেন। কেহ বা কেবল যুক্তি আর অনুমানের সাহায্যে নিজ মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পাণ্ডুয়ার অবস্থিতি লইয়া ঐতিহাসিকগণ যিনি যাহাই বলুন না কেন, আমরা তাহার বিচারে প্রস্তুত নহি, কেন না আমাদের প্রবন্ধের বিষয় পুণ্ডরিক জাতি লইয়া,—পাণ্ডুয়া লইয়া নহে।

বলা বাহুল্য যে, পাণ্ডুয়ানগর যে স্থানেই অবস্থিত হউক না কেন, পুঁড়োজাতি যে তাহার আদিম অধিবাসী, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। তবে পুঁড়োগণের প্রাচীনদিগের নিকট শুনিয়াছি যে, তাহারা বর্ত্তমান পাবনা জেলাকেই পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বলিয়া বিশ্বাস করে। আবার এই জাতির সম্প্রদায়বিশেষ কিন্তু রাঢ়দেশের মধ্যেই পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অবস্থিতি নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। প্রমাণ স্বরূপ, তাহাদের কথাবার্ত্তা ও কথকটা আচার-ব্যাবহারকে রাঢ়দেশীয় ভাবাপন্ন দেখা যায়।

একদিন একটি অশীতিপর বৃদ্ধা পুঁড়ো তাহাদের জাতীয় উৎপত্তি সম্বন্ধে আমাকে এইরূপ একটী গল্প বলিয়াছিল যে, গঙ্গাপার হইয়া আমাদের আগমনকালীন পবিত্র গঙ্গাজলের অভাব জন্য আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ একটি তাম্রপাত্রে গঙ্গোদক রক্ষা করিয়া আনিয়াছিলেন—অদ্যাপিও আমাদের জাতীয় কি ক্ষুদ্র, কি বৃহৎ প্রত্যেক গৃহস্থেরই গৃহে গঙ্গাজল অতি যত্নের সহিত তাম্রপাত্রে রক্ষিত আছে।" যদি কেহ কোন পুঁড়ো গৃহে তাম্রপাত্রস্থ গঙ্গাজল না দেখাইতে পারে, তবে তাহার অন্ন অপরে আহার করে না। ইহাতে প্রকাশ যে, আমাদের জাতিতে আতিথ্য গৃহস্থের একটী নিত্য অনুষ্ঠেয় কার্য্য। যদি কোন গৃহস্থের বাটীতে অতিথি উপস্থিত হইয়া গঙ্গাজল চাহিয়া না পায়, তবে সে ক্ষুৎ পিপাসাতুর হইলেও তাহার বাড়ীতে জলস্পর্শ করে না। বৃদ্ধার এই কথায় ঘটনা সত্য কি না জানিবার জন্য আমি প্রায় ১২।১৩ ঘর গৃহস্থের গৃহ অনুসন্ধানে গঙ্গাজল পাইয়াছিলাম এবং পুঁড়ো রমণীগণ উহা দেখাইবার সময় প্রত্যেকেই তাম্র পাত্রে আমাকে গঙ্গাজল দেখাইয়াছিল।

যদি পুঁড়োজাতির এই গঙ্গাজল রক্ষা-পদ্ধতি তাহাদের প্রকৃতই পূর্ব্বপুরুষগণের আচরিত অনুষ্ঠান হয়, তবে একথা স্বীকার্য্য যে, তাহারা প্রকৃতই রাঢ়ীয়। কিন্তু পুঁড়ো জাতির মধ্যে রাঢ়ীয় বা বারেন্দ্র বলিয়া কোন সম্প্রদায় নাই; সাধারণতঃ তাহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা;—কৃষ্ণপক্ষে, মধ্যমে, আর বাউরে। এই তিন সম্প্রদায়ই একই প্রাচীন পৌণ্ড্রবংশসম্ভূত। অন্যান্য হিন্দুগণের ন্যায় ইহাদের সংখ্যাধিক্য হইলে অবস্থানের গতি অনুসারে ইহারা পৌণ্ড্রিক যাজক ব্রাহ্মণগণের উদ্যোগে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়।

যখন পুরাতন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ছাড়িয়া এই জাতি উপনিবেশ সংস্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন একজন ক্ষমতাশালী অভিজ্ঞ পুঁড়ো কায়স্থগণের ন্যায় নাকি একটি "একজাই" অর্থাৎ জাতি-সম্মিলনী করিয়াছিল। ঐ ব্যক্তির নাম বিদ্যাধর। ইহার অর্থ বলে উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ এই নিম্ন বর্ণের যাজন কার্য্য করিয়া পতিত হন। অধুনা এই পতিত ব্রাহ্মণ বংশীয়গণই পুঁড়োজাতির পুরোহিত। বিদ্যাধরের একজাইতে যে সকল ব্রাহ্মণ পাতিত্য-দোষে দুষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশগত পূর্ব্ব উপাধি অদ্যাপিও অক্ষুণ্ণ আছে। উদাহরণ-স্বরূপ,—যশোহর ঘোড়ামারার মুখোপাধ্যায় উপাধিধারী পুণ্ডরিক পুরোহিতগণের নাম উল্লেখ্য-যোগ্য। এই বিদ্যাধরের বংশীয় পুঁড়োগণ অদ্যাপিও পুণ্ড্রিক সমাজমধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহাদের বংশীয় পুঁড়োগণ এখনো পাবনাজেলার স্থানে স্থানে উচ্চবর্ণের হিন্দুসাধারণের ন্যায় সাংসারিক

কার্য্যে গণ্যমান্য হইয়া বাস করিতেছে। ইহাদের বংশের প্রায় সমস্ত পুরুষগণই বিদ্যা শিক্ষা করিয়া উচ্চ উচ্চ রাজকর্ম্ম করিতেছেন। অধুনা ইহাদের বংশীয়গণ "মজুমদার" উপাধিতে পরিচিত।

এই মজুমদার আখ্যাধারী পুঁড়োগণ পূর্ব্বোল্লেখিত বাউরিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। যাহারা কৃষ্ণপক্ষে বলিয়া পুণ্ডরিকসমাজে পরিচিত আছে, তাহারা অপর দুই শ্রেণীর অর্থাৎ— বাউরিয়া ও মধ্যমে সম্প্রদায় হইতে অতি নিম্ন। কৃষ্ণপক্ষীয় পুঁড়োগণই সাধারণতঃ বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলার অধিবাসী। তবে যশোহর, বরিশাল, খুলনা প্রভৃতি জেলায় ইহাদের সংখ্যা অল্প হইলেও পুঁড়োসমাজে ইহারা নিতান্ত নগণ্য নহে। এই শ্রেণীভুক্ত লোকে পিতা মাতার মৃত্যু হইলে, সম্মানরক্ষার জন্য মৃত ব্যাক্তির ভস্মীভূতপ্রায় অঙ্গের কোন না কোন এক টুকুরা অস্থি গৃহমধ্যে মৃত্তিকাতলে প্রোথিত করিয়া রাখে। এই জন্য অপর দুই শ্রেণীর পুঁড়োগণ ইহাদিগকে অতি ঘৃণা করে এবং ইহাদের সঙ্গে এক পংক্তিতে আহার করে না। এই শ্রেণীর পুঁড়োগণ প্রায়ই কৃষি-ব্যাবসায়ী; তবে স্থানে স্থানে অল্পবিস্তর ব্যবসা-বাণিজ্যও করিয়া থাকে। পুরোহিতগণ ইহাদের বাড়ীতে শ্রাদ্ধাদি প্রেতকৃত্য-সম্বন্ধীয় দ্রব্যাদি পাইয়া তাহা অপর শ্রেণীর পুণ্ডরিক বাড়ীতে ব্যবহার করিতে পারেন না। সম্প্রতি খুলনা জেলায় অতি ভদ্রপল্লী সেনহাটী গ্রামের এক কৃষ্ণপক্ষীয় পুঁড়োর বাড়ীতে একটী ব্রাহ্মণ আদ্যশ্রাদ্ধের শয্যাচ্ছাদনাদি লইয়া মধ্যম-শ্রেণীর পুঁড়োর বাড়ীতে ব্যবহার করেন, তাহাতে পুণ্ডরিক-সমাজে এক মহা-সামাজিক বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। পরিশেষে সেই আত্মবিনাশক গোলযোগ জমিদার বাড়ীতে কিছু অর্থদণ্ড দিয়া মিটিয়া গিয়াছে। ঐ কৃষ্ণপক্ষীয় পুঁড়োগণকে স্থানবিশেষে "পটো" কহে, অর্থাৎ ইহারা চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়া হিন্দু সাধারণের গৃহে পট চিত্র করিয়া এই আখ্যা পাইয়াছে। বস্তুতঃ পটো বলিয়া এক শ্রেণীর না হিন্দু না মুসলমান জাতি সেই অঞ্চলে বাস করিতেছে। তাহাদের সঙ্গে এই কৃষ্ণপক্ষীয় পুণ্ডরিকগণের কোন সংস্রব নাই; কেবলমাত্র চিত্রপটের কার্য্য জন্য ইহারা 'পটো' নামে অভিহিত। সম্ভবত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এই জাতিই "পাটু" বলিয়া উল্লিখিত।

তাহার পর, মধ্যমশ্রেণীর পুণ্ডরিকগণ আজকাল একরূপ উন্নত ধরণের হিন্দুভাবে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। ইহারা হরিদ্রা লঙ্কা বেগুন প্রভৃতি তরকারীর আবাদ এবং ব্যবসা করে। তবে স্থানবিশেষে এই শ্রেণীর পুঁড়োগণ কৃষিকার্য্যজাত অন্যবিধ দ্রব্যাদিও প্রস্তুত করিয়া থাকে। কোন কোন স্থলে ইহারা সামান্য সামান্য লেখা-পড়াঘটিত চাকুরি ও ব্যাবসাবাণিজ্য করিতেছে। ইহারা পুরোহিতের প্রতি ভক্তিশূন্য জাতি। পুরোহিতগণও ইহাদের উপর একরূপ খড়্গহস্ত। মধ্যমপক্ষীয় পুণ্ডরিকগণ বলিয়া থাকে যে, আমরা "জলচল জাতি" অর্থাৎ উচ্চ-বর্ণের হিন্দুগণ আমাদের জল খাইতে পারেন; কেবল হিন্দু-আচার অনুষ্ঠানের জন্য পতিত ব্রাহ্মণগণের দ্বারা যাজন কার্য্য করাইয়া থাকি বলিয়া আমাদের জল খাইতে অন্যান্য হিন্দুগণ অসম্মত। শুনা যায় যে, কৈবর্ত্ত জাতির পুরোহিতের অন্ন যেমন কৈবর্ত্তগণ ব্যবহার করে না,

সেইরূপ এই মধ্যমপক্ষীয় পুণ্ডরিকগণ তাহাদের পুরোহিতের অন্ন আহার করিতে সম্মত নহে। কিন্তু বিগত ১১০৩ সালের পৌণ্ডরিক একজাই সভাতে ব্রাহ্মণগণ ইহাদের ক্রিয়াকর্ম্ম করিতে অসম্মত হওয়ায়, এই শ্রেণীর পুঁড়োগণ অতঃপর পুরোহিতের অন্ন আহার করিতেছে। এই সম্প্রদায়ভুক্ত পুণ্ডরিকসমাজে একটি অতি পুরাতন গল্প আছে যে,—দক্ষিণবঙ্গের অদ্বিতীয় অধিপতি বীরভুমি যশোহরের বীরসন্তান বাঙ্গালীজীবনের স্মরণীয় আদর্শ পুরুষ—মহম্মদপুরাধিপতি সীতারাম রায় পূর্ব্ব-জন্মে পুঁড়ো ছিলেন। গল্প এই—একদিন বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইলে রাজা অসময় পাঁকা কাঁঠালের গন্ধ পাইয়া একজন জ্যোতির্বেত্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ইহার কারণ কি? সভাস্থ জ্যোতির্বিদ্ কহিলেন, মহারাজ! আপনার পূর্ব্বজন্মের একটী পুত্র আপনার শ্রাদ্ধ করিতেছে, পিণ্ডের সঙ্গে সে ব্যক্তি পাঁকা কাঁঠাল দিয়াছে, তাই আপনি গন্ধ অনুভব করিতেছেন। জ্যোতির্বেত্তার কথা শুনিয়া রাজা তৎক্ষণাৎ রাজ্য-মধ্যে অনুসন্ধান করিতে আদেশ দিলেন। রাজ-অনুচরগণ বহুকষ্ট ও অনুসন্ধানে একজন বৃদ্ধ পুঁড়োকে আনিয়া উপস্থিত করিল। তখন রাজা সেই বৃদ্ধকে বৃত্তি দিয়া প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। এই সময় জ্যোতিষী কহিল, মহারাজ আপনি পূর্ব্বজন্মে পুঁড়ো ছিলেন। একদিন দুই প্রহরে একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পিপাসায় কণ্ঠগতপ্রাণ হইয়া আপনার কৃত তরমুজের জমিতে উপস্থিত হইলে আপনি তাঁহাকে একটি পাকা তরমুজ দিয়া তাঁহার সেই দারুণ পিপাসা নিবারণ করিয়াছিলেন, সেই ফলদান পুণ্যবলে আপনি এই জন্মে রাজা হইয়াছেন।*

ইত্যাদি গল্পের উপর নির্ভর করিয়া পুড়োগণ বলিয়া থাকে যে, "রাজা সীতারামের প্রদত্ত নিষ্কর জমি অদ্যাপি মাগুরা মহকুমার সিরিজদিয়া গ্রামের তারিণী পুণ্ডরিক এবং তদীয় বংশীয়গণ ভোগ করিতেছে। আমি কথার উপর বিশ্বাস করিয়া তারিণীপুণ্ডরিকের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ গোপালচন্দ্রের নিকট সত্যাসত্য অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। তাহাতে গোপাল বলিল যে, "উক্ত জমি মধুবতীর ভাঙ্গনে ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পর আর তাহা আমরা পাই নাই।" বস্তুতঃ এই অঞ্চলের পুণ্ডরিকগণের মধ্যে গোপালের পিতা কালাচাঁদ প্রধান ব্যক্তি। ইহাদের নিকটই আমি পুড়োজাতির বিবরণ যাহা কিছু সংগ্রহ করিয়াছি মাত্র; ইহারা মধ্যমপক্ষীয় পুণ্ডরিক। হরিদ্রা প্রভৃতি পণ্য দ্রব্যই ইহাদের জীবনযাত্রার প্রধান উপায়। কৃষ্ণপক্ষীয়গণ হইতে এই মধ্যমপক্ষীয়গণ অনেকটা উন্নতধরণের অবস্থাপন্ন। এই শ্রেণীর পুঁড়োগণের নিকট হইতে সমগ্র পুণ্ডরিকজাতির সামান্য একটী পৌরাণিক প্রমাণ পাইয়াছি, তাহা বাউরিয়া শ্রেণীর বিবরণমধ্যে উল্লিখিত হইল।

এইস্থানে আর একটী কথা আছে। এই মধ্যমশ্রেণীর পুণ্ডরিকগণ পুত্রকন্যার বিবাহে একরূপ অভিনব প্রথার আচরণ করিয়া থাকে, অর্থাৎ ইহারা পুত্রকন্যার বিবাহে উচ্চবর্ণের হিন্দুর ন্যায় "লগ্নপত্র" স্থির করিয়া তাহাতে একটী হরিদ্রার কৌটা দিয়া স্বাক্ষরান্তে বরকন্যার

* সীতারামের জলকীর্ত্তি দেখিয়া সাধারণে ইত্যাদি গল্প প্রচলিত করিয়াছে ইহাই সত্য।

হস্তে উহা অর্পণপূর্ব্বক পরস্পর আদানপ্রদান ক্রিয়া সম্পন্ন করে। এই প্রথা অপর দুইশ্রেণীর পুণ্ডরিকগণের মধ্যে প্রচলিত নাই। ইহারা বলে যে, পাবনাজেলায় যে পুণ্ডরিকজাতি আছে, তাহাদের সহিত আমাদের পংক্তিভোজন নিষেধ নাই ; কিন্তু সামাজিকভাবে আহারাদি হয় না। কেন না আমরা রাজসম্মানিত, অর্থাৎ রাজা সীতারাম রায়ের সম্পর্কিত বলিয়া আমরাই শ্রেষ্ঠ। তবে "বিদ্যাধরের অধস্তন পুরুষগণ আমাদের জাতির মধ্যে সর্ব্বপ্রধান।" আমরা মধ্যমপক্ষীয় হইলেও রাজসম্মানে শ্রেষ্ঠত্ব পাইয়াছি। আমাদের শ্রেণীর বড় বড় গৃহস্থই কলিকাতার দক্ষিণে ডায়মণ্ডহাড়বার মহকুমায় অবস্থান করিতেছেন। তাহারা সকলেই চাকুরিব্যবসায়ী। এই পুণ্ডরিক গৃহস্থগণ অতি পুরাতনকাল হইতে আমাদের জাতীয় ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া চাকুরি এবং অন্যবিধ ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই জমিদারের গোমস্তা, মুহরী, মুন্সী ইত্যাদি কার্য্য করেন। বর্ত্তমানকালে ইংরাজীতে কৃতবিদ্য হইয়া আবার অনেকে গবর্ণমেণ্টের আফিসে এবং কেহ কেহ সওদাগরি আফিসে কার্য্য করিতেছেন। ইহাদের উপাধিতে পুণ্ডরিক বলিয়া আদৌ চিনা যায় না। বিশ্বাস, সরকার, প্রামাণিক, শিকদার, ভুঁয়ে প্রভৃতি নবাবী উপাধি এবং কার্বাল, নাঙ্গলে, দাম, মাহম, প্রকাইট প্রভৃতি সামাজিক উপাধিতে ইহারা সাধারণে পরিচিত। এই দক্ষিণ-বঙ্গের পুণ্ডরিক-সমাজে ৫।৬ হাজার টাকা দিতে না পারে এমন গৃহস্থ একঘরও নাই। ইহাদের যে প্রামাণিকে ক্ষৌরকার্য্য করে, তাহারা এই অঞ্চলে অন্যান্য নরসুন্দরকুল হইতে অতিশ্রেষ্ঠ, ইহাদের সাধারণ নাম "দাসপ্রামাণিক"। অপর আর এক শ্রেণীর ক্ষৌরকার এই অঞ্চলে আছে, তাহাদের সাধারণ নাম "মাল্লাপ্রামাণিক"।

এই দুই শ্রেণীর ক্ষৌরকারগণের সঙ্গে পুণ্ডরিক-সমাজের একটী পুরাতন গল্প আছে। কোন এক সময় কলিকাতা ভবানীপুরের হরপ্রসাদ রায় জমিদার মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষ সাধকপ্রবর কেশবচন্দ্র রায় তাহার জমিদারী মড়াগাছা পরগণার অন্তর্গত ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার নিকটস্থ "বানচেওড়া" গ্রামে "কেশবেশ্বর শিব" প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া পুণ্ডরিক-প্রজাগণের সাহায্য গ্রহণ করেন। তাহারা অশৌচাবস্থায় দেবকার্য্য করিতে অসম্মত হওয়ায় জমিদার কেশবচন্দ্র ক্ষৌরকারগণের দ্বারা তাহাদিগকে শৌচমুক্ত করিতে আদেশ দেন। প্রামাণিকগণ পুণ্ডরিকের ক্ষৌরকার্য্য করিলে অপর উচ্চবর্ণের কার্য্য করিতে পারিবে না বলিয়া অস্বীকার করে ; তাহাতে জমিদার মহাশয় সেই সময় পুণ্ডরিকগণের ক্ষৌর কার্য্যকারী নাপিতগণকে "দাস" উপাধি দিয়া নিজে তাহার দ্বারা ক্ষৌরকার্য্য সম্পন্ন করাইয়াছিলেন। এই হইতে যাহারা পুণ্ড-রিকগণের কার্য্য করে, তাহারা দাসপ্রামাণিক হয় এবং উচ্চবর্ণের হিন্দুরও কার্য্য করে। আর অসম্মত নরসুন্দর মাল্লা অর্থাৎ "মানটানা" বলিয়া পতিত হয়। অধুনা এই কার্য্য হইতে উচ্চ বর্ণের হিন্দুর প্রামাণিকে পুণ্ডরিকগণের কার্য্য করিয়া আসিতেছে। কেশবচন্দ্র হইতে পুঁড়ো-সমাজের আরও একটী উন্নতি হয়। পুণ্ডরিকগণ পরম জাগ্রতবিগ্রহ কেশবেশ্বর শিবের পরিচারক হইয়া অপর নিম্নবর্ণের হিন্দু হইতে অনেক পরিমাণে সাধারণ হিন্দুসমাজে প্রাধান্য পাইয়াছে।

এই আদি কালের মধ্যমপক্ষীয় পুণ্ডরিকগণ এখনও স্থানে স্থানে প্রায়ই সদ্গোপ ইত্যাদি জাতির স্থায় 'জলচল' জাতিরূপে গণ্য হইতেছে। সম্প্রতি মাগুরা মহকুমায় মধ্যমপক্ষীয় পুণ্ডরিক-সমাজের এক ব্যক্তি পুলিস সবইন্‌স্পেক্টর হইয়া অনেক উচ্চবর্ণের সঙ্গে মিশিয়া চলিয়া গিয়াছেন। ইহার নাম নৃপেন্দ্রনাথ প্রকাইট্। বস্তুতঃ এখন অনেক শিক্ষিত মধ্যম-পক্ষীয় পুণ্ডরিক জলচল জাতিরূপে গণ্য হইতেছেন।

বর্ত্তমানে ইংরাজীশিক্ষার প্রভাবে হিন্দুর সামাজিক বন্ধন তত দৃঢ় নাই। তাই অনেক নিম্নবর্ণের হিন্দু বিদ্যা শিখিয়া উচ্চবর্ণের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া চলে। কেশবেশ্বর শিবের প্রসাদে দক্ষিণদেশীয় পুণ্ডরিকগণের অনেক ভূসম্পত্তি এবং মানসম্ভ্রম হইতেছে। পুণ্ডরিক-সমাজে এই শ্রেণীর পুঁড়োগণই অধুনা অনেক উন্নতি করিয়াছে। ইহারাই সেন্‌সসের রিপোর্টে পুণ্ডরিক নাম লেখাইয়া বৈশ্যবর্ণ নামে অভিহিত হইয়াছে। আজকাল দেশে যে আভিজাত্য-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে অধিকাংশ নিম্নবর্ণের হিন্দু বৈশ্য হইয়া উঠিতেছেন। পূর্ব্বে যাহাদের কোনরূপ নামগন্ধ ছিল না, এমন অনেক জাতিও বৈশ্য পদবীতে বর্ত্তমানে উন্নীত; পুণ্ডরিকগণ অধুনা বৈশ্য বলিয়া সমাজে পরিচিত। আমরা যতদুর পারি, অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি পুণ্ডরিক-সমাজের মধ্যমপক্ষীয়গণই বর্ত্তমানে এই সমাজে অত্যুন্নত।

বাউরিয়া শ্রেণীর পুণ্ডরিকগণ বলে যে, আমাদের জাতির মধ্যে আমরাই প্রধান, কেন না আমরা কোন দিন কোন হীনকার্য্য করি না, বিশেষ আমরা উচ্চবর্ণের হিন্দুগণের সমতুল্য আচার-ব্যবহার করিয়া থাকি। আমরা শূদ্রজাতি নই। ভারতে শূদ্র বলিয়া যে এক শ্রেণীর জাতি আছে, তাহারা বৈদিককালের আর্য্যগণের দ্বারা পরাজিত জাতি। তাহারাই এই ভারতের আদিম অধিবাসী। আমরা আর্য্যবর্ণ, আমরা কখনও কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের দাসত্ব করি নাই, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ একদিন এই বঙ্গদেশে একটী অতি বিস্তৃত স্বাধীন রাজ্য গঠন করিয়াছিলেন, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন তাহার রাজধানী। আমাদের পূর্ব্বনাম পৌণ্ড্র নহে—পৌণ্ড্য। রাজা যযাতির অনেকগুলি পুত্র জন্মে, তাহার মধ্যে পৌণ্ড্য একজন। যে সময় যযাতি যৌবন-লাভের জন্য ব্যাগ্র হইয়া পুত্রগণের নিকট যৌবনপ্রাপ্তির আশা করিয়া প্রবঞ্চিত হন, তখন তাহার পুত্রগণের অধিকাংশই পিতার অসন্তুষ্টির ভয়ে দিগ্বিদিকে পরিব্যাপ্ত হন। যে পুত্র তাঁহাকে যৌবন দিয়াছিল, তিনিই পরিশেষে সাম্রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন। অপর পুত্রগণ বিতাড়িত হইয়াছিল। এই বিতাড়িত নৃপকুমারগণের মধ্যে পৌণ্ড্যও একজন। ইনিই হস্তিনা পরিত্যাগ করিয়া এই জল-জঙ্গল সমাকীর্ণ সমুদ্রতটশালিনী বঙ্গভূমিতে উপস্থিত হইয়া বাস করিয়াছিলেন। ইঁহারি বংশীয় পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নামে নৃপতি যে রাজ্য সংস্থাপন করেন—সেই স্থানের নামই প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বা পাণ্ডুয়া। এই পাণ্ডুয়া-দেশজাত বলিয়া অধুনা আমরা পৌণ্ড্রজাতি বলিয়া গণ্য হইয়াছি। আবার এই পৌণ্ড্য নামক রাজার তিনপুত্র। পরাশর, পরশুরাম, পুরঞ্জয়। এই তিন মহাত্মা আচার অনুষ্ঠানে আস্থাবান্ হইয়া বেদবিধিসঙ্গত ক্রিয়া-পদ্ধতিতে এতদুর উন্নত হইয়াছিলেন যে, ইঁহারা কালে আমাদের জাতির গোষ্ঠিপতি হইয়াছিলেন।

এই তিন মহাত্মার নামে আমরা অদ্যাপিও "গোত্র" উল্লেখ করিয়া আসিতেছি। বর্ত্তমানে পুঁড়ো বলিয়া যেখানে যে সম্প্রদায়ই থাকুক না কেন, সকলই এই তিন গোত্রজ। কালে যখন আমাদের জাতির প্রভাব হীন হইতে লাগিল, তখন আমরা বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া বহুস্থানে অধিবাস করিতে লাগিলাম।

যে সময় শোলেমান কোরানী গৌড়ের বাদসাহী তক্তে উপবিষ্ট ছিলেন, তখন আমাদের জাতির প্রতি তাহার কুদৃষ্টি পড়ে। সেই বাদসাহী অত্যাচারে আমরা ছত্রভঙ্গ হইয়া এই বর্ত্তমান হীন অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছি। কিছুকাল পরে আবার আমাদের এই পৌণ্ড্র জাতির জীবনে এক মহা শুভদিনের সূত্রপাত হয়। বিদ্যাধর নামে একজন ক্ষমতাশালী ধনী ব্যাক্তি আমাদের জাতির মধ্যে একটি মহা-সম্মিলন ক্রিয়া করিতে "একজাই" করিয়াছিলেন। এই সময় বঙ্গীয়, রাঢ়ী, বারেন্দ্র বৈদিক এই শ্রেণীত্রয়ের ব্রাহ্মণগণ বিদ্যাধরের দানে অসন্তুষ্ট হইয়া আমাদের সংস্রব পরিত্যাগ করেন। অর্থলোভে তৎকালের কতকগুলি অশিক্ষিত অজ্ঞ ব্রাহ্মণ আমাদের পৌরোহিত্য করিতে সম্মত হইয়া পতিত হইলেন। অদ্যাপি আমাদের পুরোহিত বংশে অনেক স্থানে ব্রাহ্মণের উচ্চ উপাধি আছে।

তাহার পর, বিদ্যাধরের একজাই কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে না হইতে অর্থের লোভে অপর কতকগুলি চতুর ব্যক্তি ব্রাহ্মণ সাজিয়া আমাদের ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিলেন; এইজন্য অদ্যাপিও একটা প্রবাদ আছে যে, আমরা পুরোহিতের অন্ন আহার করি না, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যহীন ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মণ হইয়া চলিতেছেন বলিয়া কিছু সময় আমাদের জাতির মধ্যে স্থানে স্থানে এরূপ ব্যবহার ছিল; কিন্তু তাহা ১১০৩ সালের "পৌণ্ডরিক একত্তিতে" অর্থাৎ পৌণ্ডরিক সম্মিলনে রহিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আমরা শূদ্র জাতি নহি—বর্ত্তমানে শূদ্রত্ব আসিয়া পড়িয়াছে বটে। বিদ্যাধরের একজাই সময়ে সমগ্র পৌণ্ড্রজাতি তিনজন গোষ্ঠিপতির নামে পরিচিত হয়, উহাই অদ্যাপি প্রচলিত আছে। এই তিন ব্যক্তির গোষ্ঠিতে বর্ত্তমান পৌণ্ড্রজাতি কৃষ্ণপক্ষীয়, মধ্যমপক্ষীয়, আর বাউরিয়া নামে অভিহিত হইয়াছে। আমরা আমাদের ব্রাহ্মণ-গণের কুকার্য্যেই বর্ত্তমানে স্পর্শদোষ-দুষ্ট জাতি মধ্যে গণ্য হইয়াছি। অদ্যাপিও আমাদের জাতিতে কেহ কোন বেদবিধি বিবর্জ্জিত কার্য্য করে না। এখনও আমাদের জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণাদি জাতির ন্যায় বিবাহ, শ্রাদ্ধ, তর্পণ ও পূজাপদ্ধতি প্রচলিত আছে।

এখন কথা হইতেছে যে, এই বাউরিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত পৌণ্ডরিকগণের মতে বিশ্বাস স্থাপন করিলে দেখিতে পাই যে, প্রকৃতই ইহারা যযাতিপুত্র পৌণ্ড্ররাজার রওণজাত জাতি। আবার ঐতিহাসিক যুগের প্রমাণ বলে ইহাদের কথায় এই পুঁড়ো জাতিকে অতি পুরাতন বঙ্গীয় অধিবাসী বলিয়া গ্রহণ করিতে কোন বিঘ্নই দেখিতে পাওয়া যায় না। নব্য এবং প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ একবাক্যে ইহাদিগকে প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরের অধিবাসী বলিতে কুণ্ঠিত নহেন। সুতরাং বর্ত্তমান পুঁড়ো অর্থাৎ পৌণ্ডরিক জাতি পৌরাণিক পৌণ্ড্রজাতি হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার পর, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে উল্লেখ আছে যে, ক্ষত্রিয়ের উগ্র বীর্য্যে বৈশ্যানী

উদরে। জন্মিল পৌণ্ডক জাতি অবনী ভিতরে।' পুরাণের এই সাক্ষ্য গ্রহণ করিলেই ইহারা জল-চল জাতি হয়। আজ কাল যে আভিজাত্য যুগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে এই বর্ত্তমানের জল-চল পুঁড়ো জাতিও হিন্দুর উচ্চবর্ণের অভিমান করিবে, ইহা অসঙ্গত নহে। বিশেষতঃ বিগত সেন্‌সস্ রিপোর্টে সমগ্র পুঁড়োজাতি এই প্রমাণ দেখাইয়া গভর্ণমেণ্টে দরখাস্ত করিয়া পৌণ্ডরিক নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহাদের জাতি মধ্যে কোন ধারাবাহিক তত্ত্ব লিখিত বা প্রচলিত নাই, অথবা এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ কোনরূপ 'কারিকা' কিংবা 'কুলপঞ্জিকা' প্রস্তুত করেন নাই; সুতরাং ইহাদের মৌখিক কথাকেই প্রমাণ মধ্যে গণ্য করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতে হইতেছে।

উল্লিখিত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের শ্লোক হইতে অনুমিত হইতে পারে যে, যুগমাহাত্ম্যে বৈশ্যানীর গর্ভে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে পৌণ্ড্রজাতির উৎপত্তি হওয়ায়, ইহারা মাতৃজাতি প্রাপ্ত হইয়া বৈশ্য হইয়াছে। ইহাদের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া হইতেও ইহাদিগকে বৈশ্য বলা যাইতে পারে। অধুনা ইংরাজী শিক্ষার বলে ইহারা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীন যে পদই লাভ করুক না কেন, পঞ্চাশ বর্ষ পূর্ব্বে ইহারা সকলেই যে কৃষিজীবী ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। নানাবিধ তরকারী ও হরিদ্রা মৌরী আদা প্রভৃতি মসলা উৎপন্ন করাই ইহাদের প্রধান কার্য্য। কৃষিকার্য্যই পুরাণমতে বৈশ্য-বর্ণের মুখ্য-কার্য্য, বৈশ্যানীর গর্ভে উৎপন্ন হওয়া ও ঐতিহাসিক বিপ্লবে মুসলমান রাজগণ কর্ত্তৃক স্বদেশ হইতে বিতাড়িত ও হৃতসর্ব্বস্ব হওয়ায় কৃষিপ্রধান বঙ্গে ইহারা কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়াছে। কৃষ্ণপক্ষে পুণ্ডরিক সম্বন্ধে অন্য এক অনুমানও উপস্থিত হয়। যশোর, খুলনা, বরিশাল প্রভৃতি জেলার বারজীবি-জাতির মধ্যে দুই সম্প্রদায়ের বারুই দেখা যায়; কৃষ্ণপক্ষ বারুই ও শুক্লপক্ষ বারুই। কৃষ্ণপক্ষ বারুয়ের অপর নাম মগের বারুই। প্রায় দুইশত বর্ষ পূর্ব্বে এই অঞ্চলে মগদিগের অমানুষিক অত্যাচার ছিল। এই অত্যাচার-নিবন্ধন এই অঞ্চলের ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ বারুই প্রভৃতির মধ্যে একটী "মগো" থাক হইয়াছে। বারুইজাতির মগোদল মগো নাম অতি ঘৃণিত বলিয়া কৃষ্ণপক্ষ বারুই নাম লইয়াছেন। সম্ভবতঃ প্রতিবেশী বারুইগণের অনুকরণে মগো পুণ্ডরিক কৃষ্ণপক্ষ পুণ্ডরিক নামে পরিচিত হইয়াছে।

বঙ্গে দুই শত বর্ষ পূর্ব্বে মোগল পাঠানগণের জয় পরাজয় ও আধিপত্য স্থাপন লইয়া অপর জাতিগণের প্রতি অনেক প্রকার অত্যাচার ও উৎপীড়ন চলিয়াছিল। সেই সূত্রে গৌড় পাণ্ডুয়া রাঢ় প্রভৃতি দেশে ইসলামবাহিনীর যেরূপ গতিবিধি হইয়াছিল, তাহাতে কত উচ্চ শ্রেণীর জাতিকে স্থানচ্যুত হইয়া নিম্ন বঙ্গের অধ্যুষিত প্রদেশে বসবাস করিতে হইয়াছে। যাহাদের ধনসম্পত্তি ছিল না—যাহারা দেশ হইতে ব্রাহ্মণ, গুরু-পুরোহিত, ক্ষৌরকার প্রভৃতি আনিতে পারেন নাই, তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া নিম্নবঙ্গের হিন্দুশ্রেণীর নিম্নস্তরে অবস্থিত করিতে হইয়াছিল। কে জানে, কালে পুরাতত্ত্বানুসন্ধান ফলে কোন নিম্ন শ্রেণী কোন মহজ্জাতির অধঃপতিত শাখা বলিয়া প্রমাণিত হইবে! পৌণ্ড্রকজাতীয় লোকসমূহ যে রাঢ়দেশ হইতে এই দেশে নবাগত তাহার আর একটী প্রমাণ পাওয়া যায়। পঞ্চাশ বর্ষ পূর্ব্বে এই অঞ্চলে তরকারীর ব্যবহার

অতি অল্প ছিল। নদীমাতৃক নিম্নবঙ্গে মৎস্যের অভাব ছিল না। সকলই যথেষ্ট পরিমাণে মৎস্য ব্যবহার করিত। তরকারী আদি রাঢ় অঞ্চলেই অধিক পরিমাণে ব্যবহার হয়। সম্ভবত পৌণ্ডরিকগণ এই দেশে তরকারীর চাষ নাই দেখিয়া তাহাদের আগমনের সময় হইতে তরকারীর চাষ আরম্ভ করিয়া এতদিনে তরকারীর ব্যবহার শিক্ষা দিয়াছে। প্রাচীনগণের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে ৮০ আশি বর্ষ পূর্ব্বে এই অঞ্চলে পটল পাওয়া যাইত না—৪০ চল্লিশ বর্ষ পূর্ব্বে পালং শাকের নাম এ অঞ্চলের লোকে শ্রুত ছিলেন না— মিষ্টকুষ্মাণ্ড এই দেশে নবাগত বলিয়া "বিলাতি কুষ্মাণ্ড" নামে পরিচিত। যশোহর, খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলার অনেক লোক এখনো "সজিনা খাঁড়া, পুঁই শাক" প্রভৃতি আহার করিতে শিখেন নাই। এই অঞ্চলে বহুল পরিমাণে যে শ্রেণীর বেগুণ হয়, তাহা কলিকাতা অঞ্চলের লোকে দেখিলে না হাসিয়া থাকিতে পারিবেন না। ইহাতেই আমরা অনুমান করিতে পারি যে, রাঢ় অঞ্চলের পৌণ্ডরিকগণ এই দেশে আসিয়া স্বদেশী তরকারী প্রস্তুত করিতে করিতে অধুনা এই দেশের লোককে তাহার ব্যবহার শিক্ষা দিয়াছে।

পূর্ব্বে যে কৃষ্ণপক্ষীয় পৌণ্ডরিকদিগের গৃহ মধ্যে পিতৃমাতৃর অস্থি রাখিবার কথা বলিয়াছি তাহা বোধ হয়, মগদিগের সংস্পর্শে প্রচলিত হইয়াছিল। মগদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি শব সমাধিস্থ করে। কেহ কেহ শবদাহ করিয়া দগ্ধাবশেষ সমাধিস্থ করিয়া থাকে। পৌণ্ড্রক জাতির গৃহ মধ্যে অস্থি প্রোথিত রাখার প্রথা, বোধ হয়, মগসংস্পর্শে ঘটিয়াছে। ইহাও কৃষ্ণপক্ষীয় পুড়োগণের মগো পৌণ্ড্রিক নামের দ্বিতীয় প্রমাণ। বস্তুতঃ পৌণ্ড্রক জাতি যে আদিতে একটা বড় জাতি মধ্যে গণ্য ছিল, তাহার আরো প্রমাণ আছে।

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, ১২০৩ সালের পূর্ব্বে এক সম্প্রদায় পৌণ্ড্রিক তাহাদের পুরোহিতের অন্ন আহার করিত না; ইহা পৌণ্ড্রজাতির পূর্ব্বতন বংশমর্য্যাদার দৃষ্টান্ত। তাহারা তাহাদের আদিবাস স্থানে সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ দেখিয়া আসিয়াছিল। নবনিবাসে আসিয়া কৃষিকার্য্য করার জন্য এদেশীয় সদাচাররত ব্রাহ্মণগণ তাহাদের কার্য্য করিতে এবং জল গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না, সুতরাং পৌণ্ড্রিকগণ নিম্নস্তরের ব্রাহ্মণের দ্বারা যাজন-কার্য্য সম্পন্ন করাইতে বাধ্য হইল। কিন্তু পূর্ব্বসংস্কারে এই নিম্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের অন্নগ্রহণ করিতে তাহারা স্বীকৃত হইল না। ইত্যাদি কারণে আমরা অনুমান করিতে পারি যে, পৌণ্ড্রিকজাতি বৈশ্যবর্ণ হইবে তাহার সন্দেহ নাই। ইতিহাসের গূঢ়তত্ত্ব অনুসন্ধিত হইলে বঙ্গের অনেক স্পর্শদোষ দুষ্ট নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর মৌলিকতত্ত্ব বাহির হইবে।

আমাদের এই ক্ষুদ্র আলোচনায় শিক্ষিত সম্প্রদায় আকৃষ্ট হইলে, ভরসা করি, পৌণ্ড্রিক জাতির সঙ্গে অনেক নিম্নবর্ণের ঐতিহাসিকতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবে।

শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য

পিপ্‌রাবার প্রাচীন লিপি।

এ পর্য্যন্ত যত সুপ্রাচীন ব্রাহ্মী খোদিতলিপি বাহির হইয়াছে, তৎসমুদয় মধ্যে পিপ্‌রাবা নামক স্থান হইতে আবিষ্কৃত ভগ্নস্তূপাভ্যন্তরস্থ প্রস্তরপাত্রে অঙ্কিত ব্রাহ্মী লিপিই সর্ব্বপ্রাচীন বলিয়া পরিগণিত। ইংরাজীতে ইহার বিবরণ বিবৃত হইয়াছে, বাঙ্গালায় হয় নাই। আমাদের সর্ব্বসাধারণের এই অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়টী কেবল কতিপয় ইংরাজীশিক্ষিত লোকের মধ্যেই কি থাকিবে? তাই আজ আমি ইহার বিবরণ বাঙ্গালা ভাষায় বিবৃত করিতে প্রয়াস করিতেছি।

পিপ্‌রাবা একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত নেপালপর্ব্বতের উপত্যকাদেশের বস্তি নামক জেলায় অবস্থিত। এখানে একটী প্রাচীন স্তূপের ভগ্নাবশেষ পরিদৃষ্ট হওয়ায়, উহা ইংরাজী ১৮৯৮ সালে উত্তরপশ্চিমের গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক খনিত হয়। খুঁড়িতে খুঁড়িতে ১৮ ফিট্ মৃত্তিকার নীচে ৪´৪´´×২´×৮½´´×২´২½´´ পরিমিত একটী পাথরের সিন্দুক পাওয়া যায়। সেই সিন্দুকের অভ্যন্তরে মুক্তা প্রবাল সোণারূপা ও নানাবিধ মূল্যবান্ প্রস্তরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্র পুষ্প পক্ষী ত্রিরত্ন স্বস্তিক প্রভৃতি বহুবিধ দ্রব্য ও মাকড়া পাথরের কতিপয় পাত্র ও একটী অতি সুন্দর স্ফটিকের পাত্রও পাওয়া যায়। কতিপয় বড় বড় লোহার প্রেক্ও তাহার ভিতর থাকে। স্ফটিকপাত্রটী অতি সুন্দর, তাহার ঢাক্‌নীর ধরিয়া তুলিবার স্থানটী একটী সুন্দর মৎস্যাকারে নির্ম্মিত; মৎস্যের অভ্যন্তর সুবর্ণের তারদ্বারা বেষ্টিত।

ঐ মাকড়া পাথরের পাত্রগুলির অন্যতম একটী পাত্রে অঙ্কিত লিপিই আজিকার আমার এই প্রবন্ধের আলোচ্য পিপ্‌রাবার প্রাচীন লিপি।

পাত্রটী খুরা দেওয়া গোলাকার [illegible] হইতে নির্ম্মিত। উহার ঢাক্‌নী আছে, ঐ ঢাক্‌নীর গলদেশে গোলাকারে অঙ্কিত ব্রাহ্মী অক্ষরগুলিই প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে আবিষ্কৃত ব্রাহ্মী লিপিসমূহ মধ্যে প্রাচীনতম।

ইহার আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু এ মত প্রচারিত হয় নাই।* ইংরাজী ১৯০৬ সালে ডাক্তার ফ্লিট্ এই মত প্রচার করেন। তিনি এই লিপির পূর্ব্বপাঠ পরিবর্ত্তিত করিয়া নূতন পাঠ অবলম্বনে যেরূপে ইহার প্রাচীনতমত্ব সিদ্ধান্তিত করিয়াছেন, তাহা ইহার পূর্ব্বপাঠ ও তৎকর্ত্তৃক কৃতপাঠ নিম্নে সন্নিবিষ্ট করিয়া সাধারণের গোচর করিতেছি।

পিপ্‌রাবার ব্রাহ্মীলিপির পূর্ব্বপাঠ—

"ইয়ং সলিলনিধনে বুধস ভগবতে সকিযনং সুকিতিভতিনং সভগিনিকনং সপুতদলনং" (ইহাই মূল)

* J. R. A. S. January 1906 page 149 দ্রষ্টব্য।

ইহার সংস্কৃত :—

"ইদং শরীরনিধানং বুদ্ধস্য ভগবতঃ শাক্যানাং সুকীর্ত্তিভ্রাতৃণাং সভগিনীকানাং সপুত্রদারাণাং।"

ইহার বাঙ্গালা :—ভগবান্ বুদ্ধের* এই শরীরনিধান (relic vase) ভগিনীগণ ও পুত্রদারগণের সহিত শাক্যবংশীয় সুকীর্ত্তির ভ্রাতৃগণকর্ত্তৃক ভগবান্ বুদ্ধের এই শরীরনিধান (relic vase) রক্ষিত হইয়াছে।

ইহার আবিষ্কারের পর প্রত্নতত্ত্ববিদেরা যখন ইহার এইরূপ পাঠ ও এইরূপ অর্থ নির্দ্ধারিত করিলেন, তখন স্থির হইল যে, পিপ্‌রাবায় এই যে ভগ্নাবশিষ্ট স্তূপটী বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহার অভ্যন্তরস্থ এই লিপিদ্বারা জানা যাইতেছে যে ভগবান্ বুদ্ধের নির্ব্বাণান্তে তাঁহার দেহাবশেষের উপর শাক্যগণকর্ত্তৃক নির্ম্মিত আটটী প্রসিদ্ধ স্তূপের মধ্যে উহা একটী। এবং যখন তাহা কপিলবস্তুতে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়, তখন এই আধুনিক পিপ্‌রাবাই সেই প্রাচীন কপিলবস্তু।

ডাক্তার ফ্লিটের পাঠ।

সুকিতিভতিনং সভগিনিকনং সপুতদলনং ইয়ং সলিলনিধনে বুধস ভগবতে সকিযনং।

ইহার সংস্কৃত :—

সুকীর্ত্তিভ্রাতৃণাং সভগিনীকানাং সপুত্রদারাণাং ইদং শরীরনিধানং বুদ্ধস্য ভগবতঃ স্বকীয়ানাং।

অর্থ—ইদং শরীরনিধানং সুকীর্ত্তের্ভগবতো বুদ্ধস্য স্বকীয়ানাং (জ্ঞাতীনাং) ভ্রাতৃণাং কীদৃশানাং ভ্রাতৃণাং সভগিনীকানাং অল্পা ভগিন্যো ভগিনীকা অবিবাহিতা ভগিন্যস্তাভিঃ সমেতানাং এবং সপুত্রদারাণাং পুত্রদারসমেতানাঞ্চ। অর্থাৎ এই শরীরনিধান অবিবাহিত ভগিনী ও পুত্রদারগণসমেত যশস্বী ভগবান্ বুদ্ধের জ্ঞাতি ভ্রাতৃগণের।

এই পাঠ পরিবর্ত্তনে বিষয়েরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পূর্ব্বপাঠানুসারে ইহা শাক্যগণকর্ত্তৃক রক্ষিত ভগবান্ বুদ্ধের শরীরনিধান বলিয়া বিবেচিত ছিল, এখন এই পাঠানুসারে স্থির হইল যে ইহা বুদ্ধের শরীরনিধান নহে, বুদ্ধের আত্মীয় ভ্রাতৃগণের ও তাহাদের অবিবাহিত ভগ্নীগণের ও স্ত্রীপুত্রগণের। সুতরাং পিপ্‌রাবার এ ভগ্নাবশিষ্ট স্তূপ শাক্যগণকর্ত্তৃক নির্ম্মিত ভগবান্ বুদ্ধদেবের দেহাবশেষের উপর নির্ম্মিত স্তূপ নহে, ইহা শাক্যগণেরই দেহাবশেষের উপর নির্ম্মিত স্তূপ।

ডাক্তার ফ্লিটের এ আবিষ্কার নূতন ও অসাধারণ। তিনি কি প্রকারে এ পাঠ পরিবর্ত্তন করিয়া এ নূতন আবিষ্কারটী করিলেন তাহা বলিয়া দিতেছি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এ লিপিটী পাত্রটীর ঢাকনীর গলদেশে গোলাকারে খোদিত। লিপির সকল অক্ষরগুলিই এক পংক্তিতে কেবল "সকি" ও "সুকিতি" এই পদদ্বয়ের মধ্যস্থলে

উপরিভাগে "যনং" এই পদটী উত্তোলিতরূপে খোদিত। ডাক্তার ফ্লিট্ ইহাতেই বিচার করিয়াছেন। লেখক যদি 'ইয়ং সলিলনিধনে' বলিয়া বাক্য আরম্ভ করিতেন, তাহা হইলে 'সকি সুকিতি'র মধ্যস্থলে 'যনং' পদটী কেন ফেলিয়া যাইবেন, 'সকিযনং সুকিতি' বলিয়াই তিনি একযোগে খোদাই করিয়া যাইতে পারিতেন। তাহার পর যেখানে স্থানাভাব দেখিতেন, সেইখানেই না হয় অবশিষ্ট পদ তুলিয়া দিতেন; অমন মাঝখানে তুলিয়া দিবেন কেন? সুতরাং এ লিপির যিনি খোদাইকর্ত্তা, তিনি কখনই 'ইয়ং সলিলনিধনে' হইতে খোদাই কার্য্য আরম্ভ করেন নাই। তিনি আরম্ভ করিয়াছিলেন, 'সুকিতিভতিনং' হইতে খোদাই করিতে। তাহার পর, গোলাকারে খোদাই করিতে করিতে 'সকি' পর্য্যন্ত আসিয়া যখন দেখিলেন, আর স্থান নাই তখন "যনং" পদটী তুলিয়া দিলেন। লিখিতে বা খুদিতে যাইলে সচরাচর ঘটিয়াও থাকে তাহাই। এখানেও ইহাই ঘটিয়াছে বিবেচনায় ডাঃ ফ্লিট্ 'সুকিতিভতিনং' হইতে বাক্য আরম্ভ করিয়া 'সকিযনং' এই বাক্য লিপিপরিসমাপ্ত করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ পাঠ পরিবর্ত্তন করিলেন।

ডাক্তার ফ্লিটের এ সূক্ষ্মদর্শিতা প্রশংসনীয় ও তাঁহার পাঠ-পরিবর্ত্তন যুক্তিপূর্ণ। আমাদেরও বোধ হয়, ইহার এইরূপ পাঠ হওয়াই উচিত। পাঠ-পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি ইহার অর্থেরও যে পরিবর্ত্তন করিয়াছেন তাহাও সমীচীন ও ইতিহাস-বিশুদ্ধ। তৎকৃত এই অর্থ পরিবর্ত্তনেই ইহা যে একটী নির্ব্বাণ-পূর্ব্বঘটিত ঘটনার জ্ঞাপক লিপি ও সুতরাং প্রাচীনতম; ইহা সিদ্ধান্তিত হওয়ায় তিনি বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহারই এই অর্থ পরিবর্ত্তন হইতে আমরা আজ জানিতে পারিতেছি যে, পিপরাবার এই ভগ্নস্তূপ ফা-হিয়ান-পরিদৃষ্ট কপিলবস্তুর সেই শাক্যগণের দেহাবশেষের উপর নির্ম্মিত স্তূপ। যে শাক্যগণ কোশলের রাজা প্রসেনজিতের পুত্র বিরূঢ়ক কর্ত্তৃক আবালবৃদ্ধ বনিতাগণের সহিত নিহত হয়েন, এই স্তূপই তাহাদের সেই দেহাবশেষের উপর নির্ম্মিত। শাক্যগণ বুদ্ধদেবের জীবিতকালেই বিরূঢ়ক কর্ত্তৃক নিহত হয়েন, সুতরাং ফ্লিটের সাহায্যে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, এ লিপি নির্ব্বাণপূর্ব্বঘটিত ঘটনার জ্ঞাপক ও প্রাচীনতম। ফ্লিট্ কিন্তু নির্দ্ধারিতরূপে ইহার সময় নির্দ্দেশ করেন নাই, শাক্যগণের ধ্বংসের কত দিন পরে যে এ স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা তিনি ঠিক্ করিতে বলিতে পারেন নাই— তবে তিনি বলিয়াছেন যে, বিরূঢ়কের হস্তে আহত বিরূঢ়কের মাতামহ মহানামের সঙ্গে যে কতিপয় শাক্য বাঁচিয়াছিলেন হয় তাঁহাদের দ্বারা বা তাঁহাদের সন্তানগণ দ্বারা এ স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সময় সম্বন্ধে তিনি লিপির আকারানুসারে বলেন, ইহা অশোকের অন্ততঃ একশত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সুতরাং এ যাবৎ আবিষ্কৃত ব্রাহ্মীলিপিসমূহের মধ্যে ইহাই প্রাচীনতম।

ডাক্তার ফ্লিটের এই অসাধারণ প্রত্নতত্ত্ব-নৈপুণ্যের প্রশংসা করিয়া তৎকৃত ইহার এই অর্থের একটী স্থানে আমার যে কিছু বক্তব্য আছে, আমি তাহা আজ এই বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সুযোগ্য সভ্যগণকে অবগত করাইতে চাই

ও সেই সঙ্গে সঙ্গে আশা করি, তাঁহারা যেন ইহা বিচার করিয়া দেখেন যে, ডাক্তার ফ্লিট্‌কে একথা জানান আবশ্যক কি না।

আমার বক্তব্য এই যে, ডাক্তার ফ্লিট্, "সুকিতি ভতিনং" এই কথাটীর অর্থ করিয়াছেন। of the brethren of the Well-famed one অর্থাৎ সুকীর্ত্তের্যশস্বিনো বুদ্ধস্যেত্যর্থঃ ভ্রাতৃণাং ভাই কাহার—না সুকীর্ত্তির, সুকীর্ত্তি কে—না শোভনকীর্ত্তিশালী ভগবান্ বুদ্ধ।' সুকিতিভতিনং শুদ্ধ এ কথাটীর এরূপ অর্থ অসঙ্গত নহে; কিন্তু "সুকিতিভতিনং সভগিনিকনং সপুতদলনং ইয়ং সলিলনিধনে বুধস ভগবতে সকিয়নং" এস্থানে সুকিতিভতিনং ইহার অর্থ ওরূপে সঙ্গত হয় না। 'সুকীর্ত্তি-ভ্রাতৃণাং বুদ্ধস্য ভগবতঃ এই সংস্কৃত বাক্যের "যশস্বী ভগবান্ বুদ্ধের ভ্রাতৃগণের" এরূপ অর্থ সঙ্গত কি? ভ্রাতৃণাং এর সহিত সমস্ত সুকীর্ত্তিপদটী 'বুদ্ধস্য ভগবতঃ ইহার সহিত বিশেষণরূপে সম্বন্ধ হইবে কি প্রকারে? যশস্বী-ভগবান্ বুদ্ধের ভ্রাতৃগণের এরূপ অর্থে সুকীর্ত্তি ভ্রাতৃণাং বুদ্ধস্য ভগবতঃ এরূপ সংস্কৃত বাক্য হইতে পারে না; এরূপ অর্থে সংস্কৃতবাক্য করিতে হইলে করিতে হয়, 'সুকীর্ত্তির্বুদ্ধস্য ভগবতো ভ্রাতৃণাং।' সংস্কৃতে বাক্য রচনা করিতে হইলে তাহাতে যোগ্যতাকাঙ্ক্ষাসত্তি-যুক্ততা থাকা চাই, সংস্কৃত বাক্যের লক্ষণ "বাক্যং স্যাদ্ যোগ্যতাকাঙ্ক্ষাসত্তিযুক্তঃ পদোচ্চয়ঃ।" (সাহিত্যদর্পণ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ প্রথম সূত্র) সংস্কৃতে বাক্য রচনা করিতে হইলে তাহাতে এমন সব পদসমবায় ব্যবহার করিতে হয়, যাহাতে যোগ্যতা আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তির অভাব না হয়।

এখানকার এ বাক্যের অর্থ যদি হয় "যশস্বী-ভগবান্ বুদ্ধের ভ্রাতৃগণের" তাহা হইলে সুকীর্ত্তি এই পদটীর সহিত ভগবান্ বুদ্ধের এই পদটীর যোগ্যতা আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তি রাখিতে হইবে। কিন্তু ভ্রাতৃ শব্দের সহিত এই সুকীর্ত্তি শব্দটী সমাস হইয়া উহারই সহিত উহার যোগ্যতা আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তি থাকায় (১) বুদ্ধ শব্দের সহিত উহার যোগ্যতাও নাই আকাঙ্ক্ষাও নাই, আসত্তিও নাই। সুতরাং ওরূপ অর্থে এরূপ বাক্য প্রযুক্তই হইতেই পারে না। যেমন "অসাধারণ বুদ্ধি ডাক্তারস্য ফ্লিটস্য" এই সংস্কৃত বাক্যের অর্থ কি হইবে? কে বলিবে যে, ইহার অর্থ অসাধারণ যে ডাক্তার ফ্লিট্, তাঁহার বুদ্ধি। ডাক্তার ফ্লিট্ ভিন্ন বোধ হয় আর কেহই না বলিবেন না, যে ইহাই অর্থ! বস্তুতঃ তাহা নহে ইহার অর্থ—ডাক্তার ফ্লিটের অসাধারণ বুদ্ধি। ইহাও ঠিক্ সেই স্থান—'সুকীর্ত্তিভ্রাতৃণাং বুদ্ধস্য ভগবতঃ' ভগবান্ বুদ্ধের যশস্বী ভ্রাতৃগণের ইহাই ইহার নিসর্গিক অর্থ ও এই অর্থেই ইহা শুদ্ধবাক্য। ইহা সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ডাক্তার ফ্লিট্ ইহার এই—নৈসর্গিক অর্থ জোর

---

(১) পদদ্বয়ে যোগ্যতা আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তি না থাকিলে সমাসই হইতে পারে না ("সমর্থানাং সমাস" ইত্যাদি সমাস সূত্র দ্রষ্টব্য) সুকীর্ত্তির ভ্রাতৃ এরূপ অর্থে যে সমাস হয় না, তাহা নহে সুকীর্ত্তি ভ্রাতৃণাং বুদ্ধস্য এরূপ স্থলে বুদ্ধস্য সুকীর্ত্তি ভ্রাতৃণাং বলিয়া সমাস করা চলিবে না, কেন না এরূপ স্থলে সুকীর্ত্তি ভ্রাতৃকে ছাড়িয়া আসিয়া বুদ্ধের বিশেষণ হইতে পারে না।

করিয়া পরিত্যাগ করিয়া ঐ একপ্রকার অভিনব অর্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন সুকিতিভতিনং সুকীর্ত্তি ভ্রাতৃণাং ইহার অর্থ যদি করা যায় "of well famed brothers (যশস্বি ভ্রাতৃগণের) তাহা হইলে ইহা "Would hardly give any sense here" অর্থাৎ ইহার কিছুই অর্থ হয় না। পাঠকগণ দেখুন, ইহা কি অদ্ভুত যে ডাক্তার ফ্লিট্ "ভগবান্ বুদ্ধের যশস্বি ভ্রাতৃগণের" একথাটীতে কোন অর্থ খুঁজিতে পাইলেন না। তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন, সুকিতি এ পদটী ভতিনং এ পদের বিশেষণ নহে ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষের আখ্যা; তাই তিনি পালিসাহিত্য-সাগরমন্থন করিয়া স্থির করিলেন সুকিতি আর কেহ নহে, উহা বুদ্ধ। আর অমনি ব্যাখ্যা করিলেন "of the brethern of the well-famed One" কিন্তু ওরূপ ব্যাখ্যায় যে ওরূপ বাক্য গঠিত হইতে পারে না, তাহা আর তিনি একবারও বিবেচনা করেন নাই, বরং ঐরূপ উদোরপিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপানরূপ ব্যাখ্যার সমর্থনের জন্য একটী উদাহরণ দেখাইয়া বলিলেন যে, এরূপ ভাঙ্গা ভর্ত্তি করিয়া ব্যাখা চলে, যেমন সপুরিসস মোগলী-পুতস গোতিপুতস অংতে বাসিনো (আন্ধের স্তূপ নং ২, ক্যানিঙ্‌হামে ভিল্‌সাটোপে বিবৃত) এই শরীরনিধান সৎপুরুষ মোগলীপুত্রের যিনি গোতিপুত্রের শিষ্য। এখানে তিনি দেখাইয়াছেন যে যেমন এখানকার এই অন্তেবাসী শব্দ গোতির পুত্রের সহিত সম্বন্ধ না হইয়া মোগলীর পুত্রের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়াছে তেমনি এখানকার ঐ সুকিতি শব্দের ভতিনং শব্দের সহিত সম্বন্ধ না হইয়া বুধস শব্দের সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে। অদ্ভুত সমর্থন! আমাদের এ ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে কিন্তু এ সমর্থনের বিন্দুমাত্রও অর্থ প্রবেশ করিল না। পাঠকগণের নিকট ধরিয়া দিলাম তাঁহারা বিচার করিয়া দেখুন "মোগলীপুত্রস্য ইদং শরীরনিধানং গোতিপুত্রস্য অন্তেবাসিনঃ" এই সংস্কৃত বাক্যের অন্তেবাসী শব্দ মোগলীর পুত্রে নিসর্গতঃই সম্বন্ধ—না কষ্টকল্পনার সাহায্যে সম্বন্ধ, যে আমরা ইহাকে তাঁহার ঐ দোষযুক্ত ও নিরর্থক কষ্টকল্পনার সাহায্যঘটিত 'বুধস শব্দের সহিত সম্বন্ধ সুকিতি শব্দের' সম্বন্ধার্থই সমীচীন বলিয়া স্বীকার করিয়া লইব?

সুতরাং আমার বিবেচনায় ডাক্তার ফ্লিট্‌কর্ত্তৃক অমন সুন্দররূপে ও সুক্ষ্মতাসহকারে পরিবর্ত্তিত পিপ্‌রাবা-পাত্রের লিপির পরিবর্ত্তিত পাঠের অর্থ ঠিক তাঁহার মতানুযায়ী না করিয়া এরূপ করিতে হইবে যে, এই শরীরনিধান ভগবান্ বুদ্ধের যশস্বী আত্মীয় ভ্রাতৃগণের ও তাহাদের অবিবাহিত ভগিনীগণের এবং স্ত্রীপুত্রগণের।

সুকিতিভতিনং ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস না করিয়া কর্ম্মধারয় সমাস করিলে সুকীর্ত্তয়ো যে ভ্রাতরস্তেষাং সুকীর্ত্তি ভ্রাতৃণাং পদ হইবে, উহার পালিরূপই সুকিতিভতিনং।

সুকিতি শব্দ ভতিনং শব্দের বিশেষণ করিয়া ডাক্তার ফ্লিট্ যেমন দেখিয়াছেন এবং বিশেষণের কোন অর্থ হয় না বুঝিয়াছেন, আমিও তেমনি দেখিতেছি এই বিশেষণে উহার অর্থ অতি সুন্দর হইয়াছে। কারণ বুদ্ধঘোষ বলিয়াছেন, বিরূঢ়ক যখন চতুর্থবার শাক্যগণকে নিহত করিতে আসিল, তখন শাক্যগণ সশস্ত্রে বহির্গত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা ভগবান্ বুদ্ধের জ্ঞাতি, যিনি অহিংসা ধর্ম্মপ্রচার করিতেছেন সেই বুদ্ধদেবের বংশীয় সুতরাং তাঁহারাও অহিংসাপরায়ণ,

তাঁহারা সমরে নির্গত হইয়াও শত্রুকে মারিলেন না, কেবল ভয়প্রদর্শনের জন্য জ্যাঘোষাদি করিতে লাগিলেন। বিরূঢ়ক যখন তাঁহাদের এরূপ সাধুপ্রবৃত্তি অবগত হইল তখন তাহার সে দুষ্প্রবৃত্তি কিয়ৎপরিমাণে অন্তর্হিত হয়, কিন্তু শাক্যগণকর্তৃক তৎপ্রতি আচরিত অবমাননার তীব্রতা স্মরণ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল যে, যে স্বীকার করিবে যে আমি শাক্য সে অহিংসাধর্ম্মী হইলেও তাহাকে বধ করিব। তখন হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হইল। ভগবান্ বুদ্ধের জ্ঞাতিগণ অহিংসাধর্ম্মী ও সত্যবাদী—ঐ দুই ধর্ম্ম রক্ষা করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত হইলেন না। অকাতরে প্রাণদান করিতে লাগিলেন। এইরূপে অকাতরে প্রাণ দিয়া যাঁহারা অহিংসাধর্ম্ম ও সত্য-ধর্ম্মকে রক্ষা করিলেন তাঁহারা যশস্বী না তো কি? তাহারা সুকীর্ত্তিবিশেষণে বিশেষিত হইবে না তো হইবে কে?

তাই বলিতেছি, ডাক্তার ফ্লিট্ যে বিশেষণে অর্থ দেখিতে পান নাই, আমি সে বিশেষণে অতি সুন্দর অর্থ দেখিতে পাইতেছি। সুতরাং ভরসা করি, পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে এই ব্রাহ্মীলিপির: "এই শরীরনিধান ভগবান্ বুদ্ধের যশস্বী আত্মীয় ভ্রাতৃগণের ও তাঁহাদের অবিবাহিতা ভগিনীগণের এবং স্ত্রীপুত্রগণের" এরূপ অর্থই সঙ্গত কি না?

পরিশেষে বক্তব্য কলিকাতা ইণ্ডিয়ান মিউজিউমে পিপ্রাবার এই প্রাচীন লিপিপাত্র ও ঐ পিপ্রাবা স্তূপসংক্রান্ত অন্যান্য দ্রব্যনিচয় রক্ষিত হইয়াছে, ইচ্ছা করিলে সকলেই দেখিয়া আসিতে পারেন।

শ্রীবিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ

বাঙ্গালা পুঁথির বিবরণ

১। মণিহরণ পুস্তক।

আরম্ভ :

নমঃ কৃষ্ণায়॥ অথ মণিহরণ পুস্তক লিখ্যতে।

ভুমিতে মস্তক ধরি,　　গুরুকে প্রণাম করি,
　　সর্ব্ব জন কর অবধান।
বলে শুক মহামতি,　　পরিক্ষিত নরপতি,
　　শুন রাজা অপুর্ব্ব আখ্যান॥

ভণিতা :—

পূজন করিয়া সবে,　　একান্ত অন্তর ভাবে,
　　গলে বস্ত্র করয়ে স্তবন।
দুর্গাপদ হৃদে ভাবি,　　রচিল নৌতুন কবি,
　　কমলাকান্ত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ॥

পুথিখানি খণ্ডিত ১৫ পত্রাঙ্ক পর্য্যন্ত আছে। তুলট কাগজে দুই ভাঁজে লেখা। নিম্নলিখিত ছন্দগুলি গ্রন্থে যোজিত রহিয়াছে। যথা :—ত্রিপদী, পয়ার, মালঝম্প, ষট্‌পদী খর্ব্ব ও চৌপদী। গ্রন্থকার যে সংস্কৃতে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন, তাহা "শ্রীনাথে জানকীনাথে" ইত্যাদি লিখিত সংস্কৃত শ্লোকটীর অনুবাদ দেখিলেই বুঝা যায়। তাহা এইরূপ :—

জাম্বুবান বলে প্রভু শুনহ গোঁসাঞী।
শ্রীনাথে জানকীনাথে কিছু ভেদ নাই॥
তথাপি মম সর্ব্বস্ব রাম নারায়ণ।
দয়া করি সেহিরূপ ধর সনাতন॥

২। ভানুমতী উপাখ্যান।

আরম্ভ :—

নব রত্ন লয়া রাজা বসিয়ে সভায়।
হেন কালে ভাট এক আইল তথায়॥
প্রণাম করিয়া গিয়া বসিল সভায়।

ভণিতা :—

পয়ার প্রবন্ধে বন্দে গৌরীকান্ত রায়।
শীঘ্রগতি রাতারাতি কত দুরে যায়॥

অন্যত্র

পশ্চাতে বিবাহ দিব জানিবা নিশ্চয়।
রচিয়া পয়ার বৈদ্য গৌরীকান্ত কয়॥

গৌরীকান্ত একজন খুব উচ্চদরের কবি ছিলেন, তাহার কাব্যটীতে যথেষ্ট কবিত্বের পরিচয় আছে।

৩। মজনুর কবিতা।

ইংরেজ আমলের প্রথমে মজনু ফকির নামক একজন দস্যু উত্তরবঙ্গে যথেষ্ট অত্যাচার আরম্ভ করে; কবিতাটী তদবলম্বনে লিখিত। ভণিতা নাই; তবে কবিতা শেষে কেবল "সন ১২২০ সালের ১৪ই কার্ত্তিক শ্রীপঞ্চানন দাসস্য" লিখিত আছে।

আরম্ভ :—

শুন সভে এক ভাবে নৌতুন রচনা।
বাঙ্গালা নাশের হেতু মজনু বারনা॥
কালান্তক যম যেটাক কে বলে ফকির।
যার ভয়ে রাজা কাঁপে প্রজা নহে স্থির॥
সাহেব সুভার মত চলন সুঠাম।
আগে চলে ঝাণ্ডা বান ঝাউল নিশান॥

শেষ :—

তারা বলে ঈশ্বর এহি করুক।
মজনু গোলামের বেটা শীঘ্র মরুক॥
কোন দেশ হইতে আছিল অধম।
ইহাকে ভারতে থুয়া পাসরিছে যম॥

ইতি মজনুর কবি সমাপ্ত।

৪। মহাস্থানের পৌষ নারায়ণী স্নানের কবিতা।

বগুড়ার তিন ক্রোশ উত্তরস্থ মহাস্থান নামক স্থানের পৌণ্ড্র ক্ষেত্রে শাস্ত্রোক্ত যে পৌষ নারায়ণী স্নান হইয়া থাকে, ইহা তদবলম্বনে লিখিত।

আরম্ভ :—

শুন শুন সভাপতি করি নিবেদন।
নবীন কবিতা কিছু করহ শ্রবণ॥
* * * * *
মহাদেব কহিছেন চক্রপাণি স্থানে।
পাতকী উদ্ধার হবে নারায়ণী স্নানে॥
যেমন রাবণ বধের হেতু বান্ধ্যা ছিল সেতু।
পাতকী উদ্ধার হৈতে আছে এই হেতু॥
বৈশাখ মাসেত কথা উপস্থিত হৈল।
দৈব যোগে হেন কালে পৌষ মাস আইল॥
পৌষ মাসের সোমবার অমাবস্যার ভোগ।
মুলা নক্ষত্রেতে পাইল নারায়ণী যোগ॥
বাইশ রাজা সাজে যখন স্নান করিবারে।
সাহেব লোকে উমেদারেক ডাক দিয়া বলে॥
রাজা যেন মহাস্থানে চলিতে না পারে।
মহারাজা রামকৃষ্ণ চলিলেন স্নানে॥

ভণিতা ও শেষ :—

কবিতা রচিল দ্বিজ গৌরীকান্ত নাম।
নিবাস তাহার বটে নারুলি গ্রাম॥
বগুড়ার পূর্ব্ব ভাগ যেন পাড়া গ্রাম।
দ্বিজ কুলে উৎপত্তি সেই করে গান॥

সন ১২২০ সাল।

৫। ৺জীবন মৈত্রের বিষহরি পদ্মাপুরাণ।

জীবন মৈত্র বগুড়া জেলার একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। গ্রন্থখানির প্রথম খণ্ড (দেবখণ্ড) মুদ্রিত হইয়াছিল। এইরূপ বেণিয়াখণ্ড প্রভৃতি দ্বাদশ খণ্ডে পুস্তকখানি বিভক্ত ছিল। গ্রন্থখানিতে বগুড়া জেলার অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব ছিল। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এক্ষণে এই গ্রন্থখানি দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। এখনও বিশেষ চেষ্টা করিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থখানি উদ্ধার হইতে পারে। আমি মুদ্রিত ১ম খণ্ডখানি বহুকষ্টে সংগ্রহ করিয়াছি। কিন্তু তাহার প্রথম দুইখানি পাতা নাই।

প্রথমে সরস্বতী বন্দনা, নারায়ণী বন্দনা, ভবানী বন্দনা, বিষহরি বন্দনা ও গ্রন্থ-সূচনা সময়ে দুর্গার বন্দনা। পরে গ্রন্থ আরম্ভ হইয়াছে।

গ্রন্থারম্ভ।

দেবখণ্ড

নিরাকার পালা, সৃষ্টিপ্রকরণ।

নমসে পুছেন কথা সনকের স্থানে।
কেমনে হইল সৃষ্টি বলহ আপনে॥
সনক কহেন কথা নমসের স্থানে।
অবধান কর সৃষ্টি হইল কেমনে॥
জীব জন্তু নাহি ছিল নাহি তরুবর।
সবে মাত্র ছিল একা প্রভু নিরাকার॥
গাছ হইতে বীর্য্য হৈল রাত্রি হৈতে দিবা।
সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণে হৈল তিন দেবা॥
সত্ত্ব গুণে বিষ্ণু আর ব্রহ্ম রজঃ গুণে।
তমঃ গুণে মহেশ্বর হৈলা তিন ক্রমে॥
সত্ত্ব গুণে বিষ্ণু স্থিতি হইল হৃদেতে।
রজঃ গুণে ব্রহ্মা সদা থাকেন নাভিতে॥
তমঃ গুণে কণ্ঠ মধ্যে স্থাপিত শঙ্কর।
এইরূপে থাকিলেন ব্রহ্মা বিষ্ণু হর॥
ব্রহ্মারূপে সৃজন বিষ্ণুরূপে পালন।
শিবরূপে সংহার যে করে ত্রিভুবন॥

ভণিতা :—

শ্রীবংশীবদন মৈত্র জ্ঞান মহাশয়।
চৌধুরী অনন্তরাম তাঁহার তনয়॥
অনন্ত নন্দন কবি শ্রীমৈত্র জীবন।
লাহিড়ী পাড়ায় বাস বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ॥

লাহিড়ী-পাড়া গ্রাম বগুড়া জেলার

মহাস্থান নামক স্থানের করতোয়ার পূর্ব্ব-পাড়ে অবস্থিত। কবির সময়ে বগুড়া জেলায় বৌদ্ধধর্ম্মের নিদর্শন ছিল, তাহা তাঁহার গ্রন্থমধ্যস্থ নিম্নলিখিত দুই ছত্র পাঠ করিলে বুঝা যায়।

হাড়েতে হাড়িয়া হৈল কাণেতে কাণিকা।
নাভি হৈতে গর্ব্ব নাম হৈল মহাতপা।

ইহা অবশ্য হিন্দুশাস্ত্রের কথা নহে, বৌদ্ধদিনেরই কথা।

প্রথম খণ্ডের—

শেষ :—

হিমালয়ের নগরী যে পশ্চাতে করিয়া।
কৈলাস পর্ব্বতে দোহে উত্তরিল গিয়া॥
উত্তরিয়া শিব দুর্গা তথা বাস করে।
শ্রীজীবন মৈত্র রচে মনসার বরে॥

ইতি দেবখণ্ড আদিভাগ সমাপ্ত।

৬। ঊষাহরণ

উক্ত কবি জীবন মৈত্রের অন্য একখানি গ্রন্থ। একটী পত্রমাত্র পাওয়া গিয়াছে।

পত্রের প্রথমাংশ :—

মদন দেবের বেটা,　　মুখপদ্ম চন্দ্র ছটা,
　　অহিলেন উষার বাসরে।
শূন্য পথে ভর করি,　　আইলা উষার পুরী,
　　প্রহরী জাগিছে ঘরে ঘরে॥
রথ থান দূরে রাখি,　　অন্তর হইল সুখী,
　　প্রবেশিল উষার বাসরে॥
দেখিয়া উষার ঠাম,　　মদনে হানিল বাণ
　　নয়ান ভরিয়া রূপ দেখে।
কখন উষার তরে,　　বাহু পসারিয়া ধরে,
　　কখন বা চুম্বন দেয় মুখে॥

ভণিতা :—

সখির বচনে সুখ,　　বসনে ঢাকিয়া মুখ,
　　আড় চক্ষে দেখয়ে বদন।
নয়ানে নয়ানে মেলা,　　বাড়িল মদন জ্বালা,
　　বিরচিল শ্রীমৈত্র জীবন।

কবি জীবনমৈত্রের বিষহরী পদ্মাপুরাণ ও উষাহরণ পুস্তক ভিন্ন অন্য পুস্তক ছিল কি না জানিতে পারি নাই।

৭। রসকদম্ব।

প্রণেতা কবিবল্লভ। ইনিও বগুড়া জেলার একজন প্রধান কবি।

আরম্ভ :—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণচরণশরণ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীং চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

অথ রসকদম্ব পুস্তক লিখ্যতে—

(পয়ার)

আহির রাগ

জয় জয় নাগর শেখর রস গুরু।
অযাচক যাচক পুরুষ কল্পতরু॥
প্রেম রস ভক্তি দানে শুদ্ধ মহাশয়।
দোষ গুণ নাহি ধরে গুণের আশ্রয়॥

কবির পরিচয়

শেষ :—

ঈশ্বর চৈতন্য প্রেম ভক্তি রস ধাম।
ভব দুখ বিমোচন নিত্যানন্দ নাম॥
অদ্বৈত ঠাকুর গদাধর মহাশয়।
জগতে ভাসায় দিল প্রেমের নির্ণয়॥
জ্ঞানের ঠাকুর উদ্ধব দান পতি।
তাহার প্রসাদে হৈল সংসারে সুমতি॥
শ্রীকৃষ্ণ সংহিতা মাত্র করিয়া প্রধান।
পুরাণ সংগ্রহ আর করিয়া প্রমাণ॥
সঙ্গোপনীরূপে কেহো রস উপভোগী।
প্রকৃতি লক্ষণ তত্ত্ব সর্ব্ব জন লাগি॥
ভজিব কৃষ্ণের পদ প্রকৃতি স্বভাবে।
পাষণ্ড গরিষ্ঠ হৈব পরিহাস যোগে॥
প্রকৃতি শকতি বিনে কৃষ্ণ কথা নহে।
এহি মতে মহাতত্ত্ব গ্রাম্য কথা কহে॥
সে ভাব শোধন বৈষ্ণবে জানিবে।
প্রকৃতি পুরুষ তাহা বিচারে পাইবে॥
কবি দোষ ছাড়িয়া তত্ত্বে দেহ মতি।
ভজিয়া সংসার বন্ধ ছিড় শীঘ্র গতি॥

কৃপার ঠাকুর নরহরি দাস নাম।
সে পদ কমল করি সতত সন্ধান ॥
নিজ কুলে জন্মায়া সেহি বন্ধু মহাশয়।
অনুষঙ্গে করাইল প্রবন্ধ হৃদয় ॥
তাহার প্রয়োগে কিছু লিখিনু কারণ।
যন্ত্র যোগে শব্দ যেন বোলে সাধুগণ ॥
পিতৃ রাজবল্লভ বৈষ্ণবী হেন মাতা।
জন্মায়া গোচর কৈলা সংসারের কথা ॥
কৃপা করি তারা সব দিল উপদেশ।
তা সবাক কৃষ্ণ প্রেম লভুক বিশেষ ॥
করতোয়ার কূলে মহাস্থানের সমীপে।
আউরা গ্রামেতে বাস আছিল পুরবে ॥
কাল্গুনী ফাল্গুন পৌর্ণমাসী দিনে।
বিংশতীয় শকে গুরুবার শুভক্ষণে ॥
পৌচিশ অধিক পঞ্চদশ শক ছিল।
তখনই রস-কদম্ব পুস্তক রচিল ॥
সহস্রপদি পুস্তক পরম সুন্দর।
ছয় শত আর ছয় অজুত অক্ষর ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ শুন হয়া একমতি।
শ্রীকবিবল্লভে কহে করি নানা স্তুতি ॥
হস্তি বিচলিত পদামুভিত্ত্যাবিচলিত সারস্বতি।
ভীমস্তাপি রণে ভঙ্গো মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম ॥

যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং ইত্যাদি—

লিখিতং সাক্ষর খোসালচন্দ্র দাসের পুত্র শ্রীপঞ্চানন দাসের সহস্ত—সাকীন সেরপুর মরিচী পরগণে মেহমান সাহি চাকলে ভাতুড়িয়া—তরফ সৈদপুর মুদাফত কসবা পুর্ব্বপাড়া চৌরাহা। ভূপতি মহারাণী ভবানী দেব্যা পৃথ্বীপতি মহারাজা রামকৃষ্ণ রায় বাহাদুর। কট্ খরিদদার শ্রীযুক্ত উদমন্ত সিংহ রাজা সাহেব। শকাব্দা ১৭৪৭ শক, সন ১২৩২ বারাশও বত্রিশ সাল। তারিখ ১৪ বৈশাখ সোমবার শুক্লপক্ষ তিথি সপ্তমী পুষ্যা নক্ষত্র দিবা দুই প্রহর পর আড়াই প্রহর মধ্যে লেখা সমাপ্ত হইল ইতি।

৮। রামায়ণ আদ্যকাণ্ড।

প্রণেতা অদ্ভুত আচার্য্য—

৺শ্রীশ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ। অথ আদ্যকাণ্ড লিখ্যতে।—

শ্রীরাম লক্ষ্মণ পূর্ব্বজন্মং ইত্যাদিঃ—

কবির পরিচয় :—

শিবসার যুগে সুবর্ণপুর গ্রাম।
অমৃতাখ্যা নামে তাহে অতি অনুপাম ॥
আত্রেয়ী পুত্তমুখী যথা কুরুক্ষেত্র ধাম।
করোতিয়ার পশ্চিমে জাহ্নবী অনুপাম ॥
করোতয়া পশ্চিমে আত্রেয়ী উত্তরকূলে।
মহাপুণ্য স্থান সেহি পুরাণেতে বলে ॥
অজত কুণ্ডা গোমগ্রাম অধিকারী তার।
ভূমিকাসিচার্য্য সুধীর সদাচার ॥
তার ঘরে জন্মিলেন এ চারি তনয়।
মেনকা উদরে জন্ম চারি মহাশয় ॥
জ্যেষ্ঠ তিন জন হইল মহাবিচক্ষণ।
অতি মূর্খ আছিলেন কনিষ্ঠ নিত্যানন্দ।
সপ্তম বৎসর ছাওআল অক্ষর নাহি চিনে।
খেলাইতে ফেরে সদা রাখালের সনে ॥
মাঘ মাসেতে ভীম একাদশী তিথি।
স্বপ্নাদেশে সাক্ষাত হইলা রঘুপতি ॥
সঙ্গেতে জানকি দেবী শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
সিয়রে বসিয়া কহে কমললোচন ॥
রাম বলে নিত্যানন্দ কিছু গীত শুনি।
নিত্যানন্দ বলে কিছু গাইতে না জানি ॥
টোল হতে সর গোঠা লইয়া হাতেতে।
এক গুটী মন্ত্র তার লিখিল জিহ্বাতে ॥
হৃদয়েত সেই মন্ত্র করিল স্মরণ।
পূর্ব্ব অনুক্রমে রচিল রামায়ণ ॥
আদি অযোধ্যা অরণ্য কিষ্কিন্ধ্যা সুন্দর।
লঙ্কা রচিয়া সুখে রচিল উত্তর ॥
চতুর্দ্দশাক্ষরে কৈল পদের শিকলি।
লাছাড়ি রচিল * * রচিল পাঁচালি।
সপ্তকাণ্ড পুথি কৈল পয়ার প্রবন্ধে।
অদ্ভুত আচার্য্য মুখে বোলে রামচন্দ্রে ॥

শেষঃ—

রামায়ণ পর্ব্ব কথা পয়ার প্রবন্ধ।
অদ্ভুত আচার্য্য মুখে বোলে রামচন্দ্র ॥

যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং। লেখক দোষ নাস্তিক। ভীমস্যাপি রণেভঙ্গো মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম। স্বাক্ষর শ্রীরামপ্রসাদ দাস দাসস্য সাকিন ঝাওলা, তালুক ভেরাচ-ঝাড় চাকলে ফতেপুর। হিস্যে।৶০ ছয় আনী সন ১২০২ বারো সও দুই মাহে ফাল্গুন ৭ তারিখ রোজ মঙ্গলবার দুই প্রহর সময় শ্রীশ্রীরাম সহায়।

কবির নিবাস করতোয়ার পশ্চিম ও আত্রেয়ীর পূর্ব্ব বলিয়া লিখিত আছে। বোধ হয় বগুড়া কিম্বা রাজসাহী জেলায় কবির জন্মভূমি হইবে। শুনা যায় কবি নাকি রাজসাহী তাহেরপুররাজের সভাপণ্ডিত ছিলেন।

৯। চণ্ডিকা-বিজয় বা কালী-যুদ্ধ।

প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি এ পর্য্যন্ত যতগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে রঙ্গপুর প্রদেশের কোন কবির পুঁথি এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া জানি না। এই খানিই রঙ্গপুর প্রদেশের প্রথম আবিষ্কৃত পুঁথি বলিয়া মনে হয়। গ্রন্থ খানির বিবরণ সাহিত্য-পরিষৎ রঙ্গপুর-শাখা পত্রিকার প্রথম বর্ষ (১৩১৩) প্রথম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাসকুণ্ডু কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে এবং গ্রন্থখানিও ক্রমশঃ উক্ত পত্রিকায় মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

গ্রন্থারম্ভ :—

শ্রীশ্রীদুর্গার চরণ স্মরণং
শ্রীশ্রীগুরুবে নমঃ ॥
ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ ॥
নারায়ণং নমস্কৃত্যং নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

অথ কালীযুদ্ধ পুস্তক লিখ্যতে—

বন্দো গজানন, মূষিক-বাহন,
সকল সম্পদ-দাতা।
সর্ব্ব দেব আগে, তব পূজাভাগে,
তুমি দেব শিবজাতা ॥
তুমি গণপতি, পরম ভকতি,
যে তোমা স্মরিয়া যায়।
তার সর্ব্ব সিদ্ধি, রণ জয় আদি,
সব তুমি দেহ তায় ॥
গলে পাটা শোভে, অলি ভ্রমে লোভে,
পীযূষ কারণ গণ্ডে।
তাহাতে সিন্দূর, তমঃ করে দূর,
ছিন্ন দণ্ড শোভে শুণ্ডে ॥

কবির পরিচয় :—

ঘোড়া ঘাট সরকার, আক্কুয়া পরগণা তার
দিল্লীশ্বর সুতের জাগির।
চতুর্দ্ধারী মুসলমান, পুরাণের নাহি মান,
বৈসে দ্বিজ ঘর্ঘটের তীর ॥
চড়কা বাড়ীতে ঘর, যদুনাথ বংশধর,
নাম শ্রীকমললোচন।
অম্বিকা কৃপার লেশে, চণ্ডিকা বিজয় ভাবে,
শিরে ধরি শ্রীনাথ চরণ ॥

এক্ষণে আক্কুয়া পরগণা রঙ্গপুর জেলার মিঠাপুকুর থানার অন্তর্গত এবং ঘর্ঘট (ঘাঘট) নদীতীরে চড়কা-বাড়ীগ্রাম এখনও বিদ্যমান আছে। গ্রামে কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ, গোয়ালা এবং অন্যান্য হিন্দু ও মুসলমান জাতি আছে। গ্রামটী এক্ষণে রঙ্গপুর তাজহাটের স্বর্গীয় মহারাজ গোবিন্দ লাল রায় বাহাদুরের জমিদারীর অন্তর্গত। কবির বাসস্থানের চিহ্ন বা বংশধর কেহ আছেন কিনা জানিতে পারা যায় নাই। অনুসন্ধান আবশ্যক।

"দিল্লীশ্বর সুতের জাগির" দেখিয়া কবিকে দিল্লীশ্বর শাহজাহান-সুত শাহসুজার সমসাময়িক বলিয়া বোধ হয়। কারণ শাসুজা ১৬৩৯ হইতে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার সুবেদারী করেন। বাঙ্গালার সুবেদারের বাঙ্গালাতেই 'জায়গীর' পাওয়া স্বাভাবিক। তাহা হইলে কবি কমল-লোচনকে ২৫০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী বুঝা যাইতেছে।

গ্রন্থখানি ১৬৪ অধ্যায়ে বিভক্ত। মাঝে মাঝে সুন্দর সুন্দর ধুয়া (ধ্রু) আছে। যথা—

মরম কথা শুনলো সজনি।
শ্যাম বন্ধু পরে মনে দিবস রজনী॥

কবির পিতার নাম যদুনাথ। ইনিও একজন সুন্দর কবি ছিলেন। পুত্রের গ্রন্থে পিতা মাঝে মাঝে লিখিয়াছেন। যদু-নাথের নিম্নলিখিত পদটী এত সুন্দর যে, সমস্ত গ্রন্থে এমন একটী পদ দৃষ্ট হয় নাই।

আজি কি পেখনু সম্মিলিত হরগৌরী।
সকল ভজরে নয়ন যুগল মেরি॥
চাঁচর বেণী বিরাজিত কাঁহু।
কাহুপর লম্বিত বিনোদ জরাউ॥
পারিজাত মালা গলে গিরিবালা।
গিরি গণ্ডে দোলত শোহিতাক্ষ মালা॥
মণজ পঙ্ক প্রলেপ অঙ্গচারু।
চিতা ধুলি ভুষণ ত্রিজগত গুরু॥
লোহিলোহিতাম্বর অরুণ জিনিশোহা।
বাঘাম্বর কাঁহু দনুজ দল মোহা॥
হরগৌরী নিরখে গৌরী সারং লোকাইন্ত।
যদুনাথ উভয় চরণ বলি যহিন্ত॥ ১৯২ পৃঃ—

শেষ :—

সমাপ্ত হইল গীত দুর্গার চরণে।
রাঙ্গাপদ পাবো এই আশা আছে মনে॥
প্রাণ সমর্পণ করি দুর্গার চরণে।
চণ্ডিকাবিজয় ভণে কমল লোচনে॥

ইতি ১৪৬ অধ্যায় নম।

যুদ্ধ পুস্তক সমাপ্ত

লিখিতং শ্রীবিনোদবিহারী দাস সাকিন সেরপুর পূর্ব্বপাড়া বিতারিখ ১৬ ফাল্গুন রোজ বুধবার তিথি চতুর্দ্দশী রাত্রি সওয়া প্রহরকালে সমাপ্ত, ১২১৮ সাল শকাব্দা ১৭৩৩ শক।

কয়েক পাত বদলানের সাক্ষর খোসাল চন্দ্র দাসের পুত্র শ্রীপঞ্চানন দাস সাকিন তথা তারিখ ১৪ আশ্বিন ১২৩১ সাল ১৭৪৬ শক।

১০। আসকনুরি এক দিল-সার পুথি।

মুসলমানী কেতাব। গ্রন্থকার রঙ্গ-পুরের একজন মুসলমান কবি। রচনা ফারসী মিশ্রিত হইলেও নিন্দনীয় নহে।

আরম্ভ :—

সংসারের সার জান মামুদ সবার।
হইল তামাম সৃষ্টি কুদরতে তাহার॥
গোপনে থাকিয়া সেই করিছে সৃজন।
* * * * *
আপনার পুর দিয়া সৃজিল রছুল।
আখেরিয় নরি তিনি বড়ই মকবুল॥
যত ইতি পীর আসিআছে মুল্লুকের।
সকলের জোনাব বন্দি নোয়হিয়া ছের॥
সর্ব্বত্রের রক্ষক সেই সয়ালের নাথ।
মাবুদ বলিয়া তারে চিপ্তি দিবারাত॥
নুর নবির নুর দিয়া সৃজাইল বিধি।
তাঁর মতন না সৃজিল জনম অবধি॥
কহে হীন কবিকার আসক মহাম্মদ।
পড়িলে হইবে খোস রাখিবে ইয়াদ॥

কবির পরিচয় :—

বসবাস করি যেথা কদিমি মোকাম।
হরিপুর গ্রাম বলি জান তার নাম॥
রঙ্গপুর এলাকায় মিঠাপুখর থানা।
তাহার এলাকা বটে আমার ঠিকানা॥
আসফ মামুদ মোণ্ডল জান মোর নাম।
মোণ্ডলীর কার্য্য মোরা করিছি মোদাম॥

বাবাজির নাম মেরা শুন যেবাদর।
জএনুল্লা মণ্ডল নাম জান কেশবার॥
চামু সরদার ছিল মেরা দাদাজির নাম।
দেখিতে সুন্দর ছিল বড় গুণধাম॥
বারসত এ৺ চল্লিস সালের বিচেতে।
রচনা হইল পুথি জান সকলেতে॥
তেরই আশ্বিন ছিল রোজ বুধবার।
কলম করিনু বন্দ ফজলে খোদার॥
পড়িয়া শুনিয়া সবে দোআ দিবে মোরে।
আখেরে তরায় আল্লা রোজ মাহস্বরে॥
এহিতক হৈল মেরা আরজফা নাম।
সবার খেদ মতে মেরা হাজার ছালাম॥

১১। রামায়ণ উত্তরকাণ্ড।

আরম্ভ ২৬ জ্যৈষ্ঠ সন ১২৩৩ সাল।

আরম্ভঃ :—

/৭ শ্রীশ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ। জয় রঘুবংশ তিলক
কৌশল্যা নন্দন বন্দো রাম দশবদন নিধনকারী।
দাশরথি পুণ্ডরিকাক্ষঃ শ্রীহরিঃ॥
ত্রৈলোক্য বিজয়ী রাম দুর্জ্জয় দুর্ব্বার।
দুর্জ্জয় রাক্ষস মারি মুনির খণ্ডাইলে ভার॥
মুনিগণ বোলে রাম করিল পরিত্রাণ।
অযোধ্যাতে যাই রামে করিতে কল্যাণ॥
চতুর্দ্দিকের মুনি আইল রামের দুয়ারে।
দ্বারী গিয়া জানাইল রামের গোচরে॥

ভণিতা :—

দশে দিশে ব্যাপিয়া, কুটী কুটী রথ লৈয়া,
ব্রহ্মা আইল শ্রীরামের পাশে।
সকল দেবতা মিলি, আনন্দে হুলাহুলি,
নাচারি রচিল কৃত্তিবাসে॥

শেষ :—

রামপদ পায়া সভে স্বর্গপুরে বাসী।
লক্ষ্মী মুর্ত্তিমতী সীতা রামস্থানে আসি॥
ততক্ষণে হৈল রাম লক্ষ্মী নারায়ণ।
চতুর্ভুজ হইল প্রভু * * দেবগণ॥
ব্রহ্মাদি দেবগণ করে নানাস্তুতি।
চতুর্দ্দশ ভুবনে প্রভু তুমি অধিপতি॥
শ্রীরামের স্বর্গবাস করিও সঙ্কলি (?)
উত্তরাকাণ্ডে রামায়ণ সমাপ্ত পাচালি॥
বাল্মীকি মুনি রচিল রাম অবতার।
কীর্ত্তিবাসের প্রসাদে বুঝিল সংসার॥
প্রজালোক সঙ্গে রাম স্বর্গপুরে যায়।
এহি হইতে উত্তরাকাণ্ড সমাপ্তক হয়॥
যে রাজন শুনে পড়ে রামের স্বর্গবাস।
পুত্রে পৌত্রে বাড়ে সেহি রিপু হয় নাশ॥
অপুত্রে পুত্র পায় নির্দ্ধনে পায় ধন।
এক মনে শুনে যেবা যেদ রামায়ণ॥
সাতকাণ্ড রামায়ণ শুনে যেবা নরে।
অন্তকালে নিবাস তার হয় স্বর্গপুরে॥
রাম কথা শুনিলে তার লক্ষ্মীপুরে বাস।
উত্তরাকাণ্ড সমস্ত গাইল কৃত্তিবাস॥
পুস্তক উদ্ধারিল যে কৃপার সাগর।
প্রভুভক্তি মুক্তি তাহারে দিবে বর॥

ইতি বাল্মীকি পুরাণে উত্তরকাণ্ড কৃত্তিবাসী অদ্ভুতি পুথি গড়াম লেখা সমাপ্ত। "কৃত্তিবাসী ও অদ্ভুতি পুথি গড়াম লেখা" কি বুঝিলাম না*।

লিপিকার খোসালচন্দ্র দাসের পুত্র শ্রীপঞ্চানন দাস। সাকিম সেরপুর পরগণে মেহমান সাই। * * * * * *. ইতি তারিখ ২০ অগ্রহায়ণ শকাব্দা ১৭৪৮ সন ১২৩৩ * * * *

১২। শ্রীপ্রেমভক্তি চিন্তামণি।

আরম্ভ :—/৭ শ্রীহরি।

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥

* বোধ হয়, গানের লালিত্যবর্দ্ধনের উদ্দেশে কোন গায়ন কৃত্তিবাস ও অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ হইতে সাধারণের চিত্তরঞ্জনার্থ একটী সুন্দর রামায়ণ স্বহস্তে সঙ্কলন করিয়াছিলেন। প্রাচীন কৃত্তিবাসী-রামায়ণ মুল সংস্কৃতঘটিত হওয়ায়, সম্ভবতঃ উহা সাধারণের ভাল লাগিত না। সুতরাং এইরূপে কৃত্তিবাসী রামায়ণ গঠন করিয়া তিনি রামায়ণগানের উদ্দেশ্য সফল করিয়া যান। (সা৹ প৹ প৹ স৹)

শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্টং স্থাপিতা যেন ভূতলে।
স্বয়ং রূপং কদামহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকং ॥
দান্তোধৃমাদি শব্দ বস্তাখ্যা কথ্যতে বুধৈঃ।
সা দেবী হৃদয়া মধ্যাংদদাতি স্বপদান্তিকং ॥
শ্রীগুরুচরণ বন্দো সাবধানে।
প্রেমভক্তি রত্নধন পাই যাহা হবে ॥
সংসার তারণ হেতু সে পদ আশ্রয়।
কৃষ্ণপদ প্রাপ্তি অজ্ঞান পরাজয় ॥

শেষ ও ভণিতা :—

যখন যে লীলা করে * * কিশোর।
সখীর সঙ্গিনী হয়া তাতে হঙ ভোর ॥
কখন চরণ সেবা তাম্বুল যোগাঙ।
কখন মালতীর মালা গাঁথিয়া পরাঙ ॥
কখন দুহার রূপ করে নিরীক্ষণ।
চামর ঢুলাঙ করো মুখ দরশন ॥
শ্রীরসমঞ্জরী থাকি নিরবধি।
তার পাদপদ্ম রেণু মোর মন্ত্রশুদ্ধি ॥
শ্রীরতিমঞ্জরী দেবী জন্মে জন্মে,
সেই মোর পাদপদ্ম ছায়া ॥
শ্রীরসমঞ্জরী মোকে কর অবধান।
জীবনে মরণে মোর পাদপদ্ম ধ্যান ॥
ভক্তি-চিন্তামণি কিছু সংক্ষেপে কহিল।
মনে কিছু নাহি স্ফুরে অতএব রহিল ॥
বৃন্দাবনে নিত্য নিত্য যুগল বিনাশ।
প্রার্থনা করেন কিছু নরোত্তম দাস ॥

ইতি শ্রীপ্রেমভক্তি-চিন্তামণিগ্রন্থ সম্পূর্ণ। ইতি সন ১১৭৪ সাল। এক পত্রের উভয় পীঠে লেখা। পত্র সংখ্যা ৯।

প্রসিদ্ধ নরোত্তম ঠাকুরের "প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা" ও উপস্থিত প্রেমভক্তিচিন্তামণি একই গ্রন্থ কি না, অথবা এই গ্রন্থের গ্রন্থকার সেই প্রসিদ্ধ নরোত্তম ঠাকুর কি অন্য কেহ বুঝিতে পারিলাম না।

১৩। বৈষ্ণব-বিধান।

আরম্ভ :—

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্রায় নমঃ।
বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এবচ ॥
পতিতানাং * * * বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।
আনন্দে ভজহরীশ্বর ভগবান ॥
ঠাকুর বৈষ্ণব পায়ে মজাইয়া * * *
বৈষ্ণব ঠাকুর মোর করুণার সিন্ধু।
ইহলোকে পরলোকে দুই লোকের বন্ধু ॥

ভণিতা :—

বৈষ্ণবের ঘরে যদি ভৃগু কর্ম্ম করি।
তথাপি বিষয় দুঃখ সহিতে না পারি ॥
বলরাম দাসে কয় এসব বিচার।
বিষয়ীর ঘরে জন্ম নহে যেন আর ॥
সর্ব্বত্র বৈষ্ণবঃ পূজ্যঃ স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে।
দেবতানাং মনুষ্যাণাং তথৈব রৌরব রাক্ষসী ॥

ইতি বৈষ্ণববিধান সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীবৃন্দাবন শর্ম্মণঃ (এই নামটী কায়েতী নাগরী অক্ষরে লেখা আছে)

ছোট আকারের তুলট কাগজের যুগ্ম-পত্রে দুই পীঠে লেখা। পত্র সংখ্যা সাড়ে চারিখানি। অক্ষর ভাঙ্গা নাগরাক্ষরের ন্যায়।

১৪। উপাসনা পটল।

—/৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ।

শ্রীচৈতন্য প্রভুং বন্দে শ্রীরূপং শ্রীসনাতনং
তব পাদ রন্ধ্রো মধ্যাং দদান্তিয় কৃপানিধৌ।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু শ্রীরূপ সনাতন।
শ্রীগোপাল ভট্ট আর শ্রীজীব চরণ ॥
শ্রীরঘুনাথ ভট্ট আর শ্রীদাস গোসাঞী।
শ্রীলোকনাথ গোসাঞী আর কবিরাজ
গোসাঞী ॥
শ্রীআচার্য্য ঠাকুর বন্দো নাম শ্রীনিবাস।
ইঞা সভার পদরেণু মোর পঞ্চগ্রাম ॥
গ্রন্থের আরম্ভে করি মঙ্গলা চরণ।
কৃপা করি কর মোর অভিষ্ট পুরণ ॥
সাধ্য সাধন কিছু বুঝিতে না পারি।
বহু গ্রন্থ বহু শাস্ত্র নির্দ্ধারিতে নারি ॥
দুই চারি শ্লোকার্থ সংযোগ করিয়া।
তার অর্থ ভাষা করি কৃতার্থ লাগিয়া ॥

তথাহি :—

শ্রীকৃষ্ণভজননাদ্যো সদ্গুরোরাশ্রয়ং বিনা।
কুর্ব্বন্তি যে গৃহিনাং কচিৎভক্তি
স্বর্গাৎপরো ভবেৎ। ইতি—

কৃষ্ণভজনের মুল সদ্গুরু আশ্রয়।
সর্ব্বশাস্ত্রে ইহা বিনু অন্য নাহি কয়॥

শেষ ও ভণিতা :—

কৃষ্ণলীলামৃত হয় সমুদ্র অপার।
কে ইহা বলিতে পারে সম্যক প্রকার॥
যে কিছু লিখি যে ইহা ভকতকৃপায়।
দোষ না লইবা কেহ ক্ষম এই দায়॥
মোর কি সাহস লীলা বর্ণিতে কি পারি।
ভক্তপদরজমাত্র ভরসা আমারি॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈতচরণ।
দন্তে তৃণ ধরি মাঙ্গো দেহ শ্রীচরণ॥
তোমাসভার পদোদক চিত্তে অভিলাষ।
উপাসনাপটল কহে শ্রীনরোত্তম দাস॥

ইতি উপাসনাপটল গ্রন্থ সম্পূর্ণ।

যথাদৃষ্টং ইত্যাদি—

শ্রীখোসালচন্দ্র দাস সাকিম সেরপুর মরিচা, পরগণে মেহমানসাহি। শকাব্দা ১৭৩৪ শক সন ১২১৯ সাল বতারিখ ১০ পৌষ রোজ বুধবার * * তুলট কাগজে উভয় পীঠে লেখা পত্র সংখ্যা ছয়।

১৫। কৃষ্ণভক্তি-বল্লিকা।

আরম্ভ :—/৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ।

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য ইত্যাদি—

জয় জয় মহাপ্রভু কৃপার সাগর।
ভক্তিদান দিয়া মোরে করহ কিঙ্কর॥

শেষ ও ভণিতা :—

কৃষ্ণভক্তিবল্লিকা গ্রন্থের সব কথা।
শুনিতে পরমসুখ পাইব সর্ব্বথা॥
শ্রীরূপ-পাদপদ্ম শিরোপরে ধরি।
রসময় দাস কহে প্রেমের লহরী॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লিকা গ্রন্থ সম্পূর্ণ।

যথাদৃষ্টং ইত্যাদি—

শ্রীখোসালচন্দ্র দাস সাঃ মরিচা সেরপুর সন ১১৮২ সাল রঙ্গপুর তারিখ ২৮ শ্রাবণ।

১৬। বৈষ্ণব-বন্দনা।

আরম্ভ :—/৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যৌ কৃপাময়ৌ।
সর্ব্বাবতার সম্ভক্তেণ সর্ব্বভক্তজনাশ্রয়ৌ॥

আহির রাগ।

প্রাণ গোরাচান্দ মোর ধন গোরাচান্দ।
শচীর দুলাল গোরা অখিলের প্রাণ॥ ধ্রু

শেষ ও ভণিতা :—

প্রভাতে উঠিয়া পড়ে বৈষ্ণব বন্দনা।
কোনকালে নাহি পায় কোনই যাতনা॥
দৈবের দুর্লভ প্রেমভক্তি তারে লভে।
দৈবকীনন্দন কহে এই সব লোভে॥

ইতি বৈষ্ণব বন্দনা সমাপ্তং।

অক্ষর শ্রীখোসালচন্দ্র দাস। মোকাম সেরপুর পরগণে মেনমানশাহ। শকাব্দা ১৭৩৫ শক সন ১২২০ সাল। পত্র সংখ্যা ৫।

১৭। চন্দ্রকান্ত বিবরণ।

গ্রন্থখানির প্রথম পত্রখানি পাওয়া যায় নাই। তবে গ্রন্থখানির প্রথম অংশের মর্ম্ম এই যে, যখন রাজা যুধিষ্ঠির-আদি পঞ্চভ্রাতা বনগামী হন, তখন বিভাণ্ডক মুনির আশ্রমে গিয়া উপনীত হইলে, দ্রৌপদীকে দেখিয়া কথাপ্রসঙ্গে মুনিরা স্ত্রীজাতির শক্তির বিষয় বুঝাইবার জন্য সীতা-সাবিত্রীর উপাখ্যান সংক্ষেপে বলিয়া শেষে চন্দ্রকান্তের উপাখ্যানে তিলোত্তমার অদ্ভুত শক্তির বিষয় বর্ণনা করিতেছেন। প্রথম হইতে পঞ্চম পত্র পর্য্যন্ত সীতা-সাবিত্রীর উপাখ্যান। ষষ্ঠ পত্রের পর হইতে চন্দ্রকান্তবিবরণ আরম্ভ হইয়াছে।

মুনি বলে শুন তবে পাণ্ডবনন্দন।
চন্দ্রকান্ত নামে সদাগর একজন ॥
তিলোত্তমা নামে সতী তাহার কামিনী।
কহিতে সে সব কথা অপূর্ব্বকাহিনী ॥

চিত্রসেন গন্ধর্ব্ব বৈশ্বানর নামক ব্রাহ্মণ-কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া বীরভূমের শ্রীকান্ত সদাগরের ঘরে জন্মিয়া চন্দ্রকান্ত সদাগর নামে অভিহিত হন। চন্দ্রকান্তের সাধ্বী পত্নী তিলোত্তমা গুজরাটগত পতিকে অধঃ-পতন হইতে উদ্ধার করিতে যে সকল অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাই বর্ণনা করা গ্রন্থখানির উদ্দেশ্য। ইহাতে ভারতচন্দ্রের সেই বিদ্যাকে বকুল-তলায় সুন্দর দেখান প্রভৃতি অনেক ভাব-ছায়া গ্রহণ করা হইয়াছে। মাঝে মাঝে সুন্দর সুন্দর ধুয়া আছে।

শ্যামরূপ হেরি মোর জুড়ায় নয়ন।
সদা মন করে ধ্যান ও রাঙ্গাচরণ ॥
বাঁকা হয়ে বাঁশীধরে, কালোরূপে আলো করে,
রমণীর মন হরে সে ব্রজমোহন ॥

শেষ :—

টর প্রতি তবে শক্তি ঋষি কন।
নারী হৈতে মুক্ত হইল সাধুর নন্দন ॥
অতএব মহাশয় করি নিবেদন।
দ্রৌপদী সঙ্গেতে লহ করিয়া যতন ॥
শুনি তুষ্ট হইলেন ধর্ম্মের নন্দন।
বিদায় হইয়া তবে যায় মুনিগণ ॥

ভণিতা :—

অতঃপর হরি হরি বল সর্ব্বজনে।
ভাষা গীত সুললিত গৌরীকান্ত ভণে ॥

গ্রন্থকার সমস্ত গ্রন্থে 'রাশ নামে' অর্থাৎ গৌরীকান্ত নামে ভণিতা দিয়াছেন। গ্রন্থশেষে বিস্তৃত পরিচয় দিয়া গ্রন্থশেষ করিয়াছেন। তাঁহার ডাক নাম কালী-প্রসাদ দাস।

কবির পরিচয় :—

রাশি নামে ভণি আগে করেছি রচন।
এখন বিশেষ কহি নিজ বিবরণ ॥
কলিকাতা মধ্যে সুতানুটীতে নিবাস।
বৈদ্যকুলোদ্ভব নাম মাণিকরাম দাস ॥
কালীপ্রসাদ দাস তাহার নন্দন।
রচিল পুস্তক চন্দ্রকান্ত বিবরণ ॥
* * মা শ্রীদেবী চরণের অনুমতি ॥
সমাপ্ত হইল পুস্তক চন্দ্রকান্ত ইতি ॥
শ্রীল শ্রীযুক্ত দেবীচরণ প্রামাণিক।
জনক উৎসবানন্দ পরম ধার্ম্মিক ॥
সুশীল সম্পূর্ণ গুণে বিদিত সংসার।
পিতামহ রাজচন্দ্র ধন্য কীর্ত্তি যার ॥
মাতামহ কীর্ত্তিচন্দ্র কারফরমা নাম।
কীর্ত্তিমন্ত শান্ত দান্ত সর্ব্বগুণ ধাম ॥
সংক্ষেপেতে পরিচয় দিলাম ইহার।
নানা মতে তার বংশে আছয়ে প্রচার ॥
তার অনুমতি মতে করিলাম প্রকাশ।
গোপনীয় কথা চন্দ্রকান্ত ইতিহাস ॥
সুতানুটীতে ধাম এ দিন হীন অতি।
গুণ জ্ঞান নাহি ছার অতি মূঢ়মতি ॥
সাধুজনে গ্রন্থখানি দেখ একবার।
কররে গ্রহণ গুণ দোষ তিরস্কার ॥
সাধু মুখে গুণ ব্যক্ত দোষাপহরণ।
মেঘ বর্ণে বারি বর্ষে যেন অলবণ ॥
নিজে মূর্খ রচনাতে যদি থাকে দোষ।
বিজ্ঞ জনে করিলাম না করিহ রোষ ॥

যথাদৃষ্টং ইত্যাদি। স্বাক্ষর শ্রীপঞ্চানন দাস * সাকিম সেরপুর পরগণে মেহমান-সাই। * * * * সন ১২৩৮।২৩ মাঘ * * * * মোকাম রঙ্গপুর নিজ দোকানেতে পুস্তক লেখা সমাপ্ত। * * * * এ পুথি নিজের কারণ সাকিন নলডাঙ্গার শ্রীরমানাথ চাকীর ছাবার কেতাব দেখিয়া নকল করিয়া লইলাম ইতি।

পত্রসংখ্যা ৪৪ প্রকাণ্ড পুঁথি।

১৮। চৈতন্যনিত্যানন্দগীতা।

/৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণচরণপ্রসাদাৎ—

অথ শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দ গীতা লিখ্যতে।

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ শুক সনাতন।
ত্রিভুবন পূজে যার এ দুই চরণ॥
প্রণমহ ব্যাস মুনি ঈশ্বর সমান।
গৌরব প্রণতি ভাবে অনন্ত প্রণাম॥
বৈষ্ণব সমাজ বন্দো একমন চিত্তে।
বৈষ্ণব চরিত্র কহিল যে মতে॥
আপনেত ব্রহ্মা দেব হইল চতুর্ম্মুখ।
বৈষ্ণব মহিমা কৈল শুনিতে কৌতুক॥

ভণিতা :—

বৈষ্ণব ভাবিলে দয়া করেন হৃষীকেশ।
বৈষ্ণব চরিত্রকথা ভণে কালিদাস॥

শেষ :—

ত্রাহি ত্রাহি করে পাপী মুখে রাও না আইসে।
নানা দুখ পায় পাপী আপনার দোষে॥
শুন শুন নিত্যানন্দ তোরে আমি বলি।
*　*　*　*　*
লওরে সকল লোক শ্রীহরির নাম।
যে জন লাভ না তারে বিধি হইল বাম॥
আমাকে ভজিয়া লোক আনন্দে যাবে তরি।
একমন হঞা সবে জপ হরি হরি॥
শ্রীকৃষ্ণ চরণে থাকুক মোর আশ।
চৈতন্য পরম জ্ঞান ভণে কালিদাস॥

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দগীতা সমাপ্ত।

* * তারিখ ১২ ফাল্গুন রোজ মঙ্গলবার নিঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দাস তৈ সাং সেরপুর, লিখিত রঙ্গপুর।

ছোটআকারের তুলট কাগজে দুইপীঠে লেখা। পত্রসংখ্যা ১২। গ্রন্থশেষে ১৩৬ লেখা আছে। ওটী বোধ হয় শ্লোকসংখ্যা।

১৯। স্মরণ-মঙ্গল।

আরম্ভ :—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ।

শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধোশ্চরণকমলয়ো-
কেশ শেষাদ্য গম্যা
যা সাধ্যা প্রেমসেবা
ব্রজচরিত পরৈর্গা চলোনৈকলভ্যা
সাম্প্রত প্রাপ্তা যয়াতাং প্রথয়িতু মধুনা
নমীমস্ত সেবাং ভাব্যাং রাগাধ্য পান্থৈ-
র্ব্রজমমু চরিতং　*　*　*　*　*

শেষ :—

শ্রীরূপমঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিল অষ্টকালের আখ্যান॥
শ্রীরূপ চরণপদ্ম করি আশ।
স্মরণমঙ্গল কহে নরোত্তম দাস॥

ইতি স্মরণ মঙ্গল সমাপ্ত।
*॥•॥০॥শ্রীশ্রীসঃ শ্রীশ্রী

দুই ভাঁজ কাগজে দুই পীঠে লেখা, পত্রসংখ্যা ২১ ছোটআকারের পুঁথি।

২০। বৃন্দাবন-লীলাস্থান বর্ণন।

/৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ। অথ শ্রীবৃন্দাবন ধ্যান লিখ্যতে—পরং দ্বাদশবননির্ণয়ম্।

শ্রীবৃন্দাবনং যস্য লোকাং স্থানং তস্যাং মণিমণ্ডপৌ।
নানা পুষ্প বিকশিতৌ বায়ব্যাং যমুনা সিতং
তস্যান্তকং নামা পক্ষগণ বাসঃ নানা শব্দ কুতুহলং
আনন্দং শিখী নৃত্যন্তি কপোতশুকশারীকং।
ডাহকি হংস সারসাং কামোৎকণ্ঠ সুকণ্ঠকং
নিভৃতনিকুঞ্জং শ্রীরাধায়োসহ গোপীকং
সদাতস্যাং বিহরন্তিং রাধাকৃষ্ণ কুতুহলিং। ইতি
বায়ব্য কোণ হৈতে যমুনা অহিলা বৃন্দাবনে।
শ্রীবৃন্দাবনে দক্ষিণ করি মথুরা প্রদক্ষিণে॥
গোকুল প্রদক্ষিণ করি গেলা পূর্ব্ব মুখে।
প্রাগেতে গঙ্গার সহিত গেলা দুহে সুখে॥
শ্রীবৃন্দাবনের বায়ব্যে কোণে হয় ভদ্রবন॥
অষ্টক্রোশ যমুনা পরে বিচিত্র কানন॥

নানালতা নানা পুষ্প যমুনার ধার।
তাহে গোচারণ কৃষ্ণ করেন অপার ॥

শেষ ও ভণিতা :—

চৌরাশী ক্রোশ বেষ্টিত হন বৃন্দাবন।
তার মধ্যে সংক্ষেপে কহি যে এক কোণ ॥
মোর কি শক্তি যে এত কহিবারে পারি।
যা কিছু কহিনু কহাইলা গিরিধারী ॥
এই সব লীলাস্থান ভাবি মনে কর আশ।
শ্রীবৃন্দাবন মহিমা কিছু কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবনলীলাস্থান বর্ণনা সমাপ্তং—

* * লিখিতং সাক্ষর শ্রীখোসালচন্দ্র দাস তোরক সাকিম সেরপুর মরচা পরগণে মেহমান শহি। চাকলে ভাতুড়িয়া সরকার বাজুহায়।

মন্তব্য—ক্ষুদ্র পুঁথি তিনখানি মাত্র পত্রে সমাপ্ত। ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে বৃন্দাবনের প্রাচীন ভৌগলিক বিবরণ আছে। বর্ণনাও সুন্দর। গ্রন্থকার কোন্ কৃষ্ণদাস? প্রসিদ্ধ কৃষ্ণদাস কবিরাজ নহেন তো?

২১। রতিশাস্ত্র।

আরম্ভ :—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ।

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় পালন নারায়ণ।
অনন্ত আকার শক্তি ব্রহ্ম নিরঞ্জন ॥
প্রণাম করিয়া বন্দো তাহার চরণে।
রতিশাস্ত্র কথা কহি শুন সর্ব্বজনে ॥
পুরুষ প্রকৃতি যোগে জন্ম মৃত্যু হয়।
স্ত্রী পুরুষের লক্ষ(ণ) কহ শুনি মহাশয় ॥

ভণিতা :—

গর্গমুনি বোলে রাজা শুন জন্মজয়।
গোপাল দাসের স্ত্রী শাস্ত্রের কথা কয় ॥

শেষ :—

গর্গমুনি কহিল কথা জন্মজয় স্থানে।
প্রমাণ পাইয়া কর্ম্ম করে বুধ জনে ॥
রতিশাস্ত্র গুহ্য কথা শুনিলা রাজন।
সংক্ষেপে কহিলাঙ রতিশাস্ত্রের বচন ॥

রতিশাস্ত্র সংক্ষেপ রূপ সম্পূর্ণ।

স্বক্ষর শ্রীপঞ্চানন দাস তৈ মরিচা শেরপুর বলিপাড়া পরগণে মেহমানশাহী। * * বতারিখ ১৭ অগ্রহায়ণ রোজ সোমবার সন ১২১৩ সাল ইতি।

মন্তব্য :—ক্ষুদ্র আকারের তুলট কাগজে ২২ পত্রে শেষ।

২২। হরিভক্তি-উদ্দীপনং গ্রন্থ।

আরম্ভ :—/৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ।

শ্রীকিশোরীময়ি মূঢ়ে প্রসীদ।

পাষণ্ড হরিভক্তি শুৎসন কথাহঙ্কারিন
সর্ব্বদাযুষ্মাভি প্রতিপাল্যতাংস্বাদ্রব (?)
সংসার ঘোরার্ণবা নিস্তারং যদিবাঞ্ছমাচ্চুত
কথা সন্তুষ্ট সর্ব্বেপ্রিয় শ্রীমদ্বৈষ্ণবপাদপঙ্কজরজ
সর্ব্বা যে না সেব্যাতাং। ১।
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদ বন্দো সানন্দিতে।
যাহা সম সুশীতল নাহি ত্রিজগতে ॥

শেষ :—

পতিব্রতা নারী নাহি জানে স্বামী বিনে।
তেন বৈষ্ণবের অন্ন উচ্ছিষ্ট ভোজনে ॥
প্রাণান্তে না করিব শুন ধনঞ্জয়।
শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনে কথা এই মত হয় ॥

তথাহি—

যথা পতিব্রতা নারী নজ্জৎ স্বামিনং বিনা।
অন্যোচ্ছিষ্টং ন ভোক্তব্যং মানবো বৈষ্ণব স্তথা ॥

ইতি হরিভক্তিউদ্দীপনং গ্রন্থ সমাপ্তং।

স্বাক্ষর শ্রীখোশালচন্দ্র দাস তৈ সাং মরিচা সেরপুর। পত্রসংখ্যা ২৯ ভণিতা দেখা গেল না।

২৩। শ্রীসুদাম-চরিত্র।

আরম্ভ :—/৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ।

অথ শ্রীসুদাম চরিত্র লিখ্যতে—

ভাই বিফলে জনম যায় বৈয়া।
বিফল জনম সফল কর কৃষ্ণগুণ গাহিয়া। ধ্রু
কৃষ্ণ কথা কহে তবে ব্যাসের তনয়।
আনন্দে শুনেন পরিক্ষিত মহাশয়।
কহ কহ শুকদেব পরিক্ষিত বলে।
যে যে কর্ম্ম গোবিন্দ করিলা কুতুহলে।

শেষ ও ভণিতা :—

অশেষ পাতক নাশ হয় কৃষ্ণ নামে।
এই হৈতে সুদাম চরিত্র সমাধানে।
কৃষ্ণের কৃপায় দুক্ষ হৈল সমাধান।
দ্বিজ পশুরামে গায় সুদাম আখ্যান।

ইতি সুদাম চরিত্র সমাপ্ত।

শ্রীখোশালচন্দ্র দাস সাকিম সেরপুর। শকাব্দা ১৭২৬ শক সন ১২২০ সাল বতারিখ ২৮ বৈশাখ রোজ সোমবার। পত্রসংখ্যা ১৮; ছোট আকারের তুলট কাগজে লেখা।

২৪। শিক্ষা-পটল।

আরম্ভ :—/৭ শ্রীশ্রীগুরুবে নমঃ।
অন্যাভিলাষিতা। প্রথম।

আচার্য্যমাং বিজানিয়াৎ নাবণ্যে কহর্চ্চিতং
নমস্তে বুদ্ধা সর্চ্চদেবময়গুরু।

তদনন্তর একটী সংস্কৃত শ্লোক। তারপর নিম্নলিখিত গদ্য লেখা—

স্বয়ং ভগবান থাকেন কোথা, অখণ্ড পদ্মের উপর। শ্রীবৃন্দাবন স্থান সর্ব্বশাস্ত্রের প্রমাণ। অখণ্ড পদ্মের উপর পৃথিবী। অখণ্ড পদ্ম সিদ্ধা।

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সনাতন গোসাঞীকে শিক্ষা দিলা। তেহো জিজ্ঞাসিলা শ্রীবৃন্দাবন স্থান কতখানি। মহাপ্রভু কহিলেন—তাহাকে স্বর্গলোকের উপর বৃন্দাবন স্থান। সর্ব্বশাস্ত্রের প্রমাণ।

অথ পদ্মপুরাণে ইত্যাদি—

শেষ :—

চক্রধারণ আদি পদ্ম চাকির বাহিরে। অতএব বৃন্দাবন মধ্যস্থান। দিব্য চিন্তামণি ধাম। রতন মন্দির মনোহর। * * কালিন্দীজলে রাজহংস কেলি করেন। নীলকমল উৎপল তার মধ্যে রত্নাসনে বসিআছেন দুইজনে শ্যামপুরী সুন্দর রাধিকা।

ভণিতা :—

ওরূপ লাবণ্য রাশি, অমিয়া পড়য়ে খসি,
হাস্য পরিহাস সম্ভাষণে।
নরোত্তম দাসে কয়, নিত্যানন্দ রসময়,
অনুক্ষণ বাসি ও চরণে।

ইতি সাধ্যসিদ্ধি শঙ্কেত সহতি ক্রমেণ শিক্ষা-পটল সমাপ্ত।

ইতি সমাপ্ত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ চরণেভ্যো নমঃ। শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রায় নমঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণ।

সাক্ষর শ্রীযদুনাথ সরকার। পুস্তক শ্রীহরিবোল বৈরাগী সাকিম ছড়িয়া কান্দি।

মন্তব্য :—দুই ভাঁজ তুলট কাগজে উভয় পীঠে লেখা পত্রসংখ্যা ৪। পুঁথিখানি উচ্চ দরের।

২৫। রস-নির্ণয়।

এখানি সেকালের গদ্য পুঁথি। দুঃখের বিষয় পুঁথিখানির শেষ পাই নাই। প্রথম পত্র হইতে ৭ম পত্র পর্য্যন্ত পাইয়াছি। শেষ হইতে বোধ হয় বেশী বাকী ছিল না। পুঁথিখানির নাম "রস নির্ণয়" কি না তাহাও বলা যায় না। তবে পুঁথিখানির প্রারম্ভেই লেখা আছে 'রস-নির্ণয়'। তাহা দেখিয়াই উহার রসনির্ণয় নাম লিখিলাম। পুঁথিখানি কৃষ্ণলীলাবিষয়ক।

আরম্ভ :—

/৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ। অথ রস-নির্ণয়।

শব্দগুণ।১। গন্ধগুণ।২। রূপগুণ।৩। রস-গুণ। ৪। স্পর্শ গুণ। ৫। এই পঞ্চগুণ শ্রীমতীতে বৈসে। শব্দগুণ কর্ণে। গন্ধগুণ নাসাতে। রূপগুণ নেত্রে। রসগুণ অধরে। স্পর্শ গুণ অঙ্গে। এই পঞ্চগুণে পূর্ব্ব রাগের উদয়। পূর্ব্ব রাগ মূল দুই। হঠাৎ স্মরণ। অকস্মাৎ দরশন। ইত্যাদি—

পুঁথিখানিতে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় আছে। বর্ণনাও সুন্দর। বহু প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। দুঃখের বিষয় রচয়িতার নাম পাইলাম না।

২৬। হরিবংশ।

পুঁথিখানির ৩৪, ৩৬, ৩৭, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০ ও ৫১ এই কয়েকটী মাত্র পত্র আছে।

ভণিতা :—

দেখিয়া শুনিয়া রাধার বড় হৈল ধন্দ।
যুবতী বিরহ বোলে দিল ভবানন্দ॥

নিম্নলিখিত রাগগুলি গ্রন্থে যোজিত দেখা গেল। যথা—

ভূপাল, কামোদ, ভঙ্গ, কল্যাণ, শ্রীরাগ, সিন্ধুরা, কেদার, আহির ও ধান্সী। গ্রন্থখানি উচ্চদরের সন্দেহ নাই।

২৭। ধ্রুব-চরিত্র।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয় জয় অদ্বৈতচন্দ্র গৌরভক্তবৃন্দ॥

ভণিতা :—

মায়ের বচনে ধ্রুব হইলা বৈষ্ণব।
সংসার বাসনা মায়া ত্যাগিয়া সব॥

প্রণমিয়া জননীর চরণকমলে।
গোপাল ভাবিয়া বিপ্র পরশুরাম বলে॥

পুঁথিখানির ৩ খানি মাত্র পত্র পাওয়া গিয়াছে। লেখা কবিত্বে পূর্ণ। তুলট কাগজে দুই পীঠে লেখা।

২৮। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত। (অনুবাদ)

পুঁথিখানি বৃহৎ, তুলট কাগজের উভয় পৃষ্ঠে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরে ৫৭টী পত্রে সমাপ্ত হইয়াছে। মাঝে মাঝে কোন কোন পাতা নাই এবং কতকগুলি অতিশয় ছিন্ন। ইহাতে পরিচ্ছেদ বা অধ্যায় না লিখিয়া সেই সেই স্থানে "প্রকাশ" লেখা আছে। যথা—"ইতি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে প্রথম শ্লোকে মঙ্গলাচরণে শ্রীমদ্‌গুরুদ্বয় মহিমাদি-কথনং নাম প্রথম প্রকাশ।" এক এক প্রকাশে ১০টী পর্য্যন্তও শ্লোক আছে; এইরূপ ১১৫টী প্রকাশে গ্রন্থ সমাপ্ত হই-য়াছে। গ্রন্থে সংস্কৃত শ্লোক ও তাহার অনুবাদ দেওয়া আছে। গ্রন্থকার একজন প্রগাঢ় পণ্ডিত। গ্রন্থখানি মুদ্রিত হওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয়।

আরম্ভ :—শ্রীশ্রীগুরুবে নমঃ।
শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ।

নীচে একটী সংস্কৃত শ্লোক বুঝা গেল না।

বন্দো গুরু পাদপদ্ম নখাগ্র অঞ্চলে।
যাথে হৈতে বিঘ্ননাশ সর্ব্বাভীষ্ট মিলে॥

ইহার পর বৈষ্ণবাদি বন্দনা আছে। তারপর—

কৃষ্ণ কর্ণামৃত গ্রন্থ অতি মনোহর।
যাহা আস্বাদিলা প্রভু শচীর কোঙর॥
রায় (?) রামানন্দ সনে সে বিদ্যানগরে।
আস্বাদিলা কর্ণামৃত অর্থ সে দুস্করে॥
শ্রীলীলা * বাণী সমুদ্রগম্ভীর।
সমস্ত জানিতে নারে ভার যার সুধীর॥

আদ্য গ্রন্থে কৃষ্ণকেলি মাধুরী বিবর।
কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য রসে সর্ব্ব রসময় ॥
শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ভাবে মগ্ন হৈঞা।
টীকা করি আছেন গ্রন্থ শুদ্ধ করিঞা ॥
অতি ক্ষুদ্র আমি তার অর্থ কিবা জানি।
তাহাই লিখিবে সাধু মুখে যেই শুনি ॥

শেষ ও ভণিতা :—

কৃষ্ণকর্ণামৃত কথা, সমাপ্ত হইল এথা,
সভে মিলি বোলে হরি বোল।
কৈলাস আসি বন্দনে (?) সর্ব্ব প্রভুর চরণে
এ যদুনন্দন গেল ভোল।

ইতি শ্রীকৃষ্ণাকর্ণামৃত সংস্কৃত বর্ণনে শ্লোকার্থব্যাখ্যাম শ্রীযদুনন্দন দাসেন কৃতং প্রাকৃতভাষান্বিতং সম্পূর্ণ সমাপ্তং।

যথাদৃষ্টং ইত্যাদি—স্বঅক্ষরং শ্রীখোশাল চন্দ্র দাস * সাকিম সেরপুর মরচা পরগণে মেহমান শাই চাকলে ভাতুড়িয়া সরকার বাজুহার। * * শকাব্দা ১৭৩৬ শক সন ১২২১ সাল। * *

২৯। প্রহ্লাদ-চরিত্র।

পুঁথিখানির ৩, ৪, ৫ এই তিনখানি মাত্র পত্র পাইয়াছি; নিম্নে কতকাংশ উদ্ধৃত হইল।

* * * * *

এত দিনে পড় শুন কহ দেখি সার ॥
প্রহ্লাদ বলেন বাপু কৃষ্ণপদ সার।
কৃষ্ণপদ সেবা বিনে গতি নাহি আর ॥
সংসারের সার কৃষ্ণ প্রভু ভগবান।
সেই পাঠ বিনে আমি নাহি জানি আন ॥

ভণিতা :—

ভাগবত কৃষ্ণ কথা পুরাণের সার।
গায়ে বিপ্র পরশুরাম কৃষ্ণ সখা যার ॥

পূর্ব্ববর্ণিত ধ্রুব-চরিত্র ও সুদাম-চরিত্র-প্রণেতা পরশুরামই বোধ হয় বর্ত্তমান প্রহ্লাদ-চরিত্র প্রণেতা।

৩০। স্মরণ-দর্পণ।

(রামচন্দ্র দাস রচিত)

পুঁথিখানির শেষ ছিন্ন পত্রটী মাত্র পাইয়াছি। তাহা হইতে কোন প্রকারে গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নামটীমাত্র উদ্ধার হইল। অন্যান্য অংশ ভাল বুঝা যায় না। ৬ পত্রে শেষ হইয়াছে। অক্ষরগুলি বহু প্রাচীন বলিয়া বোধ হইল।

"স্মরণ দর্পণ এহি যে কহিল রামচন্দ্র দাস।"

৩১। উষাহরণ।

পীতাম্বর সেন বিরচিত। গ্রন্থখানি তুলট কাগজে সেকালের ছাপা। ২৭ হইতে ১৩৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত আছে; শেষ হইতে বোধ হয় আর বেশী বাকী ছিল না। পয়ার, ত্রিপদী, ভঙ্গত্রিপদী, চৌপদী ও ললিত এই কয়টী ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। রচনার মধ্যে রূপ বর্ণনা, বাণরাজার গড়ের বর্ণনা, খাদ্য দ্রব্যের তালিকা, বেশ বিন্যাস ও অলঙ্কার, আচার ব্যবহার ও বর ঠকানে কৌশল ইত্যাদি বিষয় প্রয়োজনীয় বটে। রচনা সুন্দর, তবে কোন কোন স্থল অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট। বর ঠকানে কৌশলের কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

নানা দ্রব্য উপভোগে আনিয়া যোগায়।
হাস্য পরিহাস করে সখী তামাসায় ॥
কদলীর মূল আনি পরিস্কার করি।
ভিতর খুলিয়া তার গাভি মূত্র পুরী ॥
নারিকেল শিশু সম করি প্রতিভাব।
রাখে ঠকাইতে বরে করি অনুভাব ॥
পকগুড়ি দিয়া নিরমিয়াছে আসন।
ঢুলিচার সদৃশ অভেদ দর্শন ॥
অবসি কুষাণ্ড ছড় করি পরিস্কার।
গব্যরস তুল্য করি ছেনার (ছানার) আকার ॥

পুষ্পধাতা সরে গায়ে শুষে ছিদ্র করে।
ধৌত বালি পুরিয়াছে তাহার ভিতরে ॥
পানের বাটায় রাখে ভেক গোটা ছয়।
তরুণ বয়েস অতি শক্তিযুক্ত হয় ॥
এই মতে নানা দ্রব্য করি আয়োজন।
পরিস্কার স্থানে রাখে করিয়া যতন ॥
স্বর্ণরেখা সহচরী বড়ই মুখরা।
জল পানে বরে ডাকে করি বহুত্বরা ॥
গাতুলুন আসুন আসুন মহাশয়।
রাত্র ভারি হইল বিলম্ব কিছু নয় ॥
সারাদিন উপবাসে হইয়াছে গত।
কিঞ্চিৎ সলিল পান করণ উচিত ॥
'ভাল—বলি গাত্রোত্থান করিলা সুধীর।
চলিল সত্বর গতি গঞ্জিয়া হস্তির ॥

* * * *

জল পান করি যদুবংশ চূড়ামণি।
তাম্বূলের পাত্র লৈল নিজ হস্তে টানি ॥
দেখে সব সখিগণে করে কাণাকাণি।
এইবার ঠেকিলা যাদব গুণমণি ॥
হরিষে হরির নাতি হাতে লৈল বাটা।
দেখি মনে মনে হাসে স্বর্ণরেখী ঠেঁটা ॥
ইষারায় সব হস্তে ঢাকুনি খুলিল।
লম্ফ দিয়া চারিদিকে মণ্ডুক পড়িল ॥
খল খল হাসি সখী উঠিল সবাই।
দেখি বলে একি ঠাকুর জামাই ॥
একি অপরূপ হে নাগর গুণচয়।
কোথা হৈতে আনিলে মণ্ডুক গুটি ছয় ॥
আই আই লাজে মরি কওয়া নাহি যায়।
হারাষিত নয় হরি পাইল কোথায় ॥
লজ্জায় যাদব সে নীরব হয়ো রয়।
অবলা প্রবলা সে হইল অতিশয় ॥
চন্দ্রবতী স্বর্ণরেখার করয়ে ভৎ'সনা।
শিশুতা নিতান্ত তব নাহি বিবেচনা ॥
আজি কি তামাসা তোর না করিলে নয়।
ইহার পরে আর তামাসা নাহি হয় ॥
চিত্রাবতী কহে কিছু হাসিয়া হাসিয়া।
ওর মত নাহি দেখি ভাল পিটে মেয়ে ॥
অলপ বয়েস কিন্তু তস্করের আধি।
গাছে নাই উঠিতে নাবায় এক কাঁদি ॥

পীতাম্বর সেনের সদা দ্বিজ পদে আশ।
রচিলা পুস্তক উষাহরণ ভাষ ॥

যদিও এখানি ছাপার পুথি কিন্তু সেকালের "কু" এর আকৃতি "ঙ্গ" এর ন্যায় এবং "র্ণ" "স্তু" এর ন্যায়ই রহিয়াছে।

৩২। এমাম যাত্রার পুথি।

মুসলমানী কেতাব। রচক জেলা বগুড়ার মহিচরণ ও গৈনারী কান্দি সাকিনের শ্রীদুর্গতিয়া সরকার সাহেব। পুঁথিখানি নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। গদ্য ও পদ্যে লেখা। ফারসী শব্দ প্রায়ই নাই। ভাষা নিম্নশ্রেণীর কথিত ভাষার ন্যায়। পুস্তকের প্রথম বন্দনাটী উদ্ধৃত হইল।

আল্লা আর রছুলেরে চিন্‌লিনারে মণ।
আলেরে হিসাবের কালে নাহি অন্যজন ॥
আওয়াল গুরু বন্দি গাবো মুরসিদের চরণ।
দুওম গুরু বন্দি গাবো বাবাজির চরণ ॥
ছুওম গুরু বন্দি গাবো মাতাজির চরণ।
আখেরি হিসাবেরকালে নাহি অন্যজন ॥

সরস্বতী বন্দনা—

আয়মা সরস্বতী তুমি আমার মা।
মা অনাথ বালকে ডাকে শুনে শুন না ॥

৩৩। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ

(পদ্যানুবাদ)

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম খণ্ড।

এখানি উক্ত পুরাণের পদ্যানুবাদ; সেকালের হস্ত নির্ম্মিত কাগজে—(বোধ হয় কাঠের অক্ষরে) মুদ্রিত। প্রকাণ্ড গ্রন্থ; দুঃখের বিষয় খণ্ডিত। ৭ম পত্র হইতে ৪২৬ পত্র এবং ৪৪৮ অধ্যায় পর্য্যন্ত আছে; কিন্তু নিতান্ত জীর্ণ। আকার 'ফুলস্কেপ সাইজ' হইতে অল্প ছোট। শেষ

হইতে মাত্র এক অধ্যায় বাকী ছিল। শেষের পত্রটীতে নায়ক এবং শ্রোতাগণের আশীর্ব্বাদের কথা আছে। ৭ম পত্রটী নিতান্ত জীর্ণ ও অবোধ্য বলিয়া ৯ম পত্রের প্রথমাংশ উদ্ধৃত হইল।

রাধাকৃষ্ণ বিলাস।

পয়ার :—

নারায়ণ বলে শুন মহা তপোধন।
কৃষ্ণের বচন শুনি *　*　*
রাধাকৃষ্ণে প্রণমিয়া অতি ভক্তি চিতে।
স্থানান্তরে গেলা সবে মুনির সহিতে ॥
রাধা গেল কলারূপে কামেতে মগনা।
হাসিয়া হাসিয়া বক্র চঞ্চললোচনা ॥
দিলেন মালা চন্দন কায়ে পুনর্ব্বার।
নানা মতে পরিহাস করে পরিহার ॥
শ্রীকৃষ্ণ রাধার লীলা নিজ অঙ্গ পরে।
চুম্বন করিলা গণ্ড কপোল অধরে ॥

ভণিতা :—

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণে সুধাস্বাদ।
নারায়ণ আর নারদের সুসংবাদ ॥
শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ড অমৃত সাগর।
সুত শৌনকে কথন মহাপাপ-হর ॥
একশত বত্রিশ অধ্যায়ে সমাপন।
শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গীত গায় শ্রীরামলোচন।

শেষ :—

কোন চিন্তা নাই চিন্তামণি নিস্তারিবে।
যাঁহারা ভকতি করি এ গান শুনিবে ॥
মম নিজ পরিচয় জনকের নাম।
পূর্ব্বে নিবেদন করিয়াছি যথা ধাম ॥
বিশিষ্ট রূপেতে আর বলি পরিচয়।
অবধান কর সব শ্রোতা মহাশয় ॥
রামশরণ দাস শ্রীরাম তুল্য জন।
আমার প্রপিতামহ সেই শান্ত হন ॥
পিতামহ নাম কৃষ্ণকেশব প্রচার।

দুঃখের বিষয় ইহার পর আর পাতা নাই, থাকিলে বিস্তৃত পরিচয় জানা যাইত।

মম নিজ পরিচয় জনকের নাম।
পূর্ব্বে নিবেদন করিয়াছি যথা ধাম ॥

প্রথমের অপ্রাপ্ত পত্র কয়েকখানির ভিতর বোধ হয় কবির পিতার নাম ও বাসস্থানাদির বিবরণ ছিল। আমরা প্রাপ্ত গ্রন্থাংশের সমস্ত পত্র অনুসন্ধান করিয়া কবি সম্বন্ধে এতদতিরিক্ত কিছুই পাইলাম না। এখানি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের একখানি সুন্দর অনুবাদ।

৩৪। হরিনাম কবজ।

আরম্ভ :—৴৭ শ্রীশ্রীগুরুবে নমঃ।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
চৈতন্য গোসাঞী কহে শুন শচীমাতা।
অবধৌত নিতাইর আমি লইব বার্ত্তা ॥
জন্মিছে অবধি তার বার্ত্তা নাহি পাই।
এই হেতু তোমাতে পুছো শুন দেবী মাই ॥
শচি বোলে শুন * * বাছা নিমাই।
আঁখির পুতুলী তুমি মোর আর কেহ নাঞি।
শুনিয়া শচীর কথা চৈতন্য মহাশয়।
নিত্যানন্দ সহিতে আমি মিলিব নিশ্চয় ॥
এত বুলি প্রণমিয়া মায়ের চরণে।
হরিষে বিদায় করি চলে ততক্ষণে ॥

শেষ ও ভণিতা :—

অবৈষ্ণবে কদাচিত না করিহ প্রকাশ।
নিবেদন কৈল এহি গোপীকৃষ্ণদাস ॥

চৈতন্য। ইতি চৈতন্যনিত্যানন্দসম্বাদে হরিনাম কবজ সম্পূর্ণ।

৫ খানি দুই ভাঁজ কাগজে দুইদিকে লেখা। বহুকালের প্রাচীন পুঁথি। লিপিকারের নাম বা তারিখ নাই।

৩৫। সাধ্য-চন্দ্রিকা।

আরম্ভ :—

৴৭ শ্রীরাধাকৃষ্ণজী। অথ সাধ্য-চন্দ্রিকা।
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য ইত্যাদি—

শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রাণপতি জীবনে মরণে।
শ্রীগুরু হইতে পান সর্ব্ব * জনে ॥
এমন দয়ার নিধি শ্রীগুরু গোসাঞি।
তাহার কৃপায়:* দেখ হেন ধন পাই ॥
প্রথমে মন্ত্র কৃপা করি কুল উদ্ধারিলা।
অন্ধকার ঘুচাইয়া মাণিক্য বসাইলা ॥
জ্ঞানচক্ষু দিয়া দীপ্তি প্রকাশ করিলা।
ভক্তি খড়্গ দিয়া কর্ম্মসূত্র কাটিলা ॥
কর্ম্মের নাম সব বিস্তার করিয়া।
বর্ণাশ্রম কৈল দূর দাসাখ্যাতি দিয়া ॥
সাধক বসাইলা তবে নাম ধরি।
তৎপরে থুইলা নাম সিদ্ধিমঞ্জরী ॥
সাধ্য-সিদ্ধের যত করণকারণ।
সংক্ষেপে কহিলা কথা শুন সর্ব্বজন ॥

শেষ :—

শ্রীবৃন্দাবনে নিত্যলীলা যুগল-বিলাস।
সাধ্য-চন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস ॥

ইতি সাধ্যচন্দ্রিকা গ্রন্থ সমাপ্ত।

তারিখ ২০ কার্ত্তিক রোজ * * বার বেলা * * সপ্তঘাট হইতে সমাপ্ত গ্রন্থ। লিপিকারের নাম ও তারিখ নাই, অতি পুরাতন তুলট কাগজে দুই ভাঁজে উভয় পৃষ্ঠায় লেখা। পত্রসংখ্যা ১১।

৩৬। সিদ্ধান্ত-চন্দ্রিকা।

আরম্ভ :—

/৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মন্তঃকলুষ খণ্ডনম্।
ভক্তিপ্রকাশকং দেবং নিজপ্রেমপ্রদায়কং ॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
জয় নিত্যানন্দ প্রভু করুণা হৃদয় ॥

শেষ ও ভণিতা :—

জয় জয় শ্রীচৈতন্য শ্রীগুরুগোসাঞি।
মোরে কৃপা কর মোর আর কেহ নাই ॥
শ্রীগুরুচরণপদ্ম হৃদয়ে অধিকা।
সমাপ্ত হইল গ্রন্থ সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা ॥
শ্রীগুরুচরণ পথ হৃদে করি আশ।
সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা কহে রামচন্দ্র দাস ॥

ইতি সিদ্ধান্তচন্দ্রিকায়াং ব্রজেন্দ্র * * শচীসুত কথনে নাম পঞ্চম-প্রসঙ্গ। পত্র-সংখ্যা ৭। বাঙ্গালা দুইভাঁজ কাগজে উভয় পৃষ্ঠায় লেখা। লিপিকারের নাম ও তারিখাদি নাই। লেখা তত পুরাতন বোধ হয় না।

৩৭। সহজামৃত।

আরম্ভ :—

/৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণৌ জয়েতাং। সহজামৃত গ্রন্থ লিখ্যতে।

বন্দে হংসাবরণং যস্য লীলা ধামা প্রকাশিত।
গোবিন্দচরণারবৃন্দ তৎস্থানং ত্রিপাদ্যঃ মুনসং ॥
আচার্য্যং প্রবরকর্ত্তা শ্বেতদ্বীপ বেষ্টিতং।
তমোহং নিত্যানন্দো যদ্ধপং ইন্দ্রাদিনি ভবেৎ।

শেষ ও ভণিতা :—

নিতাই চৈতন্য পাদপদ্ম করি আশ।
সহজামৃত কহে শ্রীমুকুন্দ দাস ॥

ইতি শ্রীসহজামৃত গ্রন্থ সমাপ্ত ইতি—

তুলট কাগজে উভয় পৃষ্ঠে লেখা। পত্রসংখ্যা ৮। লিপিকারের নাম বা সনাদি নাই।

৩৮। সহজ-রসামৃত।

পূর্ব্বোক্ত "সহজামৃত" গ্রন্থ ও এই সহজ-রসামৃত একই গ্রন্থ। আশ্চর্য্যের বিষয়, দুইখানিতেই পৃথক নামের ভণিতা আছে। সহজামৃত খানিতে মুকুন্দদাসের ও সহজরসামৃত খানিতে কৃষ্ণদাসের ভণিতা আছে। কে 'আদত' গ্রন্থকার এবং গ্রন্থের 'আদত' নাম কোনটী এখন ইহাই বিবেচ্য। ভণিতা ব্যতীত উভয় গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে মিল আছে। উভয় গ্রন্থের ভণিতা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

নিতাই চৈতন্য পাদপদ্ম করি আশ।
সহজামৃত কহে শ্রীমুকুন্দ দাস ॥ (সহজামৃত।)
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ পদে যার আশ।
সহজরসামৃত কহে দুখী কৃষ্ণদাস ॥
(সহজ-রসামৃত।)

গ্রন্থ দুইখানি পৃথক লিপিকার দ্বারা লিখিত। বর্ত্তমান খানির পত্রসংখ্যা ১১। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ হইতে ছোট আকারের কাগজে লিখিত। সর্ব্বশেষে এইরূপ :—'ইতি সহজ-রসামৃত গ্রন্থ সমাপ্ত' ইতি।

যদ্ দৃষ্টং তৎ লিখিতং দোষকো নাস্তি পাটা অর্থে (পাঠার্থে ?) শ্রীকৃষ্ণদাস বাউল।

লিপিকার মহা পণ্ডিত।

৩৯। দ্বাদশ-কোরক বা বৃন্দাবন-কোরক।

আরম্ভ :—

প্রথমে একটী সংস্কৃত শ্লোক * দুর্ব্বোধ্য বলিয়া উদ্ধৃত করিতে পারা গেল না।

তারপর—

রত্ন চিন্তামণি দুই একত্র করিঞা।
বলরাম আস্বাদিল নির্যাস করিঞা ॥
চিন্তামণি সুখোল্লাস বলরাম জানে।
অনঙ্গমঞ্জরী হেন প্রেম আস্বাদনে ॥
অনঙ্গমঞ্জরীর গুণ কহিতে না পারি।
যার প্রেমে সদা ভোর কিশোরকিশোরী ॥
রমণী হইয়া সুখ করে আস্বাদন।
কহিএ তাহার কিছু বৃত্তান্ত বর্ণন ॥
রসোল্লাস প্রেমোল্লাস ভাবোল্লাস যত।
কহিব তাহার কথা আনন্দসম্মত ॥

শেষ ও ভণিতা :—

অনঙ্গচরণে মুঞি সদা করি আশ।
দ্বাদশ-কোরক কহে বৃন্দাবন দাস ॥

ইতি বৃন্দাবন-কোরক সম্পূর্ণ। দ্বাদশ-কোরক সমাপ্ত।

পাঠক শ্রীকৃষ্ণদাস বাউল। সন তারিখ কিছু নাই। তুলট কাগজে দুই পিঠে লেখা। পত্রসংখ্যা ১৪।

৪০। প্রেমবিলাস।

আরম্ভ :—৴৭ শ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ।

নমো নলিননেত্রায় বেণুগীতবিনোদিনে।
রাধাধরসুধাপান-শালিনে বনমালিনে ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ইত্যাদি—

শেষ ও ভণিতা :—

শ্রীরূপ চরণ পদ্ম হৃদয়ে বিলাস।
প্রেমবিলাস গ্রন্থ কহেন শ্রীনরোত্তম দাস ॥

ইতি প্রেমবিলাস সমাপ্ত। পাঠকদার শ্রীশিবনাথ দাস। রাজবংশীকুলে জন্ম। জিলা রাজসাহী পরগণে মেহমান সাহী। ডিহি নিমগাছির মোতালক থানা * * তারিখ ২৩ কার্ত্তিক। রোজ সোমবার আর্দ্ধে দুই দণ্ড গতে সমাপ্ত সন ১২৫৪ সাল বাঙ্গালা। তুলট কাগজে দুই পিঠে পত্রসংখ্যা ৭।

৪১। শনির পাঁচালী।

আরম্ভ :—

৴৭ শ্রীশ্রীসরস্বতীং নমঃ। শ্রীগণপতয়ে নমঃ। * * * চন্দ্রায় নমঃ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥
প্রথমে বন্দিব আমি জগতের পতি।
দ্বিতীয়ে বন্দিব আমি লক্ষ্মী সরস্বতী ॥
অষ্টলোক পাল বন্দো মুঞি দেব চূড়ামণি।
তার পুত্র বন্দো মুঞি দেবের গ্রহ শনি ॥
নরলোকে পুজে যাথে গ্রহের কারণ।
* * * অন্যের কার্য্য পুজে দেবগণ ॥

শেষ ও ভণিতা :—

শনির পাচালী ভাই শুন সর্ব্বজন।
যাথে পীড়া না করিব সূর্য্যের নন্দন ॥

এহি পুস্তক যেবা শুনে বারমাস।
শনির পাচালী রচিল কবি কালিদাস ॥

এতানি মাত্রেন পাঁচালী সমাপ্ত। ইতি শনির পাঁচালী সমাপ্ত। স্বক্ষর লিখিতং শ্রীকৃষ্ণনাথ দাশ কর্ম্মকার। সাকিম সেরপুর। পরগণে মেহমান সাহী। ঋ ঋ ঋ ঋ ঝ ঝ ঝ ঝ ল ল ল ল ক ক ক ক স স স শ শ শ ষ হ ক্ষ। "ঋ ঋ ঝ ঝ" এগুলি লেখা কেন বুঝিলাম না।

ক্ষুদ্র আকারের তুলট কাগজে উভয় পৃষ্ঠে লেখা। পত্র সংখ্যা ২৭। অক্ষর অতি সুন্দর। সন তারিখ নাই।

৪২। কৌপীন বহির্ব্বাস-তত্ত্ব।

আরম্ভ :—

কহ সাধু ভাই আখ্যান তোমার।
কোথা উপাসনা হৈল কোথা পরিবার ॥
দীক্ষা শিক্ষা দুই স্বরূপ কোথায় ভজিলা।
সিংহের ভেক তুমি কোথায় পাইলা ॥
পরিচয় দিয়া সাধু কহে তত্ত্ব কথা।
পরিচয় পাইলে হয় মনের সুখতা ॥
অকপট হয়া কহ কপট করি দুর।
কোথায় পাইলা ভেক কৃষ্ণ ভক্তস্বর ॥
কোন ভাবে ভেক আশ্রয় কৈল গৌরহরি।
হেন ভেক জীবে নৈল কোন শক্তি ধরি ॥
কি খাই জীবে ভেকে ভেকের দেবতা কে।
এ সব পরম তত্ত্ব ভেদ ভাঙ্গি দে ॥
শুন অহে সাধু লোক * * প্রেম কথা।
ডোর কপ্নি পরিয়া মুড়াইছ মাথা ॥
* * * * * *
* * * * * *
এবে এক কথা মোর পড়িয়াছে মনে।
কি কারণে কৌপীন পরিলা সাধু জনে ॥
ভিতরে পরিছ কৌপীন উপরে বহির্ব্বাস।
কোন সম্বন্ধ হয় তাহা কহোত নির্য্যাস ॥
কৌপীন বিসে কোন ভাবের কারণ।
বহির্ব্বাসে ঢাকে কোন ভাবের কারণ ॥

শেষ ও ভণিতা :—

শ্রীরূপ-সনাতন পদে যার আশ ॥
কৌপীন বহির্ব্বাসতত্ত্ব কহে কৃষ্ণদাস ॥

ক্ষুদ্র আকারের তুলট কাগজে উভয় পৃষ্ঠে লেখা। পত্র সংখ্যা ৫।

৪৩। উদ্ধব-সংবাদ।

আরম্ভ :—শ্রীহরি।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সুধাংশুভোং হর্য্যস্তি।
তং বেদশাস্ত্রাপরিনিষ্ঠিত শুদ্ধবুদ্ধিং চর্ম্মাম্বরং।
সুর মুনীন্দ্র:নুতং * * ইত্যাদি—
কৃষ্ণ কথা সুখময় অমৃতের ধারা।
পদে পদে নব নব শ্রুতি মনোহরা ॥
হরিগুণ শ্রবণে ভহি বাড়াইর মতি।
পরম কারণ হরি অগতির গতি ॥

শেষ :—

এতেক বুলিয়া প্রভু হইলা নিঃশব্দ।
উদ্ধব-সম্বাদ কথা হইল সমাপ্ত ॥

যথাদৃষ্টংতথা লিখ্যাতে। সহ অক্ষর মিদং শ্রীদিনরাম সেনস্ত সাকিন বরেয়াবাড়ী পরগণে বড়বাজু সন ১১৯৪। সদ:পরগণা। ভণিতা দেখা গেল না। তুলট কাগজে উভয় পৃষ্ঠে:লেখা। পত্র সংখ্যা ২০।

৪৪। রোগ-নির্ণয় গ্রন্থ।

প্রথম পত্রের প্রথমাংশ নাই, শেষাংশ এইরূপ :—

সর্পগতি ভেক গতি যদি হয়ত ধমনী।
বাত পৈত্তিক * * * এই সে বাখানি ॥

সন ১২৫৩ সাল তারিখ ২ আষাঢ় শুক্রবার। পুস্তক শ্রীগোবিন্দচন্দ্র শর্ম্মণ কবিরাজ। সাকিন তেকাসী (?) পরগণে গোনাদশী হিস্তা ॥৵৹ নয় আনা। দুই ভাঁজ তুলট কাগজে দুই পিঠে লেখা। পত্র সংখ্যা ৪।

৪৫। নলোপাখ্যান।

আরম্ভ :—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ।

অথ নলদময়ন্তীর উপাখ্যান লিখ্যতে :—

নল পর্ব্বের কথা অমৃতসমান।
শুনিলে পাতক ক্ষয় বৈকুণ্ঠে হয় স্থান॥
শুনিলে শ্রবণে সুখ নরক এড়ান।
শুনিলে পবিত্র হয় সর্ব্বত্র কল্যাণ॥

ভণিতা :—

জীবনে আছে কি কাজ, হাহা পুত্র হংসরাজ,
তুমি সে মোর প্রাণপতি।
কি ক্ষণে পোহাল রাতি, আজি ছাড়িলেন পতি,
কেন বিধি দিলেন দুর্গতি॥
সত্যবতী সুত ব্যাস, করিল প্রকাশ,
শ্লোক বন্দে ভবেত রচিল।
সেহি সব কথা লেশে, রামনারাণ ঘোসে,
পদ বন্ধে সঙ্গীত করিল॥

গ্রন্থখানি বহু দিনের প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না। ইহাতে ম্লেচ্ছরাজ ও অন্যান্য দেশের কথা আছে। যথা :—

রাজার আজ্ঞাতে দূত চলিল শীঘ্রগতি।
অনুক্রমে ভেটাইল যতেক নৃপতি॥
হস্তিনা মথুরা কাশী উত্তর কোশলা।
মগধ চম্পক মায়া অবন্তী মিথিলা॥
হীরাখণ্ড দ্বারখণ্ড দ্বারি উৎকল।
কলিঙ্গ কৌশিকী অঙ্গ পট্টচল॥
পাঞ্চাল কম্বোজ পুর আর মন্ত্রেশ্বরী।
একচক্র পঞ্চবটী কাঞ্চি ভদ্রাপুরী॥
এ সব রাজ্যের রাজা নানা রত্ন লয়া।
ভক্তি ভাবে নল পায়ে দণ্ডবৎ হইয়া॥
দিব্য অশ্বগণ লয়া যতেক নৃপতি।
সম্ভ্রমে ভেটাইলেক করিয়া প্রণতি॥
শোণিতপুরের রাজা হরষিত মনে।
কর লয়া প্রণমিল নলের চরণে॥
মণিপুর রত্নাবতী দশার্ণ মৎস্য অধিপতি।
*   *   *   *   *
চিকিকামপুর কোচ ত্রিপুরা তেলঙ্গ।
ম্লেচ্ছরাজ মিলিলেক পশ্চাৎ কি রঙ্গ॥
বলিন্দ্র দ্বিপদ শুশকর্ণ.পদ এক।
দীর্ঘ নাশা নৃপতি কোটিল নিশেদেক॥

শেষ :—

জয় মুনি বোলে শুন রাজা জন্মেজয়।
ভারত প্রস্তাবেত পুণ্যের উদয়॥
পুণ্য শ্লোক নলরাজা পুণ্যশ্লোক যুধিষ্ঠির।
পুণ্যশ্লোক বৈদেহী পুণ্যশ্লোক জনার্দ্দন॥
এই চারি স্মরে যেবা প্রভাত সময়।
তাহার শরীরে পাপ না রহে নিশ্চয়॥

ইতি নল-প্রস্তাব সমাপ্ত।

পত্র সংখ্যা ৩৪ ; লিপিকারের সন তারিখ নাই।

৪৬। চাণক্যের শ্লোক (অনুবাদ)

আরম্ভ :—

৮শ্রীশ্রীদুর্গাঃ। চাণক্যের শ্লোক লিখ্যতেঃ—

নানাশাস্ত্রোদ্ধৃতং বক্ষ্যে রাজনীতিসমুচ্চয়ং।
সর্ব্বশাস্ত্রমিদং বীজং চাণক্যসারসংগ্রহঃ॥
তত্রার্থঃ
হরগৌরী পাদপদ্ম ভাবিয়া হৃদয়।
সর্ব্ব শাস্ত্র বিজয়ী চাণক্যের উদয়॥

শেষ :—

ব্রহ্মহাপি নরঃ পুজ্যো যস্যাস্তি বিপুলং ধনং।
*   *   *   *   *   *
তত্রার্থঃ
আছ মরি পুন ধন যে সবের ঘরে।
ব্রহ্মবধি হইলে লোকে পুজে তাকে॥

৬১টী শ্লোক ও তদর্থ আছে। দুই ভাজ কাগজে ৩টী পত্রে শেষ। লিপিকারের নাম ও সন তারিখ নাই।

৪৭। শ্রীমদ্ভাগবত

শ্রীগুরবে নমঃ

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততোজয়মুদীরয়েৎ॥

কৃষ্ণায় যাদবেন্দ্রায় জ্ঞানমুদ্রায় যোগিনে।
প্রণত ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোপীনাথ গোকুলনন্দন ॥
বৃন্দাবন চন্দ্র ব্রজরমণীজীবন ॥

শেষ ও ভণিতা :—

শ্রীগদাধর জ্ঞান ধীর শিরোমণি।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস বাণী ॥

ইতি নবম স্কন্ধ সমাপ্ত

গ্রন্থ খানির কোন কোন স্কন্ধে গ্রন্থের নাম কৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিণী লিখিত আছে। শকাব্দা ১৬৪৬ চৈত্রের ২২ তারিখ রোজ শনিবার। * *

স্বাক্ষরমিদং * * পরগণে সেনবর্ষ তালুক শ্রীযুক্তা কুনিসৈদানী গোসান্দি। শ্রীসৈদনাথ ওয়াজেদার। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সরকার সিকদার সরকার সন ১১৩১ সাল। * *

পত্র সংখ্যা ১৮৩ সংখ্যা। এইরূপ লেখা আছে—"১১॥৵"।

৪৮। জৈমিনি ভারত।

আরম্ভ :—

৺শ্রীচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

গোবিন্দং সুরবন্দিতং গিরিবরং গোপীকুলং
দেবেশং জলশায়িনং সুরধরলক্ষ্মীপুরীকেশ্বরং।
দৈত্যারিং বনমালীং ভগবতং মায়াধীনং
বামনং গোবিন্দং রঘুনন্দনং হরিহরে
বন্দেব নারায়ণং ॥ জয়তি পরাশর সুত
সত্যবতী হৃদয়নন্দন ব্যাস। যস্তাস্ত কমলমুখং
ললিতমমৃতং রসমায়া জগতো পিবতি।
প্রণামহো নিরঞ্জন পুরুষপ্রধান।
প্রণমহো ব্যাসদেব গুণের নিধান ॥
অস্ত্রে শস্ত্রে বিশারদ মহিমা অপার।
কলিযুগে হৈল যেন বিষ্ণু অবতার ॥
প্রতাপে তপন যেন বিপক্ষের কাল।
পৃথিবী পুরিল তার যশের অপার ॥
সুলতান আলালেক্কন গৌরনাথ।
ত্রিপুরার যারজ্য সমর্পিল যার হাথ ॥
রাঙ্গা টুপী সমে দিন লস্করে কাপড়া।
সোনার পালঙ্ক দিল একশত ঘোড়া ॥
শ্রীযুত লস্কর পরাগল খান মহামতি।
দরিদ্র খণ্ডন করে অনাথের পতি ॥
কুতুহলে পুছিলেন সকল কাহিনী।
কি মতে পাণ্ডবে হারাইল রাজধানী ॥
কাননে বঞ্চিল কেনে দ্বাদশ বৎসর।
কোন কার্য্যে তারা ছিল বনের ভিতর ॥
বৎসরেক ছিল কেনে অজ্ঞাত বসতি।
কেমনে পৌরষে পাছে আইল বসুমতী ॥
মহামুনি ব্যাসদেব রচিল ভারত।
সংহিতা করিয়া রচে পঞ্চত্রিংশত ॥

ভণিতা :—

কবিন্দ্রে কহএ কথা ভারত পুরাণ।
নারী পর্ব্বের কথা এই সমাধান ॥

শেষ :—

বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত সমান।
মুনিবরে কহিলেন জন্মেজয় স্থান ॥
ইহাকে শুনিতে জীব না করিহ হেলা।
কলি ভব সাগরেতে কৃষ্ণনাম ভেলা ॥
ইহা জানি সর্ব্ব জীব হৈয়া একমন।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্মরণ করহ সর্ব্বক্ষণ ॥

ইতি স্বর্গারোহণ পর্ব্ব সমাপ্ত।

ইতি অষ্টাদশ পর্ব্ব জয়মুখী ভারত সমাপ্ত।

পত্র সংখ্যা ৩৭৪; লিপিকারের নাম নাই। অক্ষর অতি সুন্দর ছাপার অক্ষরের ন্যায়। কবির নিজের হস্তাক্ষর বলিয়াই মনে হয়।

৪৯। কালীবিকাস

পুঁথি খানির ৯ম পত্র হইতে ১২৮ পত্র পর্য্যন্ত আছে। বাঙ্গলা কাগজে সেকালের কাঠের অক্ষরে মুদ্রিত। কয়েক পত্র ছিন্ন বলিয়া ১৭ পত্রের একটী গান নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

অথ তেজোময়ীর সাকার বর্ণনা।

রাগিনী সরফরদা তাল আড়খেমটা।

তব তত্ত্ব কে জানে গো তারিণী।
কখন প্রকৃতি তুমি কভু পুরুষ শুনি॥
কিঞ্চিৎ মাহাত্ম্য তব অন্তরে বুঝিয়া ভব
পদতলে শিব ছলে পড়েছেন আপনি॥

ভণিতা :—

পাগলের বেশ শঙ্করে হেরে।
রাণীর নয়নে সলিল ঝরে॥
কালীর চরণ করে স্মরণ।
দ্বিজ কালিদাস করে রচন॥

এই পুস্তক খানিতে প্রাচীন কালের দুই খানি চিত্র আছে; একখানি হর-বিবাহ ও অন্য খানি মহিষমর্দ্দিনীরূপ।

৫০। জয়দেব।

এ খানি জয়দেবের গীতগোবিন্দের পদ্যানুবাদ। প্রাচীন কালের কাঠের অক্ষরে মুদ্রিত। ৩য় পত্র হইতে ১৩৬ পত্র পর্য্যন্ত আছে। ৩য় পত্রের প্রথমাংশে এইরূপ—

মেঘাবৃত চন্দ্র পুনঃ বহে সেইখানে।
টীকা করি এইমত করিয়া বাখানে॥
শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত এক আছয়ে পুরাণ।
তাহাতেই এইমত করয়ে বাখ্যান॥
শ্রীপ্রবোধানন্দ গোসাঞি প্রভুর প্রিয়তম।
দুই পক্ষে বাখ্যা তার অত্যন্ত সুগম॥
তিঁহো কহিলেন খন্তোগের পর লিখি।
তাহা কিছু লেখি এই তাঁর আজ্ঞা দেখি॥
নন্দের আদেশেতে চলিলা দুই জন।
এই মত হয় অন্য টীকার লিখন॥

অনুবাদের নমুনা।

শ্লোক

ললিত-লবঙ্গ-লতা-পরিশীলন কোমল-মলয় সমীরে।
মধুকর-নিকর-করম্বিত-কোকিল-কুজিত-কুঞ্জ-কুটীরে।
বিহরতি হরিরিহ সরস বসন্তে।
নৃত্যতি যুবতী জনেন সমং সখি বিরহী জনস্য দুরন্তে॥

অনুবাদ

ললিত লবঙ্গ লতা তাহার মিলনে।
কোমল মলয় বায়ু বহে অনুক্ষণে॥
মধুকর নিকর বেষ্টিত সব ঠাঞি।
কোকিল কুজিত কুঞ্জ কুটীর সদাই॥
বিরহিণী জনে বহু দুরন্ত বিশেষ।
বসন্ত মলয় তাহে বৃন্দাবন দেশ॥

৫১। কবিকঙ্কণ-চণ্ডী

প্রাচীন কাঠের অক্ষরে বাঙ্গালা কাগজে মুদ্রিত ১০ম হইতে ৪৯৪ পত্র পর্য্যন্ত আছে। নিম্নে গ্রন্থমধ্যস্থ হরগৌরীর বিবাহ অংশ উদ্ধৃত হইল।

মঙ্গল রাগ।

হিমন্তে হরিষে, কিঙ্কর আদেশে,
আনন্দ দুন্দুভি বাজন।
অমর নাগ নর, আসিবে মোর ঘর
যে মোর হয় বন্ধুজন॥
সকল দোষহীন, আজি সে শুভ দিনে,
গৌরীর বিবাহ মঙ্গল।
খমক বেণী বীণা, মৃদঙ্গ ভেরী নানা,
বাদোতে হইল কোলাহল॥
আসিয়া দ্বিজগণ, করিল শুভক্ষণ,
আঙ্গিনায় বান্ধিল ছান্দোলা।
মণি মুকুতা ছান্দা, উপরে টানায় চান্দা,
চৌদিকেতে দীপমালা॥
প্রথমে দ্বিজকুল, লইয়া তণ্ডুল,
করিল স্বস্তিক-বাচন।
আরোপি হেমঘটে, যুগল কর পুটে,
গণেশ করি আবাহন॥
পার্ব্বতী রূপবতী, হরিদ্রাযুত ধুতি,
পরিয়া বসিলা আসনে।
যতেক দ্বিজমুনি, করয়ে বেদধ্বনি,
গৌরীর গন্ধাদি বাসনে॥
মহী গন্ধশীলা, দূর্ব্বা পুষ্পমালা,
ধান্য ফল ঘৃত দধি।
স্বস্তিক সিন্দুর, কজ্জল কর্পূর,
শঙ্খ দিল যথা বিধি॥

ধাক্কিল কর সূত্র, প্রশস্ত দীপ পাত্র,
মস্তকে করিল বন্দনা।
সুবর্ণ সিতি শিরে, কনকাঙ্গুরি করে,
করিল আশীষ যোজনা ॥
রজত কাঞ্চন, তাম্র গোরোচন,
সিদ্ধার্থ চামর দর্পণ।
কুসুম দিয়ে দ্বিজে, পূজিল দেবরাজে,
কন্যার গন্ধাদি বাসন ॥
নৈবেদ্য দিয়া ভূরি, মাতৃকা পূজা করি,
দিলেন বসুধারা দান।
বসুরে পূজা করি, বসিল হেমগিরি
করিল নান্দী-মুখের বিধান ॥
মেনকা সুন্দরী, ডাকি সহচরী,
আনাইল যত সখীগণ।
শুনি আনন্দ রব, ধাইল নারী সব,
আইল গিরিরাজার ভবন ॥
তুড়সী মালতী, কৌশল্যা অরুন্ধতী,
আইল কুমারী ভবানী।
সাধু মাধু হারি, গঙ্গা দুর্গা পারি,
কমলা কলাবতী বাণী ॥
চিত্ররেখা শীলা, সুভদ্রা সুশীলা,
শ্রীমতী আইলা সাবিত্রী।
গৌরী সতী মায়া, চিত্রাকালী জয়া,
করুণা তারা হীরাবতী ॥
জাহ্নবী হেমবতী, অহল্যা রেবতী,
অভয়া অম্বিকা সুমতি।
ফুল্লরা বিমলা, বিদ্যাধরী লীলা,
সুমিত্রা কেকয়ী পার্ব্বতী ॥
কালিন্দী কামিনী, অপর্ণা রোহিণী,
সারদা বরদা রুক্মিণী।
ভারতী শশীকলা, বিজয়া সতী মালা,
ললিতা নাগরী বারুণী ॥
কাঁখে হেমঝারি, মেনকা সুন্দরী,
জল সাধে ঘরে ঘরে।
যত আইও মেলি, দেয় হুলাহুলি,
মঙ্গল সূত্র বান্ধে করে ॥
অধিবাস আদি, মহেশ যথাবিধি,
করিল বেদের বিধান।
কণ্ঠে হাড় মাল, পরিল বাঘছাল,
বৃষভে কৈল আরোহণ ॥
চলিল দেবরায়, প্রমথ পিছে ধায়,
বেউটি ধরে দানাগণ।
শিঙ্গার বাজনা, করয়ে ভূত দানা,
চলয়ে ঝড় বরষণ ॥
আইলা ত্রিপুরারী, হেমন্ত হাতে ধরি,
বসাইলা কনক আসনে।
বসন অঙ্গুরী, মাল্য দিয়া গিরি,
করিল বরের বরণে ॥
বিরলে স্থল করি, মেনকা সুন্দরী,
করিল স্ত্রী-আচরণ।
রচিল ত্রিপদীছন্দ, পাঁচলি করিয়া বন্দ,
গাইল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৫২। করচা।

আরম্ভ :—/৭ শ্রীশ্রীগুরুবে নমঃ।

কামানুগা রাগানুগা ১। শ্রীরাধিকা জিউ কামময়ী, শ্রীরূপমঞ্জরী কামরূপ। তার স্থাইকে তার আমি ॥ কামানুগা রাগানুগা কোন কামানুগা ৬টস্থার ইচ্ছাময়ী, সম্ভোগ ইচ্ছাময়ী, তার তুমিকে আর আমি ওটস্থার ইচ্ছাময়ী, কোন ভক্তি কামরূপা ভক্তি, শ্রীরূপমঞ্জাদি। ৪ ॥

শেষ :—

ইতি দামুঘোষ গোস্বামীর সিদ্ধান্তটীকা সম্পূর্ণ। যথাদৃষ্টং ইত্যাদি—সন ১২২২ সাল তারিখ ২১ বৈশাখ রোজ মঙ্গলবার।

গদ্য গ্রন্থ ক্ষুদ্র আকারের তুলট কাগজে ৪ পত্রে শেষ।

৫৩। গোসাঞীর তত্ত্ব-নিরূপণ।

আরম্ভ :—/৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত বৃন্দ ॥
জয় জয় শ্রীরূপ সনাতন।
জয় ভট্ট রঘুনাথ জয় শ্রীজীব গোপাল ভট্ট ॥
জয় দাস রঘুনাথ।

এই ছয় গোসাঞী যাইয়া ব্রজে কৈলেন বাস।
শ্রীরাধাকৃষ্ণের যাই কিছু করিল প্রকাশ॥
সোম শব্দে সোমগুল দিব্য জ্যোতির্ম্ময়।
তাহাতে বিরাজে কৃষ্ণ রাধিকার সার॥
নানা রত্নে বিচিত্র ঘর ব্রহ্মাণ্ডের উপর।
নিত্যলীলা বিলাস স্থান অক্ষয় অমর॥
আনন্দ চিনিময় সেই জানিহ ব্রহ্মমূলে।
ভাবনা ভেদেতে ভাব ভাবনা সেইকালে॥
মণিমুক্তা প্রবালেতে মন্দির খচিত।
স্ফটিকের স্তম্ভ কত তাহাতে রচিত॥
সে মন্দিরের মধ্যে আছে অষ্টদল।
নানা রত্নে বিচিত্র সে করে ঝলমল॥
অষ্টদলে অষ্ট সখী মধ্যে রাধাকৃষ্ণ।
সোময় জানিয়া করে সেবাই শ্রেষ্ঠ॥

শেষ ও ভণিতা :—

শ্রীরূপ-সনাতনের পাদপদ্ম করি আশ।
তত্ত্বনিরূপণ কহেন শ্রীনরোত্তম দাস॥

ইতি গোস্বামীর তত্ত্বনিরূপণ সমাপ্ত।

ইতি সন ১২২৬ সাল মাহে ফাল্গুন।

ক্ষুদ্র আকারের তুলট কাগজে দুই পিঠে লেখা; পত্র সংখ্যা ৫।

৫৪। গোপীকথা।

আরম্ভ :—শ্রীশ্রীরাধকৃষ্ণায় নমঃ।

শ্রীযুত রূপগোস্বামী জি শেষ লীলাকালে শ্রীকবিরাজ গোস্বামী শ্রীযুক্ত দাস গোস্বামীকে নিবেদন করিলেন। শিষ্যানামের প্রসঙ্গ শুনিয়া দাস গোস্বামী কবিরাজ গোস্বামীকে ক্রোধ করিলেন, ভয় পাইয়া কবিরাজ গোস্বামী শ্রীকুণ্ড হইতে শ্রীবৃন্দাবন গেলেন। সে সকলে শ্রীযুত ভট্ট গোস্বামী জিউ বৃহৎ সনন্দে সদীপিকা লিখিতে ছিল। সে কথা শুনিয়া কবিরাজ গোস্বামী বড় খুসী হইল। নিকটে বিরলে ডাকিয়া পুস্তক লিখিল। কবিরাজ গোস্বামীটি নাম গোষ্ঠী সহিতে লিখিয়া লইলেন।

৫৫। রসমঞ্জরী।

আরম্ভ :—শ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ।

শ্রীরাধাস্য প্রেমামৃতে যস্য প্রেম সদা প্রাহিণ
তস্য রাধা সদাপ্রৎমপি রাধা স্বিৎসদা॥

শ্রীঅনঙ্গ-বাক্য অনঙ্গ সেবন অনঙ্গ ধ্যান অনঙ্গ নিরূপণ অনঙ্গ প্রাপ্তি এ পাঠ অনঙ্গ কহিতে শ্রীমতী হৈতে সমঙ্গ হৈতে কি অনঙ্গ হৈতে পঞ্চতৎ কি কি ভক্তরূপ। শ্রীচৈতন্য প্রভু ভক্তস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈত প্রভু ভক্তাখ্যান।

শেষ :—

পীতাম্বরং কৃতরপি মাধুর্য্য মধুরং ভবেৎ।
কৃতাস্ত কৃষ্ণকৃতভিবৃতং কৃষ্ণ উম্বরণং॥

ইতি শ্রীজীবগোস্বামি-বিরচিতং রসমঞ্জরী সম্পূর্ণ।

৫৬। রসকল্পসার-গ্রন্থ।

আরম্ভ :—৴৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ।
রসকল্পসার গ্রন্থ লিখ্যতে।

ইদং বৃন্দাবনং রম্যং নিকুঞ্জবনমধ্যকং।
রসলীলাকৃতং নিত্যং শৃঙ্গারাদি বিবর্দ্ধনং॥
শ্রীবৃন্দাবন কুণ্ড মধ্য রসাবেশ হয়া।
পরম আত্মা হৈতে নিজ শক্তি প্রকাশিয়া॥
সেই শক্তি হৈতে হয় আনন্দের ধাম।
সেই শক্তি পূর্ণ করে গোবিন্দের কাম॥

শেষ ও ভণিতা :—

নিত্যানন্দ দাস মুঞি নিত্যানন্দ দাস।
জন্মে জন্মে হইব তার দাসের দাস॥
অতি দীন হীন মুঞি বৃন্দাবন দাস।
রসকল্পসার এই করিল প্রকাশ॥
জয়রাধা সমখ্যাতা তত্র দাস গদাধরঃ।
পূর্ব্বে অনঙ্গমঞ্জরীশ্চৈব এতানি জাহ্নবাস্থিতি॥
রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ রাধারস বিগ্রহং।
একোপি জগদ্ব্যাপি কোটী ব্রহ্মাণ্ড বিগ্রহং॥

ইতি রসকল্পসার গ্রন্থ সম্পূর্ণ।

ইহার পর একটী সংস্কৃত শ্লোক আছে। তুলট কাগজে দুই পিঠে লেখা। পত্র সংখ্যা ৩। লিপিকারের নাম বা সন তারিখ কিছুই দেখিলাম না।

৫৭।

আরম্ভ :—

/৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ। জবামঞ্জরী গ্রন্থ।

ক্ষিতি জল বায়ু আকাশ এই পঞ্চরূপ হৈতে দেহের প্রকাশ। ইহার রক্তবীজ চন্দ্রবীজ আর পুরুষের রেত ইহাতে আধার হয়। অধোমূলেতে ইহাকে ভূত আভো বলি। ইহার স্থিতি কোথা চতুকুলে গুহ্যকুলে।

শেষ ও ভণিতা :—

জবা মঞ্জরী গ্রন্থ অতি সে সার।
দীন গদাধরে না পাই পার॥
জবামঞ্জরী গ্রন্থ আধ।
কহে গদাধর পণ্ডিত দাস॥

• সমাপ্ত হইল ইতি *।*।*।১। জবামঞ্জরী গ্রন্থ সমাপ্ত হইল। কৃপা করি শ্রীনাথ প্রদান করিল তার নাম শ্রীকালাচন্দ ঠাকুর বৈষ্ণব। তুলট কাগজে দুই পিঠে লেখা পত্র সংখ্যা ২। সন তারিখাদি নাই।

৫৮। অষ্টকালী গ্রন্থ।

আরম্ভ :—

/৭শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।
অথ অষ্টকালী গ্রন্থ লিখ্যতে—
গুরু-বন্দনা।

শেষ ও ভণিতা :—

অভাগা মোহনদাস ভাবিতে চিন্তিতে।
চর্ব্বিত তাম্বূল কিছু আশা ধরে পাইতে॥
ললিতার চরণ ধরি * এই দান।
চর্ব্বিত তাম্বূল সুধা দিয়া রাখ প্রাণ॥
মোর ধনরত্ন প্রাণ যুগলচরণ।
কৃপা যেন করে মোকে ব্রজের নন্দন॥
ঠাকুর বৈষ্ণব পদে রহে যেন মন।
অধম মোহন দাসের প্রার্থনা পূরণ॥

৫৯। সিদ্ধিপটল।

আরম্ভ :—

/৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ।
অথ সিদ্ধিপটল লিখ্যতে।

মহাপ্রভুর সিদ্ধিনাম কি—মনোহর। সাধ্যনাম কি—নায়েক-চূড়ামণি। সঙ্কেত নাম কি—গৌরমণি॥ নিত্যানন্দপ্রভুর সিদ্ধিনাম কি—চক্রবিন্তু। সাধ্যনাম কি—লীলাবিন্তু। সঙ্কেতনাম কি—রাসবিন্তু। অদ্বৈতপ্রভুর সিদ্ধিনাম কি—কল্পতরু। সাধ্যনাম কি—রাসগুরু। সঙ্কেতনাম কি অদ্বৈত গোবিন্দ। পরম সিদ্ধিনাম কি—মণিমঞ্জরী। সাধ্যনাম কি—রসমঞ্জরী। সঙ্কেতনাম কি—যশোমঞ্জরী। গুরুসিদ্ধিনাম কি—মধুমঞ্জরী। সাধ্যনাম কি—কাম-মঞ্জরী। সঙ্কেতনাম কি—ভজনমকি (?)। বৈষ্ণব গোসাঞীর সিদ্ধিনাম কি—আনন্দ-মঙ্গল। সাধ্যনাম কি—বৈষ্ণব গোসাঞী। সঙ্কেতনাম কি—গুরু গোসাঞী। সেবকের সিদ্ধিনাম কি—প্রেমমঞ্জরী। আশ্রয় প্রেম সখী। আলমরস নায়েক-চূড়ামণি। ভজনের সিদ্ধিনাম কি—রাগবস্তু। সাধ্য-নাম কি—লীলাতত্ত্ব। ভাবের সিদ্ধিনাম কি—বিলাসমঞ্জরী। সাধ্যনাম কি—কৃপা-মঞ্জরী। মালার সিদ্ধিনাম কি—সিদ্ধেশ্বরী। সাধ্যনাম কি—সরস্বতী। তিলকের সিদ্ধিনাম কি—উজ্জলরেখা। সাধ্যনাম কি—ভেকশোভা। সেবার সিদ্ধিনাম কি—সাধনপ্রতিমা। সাধ্যনাম কি—রাসমণ্ডলী। চার কোঠাক নাম কি। বাল কোঠাতে বাচা

মার্ব্ব কোঠাতে শোভা ভুমর সরল। মার্ব্ব কোঠা কাথে বলি রত্নবেদী—শ্রীরাধিকাজীর সিদ্ধিনাম কি—বৈষ্ণব গোসাঞী। সাধ্যনাম কি—হেমমঞ্জরী। সঙ্কেতনাম কি—পদ্মনয়নী। সর্ব্বসিদ্ধি ইতি। আর প্রবর্ত্ত নাম ছয়। গ্রাম চারি—নন্দীশ্বর ১ জাবট ২ আরট ৩ এক ক্রোশ সঙ্কেত এক ক্রোশ পিনখুরী। ব্রহ্ম ভাস্নুপুর এই ছয় গ্রাম। দশ বাড়ী চারিদ্ধতেউ সতি হন্দারা। কেলার স্থানে জল। দুই বালিকা। ছয় গ্রামে ছয় রিপু। চারি যুগে চারি ধাম। সাত ইন্দ্র। সাত পরকীয়া। দশ বাড়ী। দশ দশা। দুই বালিকা। এক নিষ্ঠকেশর। এক বায়সকেশর। বিলাস নয়। প্রকাশ সাকার। গোস্বামীর পঞ্চ নাম। কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ রাধাকৃষ্ণ এক কৃষ্ণ অনুমান। এক কৃষ্ণ বর্ত্তমান। আর গোবিন্দ রস রাধিকাপ্রাপ্তিবর্দ্ধক স্বরূপ রূপবর্ণ কৈশর। প্রাপ্তি উজ্জ্বল। অনুমান কৃষ্ণের দেশ কাল পাত্র কি—দেশ বর্ণ। কাল শব্দ। পাত্র গুণ। বর্ত্তমান বৈষ্ণব। দেশ কাল পাত্র কি—সে সব কয় কালস্তম্ভগ পাত্রবর্ত্তে। শ্রীরাধিকার দেশ কাল পাত্র কি। শ্রীধর। কাল আস্বাদন পাত্র দূতী। কৃষ্ণের দেশ কাল পাত্র কি—দেশ বৃন্দাবন। কাল মধুর। পাত্র নন্দের নন্দন। ইতি সিদ্ধপটল সমাপ্ত। যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং ইত্যাদি।

সন ১২৩৪। পত্র সংখ্যা ২। গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র বলিয়া সমস্ত গ্রন্থভাগ নকল করা হইল।

৬০। ভক্তিবিরচন গ্রন্থ।

ভণিতা :—

> শ্রীগুরু বৈষ্ণব কৃষ্ণ পদে রহুক আশ।
> ভক্তি-বিরচন গ্রন্থ কহে কৃষ্ণদাস ॥

গ্রন্থখানির নাম ও ভণিতাটুকু ব্যতীত আর কিছু প্রাপ্ত হই নাই।

৬১। সূর্য্যমুনি গ্রন্থ।

আরম্ভ :—/৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ নমঃ।

> রাধিকার গুহ্যতত্ত্ব কহন না যায়।
> শ্রীরাধিকা হইতে কত কৃষ্ণ হয় ॥
> রাধিকা হইলে হৈল কৃষ্ণ উপাদান।
> ইহাতে প্রমাণ দেখ অপরো পুরাণ ॥

শেষ :—

> শ্রীরাধিকার পাদপদ্ম করিয়া সহায়।
> অল্পে কিছু সূর্য্যমুনি করিল নির্ণয় ॥
> শ্রীরূপবিরচিতং সূর্য্যমুনি গ্রন্থ সমাপ্ত হইল।
> কৃপা করি গুরু মোরে প্রদান করিল ॥

৬২। গোবিন্দ-লীলামৃত।

গ্রন্থের প্রথম পত্রখানি প্রায়ই ছিন্ন; সেজন্য ৩য় পত্রের প্রথমাংশ উদ্ধৃত।

> মোর সুখ মরুস্থল, বাণী থির রূপচর,
> গোকুল উন্মুখী বাক্যগণ।
> বৈষ্ণবের কর্ণনদী, প্রবেশ করয়ে যদি,
> পুষ্ট * * হইবে তখন ॥

ভণিতা :—

> শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত, অমৃত হৈতে পরামৃত,
> যেহ ইহা সদা করে পান।
> তাহার চরণ ধূলী, আপন মস্তকে করি,
> তার পদ-জল করি পান ॥
> চৈতন্য দাসের দাস, ঠাকুর শ্রীশ্রীনিবাস,
> আচার্য্যাজ্ঞা শ্রীল হেমলতা।
> তাঁর পাদপদ্ম আশ, এ যদুনন্দন দাস,
> অম্বষ্ঠ প্রাকৃতে কহে কথা ॥

শেষ :—

> শুন শুন ওরে গোসাই কবিরাজ ঠাকুর।
> কেবল তোমার আমি উচ্ছিষ্ট কুকুর।

দোষ না লইহ মোর আপনার গুণে।
আমার লিখন যেন শুকের পাঠানে ॥
জয় জয় কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোসাই ॥
তোমার কৃপাতে এবে কৃষ্ণলীলা গাই ॥
রাধাকৃষ্ণ-পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে।
এ যদুনন্দন কহে গোবিন্দ বিলাসে ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে সায়াহ্ন-লীলা বর্ণনং নাম ত্রয়োবিংশতিস্বর্গঃ সমাপ্তশ্চায়ং শ্রীগোবিন্দলীলামৃতঃ।

এ গ্রন্থখানি এত সুন্দর যে, ইহার কোন্ অংশ ছাড়িয়া কোন্ অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব বুঝিতে পারি না। গ্রন্থখানি অতি সুন্দর। মনে হয় সমগ্র গ্রন্থখানি স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া সকলকে দেখাই। অনেক আবশ্যকীয় বিষয়ও ইহাতে সন্নিবেশিত আছে। সময়ান্তরে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিবার ইচ্ছা রহিল। সাহিত্য-পরিষৎ হইতে ইহার পুনঃ মুদ্রণ হওয়া একান্ত আবশ্যক।

বহু পূর্ব্বে বটতলায় ইহা মুদ্রিত হইয়াছিল। এখন পাওয়া যায় কি না জানি না। আলোচ্য গ্রন্থখানি ২৯৮ পৃষ্ঠায় শেষ হইয়াছে।

৬৩। কাশীদাসের মহাভারত
(আদিপর্ব্ব)

গ্রন্থখানি খণ্ডিত বহু প্রাচীনকালের কাঠের অক্ষরে ছাপা। ১৫ হইতে ৪৯৪ পৃষ্ঠা অর্থাৎ সমুদ্র মন্থন হইতে সুভদ্রাহরণ পর্য্যন্ত আছে। নিম্নে কতকাংশ উদ্ধৃত হইল।

অন্ধ হয়্যা জন্ম হৈল উতথ্য নন্দন।
সৌরভি বংশেতে তেঁহ কৈল অধ্যয়ন ॥
গোধর্ম্ম পঠন কৈল গরুর আচার।
যারে পায় তারে ধরি করয়ে শৃঙ্গার ॥
তার কর্ম্ম দেখিয়া যতেক ঋষিগণ।
ধিক্কার করিয়া সবে বলিল বচন ॥
নিকটে বসতি যোগ্য নহে দুরাচার।
দূর করি দেহ অঙ্কে করি গঙ্গা পার ॥
এতেক বলিয়া তবে ধরে যত ধীরে।
ভাসাইয়া ছিল তারে জাহ্নবীর নীরে ॥
ভেলায় বন্ধনে ভাসি গেল বহু দূর
দৈবকে দেখিল তারে বলি মহাশূর ॥
ধরিয়া আনিল ভেলা দেখিল ব্রাহ্মণ।
জিজ্ঞাসিল তাহারে যতেক বিবরণ ॥
কহিল সকল কথা উতথ্য নন্দন।
বলে বলি আমি তোমায় করিনু বরণ ॥
তপোবলে প্রভু মোর বংশ বৃদ্ধি কর।
শুনি অঙ্গীকার কৈল অন্ধ দ্বিজবর ॥
গৃহে আনি মুনিরাজে করিল অর্চ্চন।
সুদেষ্ণা রাণীর তবে কহে বিবরণ ॥
এই দ্বিজে কর ভক্তি সন্তান কারণ।
দ্বিজদ্বারা পুত্র শ্রেষ্ঠ কহে মুনিগণ ॥
অন্ধ দেখি সুদেষ্ণা করিল অনাদর।
শূদ্রাদাসী পাঠাইল যথা দ্বিজবর ॥
দ্বিজের ঔরসে তার হৈল পুত্রগণ।
চারিবেদ ষড় শাস্ত্র করে অধ্যয়ন ॥
হেন কালে বলি গেল দ্বিজের ভবন।
জিজ্ঞাসিল এই সব আমার নন্দন ॥
দ্বিজ বলে নহে তব এ সব কুমার।
শূদ্রাগর্ভে জন্ম হৈল কুমার আমার।
আমারে দেখিয়া অন্ধ তব পাটেশ্বরী ॥
না আইল মোর স্থানে অনাদর করি ॥
এত শুনি অন্তঃপুরে গেলেন রাজন।
সুদেষ্ণা রাণীরে বহু করিল ভর্ৎসন ॥
তবে তো বলির রাণী স্বামী আজ্ঞাবশে ॥
পুত্র জন্মাইল শুন দ্বিজের ঔরসে ॥
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ যে পুণ্ড্র অনুপম।
পৃথিবীর মধ্যে তারা হইল উত্তম ॥
অঙ্গদেশ বলি হৈল জ্যেষ্ঠ পুত্র অঙ্গ
কলিঙ্গ কলিঙ্গ দেশে বঙ্গদেশে বঙ্গ ॥
পুণ্ড্র নামেতে দেশ হইল বিখ্যাত।
উর্ব্বরা হইল ধরা বলিবংশ জাত

৬৪। কাশীদাসের মহাভারত (বনপর্ব্ব) খণ্ডিত।

প্রাচীনকালের কাঠের অক্ষরে ছাপা।

আরম্ভ :—

শরণং। অথ মহাভারতীয় বনপর্ব্ব। নমো গণেশায় ॥

জন্মেজয় বলে কহ শুনি মুনিবর।
পূর্ব্ব পিতামহ কথা অতি মনোহর ॥
কিরূপে কপটে জিনে নিল রাজ্যধন।
বহু ক্রোশ করাইল বলি কুবচন ॥
কলহের পথ কুরু করিলে শ্রবণ।
কহ শুনি কি করিল পিতামহগণ ॥

শেষ যুধিষ্ঠিরের আক্ষেপ পর্য্যন্ত আছে। উহা কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল।

এইরূপে নরপতি কান্দে উচ্চৈস্বরে।
কোথা কৃষ্ণ * * রাখহ আমারে ॥
এমন বিপদে কেন ফেলিলে আমায়।
কোন দোষে দোষী আমি নাহি তব পায় ॥

পত্র সংখ্যা ৩৭৪।

৬৫। কাশীরামদাসের মহাভারত (দ্রোণপর্ব্ব) খণ্ডিত।

কাঠের অক্ষরে সেকালের ছাপা। অভিমন্যুর যুদ্ধযাত্রা হইতে দ্রোণের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ পর্য্যন্ত আছে।

অভিমন্যুর যুদ্ধযাত্রা।

অভিমন্যু বাক্য শুনি সারথি সত্বর।
তুলিল অনেক অস্ত্র রথের উপর ॥
জাটি ঝকড়া শেল শূল মুষল মুদ্গর।
শক্তি ভিন্দিপাল আদি তুলিল তৎপর ॥
মহাদম্ভ করি বীর উঠে গিয়া রথে।
সমরবিজয়ী শর মহাধনু হাতে ॥
ভীমাদি করিয়া যত মহারথীগণ।
তাহার পশ্চাতে যায় করিবারে রণ ॥

দ্রোণের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ।

মুনি বলে মহাশয়, শুন রাজা জন্মেজয়,
হেন মতে পড়ে ভগদত্ত।
দেখি রাজা দুর্য্যোধন, শোকে যে আকুল মন,
আরোহণ কৈল গজ মত্ত ॥
অশ্বত্থামা হস্তী নাম, সংগ্রামেতে অনুপাম,
তার তুল্য নাহি গজবর।
বর্ণ জিনি জলধর, ঈশসম দণ্ডধর,
দেখিতে বড়ই ভয়ঙ্কর ॥

৬৬। কৃত্তিবাসী রামায়ণ (অযোধ্যাকাণ্ড) খণ্ডিত।

আরম্ভ :—শ্রীশ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ ॥ অথ অযোধ্যাকাণ্ড।

দ্বিতীয় অযোধ্যা কাণ্ড শুন সর্ব্ব জন।
কৈকেয়ীর দুরন্ত বাক্যে রাম গেল বন ॥
অযোধ্যা নগরে দশরথ মহারাজা।
দেবলোক নরলোক করে যার পূজা ॥
শুকুল অভরণ রাজার শুকুল উত্তরি।
চন্দনে লেপিত রাজা শুকুল বস্ত্রধারী ॥
বুড়া বয়সে দশরথের পাকিল মাথার কেশ।
শুকুল মালা পরে রাজা শুকুল সকল বেশ ॥
রাজকার্য্য করে রাজা বসিয়া সিংহাসনে।
চতুর্দ্দিকের রাজা আইল রাজসম্ভাষণে ॥
হস্তী ঘোড়া রথ কত নানা আভরণে।
বিবাহ যৌতুক বাসে দিল রাজগণে ॥
সভায় নমস্কার সবে করে যোড় হাত।
মহারাজ দশরথ প্রজাকার নাথ ॥

দশরথের শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত আছে। নিম্নে কতকাংশ উদ্ধৃত হইল।

রাজার শ্রাদ্ধ কৈল ভরত শাস্ত্রের বিধান।
পাত্র মিত্র কহে গিয়া ভরতের স্থান ॥
সূর্য্যবংশের রাজ্য তোমার অযোধ্যানগরী
তোমারে রাজ্য দিয়া রাজা গেল স্বর্গপুরী ॥
সূর্য্যবংশের রাজ্য অন্যের নাহি সাজে।
তুমি রাজা না হইলে তোমার বাপের রাজ্য মজে
ভরত বলে হেন যুক্তি নাহি বল আর।
জ্যেষ্ঠ থাকিতে কনিষ্ঠরে নাহি অধিকার ॥

রাজা হইয়া যদি আমি বসিলাম পাটে।
মা যত দোষ করিলেন আমার তবে ঘটে॥
রাজার যোগ্য হএন আমার শ্রীরাম ভাই।
রাম রাজা করো চল তথা যাই।
অভিষেক যত দ্রব্য লহ রাজ্য খণ্ড।
তথা গিয়া রামেরে ধরাব ছত্র দণ্ড॥
রাম রাজা করিয়া পাঠাইয়া দিব দেশে।
শ্রীরামের বদলে আমি যাইব বনবাসে॥
ডাঙ্গা ডহর ভাঙ্গিয়া শোসর কর ঝাট।
সুখে পথ বহে যেন ঘোড়া হাতি বাট॥

৬৭। কৃত্তিবাসী রামায়ণ

(লঙ্কাকাণ্ড)

প্রাচীনকালের কাঠের অক্ষরে ছাপা।

ইন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধ হইতে রাম-সীতার মিলন পর্য্যন্ত আছে। নিম্নে প্রাপ্তাংশে প্রথম ও শেষ উদ্ধৃত হইল।

প্রথমাংশ :—

শ্রীরাম লক্ষ্মণ বলেন হইলাম নৈরাশ।
মেঘের আড়ে ইন্দ্রজিত করে উপহাস॥
সহস্রলোচনে না দেখিল পুরন্দর।
দুইচক্ষে কি দেখিবি নর আর বানর॥
রাম আর লক্ষ্মণ তোরা মনুষ্যের জাতি।
আজি বুঝি তোদের পোহাইল কালরাতি॥
মেঘের আড়ে থাকি করে বাণ বরিষণ।
জর্জ্জর করিয়া বিন্ধে শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
কোথা থাকি যুঝে বেটা দেখিতে না পাই।
জীবনের বাসনা ছাড়িল দুই ভাই॥

শেষাংশ :—

ইন্দ্র বলেন যাই বানর যার বাস যথা।
রজনী বঞ্চুল রাম লয়ে দেবী সীতা॥
চৌদ্দ বৎসর বনে বনে গেছে উপবাস।
দশমাসে দুইজনে হউক সন্তাস॥
রামের হাতে ব্রহ্মা করেন সীতা সমর্পণ।
বিদায় হইয়া স্বর্গে গেল দেবগণ॥
যখন যে কর্ম্ম তাহা বিভীষণ জানে।
অষ্ট শত বৃহন্দে (?) নেত্রের ঘর আনে॥
সোণার আওয়াস ঘর বিচিত্র গঠন।
রত্নসিংহাসনে পাতি নেতের বসন॥
নারায়ণ তৈল দীপ জ্বালে চারি ভিত।
পারিজাত পুষ্প পরে গন্ধে আমোদিত॥
সৌরভে ভুবন ভরে এক পারিজাতে।
হেন পুষ্প লক্ষ লক্ষ সিংহাসনেতে পাতে॥
আপনি যে বিভীষণ হইলা প্রহরী।
আওয়াস বেড়িয়া ঠাট রহে সারিসারি॥
সাক্ষাৎ যে সীতাদেবী লক্ষ্মী অবতার।
সীতা লয়ে রাম গেলা আনন্দে অপার॥
শ্রীরামের পাশে বৈসেন সীতা ঠাকুরাণী।
চন্দ্রের পাশেতে যেন শোভিল রোহিণী॥
এইরূপে দুই জনে বঞ্চিলা রজনী।
করেছে বানরগণের রাম জয়ধ্বনি॥
রাম সীতার বাসর শুনিবে যেই জন।
জন্মে জন্মে সুখভোগ না যায় খণ্ডন॥

৬৮। প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা।

আরম্ভ :—শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

অথ প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা।

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥১
শ্রীচৈতন্য মনোভিষ্টং স্থাপিতা যেন ভূতলে।
স্বয়ংরূপ কদামহ্যং দদাতিস্বপদান্তিকং॥

অস্যার্থঃ॥

শ্রীগুরুচরণ পদ্ম, কেবল ভকতি সদ্ম,
বন্দো মুক্তি সাবধান মনে।
যাঁহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাহা হলে॥
গুরু মুখ পদ্ম বাক্য, হৃদি করি মহা ঐক্য
আর না করিহ মনে আশ॥
শ্রীগুরুচরণে রতি, এই যে উত্তম গতি,
যে প্রসাদে পুরে সর্ব্ব আশা॥ ইত্যাদি—

শেষ ও ভণিতা :—

শ্রীগোলকনাথ পাদপদ্ম বিলাস।
প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস॥

ইতি শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা গ্রন্থসমাপ্ত

৬৯। দণ্ডাত্মিকা গ্রন্থ।

আরম্ভ :—/৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ নমঃ।

প্রাতঃকালে উঠি শ্রীরাধাঠাকুরাণী।
দন্তধাবন ক্রিয়া করিলা আপনি॥
তবে রহি প্রাতঃস্নান কৈলা আচরণ।
কিঞ্চিৎ পুরি মিষ্টান্ন করিলা ভক্ষণ॥
তবে কৈলা বেশ ভূষণ পরিধান।
এই সেবাতে শ্রীরাধিকার একদণ্ড জ্ঞান॥
তবে রাই কৃষ্ণ লাগি রন্ধন করিতে।
নন্দীশ্বরে যাইতে একদণ্ড হইল পথে॥
দুই দণ্ডের পরে রন্ধন।
পাঁচ দণ্ড তার পরে কৃষ্ণের ভোজন॥
সখী লয়া রাধিকার ভোজন একদণ্ড।
বিবিধ ব্যঞ্জন অন্ন অমৃতের খণ্ড॥

শেষ ও ভণিতা :—

দুই দণ্ড রাত্রি ছিল রাই নিদ্রা গেলা।
এহি বত্রিশ দণ্ড দিবারাত্র দোহার লীলাখেলা।
এই মত রাধাকৃষ্ণ ব্রজে করে নিত্য-লীলা।
* * * * *
এই মত চৌষট্টি দণ্ড রাত্র নিরূপণ।
সেবা অনুসারে ব্রজের গোপীগণ॥
রাধাকৃষ্ণ ব্রজে নিত্য লীলা করে অতিশয়।
রাধাকৃষ্ণ সবার অন্ত কহন না যায়॥
সংক্ষেপে কহিনু এই সেবার নির্ণয়।
এহি অনুসারে রাধাকৃষ্ণ ভজহ নিশ্চয়॥
* * * হইয়া কর সাধ্য সাধন।
সিদ্ধি দেহ হইয়া কর মানস ভজন॥
সাধক যখন সেবা বর্ণিছ বুঝিয়া।
যে সময়ে যে সেবা করিবে জানিয়া॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৌষট্টি দণ্ডের সেবা কহে কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীদণ্ডিকা গ্রন্থ সমাপ্ত।

তুলট কাগজে দুই পিঠে লেখা। পত্র সংখ্যা ৩। বহু পুরাতন বলিয়া বোধ হয়। লিপিকারের নাম বা সন তারিখ নাই।

৭০। জিজ্ঞাসা-প্রণালী।

আরম্ভ—/৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণজী।

জিজ্ঞাসা পত্র লিখিত প্রভুর পরিবার। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পরিবার। আশ্রয়ে শ্রীগুরুর। উপাসনা কি কৃষ্ণমন্ত্র। কার অক্ষর ষঢ় অক্ষর। অবলম্বন কি—বৈ সাক্রি। আলাপনে কৃষ্ণকথা।
শেষ :—প্রবেশ তিন। রামকৃষ্ণ হরি। সাক্ষী আগম নিগম। পুরোহিত কৃষ্ণচন্দ্র। ঘটক কেশবভারতী। নারদ সভাপতি। সনকাদি মুনি প্রমাণ। জ্ঞাতি দ্বাদশ-গোপাল। চৌষট্টি মুনি মহন্ত। কুলদেব নিত্যানন্দ। মানতত্ত্ব কর্ম্ম প্রেম উপার্জ্জন। সঞ্চিত বিশ্বাস। শ্রীগুরুর আজ্ঞা। নর্ম্মদা অকিঞ্চন ভক্তি জিজ্ঞাসা-প্রণালী সমাপ্ত।

একখানি বড় তুলট কাগজের এক দিকে লেখা। অতি ক্ষুদ্র পুঁথি। লিপিকারের নাম বা সন তারিখাদি নাই।

৭১।

শেষ

বারে বারে কহি
তুয়া পদ ধরি
বৃন্দাবন বিহারিণী
যদি কৃপা করি
এ দাসীর উপর
ধর মোর এই বাণী।

কিশোরী পূজন
প্রার্থনা ভজন
তুয়া পরমাদে
যদি কৃপা কর,
এ দাসীর উপর
নিবেদিই দেবি রাধে।

চাটু পুষ্পাঞ্জলি বৃন্দাবনেশ্বরী
এহি শুবা বলি তায়ে কৃপা করি,
যে জন করয়ে গান। দাসীপদ দেয় দান। ইতি

প্রথমাংশ নাই ; ক্ষুদ্র পুঁথি পত্র সংখ্যা ২ পদসংখ্যা ২৪, সন তারিখাদি নাই।

নিম্নলিখিত গ্রন্থ কয়েকখানির নাম ও রচয়িতার নাম সংগ্রহ করিবার অবসর পাইয়াছিলাম।

	গ্রন্থ	গ্রন্থকার	পত্রসংখ্যা	আকার
৭২।	চৈতন্য গণোদ্দেশ-দীপিকা	রমাই	৩২	ক্ষুদ্র
৭৩।	হংসদূত	যদুনাথ, নরসিংহ হুটীরাম	২৭	বড়
৭৪।	স্বরূপ-বর্ণন	কৃষ্ণদাস	৬	বড়
৭৫।	স্বরণীয় টীকা	সনাতন গোস্বামী	৭ দীর্ঘ ও বড়	
৭৬।	প্রেমতত্ত্বসার	ঐ	৫	ঐ
৭৭।	আশ্রয়াবলম্বন	নরোত্তম দাস	৯	ক্ষুদ্র
৭৮।	রাধাবল্লভ দাসের সূচক।			
৭৯।	শিব-মাহাত্ম্য	রামরাম দাস		
৮০।	লোচনের পদাবলী।			
৮১।	ভক্তি-বিরচন	কৃষ্ণদাস।		
৮২।	লহরীদাসের পদাবলী।			
৮৩।	সাধন-দণ্ডিকা।			
৮৪।	শেখরদাসের পদাবলী।			

শ্রীহরগোপাল দাসকুণ্ডু
মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর

কবি গঙ্গারাম ও মহারাষ্ট্রপুরাণ

পরিষদের চেষ্টায় আবার একখানি অশ্রুতপূর্ব্ব পুথির বিবরণ প্রকাশ পাইয়াছে।

এই আলোচ্য পুথিখানির নাম "মহারাষ্ট্র-পুরাণ।" পুথির রচয়িতার নাম কবি গঙ্গারাম। পুরাণখানি কত বড়, কয় খণ্ডে বিভক্ত, তাহা কিছুই জানা যায় না। আমরা যে অংশটুকু পাইয়াছি, তাহা প্রথম-কাণ্ড মাত্র। এই কাণ্ডের নাম 'ভাস্কর-পরাভব'। পুথিখানির তারিখ শকাব্দা ১৬৭২ সন ১১৫৮ সাল তারিখ ১৪ পৌষ রোজ শনিবার। বাঙ্গলা ১১৬৪ সালে পলাশীর যুদ্ধ হয়; সুতরাং পুথিখানি পলাশীর যুদ্ধের ছয় বৎসর পূর্ব্বে লেখা। লেখকের নাম নাই। ১৩১১ সালে ময়মনসিংহে যে শিল্পকৃষি-সাহিত্য প্রদর্শনী হইয়াছিল, "ময়মনসিংহের ইতিহাস" প্রণেতা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার মহাশয় সেই প্রদর্শনীতে এই পুথিখানি উপস্থিত করিয়াছিলেন। তিনি কোথায় কিরূপে এই পুথিখানি পাইয়াছিলেন, তাহা জানিবার জন্য তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছি।

আলোচ্য গ্রন্থখানি "মহারাষ্ট্র-পুরাণ", অতএব পুরাণের ন্যায় ইহার মুখবন্ধ অতি গুরুগম্ভীরভাবে আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ লিখিতে গিয়া মহর্ষি বেদব্যাস যে কৌশলে পুরাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন, মহারাষ্ট্রপুরাণ-কর্ত্তা কবি গঙ্গারাম সেই মহাজন-প্রদর্শিত পথ ত্যাগ করিবেন কেন?—তিনি গ্রন্থারম্ভেই লিখিতেছেন,—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ।

"রাধাকৃষ্ণ নাহি ভজে পাপমতি হইঞা। রাত্রদিন ক্রীড়া করে পরস্ত্রী লইঞা॥
শৃঙ্গার কৌতুকে জীব থাকে সর্ব্বক্ষণ। হেন নাহি জানে সেই কি হবে কখন॥
পরহিংসা পরনিন্দা করে রাত্র দিনে। এই সকল কথা বিনে অন্য নাহি মনে॥
এত যদি পাপ হইল পৃথিবী উপরে। পাপের কারণে পৃথি ভার সহিতে নারে॥
তবে পৃথি চলি গেলা ব্রহ্মার গোচর। কহিতে লাগিলে পৃথি ব্রহ্মা বরাবর॥
পাপের কারণে প্রভু পৃথি হইল ভারি। কত ব্যাম পাব আমি ভার সহিতে নারি॥
এতেক শুনিঞা ব্রহ্মা বোলিছে বচন। ব্যাকুল না হইয়া তুমি ধৈর্য্য কর মন॥
পৃথি সঙ্গে করি ব্রহ্মা গেল শিবস্থানে। কহিতে লাগিলা ব্রহ্মা স্তুতি বচনে॥
তুমি হর্ত্তা তুমি কর্ত্তা তুমি নারায়ণ। স্থাবর জঙ্গম তুমি তুমি নিরঞ্জন॥
তুমি মাতা তুমি পিতা তুমি বন্ধুজন। এ মহীমণ্ডল প্রভু তোমার সৃজন॥
এতেক বিনয় যদি কৈলা ব্রহ্মাবর। হাসিঞা তাহারে তবে বলিলা শঙ্কর॥
এতেক মিনতি কর কিসের কারণ। বোল দেখি শু(শু)নি আমি তাহার বিবরণ॥

তবে ব্রহ্মা কহিলেন হাসি ত্রিলোচনে। পৃথিভার সহিতে নারে পাপের কারণে ॥
পাপমতি হইল জীব করে দুরাচার। পাপিষ্ঠ মারিআ প্রভু দুর কর তার ॥
কহিতে লাগিলা হর এতেক সুনিঞা। পাপিষ্ঠ মারিছি আমি দুত পাঠাইঞা ॥
এতেক বলিলা যদি ব্রহ্মার গোচর। পৃথি সঙ্গে গেলা ব্রহ্মা আপন ঘর ॥
তবে ব্রহ্মা বিদায় করিলা পৃথিরে। ভাবিতে ভাবিতে পৃথি আইলা আপন ঘরে ॥

ইহার পরে মহাদেব একটু ভাবনায় পড়িলেন। ব্রহ্মা ও পৃথিবীকে তিনি অভয় দিলেন; কিন্তু কিরূপে কাজটা সমাধা করিবেন, তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে বসিলেন।

'ব্রহ্মাকে বিদায় দিয়া শিব রইলা ধ্যানে।
কতক্ষণ পরে সেই কথা পইল মনে ॥'

ধ্যানে ভাবিয়া চিন্তিয়া কথাটা শিবের মনে উদিত হইল,—পৃথিবীর ভারনাশের প্রণালীটা স্থির হইয়া গেল। তখন,—

'নন্দীকে দেখিয়া শিব বলিছে বচন। দক্ষিণ সহরে তুমি জাহ ততক্ষণ ॥
সাহুরাজা নামে এক আছে পৃথিবীতে। অধিষ্ঠান হও জাইয়া তাহার কণ্ঠেতে ॥
বিপরীত পাপ হইল পৃথিবী উপরে। দূত পাঠাইঞা জেন পাপিলোক মারে ॥
এতেক সুনিঞা নন্দী গেলা শীঘ্রগতি। উপনীত হইলা গিয়া সাহুরাজা প্রতি ॥'
সাহুরাজা বোলে তবে রঘুরাজার তরে। অনেকদিন হইল বাঙ্গালার চৌত না দেহ মোরে॥

এইস্থান হইতে আমাদের আলোচ্য মহারাষ্ট্র-পুরাণের ঐতিহাসিক অংশ আরম্ভ হইল; কিন্তু গোড়ায় গলদ! কবির কথায় বলিতে গেলে "দক্ষিণ সহর" নতুবা আসলে সেটি কোন দেশ তাহা ভূতভাবন ভবানীপতি ভাবিয়া চিন্তিয়াও বলিয়া দিলেন না। আসল কথা, কবি গঙ্গারামের বাড়ী রাঢ়ের যে গ্রামেই থাকুক না, তিনি যে বাঙ্গালার বাহিরে চতুর্দ্দিকে কোথায় কোন দেশ আছে, আর তাহার নাম কি, তাহার বিশেষ সংবাদ রাখিতেন না, তাহা তাঁহার শিবের কথায় বুঝা যাইতেছে। যাহা হউক কবির দক্ষিণ সহরের রাজা সাহুরাজা যে কে, তাহা নির্ণয় করিতে পারি নাই; কারণ ভাস্করপণ্ডিত যখন আসেন, তখন মহারাষ্ট্রে বালাজী রাও পেশওয়া রাজত্ব করিতেন। যাহা হউক শিব নন্দীকে দক্ষিণ সহরে যাইতে বলিলেন বটে; কিন্তু সাহুরাজার অবস্থিতি স্থানটা বেশ সুনির্দ্দেশ করিয়াই বলিয়া দিলেন না, "সাহুরাজা নামে এক আছে পৃথিবীতে।" যাহা হউক নন্দী বেচারী শীঘ্রগতি পৃথিবীটা খুঁজিয়া "উপনীত হইল গিয়া সাহুরাজা প্রতি।" কবি গঙ্গারামের দক্ষিণ দেশের জ্ঞান বা মহারাষ্ট্র দেশের জ্ঞান যতই অস্পষ্ট হউক না, ঐতিহাসিক ঘটনায় তাঁহার অতঃপর আর ভুল নাই। সাহুরাজার ঘাড়ে নন্দী ভর করিলে, সাহুরাজা রঘুরাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বহুদিন বাঙ্গালার চৌথ পাই নাই কেন? এই রঘুরাজা যে নাগপুরের রঘুজী ভোঁস্‌লা তাহা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন, আর তখন মহারাষ্ট্র-রাজ যে বাঙ্গলার রাজস্বের এক চতুর্থাংশ পাইতেন তাহাও জানেন।

আলীবর্দ্দী খাঁ বিদ্রোহী হইয়া যখন সরফরাজ খাঁর হাত হইতে বাঙ্গালার মসনদ কাড়িয়া

লন, সেই গোলোযোগে বাঙ্গালার রাজস্ব দুই বৎসর দিল্লীতে যায় নাই। মহারাষ্ট্রীয়গণ ১৭৪০ সালে দিল্লীর বাদশাহ্ মহম্মদ শাহ্‌র নিকট বাঙ্গালার চৌথ দাবী করিয়া পাঠান। বাদশাহ্ সত্য কথা বলিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগকে বাঙ্গালায় আলিবর্দ্দীর নিকট হইতে চৌথ আদায় করিতে আদেশ দেন।

নন্দী ভর করিবামাত্র সাহুরাজা রঘুরাজাকে বলিলেন, বাদশার নিকট একজন দূত পাঠাইয়া দাও, জানিয়া আসুক—বাঙ্গালার চৌথ কেন পাওয়া যাইতেছে না। 'রঘুরাজা পত্র লিখে আখর পাঁচ সাতে' অর্থাৎ সংক্ষেপে পত্র লেখা হইল। দিল্লীপতি যথাকালে পত্র পাইলেন ও তাহার মর্ম্মার্থ অবগত হইলেন। এই দিল্লীপতিটি কে, কবি গঙ্গারাম তাহা আমাদের বলিয়া দিলেন না। কিন্তু তিনি যে মোগল সম্রাট মহম্মদ শাহ্, তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি। তাহার পর দিল্লীপতি একটু কৌশল করিয়া জবাব দিলেন,—

"চাকর হইয়া মারিল সুবারে। জবর হইল লালবন্দি না দেয় মোরে ॥
লোক লস্কর তবে নাই আমার স্থানে। হেন কোন নাই তারে গিয়া আনে ॥
বাঙ্গালা মুলুক সেই ভুঞ্জে পরম সুখে। দুই বৎসর হইল লালবন্দি না দেয় মোকে ॥
জবর হইয়া সেই আছে বাঙ্গালাতে। চৌথের কারণে লোক পাঠাও তথাতে ॥"

দিল্লীপতি এই পত্র লিখিয়া কৌশলে ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন বটে; কিন্তু আপনার অক্ষমতা, দুর্ব্বলতা, হীনতা শত্রুর নিকট ষোল আনা প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন—কবি গঙ্গারাম তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহার সাহুরাজাও একটু বোকা-ধাতুর লোক বলিতে পারা যায়। এরূপ একটা চিঠি পাইয়া সাহুরাজার বাঙ্গালার সামান্য চৌথ আদায়ে যাত্রা করা অপেক্ষা দিল্লীর ষোল আনাই আদায় করিতে গেলে বোধ হয় ক্ষতি হইত না। যাক্ সাহুরাজা বুদ্ধিমান হইবার আশায় তাহা করেন নাই, ইতিহাস বজায় রাখিবার জন্য তিনি বাঙ্গালাতে চৌথ আনিতেই গেলেন; অর্থাৎ বাদশার পত্র পাইয়া কাহাকেও চৌথ আদায়ের জন্য বাঙ্গালায় যাইতে বলিলেন। রঘুরাজা নিকটে বসিয়াছিলেন। তিনি নিজে যাইবার অনুমতি চাহিলেন, 'তথাস্তু' তাহাই পাইলেন—কিন্তু রঘুরাজা নিজে না গিয়া দেওয়ান ভাস্করকে পাঠাইলেন। ভাস্কর ডঙ্কা নাগারা নিশান ও ফৌজ লইয়া চলিলেন। সেতারা ছাড়িয়া বিজাপুর হইয়া তিনি রওয়ানা হইলেন, বাঙ্গালী কবি বাঙ্গালার নবাবী চাল দেখিয়াছেন, নবাবী সেনার কুচ কাওয়াজের প্রথাই তিনি জানেন, কাজেই তিনি মহারাষ্ট্রীয় কঠোরতার বিষয় না জানিয়াই পথের বিবরণে বিজাপুরে ভাস্করসৈন্যের একরাত্রি বিশ্রাম বর্ণনার মধ্যে স্বচ্ছন্দে লিখিয়া দিলেন,—

'সেতারা ছাড়িয়া যবে, বিজাপুর আইলা তবে,
একরাত্রি রইলা সেই খানে।
রাগরঙ্গ হইল যত, নাটুয়া নাচিল কত,
কটক চলিল পর দিনে ॥'

যাহা হউক, ভাস্কর ক্রমে গ্রাম উপবন ছাড়াইয়া নাগপুরে আসিয়া উপনীত হইলেন। তখন তাঁহার জানা আবশ্যক হইল, নবাব কোন স্থানে আছেন। চর প্রেরিত হইল। শীঘ্র চরমুখে সংবাদ আসিল। বর্দ্ধমান সহরে রাণীর দীঘীর পাড়ে নবাব ছাউনি করিয়া আছেন। তখন আবার কুচ আরম্ভ হইল। বীরভূম বামে রাখিয়া গোয়াল-ভূমের পার্শ্ব দিয়া ভাস্কর স্বদলে বর্দ্ধমানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাত্রিতে ভাস্কর নবাবকে ঘিরিয়া ফেলিলেন, নবাব নিশ্চিন্ত মনে ছিলেন, এ সকল কিছুই জানিলেন না। হরকরা অর্থাৎ প্রহরীরা রাত্রিতেই এই বিপদের কথা জানিতে পারিল এবং রাজারামকে সংবাদ দিল। এই নবাবটির নাম কি, কবি গঙ্গারাম তাহাও আমাদের কোথাও বলিলেন না। রাজারাম লোকটা যে কে, তাহারও কোন পরিচয় তিনি দেন নাই, তবে একটা তারিখ তিনি আমাদের এই সময় বলিয়া দিয়াছেন—

'বৈশাখের উনিশায়, বরগী আইলা তায়,
মহা আনন্দিত হইয়া মনে।'

১৯শে বৈশাখ বরগী বর্দ্ধমান ঘিরিল; কিন্তু কোন্ বৎসর তাহা কবি গঙ্গারামের মনেই রহিয়া গেল, কলমে ফুটিল না। পরদিন প্রাতে রাজারাম সংবাদদাতা হরকরাকে সঙ্গে লইয়া নিজের সতর্কতার কথা জানাইয়া অম্লানবদনে নবাবকে বলিলেন;—

'ইহা আমি না জানিল, আচম্বিতে সৈন্য আইল,
আসিয়া ঘেরিল লস্করে।'

নবাবটী এ সংবাদে রুষ্ট কি তুষ্ট হইলেন, রাজারামকে কর্ত্তব্য পালনের জন্য অথবা তাহার সরল সত্য কথার জন্য কোন আদর আপ্যায়ন করিলেন কি না, কবি তাহা কিছুই লেখেন নাই; কিন্তু তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে নবাবটিকে একটু বুদ্ধিমান্, কর্ম্মতৎপর লোক বলিয়া বুঝা যায়। কবি লিখিয়াছেন—

'রাজারামে এত কয়, নবাব শুনিয়া রয়,
তৎপরে দিলেন উত্তর।
হরকরা পাঠাইয়া, হকিকত আনাইয়া,
কোথা হইতে আইল লস্কর॥'

গতানুশোচনা ত্যাগ করিয়া নবাব উপস্থিত মত কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। চর গিয়া সংবাদ আনিল,—

'চব্বিশ জমাদার, ভাস্কর সরদ্দার,
চল্লিশ হাজার ফৌজ লইএগ।
সেতারা গড় হইতে বরগী আইল চৌথ নিতে,
সাহুরাজার হুকুম পাইএগ॥'

নবাব শুনিয়া ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিলে মুস্তাফা খাঁ বলিলেন, একি কথা, যখন সুজা খাঁ

নবাব ছিলেন, তখন বাঙ্গালার বাদশাহী খাজনা দিল্লী যাইত, সেখান হইতে মাহারাট্টা চোথাই পাইত, এখান হইতে কখন দেওয়া হয় নাই।

তাহার পর নবাব উকীল পাঠাইয়া ভাস্করকে দিল্লী হইতে চৌথ নিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ভাস্কর বলিলেন, দিল্লীর বাদশাহ্‌র হুকুমে যখন আসিয়াছি, তখন রাজ্য নষ্ট করিয়াও চৌথ লইয়া যাইব। নবাব আশায় পড়িয়া চৌথ দিবার জন্য ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন,—

'এতেক শুনিয়া যবে, নবাব জানিল তবে,
ডাক দিয়া জমাদারে কহে।
যত জমাদার ছিল, তারে নবাব কহিল,
চৌথাই চাহে বারে বারে॥'

জমাদার অর্থাৎ সেনাপতিরা নবাবের মনোভাব বুঝিয়া বলিল,—

[illegible] বর[illegible] সিপাএরে।
আমরা যত লোকে, মারিব বরগিকে,
দেশে যেন আইস্তে নাই পারে॥"

সৈন্যগণের বেতন পাওনা ছিল, তাহারা দেখিল টাকাটা কেন বাহিরে যায়, নবাবও কথাটা গ্রাহ্য করিলেন, কারণ দিল্লীপতির ন্যায় তাঁহার আর তখন "হেন কোন জন নাই তারে গিয়া আনে" বলিয়া নাকে কাঁদিবার অবসর রহিল না। নবাব তার পর, "পানবাটা কাছে ছিল, পান তুইলা সভারে দিল।"—যুদ্ধের উদ্যোগ পড়িয়া গেল।

এদিকে ভাস্কর পণ্ডিতও সাজিতে লাগিলেন। যে সকল সর্দ্দার সজ্জিত হইল, কবি গঙ্গারাম তাহাদের নামের একটা তালিকা দিয়াছেন,—

'ধামধমা মাত্র আর হিরামন কাশী। গঙ্গাজি আমজ্জ জাএ আর সিমন্ত জোশী॥
বালাজি জাএ আর সেবাজি কোহেড়া। সম্ভুজি জাএ আর কেশোজী আমোড়া॥
কেশব সিংহ মোহন সিংহ এ দুই চামার। যার সঙ্গে জাএ ঘোড়া পাচ হাজার॥
এই দশজনা জাএ গ্রাম লুঠিতে। আর দশজনা থাকে নবাবের চারিভিতে॥
বালারাও শেষরাও আর শিশু পণ্ডিত। সেমন্ত সেহড়া আর হিরামন মণ্ডিত॥
মোহন রায় পীতরাএ আর শিশোপণ্ডিত। যার সঙ্গে আছে বরগী মহা বিপরীত॥
শিবাজী সামাজি আর ফিরঙ্গরাএ। লুটিতে যাহার সঙ্গে বরগী দ্রুত ধাএ॥
আদি * * সুনন্দন খাঁ আর ভাস্কর। এই চৌদ্দ জনাতে ঘেরিল লস্কর॥'

কবি গঙ্গারাম এই বরগিসর্দ্দারদের নামাবলি না দিয়া যদি নবাবের সেনাপতি জমাদারদিগের নামাবলি শুনাইতেন, তাহা হইলে আজ বাঙ্গালার ঐতিহাসিক তত্ত্বান্বেষীদিগের বেশী তৃপ্তির কারণ হইত।

যাহা হউক, ভাস্কর একদিন দুই দিন করিয়া সাত দিন বর্দ্ধমান অবরোধ করিয়া বসিয়া রহিলেন[illegible] নগরের অবস্থাটা কবি যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা শুনাইতেছি,—

'একদিন দুইদিন করিয়া সাতদিন হইল। চতুর্দ্দিগে বরগীতে রসদ বন্ধ কৈল॥
মুদি বাণিঞা জত বারাইতে নারে। লুটে কাটে মারে ছুমুতে পাএ জারে॥
বরগীর তরাসে কেহ বাহির না হএ। চতুর্দ্দিকে বরগীর ডরে রসদ নাহি লএ॥
চাউল কলাই মটর মুষরি খেসারি। তৈল ঘি আটা চিনি লবণ একসের করি॥
টাকা সের হইল আনাজ কিনতে নাহি পাএ। ক্ষুদ্র কাঙ্গাল যত মইরা মইরা জাএ॥
গাঞ্জা ভাঙ্গ তামাক না পাএ কিনিতে। আনাজ নাহি পাওয়া জাএ লাগিলা ভাবিতে॥
কলার আইঠা যত আনেন তুলিয়া। তাহা আনি সবলোকে খাএ সিজাইয়া॥
ছোট বড় লস্করে যত লোক ছিল। কলার আইঠা সিদ্ধ সব লোকে খাইল॥
বিষম বিপত্য বড় বিপরীত হইল। অন্য পরে কা কথা নবাব সাহেব খাইল॥'

কাজেই আর ধৈর্য্য রহিল না। নবাব আক্রমণের হুকুম দিলেন; কিন্তু দিলে কি হইবে শাহী ফৌজ—নবাবী সেনা নড়িতে চড়িতে নবাবী করিবে। বরজৈই নিশান উড়াইয়া ডঙ্কানাগারা বাজাইয়া তাহারা উদ্যোগপর্ব্ব আরম্ভ করিল। মহারাষ্ট্রীরা বুঝিল, নবাবসৈন্য নড়িতেছে, তাহারা অবসর দিবে কেন? তাহারাও চারিদিক্‌ হইতে চাপিয়া আসিল—

'তখন নবাবের সেনাতে পড়িলা হড় বড়। হেন বেলাতে বহইলাতে ধরিলা ডেহর॥
হাজার হাজার ঘোড়া উঠাএ একবারে। হারা হারা কইরা আসে কাছাইতে নারে॥'

কাজেই আর বিলম্ব করা চলিল না,—

'তবে মুস্তাফা খাঁ চাইর হার ঘোড়া লইয়া। বরগি খেদাইয়া জাএ ডেহর মারিয়া॥
তবে সামনে হইতে বরগী পলাইল। আর কত বরগি আসি পিছাড়ি ঘেরিল॥
মীর হবিব তবে পিছাড়িতে ছিল। বে-কাবুড়ি সইয়া সেহ মিসাইল॥
পেছাড়ি লুঠিল বরগি আসিয়া বকত। পোড়াইল ডেরা ডাণ্ডা তাম্বু আদি জত॥
খাজনার গাড়ী জত সাতে ছিল। চাইরদিগের বরগি আইসা লুঠিতে লাগিল॥'

এই সময়ে নবাবের সেনাপতি মুসাহেব খাঁ সদলে মহারাষ্ট্রীদিগকে প্রবলবেগে আক্রমণ করিয়া একদিগের পথ করিয়া দিলে নবাব সসৈন্যে সেই দিক দিয়া কাটোঞায় উপস্থিত হইলেন। হাজী সাহেব নৌকা করিয়া নবাবের জন্য কাটোঞায় খাদ্যাদি প্রেরণ করিলেন। শিকার পলাইল দেখিয়া ভাস্কর লুণ্ঠনে মন দিলেন। গ্রামের লোকজন ভয়ে পলাইতে লাগিল। কবি গঙ্গারাম অতি উজ্জ্বল ভাষায় এই পলায়নের বিবরণ দিয়াছেন,—

'ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পলাএ পুথির ভার লইয়া। সোণারবাইনা পলাএ কত নিত্তি হড়পি লইয়া॥
গন্ধবণিক পলাএ দোকান লইয়া জত। তামাপিতল লইয়া কাসারি পলাএ কত॥
কামার কুমার পলাএ লইয়া চাক নড়ি। জাউলামাউছা পলাএ লইয়া জাল দড়ি॥
গন্ধবণিক পলাএ করাত লইয়া কত। চতুর্দ্দিগে লোক পলাএ কি বলিব কত॥
কায়স্থ বৈদ্য জত গ্রামে ছিল। বরগির নাম সুইনা সব পলাইল॥
ভাল মানুষের স্ত্রীলোক জত হাটে নাই পথে। বরগির পলানে পেটারি লইয়া মাথে॥'

ক্ষেত্রি রাজপুত জত তলয়ারের ধনি। তলয়ার ফেলাইয়া তারা পলান অমনি ॥
গোসাঞি মোহন্ত জত চৌপালাএ চড়িয়া। বোচকাবুচকি লয় জত বাহুকে করিয়া ॥
চাসা কৈবর্ত্ত জত জাএ পলাইঞা। বিছন বলদের পিঠে ঘাড়ে লাঙ্গল লইয়া ॥
সেক সাইয়দ মোগলপাঠান জত গ্রামে ছিল। বরগির নাম সুইনা সব পলাইল ॥
গর্ভবতী নারী জত না পারে চলিতে। দারুণ বেদনা পাইয়া প্রসবিছে পথে ॥
সিকদার পাটআরি জত গ্রামে ছিল। বরগির নাম সুইনা সব পলাইল ॥
দসবিস লোক যাইয়া পথে ডা-ড়াইলা। তা সভারে সোধায় বরগি কোথায় দেখিলা ॥
তারা সব বোলে মোরা চক্ষে দেখি নাই। লোকের পলান দেইখা আমোরা পলাই ॥
কাঙ্গাল গরিব জত জাএ পলাইঞা। কেথা ধোকড়ি কত মাথাএ করিঞা ॥
বুড়াবুড়ি জাএ জত হাতে লইয়া নড়ি। চাঞি ধানুক পলাএ কত ছাগলের গলায় দড়ি ॥
ছোট বড় গ্রামে জত লোক ছিল। বরগির ভয়ে সব পলাইল ॥'

তারপর বরগি পলাতক জনের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিল। লুটপাট ছাড়া কবি বলিতেছেন,—

'কারু হাত কাটে কারু কাটে নাক কান। একি চোটে কারু বধএ পরাণ ॥
ভাল ভাল স্ত্রীলোক জত ধইরা লইয়া জাএ। আঙ্গুষ্ঠে দড়ি বাঁধি দেএ তার গলাএ ॥
একজনা ছাড়ে তারে আর জনা ধরে। * * * * * *
এই মত বরগি কত পাপকর্ম্ম কইরা। সেই সব স্ত্রীলোকে জত দেএ সব ছাইড়া ॥'

তারপর গ্রামে ঢুকিয়া গৃহদ্বার পোড়াইতে আরম্ভ করিল। তখন অনেকে গঙ্গা পার হইয়া রক্ষা পাইল। ভাস্কর কাটোঞার নিকট যে সকল গ্রাম পোড়াইয়া দিয়াছিলেন, কবি গঙ্গারাম তাহার একটি ফর্দ্দ দিয়াছেন,—

'চন্দ্রকোণা মেদিনীপুর আর দিগনগর। ক্ষিরপাই পোড়াএ আর বর্দ্ধমান সহর ॥
নিমগাছি সেড়গাঁ আর সিমইলা। চণ্ডীপুর শ্যামপুর গ্রাম আনাইলা ॥'

তারপর—

'এই মতে বর্দ্ধমান পোড়াএ চারিভিতে। পুনরপি আইলা বরগি বন্দর হুগলিতে ॥
পির খাঁ ফৌজদার তবে হুগলিতে ছিল। তাহার কারণে বরগি লুটিতে নারিল ॥'

এই পীর খাঁ ফৌজদার কি কৌশলে বরগীকে বিমুখ করিলেন, কবি সেটুকু লিখিলেন না, ইহা ক্ষোভের কথা বটে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা হয় নাই। ইতিহাসে আমরা জানিতে পারি, ভাস্করের সেনাপতি শিবরাও হুগলীতে প্রবেশ করিয়া বলপূর্ব্বক রাজস্ব আদায় করিতে আরম্ভ করেন। এই রাজস্ব আদায়ের সংবাদ শুনিয়াই কলিকাতায় ইংরাজেরা ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় মহারাষ্ট্রা-নালা খনন করান এবং সহরের সমস্ত ফিরিঙ্গী ও আরমানিদিগকে লইয়া অবৈতনিক সৈন্য দল গঠন করেন। ভলান্টিয়ার সৈন্যের উৎপত্তি এইরূপে হয়।

তারপর ভাস্কর রাঢ়ের যে সকল গ্রাম ছারখার করেন, কবি তাহার একটি তালিকা

দিয়াছেন। এই তালিকায় বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, মুরশিদাবাদ, বীরভূম এবং হুগলী জেলার বিস্তর গ্রামের নাম দেখা যায়। সে তালিকা অতি দীর্ঘ, সেজন্য এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম না। কাগামোগা নামক স্থানে ওলন্দাজের কুঠি ছিল, তাহাও লুটিয়া লইয়াছিল। শেষে বরগিরা জেমোকান্দী ডাহাপাড়া পোড়াইয়া হাজিগঞ্জের ঘাটে পার হইয়া বরগিরা মুরশিদাবাদে ঢুকিয়া জগৎশেঠের বাড়ী লুটিল। হাজি আহম্মদ ও নোয়াজিস মহম্মদ কেবল মাত্র কোন ক্রমে নবাবের কেল্লা রক্ষা করিতে সক্ষম হইলেন,—

'হাজি আর ছোট নবাব উপরে ছিল। বরগির নাম শুইনা কিল্লাএ সাধাইল ॥'

নবাব তখনও কাটোঞায়। মুরশিদাবাদ লুঠের কথা শুনিয়া তিনি শীঘ্র সহরে আসিলেন। নবাবের আগমন জানিতে পারিয়া ভাস্কর সরিয়া পড়িল। জগৎশেঠের বাড়ী লুঠিয়া ভাস্কর বড় কৌশলে নগর ত্যাগ করেন। কবি গঙ্গারাম বলিতেছেন,—

'তবে বরগি পার হইলা হাজিগঞ্জের ঘাটে। শীঘ্রগতি আইলা জগৎসেঠের বাড়ী লুটে ॥
আড়কটি টাকা জত ঘরে ছিল। ঘোড়ার খুরচি ভরি সব টাকা নিল।
তবে সও দুই তিন টাকা ছিটাইঞা। শীঘ্রগতি গেলা বরগি গঙ্গাপার হইয়া ॥
তবে ফকির ফকিরা গিরস্ত জত ছিল। সেই সব টাকা তারা লুঠিতে লাগিল ॥'

এইরূপে নগরের লোককে অন্যমনস্ক রাখিয়া নিজামত কেল্লার আক্রমণ হইতে বাঁচিবার জন্য ভাস্কর গঙ্গা পার হইয়া গেল। এক জগৎশেঠের কুঠি লুটিয়া আড়াই কোটী টাকা পাওয়ায় আর অতি লোভে তাঁতি নষ্ট হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়া ভাস্কর এই কৌশলে পলাইল।

নবাব কাটোঞা ছাড়িয়া আসিবার পর ভাস্কর সদলে কাটোঞায় গিয়া জমিল এবং কাটোঞা, ভাওসিংহের বেড়া ও দাঁইহাট জুড়িয়া ছাউনি করিয়া বসিল। তখন বর্ষা আসিয়া পড়িয়াছে, আর লুটপাট চলে না, কাজেই ভাস্কর তখন চারিদিকে খাজনা আদায় করিতে লাগিল। জমীদারেরা আসিয়া মিলিল এবং—

'গ্রামে গ্রামে চর তাগিদায় গেল। তারা সব জাইয়া খাজানা সাদিতে লাগিল ॥'

ইহার পূর্ব্বে মীর হবিব বর্দ্ধমানের যুদ্ধে বরগির হস্তে বন্দী হন। তিনিই এখন ভাস্করের বন্ধু ও প্রধান মন্ত্রী। তাঁহার পরামর্শে গঙ্গায় নৌকার পুল বান্ধিয়া সৈন্য পারের ব্যবস্থা হইল। দাঁইহাটের ঘাট পর্য্যন্ত পুল বাঁধা হইল। ইহা আশ্বিন মাসের পূজার সময়ের কথা। বাঙ্গালায় ঘরে ঘরে তখন দুর্গোৎসবের ধূম দেখিয়া ভাস্কর পণ্ডিতও দুর্গোৎসবের আয়োজন করিল। জমীদারদিগকে ডাকিয়া সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া মহা ধুমধামে পূজার আয়োজন আরম্ভ হইল। একদিন রাত্রিতে বরগিরা সেই পুল বাহিয়া এপারে ফুটিসাকো নামক স্থানে আসিল, নবাব সে কথা শুনিলেন। তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া—

'ষাট হাজার ঘোড়া আর ডেড় লাখ বহনিয়া। তারকপুর আইলা নবাব এত ফৌজ লইয়া ॥'

এই সকল ফৌজের সঙ্গে যে সকল ফৌজদার আসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ঠাকুর সিংহ নামে একজন হিন্দু সেনাপতির নাম আছে। এত বৃহৎ নবাবী সেনা তারকপুরে আসায় ভাস্কর সদলে

পিছাইতে লাগিল। নবাবী সেনা পশ্চাদ্ধাবন করিল। পলাশী পর্য্যন্ত তাড়া করিয়া গেলে, পলাশীর বরগীরাও পলাইল এবং পুলপার হইয়া পুল কাটিয়া দিয়া গেল। নবাব নিজে বহনপুরে পহুছিয়া চারিদিকে তোপ সাজাইয়া "মুরচা লাগাইয়া" বসিলেন। পূর্ণিয়া হইতে ছোট নবাব বাহাদুর ও পাটনা হইতে জইনুদ্দীন আহম্মদকে সসৈন্যে আসিতে লেখা হইল; তাঁহারা আসিলে জইনুদ্দীন অবিলম্বে আক্রমণ করিবার প্রস্তাব করিলেন, নবাব কিন্তু বর্ষার জলকাদা শুকাইবার অপেক্ষা করিতে বলিলেন। জইনুদ্দীন বলিলেন,—

জলকাদা শুকাইলে বরগীর হবে বল। চতুর্দ্দিকে লুটিবে পোড়াবে সকল॥
ফৌজ পার কইরা দি নৌকাএ করিয়া। রাতারাতি যেন বরগি মারে গিয়া॥

মীর হবিব এ সংবাদ পাইয়া নবাবকে ফৌজ পারের অবসর না দিয়াই—

বড় বড় কামান আইনা থুইলা থরে থরে। হুগলি হইতে সুলুক আনে তার পরে॥
তবে গোলন্দাজে গোলা দাগিতে লাগিল। মোরচা ছেদিয়া গোলা ফৌজে পড়িল॥
জেইমাত্র গোলা আইসা ফৌজে পড়িল। তখন নবাব সাহেবের লোক উমনি পিছাইল॥

মীর হবিবের কৌশল সফল হইয়াও হইল না, কামানটা ফাটিয়া গেল, সুলুকের তলা ফুটা হইয়া গেল। এ সংবাদ নবাব শিবিরে যেমন পৌছিল, অমনি নবাব ফৌজ অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। মশাল জ্বালিয়া সেনা কুচ করিয়া নদীর তীরে আসিয়া পৌছিল। জইনুদ্দীন উদ্ধারণ পুরে আসিয়া বড় বড় পাটেলি নৌকা "জুড়িন্দা" বান্ধিয়া "গুদারা" লাগাইয়া দিলেন॥ ফৌজ তাহার উপর দিয়া পার হইয়া অজয়ের তীরে গেল। সেখানেও আবার জুড়িন্দা বাঁধিয়া লইল। রতন হাজারী বাইশ শত ফৌজ লইয়া "পাটেলি" চড়িয়া যখন পার হইবে, অমনি কতকদূরে পাটেলি তলা ফাটিয়া ডুবিয়া গেল। তখনও বরগী নিশ্চিন্ত, তবে তাহারা সংবাদ রাখিতে ছিল। রতন হাজারির দল সাঁতারাইয়া ডাঙ্গায় উঠিবামাত্র হঠাৎ বরগীর শিবিরে "বহনিয়া"-দলে মোগল আসিল বলিয়া একটা কলরব উঠিল; সকলে ভীত হইয়া পলাইতে লাগিল, ভাস্কর পণ্ডিত সে পলায়নে বাধা দিতে পারিলেন না। অষ্টমীর রাত্রিতে ভাস্কর প্রতিমা ফেলিয়া পলাইতে বাধ্য হইলেন। নবাব সে যাত্রা কাটোঞা হইতেই ফিরিলেন। ভাস্কর পুনরায় সসৈন্যে চৈত্রমাসে আসিলেন। এবার আসিয়া লুঠের অপেক্ষা হত্যার মাত্রা বাড়াইয়া তুলিলেন। কবি এখানে নিজের কাব্যের সূত্রপাতের সঙ্গে পরিণামে সামঞ্জস্য রাখিতে চেষ্টা করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন,—

ব্রাহ্মন বৈষ্ণব যত সন্যাসী ছিল। গোহত্যা স্ত্রীহত্যা শত শত কৈল॥
হাজার হাজার পাপ করিল দুর্ম্মতি। লোকের বিপত্য দেইখ্যা রুষিলা পার্ব্বতী॥
পাপিষ্ট মারিতে আদেশিলা পশুপতি। ব্রাহ্মন বৈষ্ণব হত্যা কৈলা পাপমতি॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হিংসা দেখিবারে নারি। এতেক কহিয়া তবে রুষিলা শঙ্করী॥
ভৈরবী জোগিনী যত নিকটে ছিল। জোড়হস্ত কইরা তারা ছমুতে দাড়াইল॥
তবে দুর্গা কহে শুন জতেক ভৈরবী। ভাস্করকে বাম হইঞা নবাবকে সদয় হবি॥

এতেক বলিয়া দুর্গা করিলা গমন। এখন যেরূপে ভাস্কর মইল শুন বিবরণ ॥

আমরাও তাই বলি যে—দেবতাদের ব্যবস্থা দেবতারা যাহাই করুন আর তদ্দ্বারা কবি গঙ্গারামের কাব্যশক্তি যতই কেন প্রকাশ হউক না, এখন ইতিহাসটা শেষ করা আবশ্যক।

ভাস্কর এ যাত্রাতেও আসিয়া কাটোঞ্রায় ছাউনী করিলেন। নবাব শুনিয়া মনকরাতে আসিয়া ছাউনী করিলেন। আলীভাই নামে একব্যক্তি ভাস্করকে পরামর্শ দিলেন এবার আর লুঠে কাজ নাই। বারবার আসিয়া সৈন্যক্ষয় করিয়া কি হইবে? নবাবের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করিয়া ফেল। ভাস্কর সম্মত হইলেন। আলীভাই পঁচিশ জন সওয়ার লইয়া ফুটি-সাকোতে আসিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়া নবাব-শিবিরে লোক পাঠাইলেন। নবাব নিরস্ত্র হইয়া আলীকে আসিতে আদেশ দিলেন, নিরস্ত্র হইয়া সওয়ার লইয়া আলিভাই আসিলেন ও বন্দো-বস্তের প্রার্থনা করিলেন। নবাব বর্দ্ধমানের কথা তুলিয়া বলিলেন, আমি যখন সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছিলাম, তখন তোমরা এ কথাটা কাণে তুল নাই। শুনিয়া

"আলিভাই বোলে জাহা হবার তা হইল। কদাচিত উকথা মুখে আর না বুইল ॥
দুই সরদার তুমি দেহ আমার সনে। ভাস্করকে মিলাইয়া আনি এইস্থানে ॥"

ইহা শুনিয়া নবাব জানকীরাম ও মুস্তাফা খাঁকে সঙ্গে দিলেন। ভাস্করও আসিতে সম্মত নহেন, মীর হবিবও পরামর্শ দিলেন না। শেষে মুস্তাফা খাঁ নিজে কোরাণ ও জানকীরাম গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া জামীন হওয়ায় ভাস্কর স্বীকৃত হইলেন। ১লা বৈশাখ শুক্রবারে ভাস্কর কাটোঞ্রা হইতে যাত্রা করিলেন। ২রা তারিখে মনকরা-শিবিরে দরবারে নিরস্ত্র হইয়া উপস্থিত হইলেন। নবাব পুরাতন কথা পাড়িলেন।

"এতেক শুনিঞা ভাই আলি কহিল। এতদিন যাহা হবার তাহা হইল ॥
ভাস্কর পণ্ডিত যদি মিলু তোমার স্থানে। কিছু দিঞা বন্দবস্ত কর ইহার সনে ॥"

তার পর কবি যেটুকু লিখিয়াছেন সেটুকু বেশ হাসির কথা,—

"এতেক শুনিয়া নবাব কহিলেক হাসি। খানিক বিলম্ব কর লঘ্যি কইরা আসি ॥"

এইরূপে নবাব "লঘ্যি" অর্থাৎ please let me go outএর ছুতা করিয়া উঠিয়া গেলেন। ষড়যন্ত্র পূর্ব্বেই স্থির ছিল। কতক্ষণ বসিয়া ভাস্কর বলিলেন, তবে আমিও স্নানপূজায় যাই। মুস্তাফা খাঁ বলিলেন, চল সকলেই যাই, "সে-পহরে আসিব নবাবের ঠাঞি।" তাহার পর—

জেই মাত্র ভাস্কর ঘোড়াএ চড়িতে। তলয়ার খুলিয়া তখন মারিলেক তাথে ॥
সেইক্ষণে তবে খটাবট্টি হইলা। যতগুলা আইসা ছিল সবগুলা মইল ॥

তারপর নবাব শিবিরে আনন্দ হইল, ফকীর ফকরাণ খাইল, বাজনা বাজিল, নিশান উড়িল আর কবি গঙ্গারাম গ্রন্থ সমাপন করিয়া বলিলেন,—

মনকরা মোকামে জদি ভাস্কর মইল। মনস্থুরা দউড়াইয়া কবি গঙ্গারামে কইল ॥

ইতি মহারাষ্ট্র-পুরাণে প্রথমকাণ্ডে ভাস্করপরাভব। শকাব্দ ১৬৭২ সন ১১৫৮ সাল তারিখ ১৪ই পৌস রোজ সনিবার।

কবি গঙ্গারামের কাব্য-কথা এই পর্য্যন্ত। ইহা তাঁহার প্রথমকাণ্ড, এই পুরাণের দ্বিতীয়াদি কাণ্ড আর লেখা হইয়াছিল কি-না জানি না। ১১৪৮ সালে (১৭৪১ খৃঃ) আলীবর্দ্দী খাঁ নবাবের সময়ে ভাস্কর পণ্ডিতের প্রথম আগমন হয়। ভাস্করের হত্যার সঙ্গে সঙ্গে এক বৎসরেই বিদ্রোহ দমন হয়; সুতরাং আমাদের আলোচ্য কাব্যখানি ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই লিখিত বলিলেও বলা যায়। বর্ত্তমান পুঁথিখানিও ঘটনার আট বৎসরের মধ্যে লেখা; সুতরাং এ পুথিখানি কবির নিজের মূল পুস্তক না হইলেও তাঁহার সমসাময়িক গ্রন্থ। কবি গঙ্গারাম এই কাব্যে যাহা কিছু লিখিয়াছেন, বাঙ্গালার ইতিহাসের সহিত তাহার বিশেষ অসামঞ্জস্য নাই। একটা প্রধান ঘটনা কেবল মিলিল না। বর্দ্ধমানসহরে নবাব সসৈন্যে যে ভাস্কর পণ্ডিতকর্ত্তৃক সাত দিন অবরুদ্ধ ছিলেন, তাহা মুতাক্ষরীণ, তারিখী-বাঙ্গালা বা হলওয়েলের বিবরণীতেও নাই। আমাদের কালীপ্রসন্ন বাবুও তাঁহার নবাবী আমলের ইতিহাসে সে কথা বলেন না। তবে নবাব সৈন্য যে অন্নহীন হইয়া কলাগাছের এঁঠে সিদ্ধ করিয়া খাইতে বাধ্য হইয়াছিল, তাহা অতিশয়োক্তি নহে। পাঁচ হাজার সেনা লইয়া নবাব বর্দ্ধমান হইতে সত্তর ক্রোশ দূরে কাটোঞাতে যে কষ্টে ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে অপূর্ব্ব বীরত্ব দেখাইয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন এবং নিরন্ন অবস্থায় যেরূপ কষ্টে পড়িয়াছিলেন, তাহা তারিখী-ইউসুফীর গ্রন্থকার ইউসুফ আলীর কথা হইতে কালীপ্রসন্ন বাবু যেরূপ লিখিয়াছেন, এস্থলে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল,*—

বাঙ্গালা ১১৪৮ সালে (১৭৪১ খৃষ্টাব্দে) আলীবর্দ্দি খান, বাঙ্গালার নবাবী অধিকার করেন। একবৎসরের মধ্যে রাজকার্য্য পরিচালনের জন্য নিজ মনোমত লোকজন নিযুক্ত করিয়া সুজাউদ্দীনের জামাতা মুরশিদকুলী খান্‌কে (২য়) কটক হইতে উচ্ছেদ করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। এক মাস অবরোধের পর মুরশিদকুলীর জামাতা বাকর খান একদিন যুদ্ধে আহত হইলে, মুরশিদকুলী পরাজিত হইয়া মছলীবন্দরে পলায়ন করিলেন। আলীবর্দ্দির জামাতা সৈয়দ আহম্মদ উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা হইলেন কিন্তু তাঁহার অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া মুরশিদকুলী খানের অনুকূলপক্ষ আবার বিদ্রোহী হয়। নবাব আবার উড়িষ্যায় গিয়া তাহা দমন করেন এবং জামাতার সঙ্গে মাসুম খান্‌কে প্রতিনিধি রাখিয়া আসেন। ১১৪৯ সালের শেষে নবাব মন্দ-গমনে রাজধানীতে ফিরিতে লাগিলেন। পাঁচ হাজার সেনা সঙ্গে রাখিয়া নবাব আর সকলকে বিদায় দিলেন। মেদিনীপুরের দক্ষিণে আসিয়া নবাব শুনিলেন, পঞ্চকোটের পার্ব্বত্যপথ দিয়া চল্লিশহাজার সেনা লইয়া নাগপুরের অধীশ্বর রঘুজী ভোঁসলের রণনিপুণ সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত বাঙ্গালার রাজস্বের "চৌথ" আদায়ের অছিলায় বর্দ্ধমানের দিকে চলিয়াছে। উভয়দলের মধ্যে কেবল কুড়িক্রোশ মাত্র ব্যবধান, পরদিন হয়ত মহারাষ্ট্রারা সন্ধ্যার পূর্ব্বেই নবাবের শিবিরের কাছে আসিতে পারে। নবাব মনে মনে চিন্তিত হইয়াও মুখে সাহস প্রকাশ করিলেন। মহারাষ্ট্রীয় ইতিহাসে জানা যায়,

* অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালার ইতিহাস ১৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ইহার পর শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় "বঙ্গে বর্গী" নামে একখানি ক্ষুদ্র ইতিহাস লিখিয়াছেন, সে খানিও দ্রষ্টব্য।

উড়িষ্যার দেওয়ান মীর হবিব খান্ মাহারাট্রাদিগকে বাঙ্গালা আক্রমণের জন্য আহ্বান করেন। হলওয়েলের বর্ণনা হইতে জানা যায়, মাহারাট্রাযুদ্ধের সন্ধি অনুসারে মাহারাট্রাগণ দিল্লীর বাদশাহ্ মহম্মদ শাহ্‌র নিকট দুই বৎসরের বাকী চৌথ চাহিয়া পাঠায়, কিন্তু বাদশাহ্ বলেন, বাঙ্গালার সুবাদার বিদ্রোহী, সে কোন রাজস্বই এখানে পাঠায় না, অতএব তোমরা গিয়া সুবাদারকে দমন করিয়া চৌথ আদায় করিয়া লইতে পার। ১১৪৭ সালে (১৭৪০ খৃষ্টাব্দে) এই ঘটনা হয়। ইহার দুই বৎসর পরে ভাস্করপণ্ডিত বাঙ্গালায় আসেন।*

নবাব তাহার পর বুঝিলেন যে যদি মেদিনীপুরের দক্ষিণাংশে স্বদলে আক্রান্ত হইতে হয় তবে অবরোধে পড়িয়া খাদ্যাভাবে মারা পড়িতে হইবে। তিনি তৎক্ষণাৎ দ্রুত বর্দ্ধমানে রওয়ানা হইতে আদেশ দিলেন। বর্দ্ধমানে আসিয়া দেখিলেন, বরগীরা তাঁহার পূর্ব্বে আসিয়া নগরের একাংশ পুড়াইয়া দিয়াছে। নবাব আসিতেই, তাহারা একটু দূরে সরিয়া গেল। শেষে উভয় দলে যুদ্ধ হইতে লাগিল। জয় পরাজয় নাই, প্রত্যহ প্রাতে যুদ্ধ হয়, সন্ধ্যায় উভয় দল যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া শিবিরে ফেরে। ভাস্কর পণ্ডিত নবাবের যুদ্ধরীতি দেখিয়া জয়ের আশা ছাড়িয়া কিছু টাকা লইয়া ফিরিবার ইচ্ছা করিলেন। তিনি নবাবকে জানাইলেন, মহারাট্টারা বহুদূর হইতে অর্থের আশায় আসিয়াছে, নবাব দশলক্ষ টাকা দিলেই ফিরিয়া যাইবে। মুস্তাফা খান্ তখন নবাবের সঙ্গী সেনাদলের সেনাপতি। তাঁহার প্রস্তাবে নবাব ইহাতে সম্মত হইলেন না। কাজেই লঘুযুদ্ধ যেমন চলিতেছিল, চলিতে লাগিল। একদিন নবাব সমস্ত সেনা লইয়া বিপুলবেগে আক্রমণ করিলেন; কিন্তু সৈন্যচালনায় বিশৃঙ্খলা হওয়ায় মহারাট্টাগণের সুবিধাই হইতে লাগিল। তাহারা কৌশলে নবাব-বেগমের হস্তী ঘিরিয়া ফেলিল। মুসাহেব খান্ নামে একজন সেনাপতি অশেষ বীরত্ব দেখাইয়া বেগমদিগকে উদ্ধার করেন। নবাব লক্ষ্য করিলেন, মুস্তাফা খান্ যুদ্ধে তেমন মনোযোগী নহেন। নবাবী-শিবিরের দ্রব্যাদি সমস্ত শত্রু-হস্তগত হইয়াছে। যুদ্ধের যে অবস্থা তাহাতে অগ্রসর হইবার বা ফিরিয়া শিবিরে যাইবার উপায় নাই। একটি তাম্বু ও তিন চারিখানি শিবিকা ভিন্ন তখন নবাবের নিশাযাপনের অন্য আশ্রয় নাই, কাজেই নবাব দশলক্ষ টাকা দিতে সম্মত হইলেন। ভাস্কর অবস্থা বুঝিয়া এককোটী টাকা চাহিলেন এবং নবাবের অবস্থা প্রকাশ করিয়া দিয়া প্রচার করিলেন, নবাবপক্ষের যে কেহ মহারাট্টার দলে আসিতে চাহ, এস, আমি আশ্রয় দিব। সন্ধ্যার সময়ে নবাবের দলের অনেকে বরগীর দলে গিয়া মিলিল। উড়িষ্যার যুদ্ধের সময় আলীবর্দ্দি খান্ মুস্তাফা খানের কয়েকটি অনুরোধ রাখেন নাই বলিয়া মুস্তাফা খান্ আলীবর্দ্দির উপর চটিয়া ছিলেন। এই

---

* এই পর্য্যন্ত কবি গঙ্গারামের বর্ণনার সহিত ইতিহাসের মিল আছে, কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় ইতিহাসের বিবরণটাও একটু বিচার করিয়া দেখিবার কথা। মহারাষ্ট্র যুদ্ধে বাদশাহের সঙ্গে যে সন্ধি হয় তাহা পেশবার সহিতই হইয়াছিল; চৌথের দাবী করিলে তিনিই করিবেন, নাগপুরের ভোঁস্‌লে রঘুজী তাহার অধিকারী নহেন সুতরাং চৌথের জন্য ভাস্করের আগমন ঠিক নহে, তবে ঐ অছিলায় মীর হবিব খানের আহ্বান রক্ষা করা একবারে অসম্ভবও না হইতে পারে

তাঁহার শোধ লইবার সময়। আলীবর্দ্দি ইহা বুঝিতে পারিয়া, সেনাপতিকে শান্ত করিবার জন্য বালক সিরাজকে লইয়া রাত্রিতে মুস্তাফা খানের শিবিরে উপস্থিত হইলেন ও নিজ দৈন্য জানাইয়া তাঁহার সাহায্য চাহিলেন। মুস্তাফা অন্যান্য সেনাপতির সহিত পরামর্শ করিয়া নবাবকে ভরসা দিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে নবাব অমিততেজে বিপক্ষ মধ্য দিয়া স্বদলে যুদ্ধ করিতে করিতে কাটোয়ার দিকে যাত্রা করিলেন। পাঁচ হাজার সেনা লইয়া নবাবের প্রত্যাবর্ত্তন ব্যাপার অতীব ভীষণ ব্যাপার। পূর্ব্বদিন সেনারা অনাহারে যুদ্ধ করিয়াছে, রাত্রিতে মাহারাট্টার বিজিত কামানের গোলায় ছিন্নভিন্ন হইয়াছে, তাহার উপর দশ বার ক্রোশব্যাপী লুণ্ঠিত ভস্মীভূত গ্রামনগরাদির মধ্য দিয়া অনাহারে যুদ্ধ করিতে করিতে ফিরিতে হইতেছে! এই দুর্দ্দশায় অবস্থা বুঝিয়া বর্দ্ধমানরাজের দেওয়ান রাজা মাণিকচাঁদ প্রত্যুষেই পলায়ন করিলেন। গ্রামনগরে লোক নাই, সকলে বরগীর ভয়ে পলাইয়াছে, কাজেই আহার্য্য মিলিবার কোন উপায়ও নাই। অগত্যা অনেকে বৃক্ষপত্র, বল্কল, পিপীলিকাদি ধরিয়া খাইতে লাগিল। নবাব তিনদিন উপবাসী; তৃতীয় দিবসে তিনপোয়া মাত্র খিচুড়ী সংগৃহীত হইলে তাহা সাতজনে ভাগ করিয়া খাইতে হইল। একদিন নবাবীসেনাদল রন্ধননিযুক্ত মহারাষ্ট্রীয়গণকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি খাইয়া ফেলিল। তিনদিন পরে সকলে কাটোয়ায় পঁহুছিয়া দেখিলেন, মহারাট্টারা আগে আসিয়া নগর ও শস্যভাণ্ডার পুড়াইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে। নবাবীসেনা সেই দগ্ধশস্য অমৃত মনে করিয়া খাইতে লাগিল। এই সময়ে মুরশিদাবাদ হইতে আহার্য্য ও সাহায্য আসায় নবাবীসেনার অবস্থা ফিরিল। এই সময়ে বর্ষাও আসিয়া পড়িল। মীর হবিব খান্ ইতিপূর্ব্বেই মহারাষ্ট্রদলে প্রকাশ্যতঃ যোগ দিয়াছিলেন। নবাব যখন কাটোয়ায়, তখন পরামর্শ করিয়া মীর হবিব খান একদল সেনা লইয়া মুরশিদাবাদের পশ্চিম ডাহাপাড়ায় গিয়া অগ্নিদান ও লুণ্ঠন আরম্ভ করিলেন; পরে গঙ্গাপার হইয়া জগৎশেঠের কুঠি লুঠিয়া দুইকোটী টাকা ও অনেক বহুমূল্য দ্রব্যাদি হস্তগত করিলেন। হাজী আহাম্মদ ও নওয়াজিস কেবল কেল্লাটি রক্ষা করিতে পারিলেন, আর কিছু পারিলেন না। পরদিন প্রাতে নবাব মুরশিদাবাদে আসিয়াছেন জানিয়াই মীর হবিব সদলে কাটোয়ায় ফিরিয়া গেলেন। ইহা ১১৪৯ সালে (১৭৪২ খৃষ্টাব্দের) প্রথমে ঘটে।

মহারাট্টারা কাটোয়ার উত্তরে অজয় পারে সাঁকাই নামক পল্লীতে এক মৃণ্ময় দুর্গ ও গড়বেষ্টিত ফৌজদারের বাড়ী অধিকার করিয়া বর্ষা কাটাইবার ব্যবস্থা করিল। এখান হইতে তাহারা মধ্যে মধ্যে বর্দ্ধমান, হুগলী, রাজশাহী, রাজমহল প্রভৃতি স্থান লুঠিতে লাগিল। মুরশিদাবাদের লোকেরা, মালদহ, রামপুর-বোয়ালিয়ায় চলিয়া গেল। নবাবও পরিবারবর্গকে পদ্মাপারে গোদাগাড়ীতে পাঠাইলেন। বর্দ্ধমান অঞ্চলে ইউরোপীয় বণিকেরও ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হইল। কাটোয়া ও বর্দ্ধমানের দক্ষিণ লোকাভাবে জঙ্গল হইয়া উঠিল।

হুগলীতে বরগীরা একটা প্রধান আড্ডা করিল। মীরহবিব খানের পরামর্শে শিবরাও নামে মহারাট্টা সর্দ্দার রাজস্ব আদায় আরম্ভ করিতে লাগিল। ভাগীরথীর পশ্চিম পারের

লোকেরা কলিকাতায় ইংরাজের আশ্রয়ে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। ইংরাজেরা এই সময়ে কলিকাতার তিন দিকে গড় কাটাইতে লাগিলেন। ইহাই মহারাষ্ট্রনালা। এই কাজে মজুরেরা বেতন লয় নাই। অন্যান্য ব্যয় নগরবাসীরা চাঁদা করিয়া দিয়াছিল। ইংরাজেরা এই সময়ে সহরের ইউরোপীয়, আর্ম্মাণী এবং ফিরিঙ্গীদিগেকে লইয়া ভলণ্টিয়ার সেনাদল গঠিত করিলেন। চাঁদা ও ভলণ্টিয়ারের এই সূত্রপাত।

ইতিমধ্যে বেহার হইতে নবাবের কনিষ্ঠ জামাতা জৈনুদ্দীন সসৈন্যে যোগ দিলেন। বর্ষাশেষে নবাবী সেনা কাটোয়ার দিকে অগ্রসর হইল। রাত্রিতে নৌসেতু করিয়া নবাবী সেনা কাটোয়া পার হইল। দুই তিন হাজার সেনা পার হইলে সেতু ভাঙ্গিয়া গেল। যাহা হউক আবার সেতু-নির্ম্মিত ও মহারাষ্ট্রীয়েরা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পঞ্চকোটের পথ দিয়া উড়িষ্যায় পলাইল। ইহা ১১৪৯ সালের আশ্বিনের ঘটনা। এই যুদ্ধে মুস্তাফা খান্ বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা উড়িষ্যায় মাসুম খানুকে নিহত করিয়া দেশে চলিয়া গেল। হলওয়েল বলেন শিবরাও ধরা পড়েন এবং তাঁহারা সাহায্যে পেশবা বালাজীরাওএর সহিত সন্ধি হয়। ইহার পর ১১৪৯ সালের শেষে (১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে) বালাজীরাও স্বয়ং ১১লক্ষ টাকা চৌথের জন্য বেহারের দিকে অগ্রসর হইলেন। রঘুজী ভোঁসলেও এই সময়ে নিজে বাঙ্গালার দিকে অগ্রসর হইলেন। বালাজীরাও সন্ধি অনুসারে নবাবকে সাহায্য করিতেই আসিতেছিলেন। বেহারের চৌথ দিয়া আলীবর্দ্দি তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলেন। এই সময়ে রঘুজী বর্দ্ধমান অঞ্চলে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। নবাবী-সেনা ও বালাজীর মহারাষ্ট্রীয় সেনা একত্র তাঁহার বিরুদ্ধে যাত্রা করিল। রঘুজী এবার অসুবিধা বুঝিয়া বর্দ্ধমান হইতেই পলাইলেন। পরবর্ষে রঘুজী ভাস্কর পণ্ডিতকে পাঠাইলেন, ভাস্করের উদ্দেশ্য চৌথ আদায় নহে, লুণ্ঠনে উপার্জ্জন, কাজেই ভাস্কর বেশী অগ্রসর না হইয়া পশ্চিম-বাঙ্গালার নানাস্থানে লুঠিতে লাগিল। আলীবর্দ্দী ইহাতে বিপন্ন ও হতাশ হইয়া পড়িলেন, কারণ এবার ভাস্কর যুদ্ধ করিতে চাহে না, এক স্থানে তাড়া দিলে অন্য স্থানে সরিয়া গিয়া লুঠ করে। কাজেই মন্ত্রী জানকীরাম ও মুস্তাফাকে পাঠাইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। তাঁহারা নবাবের শিক্ষানুসারে কৌশলে ভাস্করকে মনকরা নামক স্থানে নবাব দরবারে লইয়া আসিলেন। ভাস্কর দরবারে আসিলে লুক্কায়িত সেনারা তাহাকে হত্যা করিল। বাহিরে ভাস্করের অনুচর মহারাষ্ট্রসেনাদল অপেক্ষা করিতেছিল, তাহারা নবাবী সেনাদ্বারা হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া পলাইল। ১১৫০ সালে (১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে) ভাস্কর নিহত হন।

ইতিহাসের এই পর্য্যন্ত আমাদের মহারাষ্ট্র-পুরাণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। পাঠকগণ দেখিবেন, ইহার সহিত কবি গঙ্গারামের একটী কথারও অমিল নাই।

গঙ্গারামের কবিতার মধ্যে যে সকল নামের উল্লেখ আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকের পরিচয় উপরের লিখিত বিবরণে পাইয়াছেন। বাকী কয়েক জনের মধ্যে রাজারাম সিংহ নবাবের চরের অধ্যক্ষ ও মেদিনীপুরের ফৌজদার ছিলেন। ইঁহারই নিযুক্ত লোকে দেশের

সর্ব্বত্র ঘুরিয়া সংবাদ সংগ্রহ করিত। সমশের খান্ আলীবর্দ্দীর একজন সেনাপতি ছিলেন। যে যুদ্ধে সরফরাজ খানের পতন হয়, সেই যুদ্ধে মীরহবিব খান্, রাজা গন্ধর্ব্ব সিংহ ও সমশের খান্ বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। মীর উমের খান্‌ও একজন প্রসিদ্ধ সেনাপতি ছিলেন। সিরাজের সময় যে দিলীর খান্ ও আসালত খান্ সওকত জঙ্গের যুদ্ধে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তাঁহারা এই মীর উমের খানের পুত্র। এতদ্ভিন্ন আর কাহারও পরিচয় তেমন কিছুই পাওয়া যায় না।

ভাস্করের দুর্গোৎসবের কথা কোন ইতিহাসে নাই, কিন্তু তাহা যে ঘটে নাই, তাহা বলিবারও কোন প্রমাণ নাই, কারণ কবি গঙ্গারাম হিন্দু এবং সমসাময়িক কবি। তাঁহার সাক্ষ্য এ বিষয়ে অধিক গ্রহণীয়। সময়ামযিক মুসলমান ইতিহাসলেখকের পক্ষে এ পুতুল-পূজার ব্যাপার অকিঞ্চিৎকর বোধে লিপিবদ্ধ হওয়ার পক্ষে অগ্রাহ্য হওয়া কিছু অন্যায় নহে।

গ্রন্থের কাব্যাংশের শ্রেষ্ঠতা বিশেষ কিছু নাই। বর্গীর অত্যাচার বর্ণনা করিতে তিনি যে আলঙ্কারিকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কাব্যরস না ছড়াইয়া সাদাসিধা কথায় ঘটনার সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম ব্যাপারগুলি বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহার পক্ষে বিশেষ ধন্যবাদার্হ। তবে ভাস্করের দ্বিতীয়বার আক্রমণে তাঁহাকর্ত্তৃক গো ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ও স্ত্রী হত্যার যেরূপ অবাধ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা যেন অতিমাত্র অতিশয়োক্তি বলিয়াই বোধ হয়।

অতঃপর এই গ্রন্থের ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। পুথিখানির অধিকাংশ স্থানেই রাঢ়ের উচ্চারণসুলভ আনুনাসিক ক্রিয়া পদের বহুল প্রয়োগ দেখিয়া কবিকে রাঢ়ের লোক বলিয়া সহজেই অনুমান করা যায় আর সে অনুমান আমার নিজের পক্ষে এতটা দৃঢ় যে, আমি তাঁহাকে রাঢ়ীয় লোক বলিতে একটুও ইতস্ততঃ করিতেছি না। একটা কথা স্মরণ করা কর্ত্তব্য,—পুথিখানি আমরা ময়মনসিংহে পাইয়াছি, সুতরাং এখানি যে পূর্ব্ব বাঙ্গালার কোন লোকের নকল করা পুথি তাহাতেও সন্দেহ নাই আর তাহার প্রমাণও ইহাতে বর্ত্তমান আছে। অধিকাংশ স্থলেই রাঢ়ীয় উচ্চারণসুলভ আনুনাসিক ক্রিয়া পদের মধ্যে মধ্যে দুই চারিটির বানান আবার পূর্ব্ববঙ্গ-সুলভ স্বরবিস্তৃতি যুক্ত। স্বর-ব্যত্যয়যুক্ত ক্রিয়াপদেরও প্রয়োগ আছে যথা,—

(১) লোকের বিপত্য দেইখ্যা রুষিলা পার্ব্বতি।
(২) যেই মাত্র গোলা আইসা ফৌজে পড়িল।
(৩) বরগির নাম সুইনা সব পলাইল।

পূর্ব্ববঙ্গীয় লোকের হাতে নকল হওয়াতে রাঢ়ীয় উচ্চারণের অনেকগুলি ক্রিয়াপদের বানানও পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে যথা,—

(১) বোচা বুচ্‌কি লয় যত বাহুকে করিয়া।
(২) বিছন বলদ্দের পিঠে ঘাড়ে লাঙ্গল লইয়া।

আর একটি ভাষাতত্ব সম্বন্ধে রহস্ত আমি এই গ্রন্থে লক্ষ্য করিয়াছি।

অধিকাংশ স্থলে এই পুথিতে শ ও ষ এর স্থানেই স ব্যবহৃত হইয়াছে। "জ" "য" স্থানে সর্ব্বত্র 'জ'ই ব্যবহৃত হইয়াছে। ই-কারের প্রয়োগই বেশী। ণ-কারের প্রয়োগ নাই বলিলেই চলে; কিন্তু 'য়'কার স্থানে 'অ'কারের প্রয়োগ তত বেশী নহে। প্রথমভাগে কিছু কিছু আছে শেষের দিকে আদৌ নাই।

'য়া'কারান্ত অসমাপিকা ক্রিয়াপদগুলি রাঢ়ীয় উচ্চারণে সর্ব্বত্র ঞ তে আকার দিয়া লেখা হইয়াছে—পাইঞা করিঞা পাঠাইঞা ইত্যাদি। কোন কবির সময়ের এত নিকটবর্ত্তীকালের কোন পুস্তক আমরা এপর্য্যন্ত পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এই পুথিতে অধিকাংশ কথার রাঢ়ীয় উচ্চারণ অনুসারে বানান দেখিয়া আমার মনে হয়, রাঢ়ীয় কবিরা ব্যাকরণে লক্ষ্য রাখা অপেক্ষা উচ্চারণের প্রতিলক্ষ্য রাখিয়া বানান লিখিতেন। আবার রাঢ়ীয় পুস্তক পূর্ব্ববঙ্গবাসীর পঠনার্থ লিখিত হইলে বোধ-সৌকর্য্যার্থে তাহার বানান পরিবর্ত্তন করিয়া লেখা হইত। তাহার আভাস ও প্রমাণ ইহা হইতে পাওয়া যায়।

প্রাচীন পুথির ছাপার সময় বানান নির্ণয় করিতে বড় বিপদে পড়িতে হয়। একখানি পুথির সর্ব্বত্র একই শব্দের একই প্রকার বানান পাওয়া যায় না। পরিষদে যে সকল গ্রন্থ আজ পর্য্যন্ত ছাপা হইয়াছে, তাহাতেও এইরূপ ব্যাপার যথেষ্ট লক্ষ্য করা যায়। এই পুথি-খানিতে য়ামি ও আমি দুইরূপ প্রয়োগই আছে। বরগি ও বরগী দুইরূপই আছে। আবার দেইখ্যা, দেইখা, দেখিয়া দেখিঞা এই চতুর্ব্বিধরূপই আছে,—এ সকলের সামঞ্জস্য করার উপায় কিছু হয় কি না, আমি জানি না। নকার স্থানে সর্ব্বত্র 'ন' কারের প্রয়োগ এবং জকার স্থানে সর্ব্বত্র 'জ'কারের প্রয়োগ ও শকার স্থানে সর্ব্বত্র 'স'কারের প্রয়োগ, যাঁহারা প্রাচীন রীতি বলিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের যুক্তি কি আমি তাহা জানি না, কিন্তু কোন পুথিতে তাহা ধ্রুবসত্য বলিয়া দেখিতে পাই না। এ পুথিতে অধিকাংশ স্থলে তাঁহাদের মত সমর্থিত হইয়াছে বলিতে পারি; কিন্তু সংস্কৃত শব্দের প্রাকৃত বা দেশজ পরিবর্ত্তন না ঘটিলে ব্যাকরণসিদ্ধ বানান পরিবর্ত্তন করিয়া মুদ্রিত করা উচিত কি না তাহা মীমাংসার বিষয়; যেমন এই পুথিতে "যদি" শব্দটি সর্ব্বত্র "জদি" এই বানানে লিখিত হইয়াছে। ইহার পরিবর্ত্তন বা রক্ষণ কোনটী প্রার্থনীয়, তাহা বিবেচনা সাপেক্ষ।

যাক্ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের উপর আর বেশী বাক্যব্যয় করিবার আবশ্যক নাই। পরিষৎ-পত্রিকায় এই পুথিখানি যেমন আছে সেইমত বানানে ছাপাইয়া দিলাম, এখন এসম্বন্ধে মনীষীরা আলোচনা করিলে সুখী হইব।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী।

মহারাষ্ট্র-পুরাণ

প্রথম কাণ্ড

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ

রাধাকৃষ্ণ নাহি ভজে পাপমতি হইঞা।[1]
রাত্রি দিন ক্রুড়া[2] করে পরস্ত্রী লইঞা ॥
শ্রীঙ্গার[3] কৌতুকে জিব[4] থাকে সর্ব্বক্ষণ।
হেন নাহি জানে সেই কি হবে কখন ॥
পরহিংসা পরনিন্দা করে রাত্রি দিনে।
এই সকল কথা বিনে অন্য নাহি মনে ॥
এত জদি[5] পাপ হইল পৃথিবী উপরে।
পাপের কারনে[6] পৃথি[7] ভার সহিতে নারে ॥
তবে পৃথি চলি গেলা ব্রহ্মার গোচর।
কহিতে লাগীলা[8] পৃথি ব্রহ্মা বরাবর ॥
পাপের কারনে প্রভু পৃথী[9] হইল ভারি।
কত ব্যাম[10] পাব আমী[11] ভার সহিতে নারি ॥

১। হইঞা—হইয়া। রাঢ় (পশ্চিমরাঢ়) দেশের উচ্চারণে "য়া" অসমাপিকা ক্রিয়া গুলির আকার "ঞা" হইয়া যায় এবং সেই অনুনাসিক উচ্চারণ "ঞ" বর্ণদ্বারা প্রাচীন পুথিতে লিখিত হইয়া থাকে।

২। ক্রুড়া—ক্রীড়া। ৩। শ্রীঙ্গার—শৃঙ্গার। ৪। জিব—জীব।

৫। জদি—যদি। এই পুথিখানির অধিকাংশ স্থলে "য" স্থলে "জ" ব্যবহৃত হইয়াছে।

৬। কারনে—কারণে। সর্ব্বত্র "ণ"কার স্থানে "ন" ব্যবহৃত হয় নাই, তৃতীয় চরণে "ক্ষণ" শব্দ দ্রষ্টব্য।

(৭) পৃথি—পৃথ্বী।

(৮) লাগীলা—লাগিলা। এরূপ হ্রস্ব-ইকার স্থানে দীর্ঘ-ঈকারের প্রয়োগ খুব অল্প প্রত্যুত অধিকাংশ ঈ-কার স্থানেই ই-কার ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা তৃতীয় চরণে "জিব" শব্দ ও দ্বাদশচরণে "আমী" শব্দ দ্রষ্টব্য।

(৯) পৃথী—পৃথ্বী, এখানে ঈ-কারের সুপ্রয়োগ বলিতে হইবে।

(১০) ব্যাম—ব্যামোহ। (১১) আমী—আমি।

এতেক সুনিঞা[১২] ব্রহ্মা বোলিছে[১৩] বচন।
ব্যাকুল না হইয়[১৪] তুমি ধর্য্য[১৫] কর মন॥
পৃথী সঙ্গে করি ব্রহ্মা গেলা শীব[১৬] স্তানে।
কহিতে লাগিলা ব্রহ্মা স্তুতি বচনে॥
তুমি কর্ত্তা তুমি হর্ত্তা তুমি নারায়ণ।
স্থাবর জঙ্গম তুমি তুমি নিরঞ্জন॥
তুমি মাতা তুমি পীতা[১৮] তুমী[১৯] বন্ধুজন।
এ মহি[২০] মণ্ডল প্রভু তোমার স্রিজন[২১]॥
এতেক বিনয় কৈলা[২২] ব্রহ্মাবর।
হাসিঞা তাহারে তবে বলিলা সঙ্কর[২৩]॥
এতেক মিনতি কর কীসের[২৪] কারণ।
বোল[২৫] দেখি সুনি আমি তাহার বিবরণ॥
তবে ব্রহ্মা বলিলেন হাসি ত্রিলোচনে।
পৃথী ভার সহিতে নারে পাপের কারণে॥

(১২) সুনিঞা—শুনিয়া। অধিকাংশ "শ" স্থানে "স" ব্যবহৃত হইয়াছে।

(১৩) বোলিছে—বলিছে। রাঢ়ীয় উচ্চারণে ওকার দেওয়া হইয়াছে।

(১৪) হইয়—হইও। এ পুথিতে কোথাও অনুজ্ঞাবোধক ক্রিয়ার "ও"-কারের ব্যবহার নাই। সর্ব্বত্র "য়" দেখা যায়। আধুনিক সাহিত্যে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞাবোধক ক্রিয়ায় "য়"কার ব্যবহার করেন।

(১৫) ধর্য্য—ধৈর্য্য।

(১৬) শীব—শিব।

(১৭) স্তানে—স্থানে। ইহা স্পষ্টতঃ লিপিকর প্রমাদ, কারণ ৪র্থ চরণে "স্থাবর" শব্দে "স্থ"কারের বর্ত্তমান আকার স্পষ্ট লিখিত আছে।

(১৮) পীতা—পিতা। (১৯) তুমী—তুমি। (২০) মহি—মহী। (২১) স্রিজন—সৃজন। (২২) কৈলা—করিলা। (২৩) সঙ্কর—শঙ্কর।

(২৪) কীসের—কিসের। রাঢ়ে "কি" অর্থে "কিসের" শব্দও প্রচলিত আছে, কিন্তু পূর্ব্ব বঙ্গে ইহার সমধর্ম্মী (Co-relative) "ইসের" শব্দ "ইহার" অর্থে প্রচলিত আছে।

(২৫) বোল—বল। অনুজ্ঞাবোধক ক্রিয়ার ধাতুর উপান্ত অ-কারের এরূপ ওকার উচ্চারণ রাঢ়ে নাই, হিন্দী ও বঙ্গভাষীর মধ্যবর্ত্তী দেশে শুনিতে পাওয়া যায়।

পাপমতি হইল জিব করে দুরাচার।
পাপীষ্ট[২৬] মারিআ[২৭] প্রভু দুর[২৮] কর ভার॥
কহিতে লাগিলা হর এতেক মুনিঞা।
পাপীষ্ট মারিছি[২৯] দুত[৩০] পাঠাইঞা॥
এতেক বলিলা জদি ব্রহ্মার গোচর।
পৃথী সঙ্গে ব্রহ্মা তবে গেলা আপন ঘর॥
তবে ব্রহ্মা বিদাএ[৩১] করিলা পৃথীরে।
ভাবিতে ভাবিতে পৃথী আইলা য়াপন[৩২] ঘরে॥
ব্রহ্মাকে বিদাএ দিয়া শীব রইলা[৩৩] ধ্যানে।
কথোক্ষণ পরে সেই কথা পইল[৩৪] মনে॥
নন্দীকে ডাকীয়া[৩৫] সিব[৩৬] বলিছে বচন।
দক্ষিন[৩৭] সহরে তুমি জাহ[৩৮] ততক্ষন॥

(২৬) পাপীষ্ট—পাপিষ্ঠ।

(২৭) মারিআ—মারিয়া। প্রাকৃত শব্দে "য়"কারের স্থলে সর্ব্বত্র "অ"কার ব্যবহৃত হয়, কিন্তু বাঙ্গালায় "য়" গ্রহণাবধি "অ"কার পরিত্যক্ত হইয়াছে। "মরিয়া" শব্দ "মরিঞা" হইলে প্রাচীন উচ্চারণ ঠিক থাকিত, কিন্তু "মারিআ" ব্যাকরণ-সঙ্গত। প্রাচীন পুথিতে এরূপ বানানের শব্দ অনেক দেখা যায়।

(২৮) দুর—দূর। (২৯) মারিছি—মারিতেছি। (৩০) দুত—দূত।

(৩১) বিদাএ—বিদায়। ইহা "মারিআ" শব্দের ন্যায় নহে। "বিদাএ" সংস্কৃত শব্দ, প্রাকৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে ইহার বানান পরিবর্ত্তন হইলে "বিদাএ" হয়।

(৩২) য়াপন—আপন। আপন শব্দই বাঙ্গালা, তাহার "আ" "য়া" হইতে পারে না। কিন্তু এরূপ ব্যবহার প্রাচীন পুথিতে বিরল নহে।

(৩২) রইলা—রহিলা। এই শব্দটী আরও সংক্ষেপে "রলা" হয়। "তুমি রহিলে" অর্থে "তুমি রলে" বা তুমি "রল্যা" এইরূপ য-ফলান্ত পদও হয়। পূর্ব্ববঙ্গের উচ্চারণে য-ফলান্ত পদই অধিক চলিত।

(৩৩) পইল—পড়িল। (৩৪) ডাকীয়া—ডাকিয়া। (৩৬) সিব—শিব।

(৩৭) দক্ষিন—দক্ষিণ। (৩৮) জাহ—যাহ। ইহাও প্রাকৃত ব্যাকরণের পরিবর্ত্তন।

সাহুরাজা নামে এক আছে পৃথিবিতে।
অধিষ্ঠান হয়[৩৯] জাইয়া[৪০] তাহার দেহেতে ॥
বিপরিত[৪১] পাপ হইল পৃথীবি[৪২] উপরে।
দুত পাঠাইঞা জেন[৪৩] পাপি লোক মারে ॥
এতেক শুনিঞা নন্দী গেলা সিগ্রগতি[৪৪]।
উপনিত[৪৫] হইলা গিয়া সাহুরাজা প্রতি ॥
সাহুরাজা বোলে তবে রঘুরাজার তরে।
অনেক দিন হইল বাঙ্গালার[৪৬] চৌত[৪৭] না দেএ[৪৮] মোরে ॥
দুত পাঠাইয়া দেয়[৪৯] বাদসার[৫০] স্থানে।
বাঙ্গালার চৌথাই না দেএ কীসের কারণে ॥
একখানি পত্র লিখ বাদসা প্রতি।
দুত জেন তাহা লইয়া জাএ সিগ্রগতি ॥

(৩৯) হয়—হও। এই বর্ত্তমান অনুজ্ঞাবোধক "হও" "খাও" "যাও" প্রভৃতি পদ হইতে অনুজ্ঞার বিভক্তির আকার যে "ও", "য়" নহে তাহা বুঝা যায়। হইও, করিও, বলিও প্রভৃতি স্থলে "হইয়ো", "বলিয়ো", "করিয়ো" (ইহার বলিহ, করিহ প্রভৃতি রূপও আছে) "য়ো" বা "য়" কে বিভক্তি স্থলে লইলে "হইও" প্রভৃতি "ইও"কারান্ত পদে ই+ও হইয়া সন্ধির যে আশঙ্কা থাকে তাহা নিবারিত হয়, কিন্তু বাঙ্গালায় ওরূপ বিভক্তিজাত নিকটবর্ত্তী দুই স্বরের সন্ধি দেখা যায় না, ব্যঞ্জনবর্ণে স্বরবর্ণে হয় বটে। অতএব "বলিয়ো" "করিয়ো" ইত্যাদি আধুনিক ভাবে বলিও করিও প্রভৃতি শব্দের বানান পরিবর্ত্তনের আবশ্যক দেখা যায় না।

(৪০) জাইআ—যাইয়া। "ইও" বিভক্তির যুক্তি অনুসারে এই "ইআ" বিভক্তিও না বদ্‌লাইলে চলিত, কিন্তু বহুপূর্ব্ব হইতে এই দল চলিয়া গিয়াছে এখন কি করা যাইবে। তবে যদি কেহ বলেন, তবে 'ইআ' বদ্‌লাইয়া যখন "ইয়া" লইলে তখন "ইও" বদ্‌লাইয়া "ইয়ো" লাও বেদরূপটা একরূপই হউক। এই যুক্তি মানিলেও চলে কিন্তু বর্ত্তমান অনুজ্ঞায় শুদ্ধ "ও" বিভক্তি স্থানে মিশ্র "য়ো" গ্রহণ করা সুবিধাজনক হইবে না। অর্থান্তর ঘটিয়া যাইবে। হও—"হয়ো" নহে ; 'হয়ো' অর্থ হইও।

(৪১) বিপরিত—বিপরীত। (৪২) পৃথীবি—পৃথিবী। (৪৩) জেন—যেন।

(৪৪) সিগ্র—শীঘ্র। (৪৫) উপনিত—উপনীত।

(৪৬) বাঙ্গালার—'বাঙ্গালা' দেশের নাম লিখিত প্রাচীন প্রয়োগ এইরূপ অতএব 'বাঙ্গলা দেশ' এরূপ লেখা ভুল। (৪৭) চৌত—চৌথ। (৪৮) দেএ—দেয়।

(৪৯) দেঞ—দেহ, দাও। (৫০) বাদসা—বাদশাহ।

রঘুরাজা পত্র লিখে আথর[51] পাচ[52] সাতে।
পত্র লইঞা দুত তবে বাধিলেন[53] মাথে ॥
রজনি[54] প্রভাতে দুত জাএ সিগ্রগতি।
পত্র আসি[55] দিলেন জেখানে দিল্লিপতি ॥
উজিরকে য়াজ্ঞা[56] তবে দিলা দিল্লিশ্বরে[57] ।
সিগ্রগতি পত্র পড়ি শুনায়[58] আমারে ॥
উজির পড়েন পত্র বাদসা স্থনেন।
সাহুরাজা লিখে বাঙ্গালার চৌথের কারণ ॥
বাদসা তবে আজ্ঞা দিলা উজিরেরে।
পত্র লিখহ তুমি সাহু রাজারে ॥
চাকর হইয়া মারিলে স্থবারে।
জবর হইল লালবন্দি না দেয় মোরে ॥
লোক-লস্কর তবে নাই আমার স্থানে।
হেন কোনজন নাই তরে গিয়া আনে ॥
বাঙ্গালা মুলুক সেই ভুঞ্জে পরম সুখে।
দুই বৎসর হইল লালবন্দি না দেএ মোকে ॥
জবর হইঞা সেই আছে বাঙ্গালাতে।
চৌথের কারণে লোক পাঠায়[59] তথাতে ॥
এতেক বচন পত্রে লিখীলা[60] উজির।
পত্র পাইঞা দুত তবে নোঞাইল সির[61] ॥
দুত তবে বিদাএ হইলা তরিতে।
সিগ্রগতি য়াসি[62] পহুছিলা সেতারাতে ॥
সভা করিঞা রাজা বইসা[63] আছে থানে[64] ।
হেনকালে পত্র দুত আনে সেইখানে ॥
পত্র আসি দিলা দুত রাজার গোচর।
ডাড়াইলা এক ভিতে করি জোড়কর ॥

(৫১) আথর—অক্ষর। (৫২) পাচ—পাঁচ। (৫৩) বাধিলেন—বাঁধিলেন।
(৫৪) রজনি—রজনী। (৫৫) আসি—আনি (?)। (৫৬) য়াজ্ঞা—আজ্ঞা।
(৫৭) দিল্লিশ্বরে—দিল্লীশ্বরে। (৫৮) শুনায়—শুনাও। (৫৯) পাঠায়—পাঠাও।
(৬০) লিখীলা—লিখিলা। (৬১) সির—শির।
(৬২) য়াসি—আসি। (৬৩) বইসা—বসিয়া।

আজ্ঞা দিলা দেওয়ানকে পত্র পড়িবারে।
পত্র পড়িয়া দেওয়ান সুনান রাজারে॥
জবর হইল সুবা বাঙ্গালা সহরে।
দুই বৎসর হইল খাজানা না দেএ তারে॥
আজ্ঞা দিলা বাদসা ফৌজ পাঠাইঞা।
চোথাই নেএন[৬৫] জেন জবর করিঞা॥
এতেক সুনিঞা রাজা লাগিলা কহিতে।
কোনজনাকে পাঠাব মুলুক বাঙ্গালাতে॥
রঘুরাজা নিকটে আছিলা বসিআ[৬৬]।
কহিতে লাগিলা তিনি হাসিয়া হাসিয়া॥
আজ্ঞা কর বাঙ্গালা মুলুকে আমি জাই।
জবর করিয়া তথা আনিব চৌথাই॥
তবে তারে আজ্ঞা দিলেন রাজন।
তিনি পাঠাইলেন দেওয়ান ভাস্করণ[৬৭]॥
রঘু তবে আজ্ঞা দিলা ভাস্করে।
তৎপর করিয়া চৌথাই আনি দিবা মোরে॥

রাজার আদেশ পাইয়া ভাস্কর চলিল ধাইয়া
সন্য[৬৮] সঙ্গে করিয়া সাজন।
ডঙ্কা নাগারা কত নীসান[৬৯] চলে সত সত[৭০]
সন্য মধ্যে বাজিছে বাজন॥
সেতারা ছাড়িয়া তবে বিজাপুর আইলা তবে
এক রাত্রি রইলা সেইখানে।
রাগরঙ্গ হইল জত নাটুয়া নাচিল কত
কটক চলিল পর দিনে॥
গ্রাম উপবন কত লস্কর এড়াএ জত
নাগপুর আসি উপনিত[৭১]।

(৬৪) স্থানে—দেওয়ানে, দেওয়ানখানায়, দরবারে।
(৬৫) নেএন—লয়েন। (৬৬) বসিআ—বসিয়া। (৬৭) ভাস্করণ—ভাস্কর পণ্ডিত।
(৬৮) সন্য—সৈন্য। (৬৯) নীসান—নিশান। (৭০) সত সত—শত শত।
(৭১) উপনিত—উপনীত।

সেখান ছাড়িয়া জবে　　লস্কর যাইলা তবে
পঞ্চকোটে আসিলা তরিত[৭২] ॥
ডাক দিয়া দুতকে　　ভাস্কর কহিল তাকে
নবাব আছে কোনখানে ।
আজ্ঞা দিলা সেনাপতি　　দুত চলে সিগ্রগতি
নবাব য়াছে জেইখানে ॥
দুত সম্বাদ লইয়া　　সিগ্র চলিল ধাইয়া
আসিয়া কহিল তার স্থানে ।
বৰ্দ্ধমান সহরে　　রাণির দিঘির পরে
নবাব আছে সেইখানে ॥
দুত মুখে সুনি কথা　　ভাস্কর চলিল তথা
লস্কর লইয়া নিসাতে[৭৩] ।
লস্কর নিসব্দে[৭৪] জাএ　　কেহু[৭৫] নাহি জানে তাএ
আইলা বৈসাখ[৭৬] উনিশাতে ॥
বৈসাখের উনিশা জাএ　　বরগি আইলা তাএ
মহা য়ানন্দিত[৭৭] হুইয়া মনে ।
বিরভুই বামে থুইয়া　　গোআলা ভুইর কাছ হইয়া
আসিয়া ঘেরিল বৰ্দ্ধমানে ॥
তবে বরগীর লস্করে　　চতুদ্দিগে[৭৮] আসি ঘিরে
হরকারা[৭৯] কেহ নাহি জানে ।
দুই প্রহর রাইতে[৮০]　　হরকারা আইলা তাথে
আসী[৮১] কৈল রাজারাম স্থানে ॥
রজনি[৮২] প্রভাত হইল　　রাজারাম হরকারা আইল
আসিয়া কহিল নবাবেরে ।
ইহা য়ামি[৮৩] না জানিল　　আচম্বিতে সন্য আইল
আসিয়া ঘেরিল লস্করে ॥

(৭২) তরিত—ত্বরিত । (৭৩) নিসাতে—নিশাতে ।
(৭৪) নিসব্দে—নিঃশব্দে । (৭৫) কেহু—কেহ । (৭৬) বৈসাখ—বৈশাখ ।
(৭৭) য়ানন্দিত—আনন্দিত । (৭৮) চতুদিগে—চতুর্দ্দিকে ।
(৭৯) হরকারা—প্রহরী অর্থে ব্যবহৃত । (৮০) রাইতে—রাত্রিতে ।
(৮১) আসী—আসিয়া । (৮২) রজনি—রজনী । (৮৩) য়ামি—আমি ।

রাজারামে এত কএ নবাব স্থনিয়া রএ
তদপরে[৮৪] দিলেন উত্তর।
হরকারা পাঠাইয়া হকিকত[৮৫] আন জায়া[৮৬]
কোথা হইতে য়াইল লস্কর॥
এতেক স্থনিল জবে হরকারা পাঠাইল তবে
ফৌজের নির্ণয় জানিবারে।
সাজিঞা হরকারা লস্করে ফিরে তারা
আসিয়া কহিল নবাবেরে॥
চব্বিশ জমাদার ভাস্কর সরদার
চল্লিস হাজার ফৌজ লইঞা।
সেতারা গড় হইতে বরগী আইল চৌথ নিতে
সাহুরাজার হুকুম পাইঞা॥
এতেক কথা স্থনিয়া জমাদার আনে ডাকদিয়া
কহিতে লাগিলা নবাব।
সেতারা গড় হইতে বরগী আইলা চৌথ নিতে
ইহা কি বোলহ জবাব॥
বাদশাই খাজানা জাইত শেখানে চৌথাই পাইত
স্থজা খাঁ আছিল জখন।
মুস্তফা খাঁ এত কএ জাহা তোমার চিত্তে লএ
তাহা তুমি করহ এখন॥
উকীলকে কহিল সন্য সাইজা[৮৭] কেন আইল
এই কথা বল জাইয়া তারে।
উকীল কহেন কথা ভাস্কর স্থনেন তথা
তবেত কহিল তার পরে॥
সাহুরাজা পাঠাএ মোরে চৌথাই নিবার তরে
তেকারণে আইলাম আমি।
জাইয়া বোল নবাবেরে চৌথ জেন দেএ মোরে
সিগ্রগতি চলিজাহ তুমি॥

(৮৪) তদপরে—তৎপরে। (৮৫) হকিকত—মূলতথ্য
(৮৬) জায়া—যাইয়া। (৮৭) সাইজা—সাজিয়া।

এতেক স্থনিয়া জবে উকীল কহিল তবে
অন্যাএ কথা কেনে বোল।
কোনকালে বাঙ্গালাতে বরগী আসে চৌথ নিতে
এইত অন্যাএ[৮৮] বড় হইল ॥
ভাস্কর বুলিল[৮৯] তারে কেবা য়ন্যাএ করে
মনেতে কৈলে ভাবনা।
কাহার হুকুম পাইয়া মুলুক নিলা মারিয়া
বাদসাই খাজানা ভেজ না ॥
স্থনিয়া উত্তর দিলা চৌথ নিতে না জানিলা
উকীল পাঠাইতা তার কাছে।
উকীল জাইয়া পরে কহিতে নবাব তরে[৯০]
চৌথাই দিতেন তিনী[৯১] পাছে ॥
আপন কটক লইয়া পুন জায় ফিরিয়া
কহ তবে বাদসার স্থানে।
সনদ জদি দেএ খাজানা তবে জাএ
চৌথাই পাবে সেইখানে ॥
ভাস্কর তবে কএ বাদসার হুকুম হএ
চৌথ নিবার কারণ।
চৌথাই না দিবে জবে রায্য[৯২] নষ্ট হবে তবে
তার সনে করিব আমি রন ॥[৯৩]
এতেক বচন স্থনি উকীল কহেন বানি[৯৪]
ভদ্র তুমি কিসে দেখায়[৯৫] তারে।
তোমার জতেক সেনা চতুর্দিগে দিল থানা
তারা সব কী[৯৬] করিতে পারে ॥
তুমি যেমন এক জনা এমন আইসে সহস্র[৯৭] জনা
তব[৯৮] তার ভূরুক্ষেপ নাই।

(৮৮) রন্যাএ—অন্যায়। (৮৯) বুলিল—বলিল।
(৯০) নবাব তরে—নবাবের পক্ষ হইয়া। (৯১) তিনী—তিনি। (৯২) রায্য—রাজ্য।
(৯৩) রন—রণ। (৯৪) বানি—বাণী। (৯৫) দেখায়—দেখাহ—দেখাও।
(৯৬) কী—কি। (৯৭) সহস্র—সহস্র। (৯৮) তব—তবু।

চৌখুটা মুলুকে সবাই জানএ তাকে
নবাবের সমান কে আছে সিপাই ॥
উকীল বুলিলা জবে ভাস্কর জানিলা তবে
কহিতে লাগিলা তারপরে ।
চৌথাই না দিবে জবে যুদ্ধ করিব তবে
এই কথা বোল জাইয়া তারে ॥
উকীল আসিঞা পরে কহিল নবাবে তবে
রন করিতে সেহ চাহে ।
এতেক স্থনিঞা জবে নবাব জানিল তবে
ডাক দিয়া জমাদারে কহে ॥
জত জমাদার ছিল তারে নবাব কহিল
চৌথাই চাহে বারে বারে ।
জতেক সরদার ছিল, তারা সব কহিল
সেই টাকা দেহ সিপাএরে ।[৯৯]
আমরা জত লোকে মারিব বরগিকে
দেসে[১০০] জেন আইস্তে[১০১] নাই পরে ।
বরগি সব মারিব দেশে আইস্তে না দিব
কি করিতে পারে ভাস্করে ॥
স্থনিয়া এতেক বানি সন্তুষ্ট হইলা তিনি
কহিতে লাগিলা ভাল ভাল ।
পানবাটা কাছে ছিল পান তুইলা সভারে দিল
বিদাএ হইয়া সভে আইল ॥
এথা ভাস্কর সরদারে ডাক দেএ জমাদারে
কহিতে লাগিলা তা সভারে ।
তোমরা কত জনা চতুদিগে দেয়[১০২] থানা
কতজনা জায়[১০৩] লুটিবারে ॥

(৯৯) সিপাএরে—সিপাহীকে। (১০০) দেসে—দেশে।
(১০১) আইস্তে—আসিতে। (১০২) দেয়—দেহ, দাও।
(১০৩) জায়—যাহ, যাও।

সরদারে কহে এত সাজে জমাদার এত
চতুর্দিগে জাএ লুটিবার।
সাজিল জত জন শুন তার বিবরণ
একে একে নাম বলি তার॥

ধাম্‌ধরমা জাএ আর হিরামন কাসি।*
গঙ্গাজি আমড়া জাএ আর সিমন্ত জোসি॥
বালাজি জাএ আর সেবাজি কোহড়া।
সম্ভূজি জাএ আর কেসজি আমোড়া॥
কেসরি সিংহ মহন শিংহ এ ছুই চামার।
জার সঙ্গে জাএ ঘোড়া পাচ হার[1]॥
এই দশজনা জাএ গ্রাম লুটিতে।
আর চৌদ্দজনা থাকে নবাবের চাইর ভিতে।
বালারাও সেশরাও আরসিস পণ্ডিত।
সেমন্ত সেহড়া আর হিরামন মণ্ডিত॥
মোহন রাএ পিত রাএ আর সিসো পণ্ডিত।
জার সঙ্গে আছে বরগি মহা বিপরীত॥
শিবাজি সামাজি আর ফিরঙ্গ রাএ।
লুটিতে জাহার সঙ্গে বরগি দ্রিত[2] ধাএ॥
* * * সুনতান খাঁ আর ভাস্কর।
এই চৌদ্দ জনাতে ঘেরিল লস্কর॥
একদিন দুইদিন করি সাত দিন হইল।
চতুর্দিকে বরগীতে রসদ বন্ধ কৈল॥

* ইতিপূর্ব্বে বানানব্যত্যয়ের এক শত উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতেই বুঝা যাইবে, বানান-বিভ্রাট কিরূপ বিপুল। অতঃপর আর তাহার উদাহরণ দিবার আবশ্যক মনে করি না। বিভ্রাটগুলি পাঠকের দৃষ্টিতে আপনিই পড়িবে, তবে বিশেষ বিশেষ স্থলে উল্লেখ করিব।

(১) পাঁচহার—পাঁচ শ্রেণী, পাঁচ দল (Five Companies of troops) অথবা পাচ হাজার শব্দের "জ"টি পড়িয়া গিয়াছে! (২) দ্রিত—দ্রুত।

মুদি বানিঞা জত ঘারাইতে নারে।
লুটে কাটে মারেছমুতে[1] পাএ জারে ॥
বরগির তরাসে কেহ বাহির না হএ।
চতুর্দ্দিকে বরগির তরে রসদ না মিলএ ॥
চাউল কলাই মটর মুষরি খেসারি।
তেল ঘি আটা চিনি লবন একসের করি ॥
টাকা সের হৈল আনাজ কিন্তে নাই পাএ।
খুদ্রে কাঙ্গাল জত মইরা মইরা জাএ ॥
গাজা ভাংগ তামাকু না পাএ কিনিতে।
আনাজ নাহি পাওয়া যাএ লাগিল ভাবিতে ॥
কলার আইঠা[2] জত আনিল তুলিয়া।
তাহা আনি সব লোকে খায় সিজাইয়া[3] ॥
ছোট বড় লস্করে যত লোক ছিল।
কলার আইঠা সিদ্ধ সব লোকে খাইল ॥
বিসম বিপত্য বড় ৰিপরিত হইল।
অন্য পরে কা কথা নবাবসাহেব খাইল ॥
এই মতে লস্কর আছিল চৌদ্দ রোজ।
তবে নবাব কুচ কৈলা লইয়া সব ফৌজ ॥
ঘোড়ার উপরে কত নিশান চলিল।
তবে ডঙ্কা লাগারা কত বাজিতে লাগিল ॥
ঝাকুড় ঝাকুড় কত সাদিয়ানা বাজাএ।
সাহিসরা তবে নবাবের আগে জাএ ॥
চাইদিগে[4] লস্কর চলে নাই লেখাজোখা।
হেনকালে চতুর্দ্দিকে বরগী দিল দেখা ॥
চাইরদিগে বরগী আইল কত আর।
তা সভার হাতে দেখি লাহাঙ্গা তলোয়ার ॥

(১) ছমুতে—সম্মুখে, সমুখে। (২) আইঠা—এঁঠে, কদলী বৃক্ষের গোড়ার অংশ।
(৩) সিজাইয়া—সিদ্ধ করিয়া। (৪) চাইদিগে—চাইরদিকে, চারিদ্দিকে।

তখন নবাবের লস্করে পইল হড়বড় ।
হেন বেলা তেরহইনাতে[১] ধরিলা:ডেহড়[২] ॥
হাজারে হাজারে ঘোড়া উঠাএ একিবারে ।
হারা হারা[৩] কইরা আইসে কাছাইতে নারে ॥
তবে মুস্তাফা খাঁ চাইর হার ঘোড়া[৪] লইয়া ।
বরগি খেদাইয়া জাএ ডেহড় মারিয়া ॥
তবে সামনে হইতে বরগি পলাইল ।
আর কত বরগি আইলা পিছাড়ি ঘেরিল ॥
মির হবিব তবে পিছাড়িতে ছিল ।
বেকাবুতে পইড়া সেহ মিসাইল ॥
পিছাড়ি লুটিল বরগি য়াসি আর কত ।
পোড়াইল ডেরাডাণ্ডা তাম্বু যত ॥
খাজানার গাড়ি জত সাতে ছিল ।
চাইর দিগে বরগি আইসা লুটিতে লাগিল ॥
হাতি ঘোড়া কত লুইটা লইয়া জাএ ।
বড় বড় সিপাই জত অমনি পলাএ ॥
দউড়া দউড়ি[৫] আইলা তবে নিকুলসরাএ ।
মোসাহেব খাঁ তবে পড়িল ঘেরাএ ॥
ডেড় হাত্বির সাইর[৬] হইল তার সাএ ।
পচিশ ঘোড়া সুর্দ্দা[৭] খেত আইল তাথে ॥
মোসাহেব খাঁ জদি পইল নিকুনেতে ।
যল্‌দি নবাব সাহেব যাইল কাঁটয়াতে ॥
এথাতে হাজি সাহেব রসদ লইঞা ।
পাঠাইঞা দিল কত নৈকায় করিয়া ॥

(১) তেরহইনাতে—(?)। (২) ডেহড়—দ্যাওড়, অবিশ্রান্ত গতি।

(৩) হারা হারা—'হারারারা' করিয়া আসিয়া পড়িল, কোন বাধা মানিল না।

(৪) চাইর হার ঘোর—চারি দল অশ্বারোহী সৈন্য (Four Companies of Horse)

(৫) দউড়াদউড়ি—দৌড়াদৌড়ি।

(৬) ডেড় হাত্বির সাইর—কোনরূপ ব্যূহের অর্থাৎ সৈন্য যোজনার বিবরণ হইবে বোধ হয়।

(৭) সুর্দ্দা—শুদ্ধ।

তবে রসদ আসিয়া কাটঞাতে পহচিল।
নবাব সাহেবের লোক খাইয়া বাচিল॥
ঘেরাও হইতে নবাব আইল কাটঞাতে।
শুনিয়া ভাস্কর তবে লাগিল ভাবিতে॥
ছিছিছি হাএ হাএ গেল পলাইয়া।
এতদিন ব্রথা[১] আসিয়া ছিলাম ঘেরিয়া॥
তবে সব বরগি গ্রাম লুটিতে লাগিল।
জত গ্রামের লোক সব পলাইল॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পলাএ পুথির ভার লইয়া।
সোনার বাইনা[২] পলায় কত নিক্তি হড়পি লইয়া॥
গন্ধবণিক পলাএ দোকান লইয়া জত।
তামা পিতল লইয়া কাঁসারি পলাএ কত॥
কামার কুমার পলাএ লইয়া চাক নড়ি।
জাউলা[৩] মাউছা[৪] পলাএ লইয়া জাল দড়ি॥
সঙ্ক বণিক পলাএ করা লইয়া যত।
চতুর্দ্দিকে লোক পলাএ কি বলিব কত॥
কাএস্ত বৈদ্য জত গ্রামে ছিল।
বরগির নাম সুইনা সব পলাইল॥
ভাল মানুষের স্ত্রীলোক জত হাটে নাই পথে।
বরগীর পলানে পেটারি লইল মাথে॥
ক্ষেত্রি রাজপুত যত তলয়ারের ধনি।
তলয়ার ফেলাইঞা তারা পলাএ য়মনি॥
গোশাঞি মোহান্ত জত চোপালাএ[৫] চড়িয়া।
বোচকা বুচকি লয় জয় বাহুকে[৬] করিয়া॥
চাসা কৈবর্ত্ত জত জাএ পলাইঞা।
বিছন[৭] বল্‌দের পিঠে লাঙ্গল লইয়া॥

(১) ব্রথা—বৃথা। (২) সোনার বাইনা—সোণার বেণে।
(৩) জাউলা—জেলিয়া, জেলে। (৪) মাউছা—মেছো, মৎস্যব্যবসায়ী।
(৫) চোপালাএ—চৌপায়ায়, ডুলিতে। (৬) বাহুকে—বাঁকে, ভারে।
(৭) বিছন—বীজধান অথবা বিছানা (?)

সেক সৈয়দ মোগল পাঠান জত গ্রামে ছিল।
বরগির নাম স্থইনা সব পলাইল ॥
গর্ভবতি নারী যত না পারে চলিতে।
দারুণ বেদনা পেয়ে প্রসবিছে পথে ॥
সিকদার পাটআরি জত গ্রামে ছিল।
বরগীর নাম স্থইনা সব পলাইল ॥
দস বিস লোক য়াইসা পথে দাড়াইলা।
তা সভারে সোধাএ বরগি কোথাএ দেখিলা ॥
তারা সব বলে মোরা চক্ষে দেখি নাই।
লোকের পলান দেইখা আমোরা পলাই ॥
কাঙ্গাল গরীব জত জাএ পলাইয়া।
কেথা ধোকড়ি কত মাথাএ করিয়া ॥
বুড়াবুড়ি জাএ জত হাতে লইয়া নড়ি।
চাঞি ধানুক[১] পালাএ কত ছাগলের গলায় দড়ি ॥
ছোট বড় গ্রামে জত লোক ছিল।
বরগির ভএ সব পলাইল ॥
চাইর দিগে লোক পলাঞে ঠাঞি ঠাঞি।
ছর্ত্তিস বর্ণের লোক পলাএ তার অন্ত নাঞি ॥
এই মতে সব লোক পলাইয়া জাইতে।
আচম্বিতে বরগি ঘেরিলা আইসা সাথে ॥
মাঠে ঘেরিয়া বরগী দেয় তবে সাড়া।
সোনা রুপা লুটে নেএ আর সব ছাড়া ॥
কারু হাত কাটে কারু নাক কান।
একি চোটে কারু বধএ পরাণ ॥
ভাল২ স্ত্রীলোক জত ধইরা লইয়া জাএ।
আঙ্গুষ্ঠে দড়ি বাঁধি দেয় তার গলাএ ॥
একজনে ছাড়ে তারে আর জনা ধরে।
রমনের ভরে ত্রাহি শব্দ করে ॥
এই মতে বরগি কত পাপ কর্ম্ম কইরা।
সেই সব স্ত্রীলোকে জত দেয় সব ছাইড়া ॥

---

(১) চাঞি-ধানুক—সাঁওতাল জাতীয় পশুপালক অসভ্যজাতি।

তবে মাঠে লুটিয়া বরগী গ্রামে সাধাএ।
বড়২ ঘরে আইসা আগুনি লাগাএ॥
বাঙ্গালা চৌআরি জত বিষ্ণু মোণ্ডব।
ছোট বড় ঘর আদি পোড়াইল সব॥
এই মতে জত সব গ্রাম পোড়াইয়া।
চতুর্দ্দিগে বরগি বেড়াএ লুটিয়া॥
কাহুকে বাঁধে বরগি দিআ পিঠমোড়া।
চিত কইরা মারে লাথি পাএ জুতা চড়া॥
রূপি দেহ২ বোলে বারে বারে।
রূপি না পাইয়া তবে নাকে জল ভরে॥
কাহুকে ধরিয়া বরগী পথইরে ডুবাএ।
ফাফর হইঞা তবে কারু প্রাণ জাএ॥
এই মতে বরগি কত বিপরীত করে।
টাকা কড়ি না আইলে তারে প্রাণে মারে॥
জার টাকা কড়ি আছে সেই দেয় বরগিরে।
জার টাকা কড়ি নাই সেই প্রাণে মরে॥
ত্রেতা জুগে রাজা ভগীরথ ছিলা।
অনেক তপস্যা করি গঙ্গা আনিলা॥
পৃথিবীতে নাম তার হইলা ভাগিরথী।
তার পার হইয়া লোকে পাইলা অব্যাহতি॥
তবে কোন কোন গ্রাম বরগি দিলা পোড়াইয়া।
সে সব গ্রামের নাম স্থন মন দিয়া॥
চন্দ্রকোনা মেদিনিপুর আর দিগনপুর।
খিরপাই পোড়ায় আর বর্দ্ধমান সহর॥
নিমগাছি সেড়গা আর সিমইলা।
চণ্ডিপুর শ্যামপুর গ্রাম আনইলা॥
এই মতে বর্দ্ধমান পোড়াএ চাইর ভিতে।
পুনরপি আইলা বরগি বন্দর হুগলিতে॥
সের খাঁ ফৌজদার তবে হুগলিতে ছিল।
তাহার কারণে বরগী লুটিতে নারিল॥
সাতসইকা রাজবাটী আর চাঁদপুর।
কাথারা সরাই ডামদ্বে জম্বুপুর॥

ভাটছালা পোড়াএ আর মেরজাপুর চান্দড়া।
কুড়বুন পালাসি য়ার বউচি[১] বেড়ড়া॥
সমুৰ্দ্ধরগড়[২] জাম্ম´গর[৩] আর নদিয়া।
মাহাতাপূর সূনণ্টপুর[৪] থইল পোড়াএ গিয়া॥
পরাণপুর ভাটরা পোড়াএ আর মান্দড়া।
সরভাঙ্গা ধিতপুর আর গ্রাম চান্দড়া॥
সাতসইকা জাগিরাবাদ সকল পোড়াইঞা।
কুমিরা বউলতলি নিমদা পোড়াএ গিঞা॥
কড়ই বৈথন পোড়াএ আর চাড়ইল।
সিঙ্গি বাস্কা ঘোড়ানাস মস্তইল॥
গোটপাড়া চাঁদপাড়া আর য়াগদিয়া।
রাতারাতি পাটলি দিল পোড়াইয়া॥
আতাইহাট পাতাইহাট আর ডাঞিহাট।
বেড়া-ভাওসিংহ পোড়াএ আর বিকীহাট॥
এইরূপে ইন্দ্রাইল পরগণা বরগি লুটি।
কাগাএ মোগাএ লুটে ওলন্দেজের কুটি॥
এইরূপে কাগা মোগা পোড়াইঞা।
রাতারাতি পহুচিলা জাউমৱকান্দি[৫] গিয়া॥
তবে বিরভুই[৬] পরগণা বরগি দিল পোড়াইয়া
আমডহরা মহসেরপুর থানা কৈল গিঞা॥
গোয়ালাভূঞি সেনভুঞি সব পোড়াইলা।
চতুৰ্দ্দিগ পোড়াইয়া বিষ্ণুপুর আইলা॥
তবে বোনবিষ্ণুপুর[৭] গোপাল রক্ষা করে।
য়সাধ্য[৮] বরগির তবে কি করিতে পারে॥
সহর লুটিতে বর্গী তবে আইল ধাইয়া।
নৈহাটী উৰ্দ্ধানপুর কাটাঞ ডাইনে থুইয়া॥
বাবলা নদী বরগি তবে পার হইল।
মাঙ্গনপাড়া সাটই কামনগর আইল॥

(১) বৈঁচি। (২) সমুদ্রগড়। (৩) জাননগর। (৪) সুনন্দপুর
(৫) জেমুয়া কান্দী। (৬) বীরভূমি। (৮) য়সাধ্য—অসাধ্য।

মহুলা চৌরিগাছা আর কাঠালিয়া।
আধারমানিক আইলা বরগী রাঙ্গমাইটা[1] দিয়া ॥
গোয়ালজান বুধইপাড়া আর নেয়ালিসপাড়া।
সিগ্রগতি আসিয়া পহচিল দাহাপাড়া ॥
হাজি ছোট নবাব উপারে[2] ছিল।
বরগির নাম সুইনা কীল্লাএ সাঁধাইল ॥
তবে বরগি পার হইল হাজিগঞ্জের ঘাটে।
শীগ্রগতি আইসা জগৎ সেটের বাড়ী লুটে ॥
আড়কাট[3] টাকা যত ঘরে ছিল।
ঘোড়ার খুরচি[4] ভইরা সব টাকা নিল ॥
তবে সও[5] দুই তিন টাকা ছড়াইয়া।
শীগ্রগতি গেলা বরগা গঙ্গা পার হইয়া ॥
তবে ফকীর-ফকীরা[6] গিরস্ত জত ছিল।
সেই সব টাকা তারা লুটিতে লাগিল ॥
তবে কাটঞাতে নবাব সাহেব সুনিল।
জগত সেটের বাড়ী বরগি লুইটা গেল ॥
এতেক কথা জদি হরকরা কহিল।
কাটঞা হইতে নবাব শীগ্র চলিল ॥
রাতারাতী তবে নবাব আইলা মোনকরা।
ভোর হইতে হইতে তবে পহছিলা ডেরা ॥
তবে হাজি সাহেবকে নবাব অনেক বুলিল।
এতেক লস্কর রইতে বাড়ী লুইটা গেল ॥
নবাব সাহেব যদি আইলা কীল্লাতে।
তবে সব বরগি জড় হইল কাটঞাতে ॥
আসাড় মাসের দেওয়া[7] ঘন[8] বরিষণ।
অজএ ভাসিয়া গঙ্গা ভরিল তখন ॥
গঙ্গা ভরিল যদি ইপার উপার।
তবে বরগী লুটিবারে নাহি পাএ আর ॥

(১) রাঙ্গামাটী। (২) উপারে—ওপারে, অপর পারে। (৩) আড়কাট—আড়াই কোটী
(৪) খুরচি—ঘোড়ার ঘাস খাইবার ছোট থলি, তোমড়া। (৫) সও—শত।
(৬) ফকীর-ফকীরা—ফকীর-ফকরাণ, ফকীরাদি। (৭) দেবতা, মেঘ। (৮) ঘন—অবিরল।

কাটঞা ভাওসিংহ-বেড়া ডাইহাট নিয়া।
চাইরদিগে বরগি ছায়নি কৈল গিয়া॥
গ্রামে গ্রামে জত জমিদার ছিল।
তারা সবে আসি ভাস্ককে মিলিল॥
গ্রামে গ্রামে যত তাগিদার গেল।
তারা সব জাইয়া খাজনা সাদিতে লাগিল॥
এথা মির হবিব লইয়া কিছু স্থন বিবরণ।
ফরাসবন্দির[১] পর্ত্তন করিলা তখন॥
বড় বড় নৌকা যেখানে যত ছিল।
বেগার ধরিয়া সব নৌকা আনিল॥
ইপারে উপারে লাহাস[২] দিল তানাইয়া[৩]
নৌকা সব তার মধ্যে রাখিল বান্ধিয়া॥
গ্রামে গ্রামে হইতে আনে জত বাস[৪]।
নৌকার উপর বিছাইয়া বান্ধেন ফরাস॥
ঘাস চাটাই তার উপরেত দিল।
পাইছাএ পাইছাএ মাটী ফেলিতে লাগিল॥
মাটী ফেলিয়া তবে করে বরাবর।
হাজারে হাজারে ঘোড়া জাএ তার উপর॥
ডাঞিহাটের ঘাটে যদি পুল বাঁধা গেল।
কত সত বরগী তারা লুটিতে চলিল॥
এথা ভাস্কর লইয়া কিছু স্থন বিবরণ।
জেরুপে[৫] ডাঞিহাটে কৈলা পূজা আরম্ভন॥
তবে গ্রামে গ্রামে জত জমিদার ছিল।
তা সভারে ডাক দিয়া নিকটে আনিল॥
কহিতে লাগিল তবে তা সভার ঠাঞি।
জগতজননি মায়ের পূজা করিতে চাই॥
এই কথা ভাস্কর কহিল তা সভারে।
শ্রদ্ধা পাইয়া তারা সব উর্জোগ[৬] করে॥

(১) ফরাসবন্দি—পুলবন্ধি। (২) লাহাস—(?)। (৩) তানাইয়া—টাঙ্গাইয়া, বাঁধিয়া।
(৪) বাস—বাঁশ। (৫) জেরুপে—যেরূপে। (৬) উর্জোগ—উদ্যোগ।

ঘটকর্পূর[১] আনে কেহ করিয়া সম্মান।
আসিঞা প্রতিমা তারা করেন নির্ম্মান॥
এইরূপে কুমার প্রতিমা বানাইয়া।
ভাস্করের ঠাই তারা গেল বিদায় হইয়া॥
তারপর উপাদএ সামগ্রী আইল জত।
ভার বাহান্ধিতে বোঝাএ কত শত॥
ভাস্কর করিবে পূজা বলি দিবার তরে।
ছাগ মহিষ আইসে কত হাজারে হাজারে॥
এই মতে করে ভাস্কর পূজা আরম্ভন।
এথা মির হবিব বরগী লইয়া করিল গমন॥
তবে বরগী ফরাসবন্দিতে পার হইয়া।
রাতারাতি ফুটীসাঁকো উঠিলেন গিয়া॥
দ্বিতীয় প্রহর রাইতে হুড়বড়ি হইল।
ফুটিসাঁকো বরগি আইল নবাব শুনিল॥
তবে নবাব সাহেব নকিব পাঠাএ।
দ্বিতীয়প্রহর রাইতে নকিব শীঘ্র ধাএ॥
নকিব আসিঞা তবে বোলে বার বার।
হুকুম নবাবের সোয়ারি করহ তৈয়ার॥
এতেক কহিল জদি নকিব আসিয়া।
তবে সব ঘোড়ায় জিন দিল চড়াইয়া॥
একে একে জমাদার লাগিল সাজিতে।
ডঙ্কা নাগারা কত লাগিল বাজিতে॥
মুস্তাফা খাঁ সমসের খাঁ দুই জমাদার।
জার সঙ্গে যায় ঘোড়া বিস হাজার॥
রহম খাঁ করম খাঁ দুইজনাতে জাএ।
দশ হাজার ঘোড়া জার সঙ্গে ধাএ॥
আতাউল্লা মির জাফর দুইজনা সাজিল।
পোনের হাজার ঘোড়া সঙ্গে চলিল॥
উমর খাঁ আসালত দুই জনাতে গেল।
পাঁচ হাজার ঘোড়া সঙ্গে কইরা নিল॥

(১) ঘটকর্পূর—ঘটকর্পর, প্রতিমানির্ম্মাতা, কুম্ভকার।

ঠাকুরসিংহ জাএ আর বক্সি বহনিয়া[১]।
চল্লিশ হাজার বহনিয়া সঙ্গেত করিয়া ॥
ফতেহাজি ছেদনহাজি দুই জনাতে গেল।
পেএতিশ[২] হাজার বহনিয়া সঙ্গে চলিল ॥
সাইট হাজার ঘোড়া ভেড়লাক বহনিয়া।
তারকপুর আইলা নবাব এত ফৌজ লইয়া ॥
যেই মাত্র নবাব সাহেব তারকপুর আইল।
ফৌজের ধমক দেইখা বরগি পিছাইল ॥
তবে বরগি পিঠ দিয়া শীঘ্র চইলা জাএ।
নবাব সাহেবের ফৌজ পিছে পিছে ধাএ ॥
পলাসিতে জত বরগির থানা ছিল।
নবাব সাহেবের নাম সুইনা অমনি পলাইল ॥
সিঘ্রগতি আসি বরগি পুলে পার হইল।
পার হইঞা পুল তবে কাটঞাত দিল ॥
এথা নবাব রাতারাতি আইল রহনপুরে।
দেখে বরগির ছাউনি কাটিঞাত[৩] উপরে ॥
রহনপুরে নবাব সাহেব মোরচা দিল।
চতুর্দ্দিগে তোপ খা রুপিয়া রাখিল ॥
পূরনিয়া[৪] পাটনাএ লেখিলেন খত।
চলিলা দুইজনা শুইনা হকিকত ॥
হেথা জয়ন্দি[৫] আহম্মদ খাঁ আইলা পাটনা হইতে।
বার হাজার ঘোড়া ফৌজ লইয়া সাথে ॥
নবাব বাহাদুর আইলা পুরনিয়া হতে।
পাচ হাজার ফৌজ সেহ লইয়া সাথে ॥
তবে জয়ন্দি আহম্মদ বোলে নবাবকে।
পূজা না হৈতে আগে মার ভাস্করকে ॥
নবাব বোলে আগে দসরা জাউগ।
চাইর দিকে জল কাদা সকলি সুখাউগ ॥

(১) বহনিয়া—ভারবাহী। (২) পেএতিশ—পঞ্চত্রিংশ।
(৩) কাটিঞাত—কাটিয়া, ভাঙ্গিয়া। (:৩) পূর্ণিয়া। (৪) জয়ন্দি—জৈনুদ্দীন্।

এত যদি নবাব বুলিলা তার তরে।
জয়ন্দি আহম্মদ খাঁ বোলে নবাবেরে॥
জল কাদা শুকাইলে বরগির হবে বল।
চতুদিগে লুটিবে পোড়াবে সকল॥
ফৌজ পার কইরা দি নৌকায় করিয়া।
রাতারাতি যেন বরগী মারে গিয়া॥
জয়ন্দী আহম্মদ নবাব এই মনস্থবা করে।
গির হবিব লইঞা কিছু শুন তার পরে॥
বড় বড় কামান আইনা থুইলা থরে ঘরে।
হুগলি হইতে স্থলুফ[১] আনে তার পরে॥
তবে গোলন্দাজে গোল দাগিতে লাগিল।
মোরচা ছেদিয়া গোলা ফৌজে পড়িল॥
জেই মাত্র গোলা আইসা ফৌজে পৈল।
তখন নবাব সাহেবের অমনি পিছাইল॥
গোলা দাগিতে কামান গেল ফুইটা।
স্থলুফ ডুবিল তলা তার ফাইটা॥
দস বিস লোক তারা নিকটে ছিল।
কামান ফাটীয়া দুই চাইর জনা মইল॥
স্থলুফ কামান যদি দুই তবে গেল।
শুনিয়া মির হবিব তবে ভাবিতে লাগিল॥
ফতে নাই নাই বলে বারে বারে।
এতেক উর্জোগ করিলাম নারিলাম জিনিবারে॥
সূর্য্য অস্ত গেল সন্ধ্যা হইল তখন।
এথা নবাব লইঞা কিছু স্থন বিবরন॥
সম্বাদ লইয়া হরকারা আইলা হাইটা[২]।
কহিল নবাবে কামান গেল ফাইটা॥

(১) স্থলুফ-স্থলুক—একপ্রকার বাণিজ্য-দ্রব্যবাহী দূরগামী বৃহৎ নৌকা। ১৯শ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও এই স্থলুক নৌকা কলিকাতা, হুগলী, হিজলী, প্রভৃতি বন্দর হইতে মান্দ্রাজ, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করিত

(২) হাইটা—হাটিয়া

এতেক শুনিয়া নবাবে হৈল বল।
হুকুম করিলা ফৌজে আউগাউক[1] সকল॥
জত লস্কর তারা পিছে হইটা ছিল।
আপন আপন মোরচাএ সভাই আইল॥
তবে বল মহাতাব[2] সব জালিয়াত দিল।
বরকন্দাজের পরা[3] মোরচাএ লাগিল॥
হাজারে হাজারে আওয়াজ হএ একিবারে।
ডাড়াইয়া বরগি সব দেখে উপারে॥
এই মতে নবাবের ফৌজ আছে বরাবরে।
এথা জয়ন্দি আহাম্মদ খাঁ আইলা উদ্ধারণ পুরে॥
বড় বড় পাটেলি[4] সাথে আইসা ছিল।
জুড়িন্দা[5] বাধিয়া গুদারা[6] লাগাইল॥
উর্দ্ধরনপূরে জত ফৌজ পার কৈলা।
য়জএর ধারে আইসা সব দাড়াইলা॥
পূনরপি জুড়িন্দা আইনা লাগাইল।
দশ হাজার ফৌজ নিসব্দে পার হৈল॥
বাইস সও লোক সুর্দ্ধা রতন হাজারি।
পাটেলির উপরে তারা সভে চড়ি॥
যেই মাত্র পাটেলি আইল মধ্যখানে।
তলা ফাটীয়া ডূবিল সেই স্থানে॥
পাটেলি ডুবিল ফৌজে হইল কলরব।
উপারে বরগীর ফৌজে জানিলা সব॥
মোগল আইল আইল পইল হড়বড়ি।
তথন ঘোড়ায় চড়িয়া বরগি জাএ দউড়া দউড়ি॥
বরগির লস্করে জদি পইল হড়বড়।
হেনকালে বহইনাতে ধরিলা ডেহড়॥
এক এক ঘোড়ায় তুই তুই বরগি চড়িয়া।
দ্রব্য সামগ্রী কত জাএ ফেলাইয়া॥

(১) আউগাউক—অগ্রসর হউক।
(২) মহাতাব—মশাল, বৃহৎ আলোক। (৩) পরা—(?) (৪) পাটেলি—নৌকাবিশেষ।
(৫) জুড়িন্দা—বাঁধিয়া, জোড়া গাঁথিয়া। (৬) গুদারা—অস্থায়ীসেতু।

সপ্তমী অষ্টমী দুই পূজা করি।
ভাস্কর পলাইয়া জাএ প্রতিমা ছাড়ি ॥
মিষ্টান্ন সামগ্রী যত ছিল কাছে।
বহনিয়া লুটিতে লাগিল তার পাছে ॥
ছাগ মৎস্য মহিষ জাহা যত ছিল।
বহনিয়া আসিয়া সব লুটিতে লাগিল ॥
এই মতে সামগ্রী লুটে বহনিয়া।
হোতা ফৌজ লইয়া ভাস্কর গেল পলাইয়া
ভাস্কর পলাইয়া যদি গেল অনেক দুরে।
জয়ন্দি আহাম্মদ খাঁ স্থনিল তার পরে ॥
সাদিয়ানা নহবত[১] কত বাজে থরে থরে।
ফকির ফুকুরাকে খএরাত কত করে ॥
আশ্বিন মাসে ভাস্কর গেল পলাইয়া।
চৈত্রমাসে পুনরূপি আইল সাজিয়া ॥
জেই মাত্রে পুণরূপি ভাস্কর আইল।
তবে সরদার সকলকে ডাকিয়া কহিল ॥
স্ত্রী পুরুষ আদি করি যতেক দেখিবা।
তলয়ার খুলিয়া সব তাহারে কাটিবা ॥
এতেক বচন জদি বলিল সরদার।
চতুর্দিকে লুটে কাটে বোলে মারমার ॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব যত সন্ন্যাসী ছিল।
গোহত্যা স্ত্রীহত্যা সত সত কৈল ॥
হাজারে হাজারে পাপ কৈল দুর্ম্মতি।
লোকের বিপত্য[২] দেখি রুষিলা পার্ব্বতী ॥
পাপিষ্ট মারিতে আদেশিলা পস্থপতি।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব হত্যা কৈল পাপমতি ॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হিংসা দেখিবারে নারি।
এতেক কহিয়া তবে রুসিলা শঙ্করী ॥
ভৈরবি জোগিনী জত নিকটে ছিল।
জোড়হস্ত কৈরা তারা ছমুতে[৩] ডাড়াইল ॥

---

(১) সাদিয়ানা নহবত—অশ্বারোহী সৈন্যদলসঙ্গী-নহবত বাদ্য।
(২) বিপত্য—বিপত্তি, বিপদ। (৩) ছমুতে—সম্মুখে।

তবে দুর্গা কহে স্থন যতেক ভৈরব
ভাস্করকে বাম হইয়া নবাবকে সদয় হবি ॥
এতেক বলিয়া দুর্গা করিলা গমন।
এখন জেরূপেতে ভাস্কর মৈল স্থন বিবরণ ॥
ভাস্কর পণ্ডিত যদি আইল কাটঞাতে।
স্থনিঞা নবাবের ডেরা পইল মোনকরাতে।
পাল চাই ধুম পইল সহরেতে।
মুদি বানিঞা চলে নবাবের সাথে ॥
মোনকরাতে নবাবের ফৌজ হইল স্থমার।
ভাস্কর লইয়া কিছু শুন তবে আর ॥
তবে আলি ভাই বলে ভাস্করের তরে।
এইরূপে কতবার আসিবা বারে বারে ॥
ফৌজকে মানা কর গ্রাম লুটিতে।
আমি জাইয়া বন্দোবস্ত করি নবাবের সাথে ॥
এতেক স্থনিয়া ভাস্কর কহিলেন তাকে।
সাবধান হইয়া তুমি মিল নবাবকে ॥
তবে আলি পচিশ ঘোড়া লইয়া সাথে।
নবাবের সাতে মিলিতে আইল মোনকরাতে ॥
ফুটিসাঁকো যদি আলি ভাই আইলা।
সেইখানে থাকিয়া উকিল পাঠাইলা ॥
উকিল আসিয়া তবে কহে নবাবেরে।
আলিসাহেব আইসে নবাব সাহেবকে মিলিবারে ॥
তবে নবাব বোলে বোল যাইয়া তারে।
হাতিয়ার থুইয়া আইসা মিলুক আমারে ॥
উকিল আসিয়া তবে কহিলেন তাকে।
হাতিয়ার থুইয়া যাইয়া মিল নবাবকে ॥
আলি ভাই য়াইলা তবে হাতিয়ার থুইয়া।
পচিশ ঘোড়া স্থদ্ধা মিলিল আসিয়া ॥
নবাব বোলে তুমি আইলা কি কারণ।
আলি ভাই বোলে বন্দোবস্তের কারণ ॥
ভাস্করের সাথে বিবাদ কেনে কর।
দুই জনাতে মিইলা কিছু বন্দোবস্ত কর ॥

তবে নবাব সাহেব বুলিলেন তারে।
ভাস্কর আসিয়া নাকি মিলিবে আমারে ॥
জে সময়ে পূর্ব্বে ঘেইরাছিল বর্দ্ধমানে।
সে সমএ উকিল আমি পাঠাইলাম তার স্থানে ॥
বন্দবস্ত করিতে যদি থাকিত তার মনে।
সেই সমএ উকিল পাঠাইত আমার স্থানে ॥
মুলুক পোড়াইল লুটিল বারবার।
কাঁউয়ার সঙ্গে বন্দোবস্ত করিব য়ার ॥
আলি ভাই বোলে যাহা হবার তা হৈল।
কদাচিত উকথা মুখে আর না বুইল ॥
দুই সরদার তুমি দেহ আমার সনে।
ভাস্করকে মিলাইয়া আনি এই স্থানে ॥
তবে নবাবসাহেব কহিল দুজনারে।
আলি ভাইএর সঙ্গে যাইয়া আন ভাস্করে ॥
জানকীরাম মুস্তফা খাঁ দুজনে চলিল।
কাটোঞায় যাইয়া ভাস্করকে মিলিল ॥
ভাস্করকে আলি ভাই কহিতে লাগিল।
মুস্তফা খাঁ জানকীরাম দুই জনাএ আইল ॥
নবাব সাহেব পাঠাইল দুই জনারে।
সঙ্গে কইরা লইয়া জাইয়া মিলাবে তোমারে ॥
এতেক শুনিয়া তবে মির হবিব কয়।
কদাচিত ভাস্করকে জাইতে মত নএ ॥
মির হবিব কিছু তবে কহে ভাস্করে।
কদাচিত জাইয়া তুমি না মিল তাহারে ॥
মোগলের ফের তুমি করিবা মোনস্থবা।
আমার কথা শুন জদি কদাচিত না যাবা ॥
তবে মুস্তাফা খাঁ কহিতে লাগিল।
এতেক কথা তুমি কেনে কহিলা ॥
আমরা দুই জনাএ তবে সঙ্গে কইরা নিব।
বন্দবস্ত কইরা পুন এইখানে আনিব ॥
কিছু কিন্তু জদি মনে কর তুমি।
কোরাণ দরমান কইরা কিরা খাইছি আমি ॥

জানকীরাম কহে গঙ্গাজল সালগ্রাম লইয়া।
কিছু চিন্তা নাই তোমাকে আনিব মিলাইয়া॥
এতেক শুনিয়া ভাস্কর বোলে ভাল ভাল।
মুস্তফা খা বোলে তবে শীঘ্র কইরা চল॥
ভাস্কর বোলে সাথে ফোজ নিব কত।
জানকীরাম বোলে তোমার মনে লয় জত॥
আলি ভাই বোলে ফৌজে নাহি কাম।
জন দশ বারো লোক সঙ্গে কইরা জান॥
মির্ত্তুকাল হইলে যেন মতিচ্ছন্ন পাএ।
আলি ভাইএর কথায় ভাস্কর ভুইলা যাএ॥
প্রথমে বৈশাখ মাস শুক্রবার দিনে।
ভাস্কর চলিল মিলিতে নবাবের সনে॥
আলি ভাই আদি করি বাইস জনা য়াইল।
পলাসি য়াসিঞা ভাস্কর ডেরায় থাকিল॥
তার পরদিনে ভাস্কর করিল গমন।
এথা নবাব লইয়া কিছু শুন বিবরণ॥
হরকারা বোলে নববাকে ভাস্কর য়াইসে।
এতেক শুনিয়া নবাব সভা কৈরা বৈসে॥
সোটাবর্দ্দার খা সর্দ্দার নবাবের আগে।
বড় বড় জমাদার বসিলা চাইর দিগে॥
দুসরঞি বৈশাখ মাস শনিবার দিনে।
ভাস্করকে লইয়া আইল নবাবের স্থানে॥
বিধাতা বিপত্য হইল বুধ্য[1] গুইলা[2] গেল।
হাতিয়ার থুইয়া আইসা নবাবকে মিলিল॥
ভাস্কর পণ্ডিত জদি মিলিল নবাবকে।
তার পরে নবাব কহেন কিছু তাকে॥
আমার মুলুক তুমি লুটিলা বারে বারে।
বন্দোবস্ত করিতে পাঠাইলা আলি ভাইএর তরে॥
যে কালে আসিয়া তুমি ঘেরিলা বর্দ্ধমানে।
সে সমএ উকিল আমি পাঠাইলাম তোমার স্থানে।

(১) বুধ্য—বুদ্ধি। (২) গুইলা—গুলাইয়া।

বন্দোবস্ত করিতে যদি থাকিত তোমার ম[illegible]
সেই সময় উকিল তুমি পাঠাইতে আমে[illegible] নে ॥
তবে এতেক শুনিয়া ভাই আলি কহি[illegible]
এত দিন জাহা হবার তাহা হইল ॥
ভাস্কর পণ্ডিত যদি মিলে তোমার সনে।
কিছু দিঞা বন্দবস্ত কর ইহার সনে ॥
এতেক শুনিয়া নবাব কহিলেন হাসি।
খানিক বিলম্ব কর লঘ্যি কইরা আসি[3] ॥
পূর্ব্বে সভারি মন স্থবা ছিল।
সেই মন স্থবাএ নবাব উঠা গেল ॥
নবাব উঠিয়া গেল হইল অনেকক্ষণ।
ভাস্কর পণ্ডিত কিছু কহেন তখন ॥
দুই দণ্ড বিলম্ব হইল কহে মুস্তাফার ঠাই।
এখন তবে আমি সান[4] পূজাএ জাই ॥
মুস্তফা খাঁ বোলে চলো সভাই গিলে জাই।
সেপহরিতে[5] আসিব নবাবের ঠাই ॥
এতেক বুলিয়া মুস্তফা খাঁ উঠিল।
তাহার দেখনে তবে ভাস্কর উঠিল ॥
জেই মাত্র ভাস্কর ঘোড়ায় চড়িতে।
তলোয়ার খুলিয়া তখন মারিলেক তাথে ॥
সেইক্ষণে তবে ঘটাচট্টি হইল।
জত জনা য়াইসা ছিল সব জনা মইল ॥
তারপরে নবাব সাহেব সমাচার স্থনে।
স্থনি য়ানন্দিত নবাব হইল সেইক্ষণে ॥
সাদিয়ানা নহবত কত বাজিতে লাগিল।
ফকির ফুকুরাকে খএরাত কত দিল ॥
মোনকরা মোকামে জদি ভাস্কর মইল।
মনস্থবাদ উড়াইয়া কবি গঙ্গারাম কইল ॥

ইতি মহারাষ্টা পুরাণে প্রথম কাণ্ডে ভাস্কর পরাভব ॥ সকাব্দা ১৬৭২,
সন ১১৫৮ সাল ॥ তারিখ ১৪ পৌস, রোজ শনিবার ॥

---

(৩) লঘ্যি কইরা আসি—প্রস্রাব করিয়া আসি, 'লঘ্যি' শব্দের অর্থ প্রস্রাব নহে। সভাস্থলে এই সাঙ্কেতিক শব্দ ব্যবহার করে। ইহা ঠিক ইংরাজী Please let me go out হিসাবের কথা ॥

(৪) সান—স্নান। (৫) সে পহরিতে—তৃতীয় প্রহরে।

চাকমাদিগের ভাষা-তথ্য

চট্টগ্রাম, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম এবং পার্ব্বত্যত্রিপুরায় চাকমা নামক জাতিবিশেষের বাস। ইহাদের সংখ্যা প্রায় অর্দ্ধলক্ষ হইবে। শারীরিক গঠনপ্রণালী অনেকটা মঘ-ত্রিপুরাদি অপরাপর পার্ব্বত্য জাতির অনুরূপ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে ইহারাও "লোহিত" অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র (যার-কিও-সাংপো) নদের তীরভূমি হইতে আগত। এতৎসম্বন্ধে নানাবিধ জনশ্রুতি শুনিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগের দুইটী মাত্র প্রাচীন নিদর্শন সেই সমুদয়ের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য। [ধনপুদি রাধামোহনের উপাখ্যান" এবং "চাটিগাঁ-ছড়া" আখ্যায়িকার সাক্ষ্য স্বীকার করিলে প্রাগুক্ত মত অগ্রাহ্য করা যায় না; সুতরাং ইহারাও "লোহিতিক" বা "তিব্বতীব্রহ্ম" শ্রেণীর অন্তর্গত *। কিন্তু বর্ত্তমানে তাহারা বৌদ্ধদলভুক্ত হইয়াছে †।]

দেশভেদে ভাষার বিভিন্নতা স্বতঃসিদ্ধ। যদি সমগ্র পৃথিবী ব্যাপিয়া একমাত্র ভাষায় ভাবের আদানপ্রদান চলিত, তবে কত যে সুখের ও সুবিধার আশা ছিল, তাহা পরিমাণ করা যায় না; কেননা, প্রত্যেক দেশের সুধীসম্প্রদায় বহুশ্রমার্জ্জিত তত্ত্বরাশি স্ব স্ব দেশজ ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সে সমুদয় আয়ত্ত করিতে হইলে তত্তৎভাষায় পারদর্শী হওয়া সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক; সুতরাং পৃথিবীর যাবতীয় ভাষায় অধিকার না থাকিলে সমস্ত রহস্যও উদ্ঘাটিত করা দুরূহ। পরন্তু তাদৃশ সার্ব্বভৌমিক শিক্ষা সামান্য মানবজীবনে লাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাই বলিতেছিলাম, সমগ্র পৃথিবীর এক সাধারণ ভাষা হইলে উপকারের পরিসীমা ছিল না। এক সময়ে এ ভারতের প্রায় সর্ব্বাংশে হিন্দিতে কথোপকথন চলিত; কালক্রমে তাহা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সম্প্রতি কতিপয় বঙ্গীয় কৃতবিদ্য বাঙ্গালাভাষাকে ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন, তাঁহাদের মনোরথ সিদ্ধ হইলে—দেশের এক গুরুতর অভাব নিরাকৃত হইবে।

সার্ব্বভৌমিক ভাষা

ভাষাতত্ত্ব আলোচনা কালে দেখা যায়, দেশের অবস্থানের উপরই ভাষার প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। ইহা আবার বিবিধ কারণে ঘটিয়া থাকে। প্রথম—দেশবাসীর কর্ম্মতৎপরতা, দ্বিতীয়—প্রতিবেশী অপরাপর ভাষার সংঘর্ষণ এবং তৃতীয়তঃ—দেশের অবস্থানুসারে আবহাওয়ার প্রকৃতি। যে দেশের লোক সাতিশয় কর্ম্মতৎপর (যেমন বন্দরাদিতে) এমন কি একটু ভালরূপে কথাটি বলিবারও অবকাশ পায়না, তথাকার ভাষা সংক্ষিপ্ত হওয়া স্বাভাবিক—অনেকস্থলে সঙ্কেতমাত্র অবলম্বনে কার্য্য চালাইতে

ভাষাভেদ

* ইহাদের জাতীয় পরিচয় এবং প্রাচীনকাহিনী লইয়া 'আষাঢ়' এবং 'মাঘ' (১৩১৩) সংখ্যার "ভারতী"তে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

† এতৎসম্বন্ধেও "বৌদ্ধবন্ধু"র বৈশাখ হইতে কার্ত্তিক সংখ্যায় (১৩১৩) বিস্তৃত বিবরণী বাহির হইয়াছে

বাধ্য হয়। পার্ব্বত্যপ্রদেশের পক্ষেও এই ব্যবস্থা খাটে; কারণ এখানকার জীবনকেও পরিশ্রমের কঠোর শাসনে পরিচালিত করিতে প্রকৃতিই বাধ্য করে। বিভিন্ন ভাষার সংমিশ্রণে আসিলে ভাষাও একটা খিচড়ী না হইয়া যায় না। অধুনা আমরা অনেকগুলি ইংরাজী শব্দ একেবারে খাসদখলে আনিয়া ফেলিয়াছি। এই যে 'দখল' শব্দটী প্রয়োগ করিলাম, তাহাও নিজস্ব নহে। এস্থলে তৎপরিবর্ত্তে 'অধিকার' বসাইলে ঠিক উপযুক্ত (idiomatic) প্রয়োগ হইল না বলিয়া সম্ভবতঃ অনেকেই নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন। এইরূপে সকল ভাষাই কিছু না কিছু পরিমাণে বিভিন্নভাষা দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে। এতদ্ব্যতীত দেশের জলবায়ু এবং শীতাতপের বিভিন্নতা ও ভাষাবিচ্ছেদ ঘটাইবার পক্ষে সামান্য কারণ নহে। কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করিলেই দেখা যায়, কোন কোন দেশের আবহাওয়ায় জিহ্বার এত জড়তা জন্মে যে, উচ্চারণে নিতান্ত বিকৃত ঘটে। কোথায়ও বা কেবল অনুনাসিক উচ্চারণই ভাষার প্রকাশক। এইরূপ উচ্চারণ বৈষম্যে অবোধ্য ভাষার সৃষ্টি হইয়া থাকে।

চাকমাবাঙ্গলা

চাকমাদিগের মূলভাষা বাঙ্গালা; তবে ইহা আধুনিক বাঙ্গলার তুলনায় নিতান্ত বিকৃত এবং সংক্ষিপ্তও কম নহে। ইংরাজরাজপুরুষেরা ইহাকে "চাকমা-বাঙ্গালা" (The language is Chakma Bengali) নামে অভিহিত করিয়াছেন *। বস্তুতঃ বঙ্গদেশের ক্রমেই পূর্ব্বদিকে ভাষা বিকৃত হইয়া আসিয়াছে। এতৎসম্বন্ধে প্রধানতঃ দুইটী কারণ অনুমান করা যায়। (১) এ সকল দেশে পূর্ব্বে মঘের বসতি ছিল। পরে যখন পশ্চিমবঙ্গ হইতে বাঙ্গালিগণ এখানে উপনিবেশ সংস্থাপন করিতে আসে, তখন তাহাদের সেই প্রাচীন অর্থাৎ প্রাকৃতবহুল বাঙ্গলামাত্র সম্বল ছিল। (দৃষ্টান্তস্বরূপ—চট্টগ্রামে প্রচলিত অনেক কথা 'চৈতন্যভাগবত', 'চৈতন্যমঙ্গল' ও 'প্রাচীন পদাবলী' প্রভৃতি হইতে তুলিয়া দেখাইতে পারা যায় তা'ছাড়া এখানে এমতও অনেক কথা আছে, যাহা পশ্চিমবঙ্গ ভিন্ন অপর কোথায়ও ব্যবহার নাই। এ সকল এবং আরও অন্যান্য কারণে বর্ত্তমান চট্টগ্রামবাসী অধিকাংশ হিন্দুই যে দক্ষিণ রাঢ়জ, তাহা সুদৃঢ়রূপে প্রমাণিত হয়।) পরবর্ত্তী যুগে নবদ্বীপ সংস্কৃত আলোচনার কেন্দ্রস্থল হওয়াতে তৎপার্শ্ববর্ত্তী দেশ সমূহের ভাষায় বহু সংস্কৃত শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়াছে। তথা হইতে বাঙ্গালার যে অংশ যত অধিক দূরে অবস্থিত, তথাকার বাঙ্গালায় সংস্কৃত শব্দের পসার তত অল্প। (২) অপরতঃ বিভিন্ন ভাষার সংঘর্ষেও যে কোন ভাষা বিকৃত এবং নিকৃষ্ট হইয়া পড়ে। চাকমাভাষার মূল বাঙ্গলা হইলেও মগ, ত্রিপুরা এবং মুসলমানী ভাষার সহিত সংমিশ্রণ অতিশয় বিস্তৃত। ফলকথা, ইহারা বিজাতীয় সমাজ হইতে যাহা যাহা অনুকরণ করিয়াছে, ভাষা তন্মধ্যে সাধারণ। মোটামুটি বলা যাইতে পারে, চাকমাগণ হিন্দুদের হইতে :ভাষা ও দেবদেবী; মঘদিগের ধর্ম্ম, ব্যবহার, ভাষা, এমন কি অক্ষরগুলি পর্য্যন্ত; ত্রিপুরাদের ভাষা, পূজাপদ্ধতি ও আচার ব্যবহার; এবং মুসলমানদিগের ভাষা ও খাঁ প্রভৃতি উপাধি ইত্যাদি পার্শ্ববর্ত্তী প্রায় সমুদয়

* Vide—Appendix Vii; Part of A (Bengal code of cencus procedure)

জাতি হইতে কিছু কিছু করিয়া গ্রহণ করিয়াছে। এই নিমিত্ত ইহাদের জাতীয় ইতিবৃত্ত সাতিশয় জটিল হইয়া পড়িয়াছে এবং ভাষাও এত দুরূহ হইয়াছে যে, অপর কোন জাতিরই সহজবোধ্য নহে। পরন্তু ধীরে ধীরে বলিলে সাধারণ চাক্‌মাও সরল বাঙ্গালা বুঝিতে পারে, এবং প্রায় বোধযোগ্য করিয়া উত্তর প্রদান করে। আবার ইহাদের মধ্যে "গোছা" বিশেষেও কথার পার্থক্য রহিয়াছে; কোন কোন "গোছার" কথার টানও বিভিন্ন।

সংস্কৃত শব্দ

ইহারা কতিপয় সংস্কৃত শব্দ এমনি অবিকৃতরূপে গ্রহণ করিয়াছে যে, ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তন্মধ্যে—দয়া, ধর্ম্ম, শক্তি, ভক্তি, দান, মান, কৃপা, পীড়া, চিৎ, অমৃত, সুখ, গুণ, উপকার, সম্পত্তি, বন্ধু, মন, বিপদ, আপদ, ধন, ধনী, মিত্র, বিচার, অন্তর, অকুল, শাক, গূঢ় প্রভৃতি শব্দগুলি সুপ্রথিত। এতদ্ভিন্ন সংস্কৃতমূলক কোন কোন শব্দ সামান্য বিকৃত ভাবে ব্যবহৃত। যথা :—

সংস্কৃত	চাকমাভাষার	সংস্কৃত	চাকমাভাষার
ছায়া	ছাবা ;	গুচ্ছ	গোছা ;
প্রত্যয়	পাত্যায় ;	আর্য্য	আযু ;
দুঃখ	দুখ ;	ঝটিতি	ঝাদি ;
বাস (গন্ধ)	বাচ্ ,	কলুষ	কুলুক ;
পিচ্ছিল	পিচ্ছিল ;	হৃদয়ে	হিদৎ ;
সন্দেহভাষা	ছন্দভাষ ;	কুত্র	কুহ্ ;
শবশালা	দবাছাল ;	কুত্রাৎ (কস্মাৎ)	কুয়ৎ ;
শালা (গৃহ)	ছাল ;	মে দেহি	মে দেহি ;
গোশালা	গোছাল ;	কর্ম্ম	কাম। ইত্যাদি

পালিশব্দ

ধর্ম্ম বৌদ্ধ বলিয়া শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ স্বভাবতঃ প্রাকৃত-বহুল, তা'ছাড়া প্রচলিত কথায় প্রাকৃত প্রভাব তাদৃশ অধিক নহে। সচরাচর কথোপকথনে—"উজু" (উজ্জু), "এজ্যা" (অজ্জু); "লড়ি" (লট্‌ঠী), "পাথর" (পত্থর), "দুয়ার", "ঘর" "হিয়াল" (শিয়াস), "জিহু" (জট্‌ঠা), বাবন (বম্ভণ), "দড়", "আন্ধান" (অন্ধঃ) "দুনা" (দুণা), "বুরা" (বুড্‌ঢ), "তেল", "মৌ" (মহু) "রূপা" (রূপ্পা), "মাছি" (মছি), "হলৈদ" (হলদ্দা). "পুথি" (পোত্থি) প্রভৃতি মূল এবং ঈষদ্বিকৃত পালি শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়।

বাঙ্গলা শব্দ

আর অবিকৃত বাঙ্গালা শব্দও কম নহে। তন্মধ্যে ফুল, ভাল, মন্দ, ঢাক, গরীব, নিজ, চোখ, ওঝা, পরাণ ইত্যাদি শব্দগুলি সাধারণ, আবার উচ্চারণ বিকৃতি দোষে কতকগুলি বাঙ্গলা শব্দ সামান্য রূপান্তরিত হইয়া পড়িয়াছে। যেমন,—"দুষ" (দোষ), "বিহাং" (বিশ্বাস), "ভাপ" (ভাব), "কদা" (কথা), "বিগুণ" (বেগুণ), "ভেজা" (ভাজা), "বিছমলাগা" (বিষম লাগা) ইত্যাদি। এ ছাড়া, কোন

কোন শব্দ বিশেষ পরিবর্ত্তিত এবং কোনটী বা অর্থান্তরিত হইয়া গিয়াছে। কয়েকটী উদাহরণ যথা,—"অবুঝ" (অবোধ), "আভোতা" (অভুক্ত), "বারিষ্যা" (বর্ষা), "কমলে" (কোন সময়ে) এবং "কাণা" শব্দে অন্ধকে বুঝায়।

সম্পর্ক নামে বাঙ্গালীদিগের বিশেষতঃ হিন্দুগণের যথেষ্ট অনুকরণ পরিলক্ষিত হয়, কোন কোন স্থলে সামান্য বিকৃতি ঘটিয়াছে মাত্র। যথা—পিতা বা শ্বশুর—"বা" মাতা বা মাতা বা শ্বশুড়ী—"মা" পিতৃব্য—"জিচু" "জেদাই" (জ্যেষ্ঠতাতপত্নী) "খুরী" "কাকী"; জ্যেষ্ঠভ্রাতা—"দাদা"; জ্যেষ্ঠা ভগিনী—"বেই" কনিষ্ঠ ভাইভগিনী (স্নেহসূচক)—"লক্ষ"; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ—"ভুজি"*; মায়ের কনিষ্ঠা ভগিনী—"মুঝি"; মায়ের জ্যেষ্ঠা ভগিনী—"জেদাই"; "মুঝি"পতি—"মইঝা" এবং "জেদাই" পতি "জিচু", পিসী "পিসাই"; "পিসা", মামা—"মামু";—"মামী"; পিতামহ মাতামহ—"আবু", "দা"; পিতামহী মাতামহী—"বেই", "নাণী"; ভগিনীপতি—"বোনই"†।

আত্মীয়-আহ্বান

সর্ব্বোপরি ইহাদিগের সংখ্যাগণনা এক অভিনব ব্যাপার! মোট কুড়িটী রাশি আছে, কিন্তু প্রত্যেকটীরই অভিধা বিভিন্ন। ততোধিক গণনার আবশ্যক হইলে, 'এককুড়ি এত' বা 'দুই কুড়ি এত' বলিয়া প্রকাশ করে। অর্থাৎ পাঁচবার কুড়ি কুড়ি গণনার পর তবে এক শতের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বলিতে কি, এতাদৃশ প্রথা অদ্যাপি চট্টগ্রামের অশিক্ষিত সম্প্রদায়ে প্রচলিত আছে। সম্ভবতঃ ইহা তাহারই সংক্রমণ ফল; কিন্তু এই সংখ্যাগুলির নাম প্রায় বাঙ্গলা-প্রসূত হইলেও কোন্ অর্থে স্থিরীকৃত হইয়াছে, নির্ণয় করা দুরূহ। যথা:—১ একথ, ২ দিথ, ৩ তিতিরি, ৪ তিথ, ৫ কাচ, ৬ কতম, ৭ বোলাই, ৮ নিল, ৯ রাজা ১০ দিন, ১১ হাত, ১২ গাৎ, ১৩ ব্রাহ্মণ, ১৪ ছকি, ১৫ ধর্ম্ম, ১৬ তাৎ, ১৭ গন্দা, ১৮ গন্দি, ১৯ উনিশ, ২০ কুড়ি। কিন্তু বর্ত্তমানে এবংবিধ আখ্যায় গণনা এত বিরল যে, অশিক্ষিত সমাজেও কদাচিৎ পরিলক্ষিত হয়।

সংখ্যা গণনায়

ক্রিয়াপদের রূপ সংস্কৃতমূলক হইলেও নিতান্ত সংক্ষিপ্ত করিতে গিয়া তৎসমুদায় অধিকতর দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। দেখিলেই বোধ হয় যেন, প্রাকৃতের অবস্থা অতিক্রম করিয়া বাঙ্গলায় উপনীত হইবার কালে একটা মহাবিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে। একবচন ও বহুবচন বিবেচনায় ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন হয়। কাল, পুরুষ ও বচনভেদে বিভক্তি সকল অষ্টাদশবিধ। ক্রিয়াবিভক্তি যথা—

ক্রিয়াবিভক্তি

		একবচন	বহুবচন
বর্ত্তমানকাল	উত্তমপুরুষ	আং	এই
	মধ্যমপুরুষ	ইং	ও
	প্রথমপুরুষ	য়	ন

* চট্টগ্রামের হিন্দুগণ "ভইজ" এবং মুসলমানের "ভাউজ" বলিয়া থাকে।

† চট্টগ্রামের নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা বলে—"বোনাই"।

		একবচন	বহুবচন
		এইম্	এবং
ভবিষ্যৎকাল	মধ্যমপুরুষ	এবে	এবা
	প্রথমপুরুষ	এবো	এবাক্
অতীতকাল	উত্তমপুরুষ	এইয়ং	ইয়েই
	মধ্যমপুরুষ	ইয়চ	ইয়
	প্রথমপুরুষ	ইয়ে	ইয়ন

বাঙ্গলা পত্তের "মুই" ও "তুই" সর্ব্বনাম চাকমাভাষায় যথাক্রমে উত্তম ও মধ্যমপুরুষের একবচনে তুচ্ছার্থে এবং অতুচ্ছার্থে প্রচলিত; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ইহারা "আমি" এবং "তুমি" শব্দে বহুবচনার্থে প্রকাশ করিয়া থাকে। অন্যান্য

সর্ব্বনাম

প্রথম পুরুষের একবচনে সংস্কৃত "তে" এবং বহুবচনে বাঙ্গলা পত্তের "তারা" সর্ব্বনাম পদ ব্যবহৃত হয়। এই সমুদয় সর্ব্বনামের সম্ভ্রমার্থে কোন বিশেষ রূপ নাই বটে, কিন্তু তাদৃশ সম্মানিত স্থলে সংস্কৃতের অনুকরণে একের প্রতিও বহু-বচনের রূপ ব্যবহারের ব্যবস্থা আছে। মদীয় বক্তব্য কিঞ্চিৎ স্পষ্টতর করিতে এস্থলে একটী ক্রিয়ারূপ উপযুক্ত সর্ব্বনাম সহযোগে প্রদর্শিত হইল। গমনার্থ-বোধক ক্রিয়ারূপ যথা :—

বর্ত্তমান কাল।

বাঙ্গলা কথা	চাকমা কথা
আমি যাই	মুই যাং
আমরা যাই	আমি যেই
তুই যা তুমি যাও	তুই যাইচ্
তোরা বা তোমরা যাও, অথবা আপনি যান	তুমি যাও
সে যায়	তে যায়
তাহারা যায় বা তিনি যান	তারা যান

ভবিষ্যৎ কাল।

বাঙ্গলা কথা	চাকমা কথা
আমি যাব	মুই যেইম্
আমরা যাব	আমি যেবং
তুই যাবি বা তুমি যাবে	তুই যেবে
তোরা যাবি বা তোমরা যাবে অথবা আপনি যাবেন	তুমি যেবা

ক্রমপরিবর্ত্তন সুস্পষ্টই পরিদৃষ্ট হয়। অবশিষ্ট জ, ঝ, ন, র, এবং হ্ল তে সামঞ্জস্য উদ্ধার কিছু কঠিন হইয়া পড়িয়াছে সত্য, পরস্পরের মধ্যে মূলতঃ সৌসাদৃশ্য সহজেই অনুসন্ধান করিয়া লওয়া যায়। চাক্‌মা-সমাজের এ অনুকরণ অনতিকালের কথা নয়। ইহার উপর দিয়া কত রাজামহারাজার প্রভুত্ব—জগতের কত অনন্ত পরিবর্ত্তন চলিয়া গিয়াছে, তাহার তুলনায় বর্ণমালার এ সামান্য পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। বিশেষতঃ অনুকরণে প্রায়ই খাঁটি জিনিষ থাকে না, অনুকারী হয়তঃ স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধির সংযোগে একটা অভিনব পদার্থ গড়িয়া তোলে, অন্যথা তাহা যতদূর পারা যায়—সংক্ষিপ্ত সংস্করণে প্রকাশ করিয়া থাকে।

কেবল আকৃতিগত সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়াই অনুকরণ-কর্ত্তা সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই, বর্ণসংখ্যাও যথাসাধ্য সংক্ষেপের চেষ্টা হইয়াছে। সংস্কৃতমাতৃক বলিয়া এই বর্ণগুলিও স্বর এবং ব্যঞ্জনভেদে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ব্রহ্মদিগের মূল স্বরবর্ণ দশটী—ঋ এবং ৯ ইহাদের নাই। কিন্তু চাক্‌মাগণ তাহা হইতে অ-ই-উ-এ বর্ণচতুষ্টয়মাত্র গ্রহণ করিয়াছে। ই-ঈ এবং উ-ঊ পরস্পরে কোন প্রভেদ নাই। 'অ' এর উচ্চারণ—'আ'; তদুপরি (´) "মাথা তুলিয়া দিলে" অর্থাৎ রেফাক্রান্ত করিলে 'অ' উচ্চারিত হয়। তা' ছাড়া 'অ' এর উপর (`) বামমুখী আর একখানি শিখা তুলিয়া দিলে 'ঐ' এবং 'অ' এর নীচে 'উ' দিলে 'ও' উচ্চারিত হইয়া থাকে। যেমন,—

স্বরবর্ণ।

অ উচ্চারণে [চাক্‌মা অক্ষর] ও উচ্চারণে [চাক্‌মা অক্ষর]
ঐ „ [চাক্‌মা অক্ষর]

ঔএর উচ্চারণ ইহাদের মধ্যে নাই।

ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা ব্রহ্মভাষারই অনুরূপ বত্রিশটী। তন্মধ্যে বর্গীয়বর্ণগুলি ঠিকই আছে, অন্তস্থবর্ণের য—'য়্যা' এবং ব—'ওয়া'* সংজ্ঞায় প্রথিত। তালব্য 'শ' ও মূর্দ্ধণ্য 'ষ' এর শাসন ইহাদের মধ্যে নাই। উষ্মবর্ণে অবশিষ্ট 'স' ও 'হ' ব্যতীত ব্রহ্ম-বর্ণাবলীর অনুকরণে (লাজিয়ে) 'হ্ল' নামে আর একটী বর্ণ আছে, তাহার ব্যবহার অপেক্ষাকৃত বিরল। এতদ্ব্যতিরিক্ত অনুস্বার এবং বিসর্গের প্রচলনও ইহারা অজ্ঞাত নহে; তবে চন্দ্রবিন্দুর কাজ ন্ দ্বারা সারিয়া যায়। প্রাকৃতের ন্যায় ব্যঞ্জনবর্ণ সকল কা-খা-গা-ঘা ইত্যাদি ক্রমে আকারান্ত করিয়া উচ্চারিত হয়। বিশেষ পরিচয়স্থলে—তৎসঙ্গে আকৃতিসূচক বিশেষণযোগে পাঠ হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য তৎসমুদয় "আঁকুড়ে ক", "বকা ঠোঁটে খ" প্রভৃতির রূপান্তর মাত্র। তাহা দেখাইবার পূর্ব্বে বলিয়া রাখা প্রয়োজন, ইহারা সচরাচর 'স' কে 'ছ' এর ন্যায় উচ্চারণ করে এবং ট, ঠ, ড, ঢ এর উচ্চারণ যথাক্রমে ত, থ, দ, ধ এর সহিত বিনিময় করিয়া থাকে। যথা,—ক—"চুচুক্কা কা", খ—"গুজাক্যা খা", গ—"চান্দ্যা গা",

ব্যঞ্জনবর্ণ।

* এই 'ওয়া' উচ্চারণ অদ্যাপি উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে শুনিতে পাওয়া যায়। যথা—দোয়ারী (দ্বারী), দোয়ারিকা (দ্বারিকা), ঈশোয়ার (ঈশ্বর) ইত্যাদি।

ঘ—"তিনঠাল্যা ঘা", ঙ—"ছিলামুণ্ডা ঙা", চ—"দ্বিডাচ্যা চা", ছ—"মজছ্যা ছা", জ—"দ্বিবতলা জা", ঝ—"উরাউরি ঝা", ঞ—"তিলচ্যা ঞা", ট—"দ্বিরাদা তা", ঠ—"ফোডাদ্বিয়া থা", ড—"আঁডুভাঙা দা", ঢ—"লেজভরা ধা", ণ—"পেট্যো ণা", ত—"গণ্ডদা টা", থ—"জয়দা ঠা", দ—"তুলনি ডা", ধ—"তলমো ঢা", ন—"ফার্বাণ্যা না", প—"পাল্যা পা", ফ—"উয়রবোঝা ফা", ব—"উয়রমু বা", ভ—"চেরোদা ভা", ম—"বুগদ্পতলা মা", য—"ছিমুছ্যা য়্যা", র—"দ্বিদাজ্যা রা", ল—"তলমুয়া লা", ব—"বাজন্যা ওয়া", স—"ছুতিবক্যা ছা", হ—"উয়র-মুয়া হা" এবং হ্ল—"লাজিয়ে হ্লা"।

এই সমুদয় ব্যঞ্জনবর্ণকে অকারান্ত উচ্চারণের উপযোগী করিতে পূর্ব্বোক্তরূপে মস্তকোপরি (´) রেফস্থাপন প্রয়োজন। ই-ঈকার (০) শূন্য বিশেষ মাত্র, ব্যঞ্জনের দক্ষিণপার্শ্বোপরি বসে এবং উ-উকার (ˎবা ˏˎ) একটান বা দুইটান নিয়ে, একার (ে) ঠিক বাঙ্গলার ন্যায় পূর্ব্বভাগে স্থাপিত হয়। এতদ্ভিন্ন পূর্ব্ববর্ণিত পদ্ধতিতে ঐকার যোগ করিতে হইলে মস্তকে রেফ্ এবং বামমুখী শিখা উত্তোলন, ওকারে মস্তকে রেফ ও পাদদেশে 'উ' সংযুক্ত করা গিয়া থাকে। উদাহরণ যথা,—

স্বরসংযোগ।

ক　কা　কি　কু বা কূ　কে　কৈ কো

অনুস্বার, বিসর্গ এবং চন্দ্রবিন্দু—পৃথক্ বর্ণ নহে, হলন্ত বর্ণেরই রূপান্তর মাত্র। বলিতে কি, ইহাদের মধ্যেও তাদৃশ বিধি লম্বিত হয় নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, চাক্মালেখার হলন্ত 'ন্' দ্বারা চন্দ্রবিন্দুর উদ্দেশ্য সংসাধিত হয়। অপর অনুস্বার এবং বিসর্গের নিমিত্ত সংস্কৃতানুকরণে যথাক্রমে (•) একটী এবং (••) দুইটী বিন্দু ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পরন্তু এই বিন্দুগুলি সংযোক্তব্য বর্ণের মস্তকোপরি স্থান পায়। হসন্তচিহ্নও (—) মাত্রার ন্যায়, তবে বর্ণের ঈষদুপরি স্থাপিত হয়। ইহাদিগের ভাষায় ক, ঙ, চ, ঞ, ত, ন, প, ম, য়, র, এবং ল এই কয়েকটী বর্ণে মাত্র হসন্ত প্রয়োগ করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে হসন্তযোগে ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ হইয়া থাকে। যথা,—ক্ (কাক্), ঙ্ (কাঙ্), চ্ (কাচ্), ঞ্ (ঞেই), ত্ (কাৎ), ন্ (কোন্), প্ (কোপ্), ম্ (কাম্), য়্ (কেই), র্ (কার্), ল্ (কাল্) ইত্যাদি। কিন্তু অপর কোন স্বরান্ত ব্যঞ্জনের সহযোগে "ক" ইৎ যায়। বর্ণবিন্যাসের এই অংশ নিতান্ত দুরূহ। কিন্তু সংযুক্তবর্ণ লিখিবার একটি বিশেষ নিয়ম প্রচলিত আছে। ইহা সামান্যরূপ জটিল হইলেও অপরাপর নিয়মের তুলনায় বর্ণবিন্যাসের সরল সঙ্কেত বলিতে হইবে। উপরেই বলা হইয়াছে, বর্গের প্রথম ও পঞ্চমবর্ণে মাত্র হসন্ত-যোগ করিতে পারা যায়। সংযুক্ত বর্ণের যে বর্ণটী নিঃস্বর, তাহা যদি বর্গের প্রথম বা পঞ্চম বর্ণ না হয়, তবে সেইটী যে বর্গের—সে বর্গের প্রথমবর্ণোপরি হসন্ত চিহ্ন দিয়া, পরে উক্ত বর্ণ

হসন্তবিধান।

আকারান্ত করিয়া বসাইতে হয়। উদাহরণস্বরূপ যেমন 'লগ্ন'; চাক্‌মাভাষায়—'লক্‌গন'। অন্ততঃ 'স' তে হসন্তচিহ্ন প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা নাই। যেখানে 'স' কে হলন্ত করিবার প্রয়োজন হয়, তথায় 'চ'—'স' এর অধিকার পায়। যেমন—পুচ্‌প (পুষ্প), উচ্‌ণ (উষ্ণ) ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, ইহাদের মধ্যে রেফের কোন ভিন্ন ব্যবস্থা নাই। রেফ্‌ যুক্ত করিতে হইলে পূর্ব্বভাগে 'র্‌' স্থাপন করিয়া তৎপার্শ্বে বর্ণটী লিখিতে হয়। উচ্চারণের পক্ষে ইহাদের আরও একটি সরলবিধি এই যে, শব্দের অন্ত্য যে ব্যঞ্জন হলন্ত করিয়া উচ্চারিত হয়, লিখিবার সময়ও তাহাতে হসন্তচিহ্ন যুক্ত হইয়া থাকে।

ফলা।

য (য়), র, এবং ব (ওয়া) এই কতিপয় বর্ণ মাত্র 'ফলা' রূপে অপর ব্যঞ্জনের সহিত সংযুক্ত হয়। 'য ফলা'টী (।/) প্রায় বাঙ্গলারই অনুরূপ, বর্ণের পশ্চাতে বসে। 'র ফলা'টী একটু অধিক বক্র বটে, কিন্তু দেখিলেই বাঙ্গলাভাব আসে, এবং তদনুরূপ পাদমূলে বসিয়া থাকে। প্রথমেই বলিয়া আসিয়াছি, ইহাদের স্বতন্ত্র কোন ঋকার নাই। কিন্তু এতক্ষণ যাবত তাহার কার্য্য বুঝাইবার সুবিধা পাইয়াছিলাম না। কোন বর্ণে ঋকার যোগের প্রয়োজন হইলে, তাহাতে র ফলা ও ইকার যোগ করিলে উদ্দেশ্য সম্পাদিত হয়। যথা,—ক্রি (কৃ)। এতভিন্ন 'ব' অর্থাৎ "ওয়াফলা" ও (০) একটী শূন্য মাত্র—বর্ণের পদপ্রান্তে স্থান পায়, উচ্চারণ সেই উত্তরপশ্চিমাঞ্চলেরই মত "ওয়া" অর্থাৎ দোয়ারী (দ্বারী), দোয়ারিকা (দ্বারিকা) ইত্যাদিক্রমে হইয়া থাকে। নিম্নোদ্ধৃত প্রতিলিপি হইতে, আশা করি, মদীয় বক্তব্য সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

গ্রীষ্মকালে রবির কিরণ তীক্ষ্ণ হয়।

সৎপুত্র বংশ উজ্জ্বল করে।

ভাষার মূল এবং গঠনপ্রণালী যথাসম্ভবরূপে প্রদর্শিত হইল। পরিশেষে বাঙ্গলা প্রাকৃত এবং সংস্কৃত ভিন্ন অপরাপর ভাষা হইতে যে যে শব্দ ইহাদিগের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে,

অপরাপর ভাষার শব্দ।

তাহা দেখাইয়াই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। তবে ইহা দ্বারা বিভিন্ন জাতি সমুদয়ের সহিত সংঘর্ষণ পরিমাণ নির্ণয় করিতে গেলে, প্রমাদে পতিত হইতে হইবে মাত্র, কারণ, মগ ত্রিপুরাদি জাতির, যাহাদের সহিত ইহাদিগের বহুকাল ধরিয়া বসবাস চলিতেছে, অতি অল্পসংখ্যক শব্দই চাক্‌মা সমাজে অধিকার পাইয়াছে, সুতরাং প্রচলিত শব্দসংখ্যা লইয়া জাতীয় নৈকট্য পরিমাপ হইতেই পারে না।

মগভাষার শব্দ যথা :—খবং (গব্বং), খিসা (খিজা)।

ত্রিপুরাভাষার শব্দ যথা :—তাগল (তাকুয়াল)।

আরবীভাষার শব্দ যথা :—হাকিম, হুকুম, মুলবী (মৌলবী), মেজবান।

পারসীভাষার শব্দ যথা :—ফৌজদারী, কাছারী, লৌ, জোয়ানবন্দি (জবানবন্দী), ফর্য্যাদি (ফরিয়াদী)।

চীনভাষার শব্দ যথা :—ছাটিন (সাটিন), লেছু (লিচু), চিনি।

মালয়ভাষার শব্দ যথা :—ছাউ (সাগু)।

হিব্রুভাষার শব্দ যথা :—সেতান (সয়তান)।

ইংরাজীভাষার শব্দ যথা :—গোন্নমেণ্ট (গভর্ণমেণ্ট), কমিছনার কমিশনার, জজ, মাইজ্‌স্তেৎ (ম্যাজিষ্ট্রেট), আপিল, নুটিস (নোটিস), গলস (গ্লাস), রেফার (রফর)।

ফরাসীভাষার শব্দ যথা :—ফেঁরাঁই (ফিরিঙ্গি), জিন, বিছ্‌কুট (বিসকিট)।

পর্টুগীজভাষার শব্দ যথা :—বারান্দা (বারেন্দা), ফিতা, বেলা (বেহালা), গের্জা (ইগ্রিজা—আমাদের কথায় গির্জা), পাদারী (পাদ্রী), কাদিরা (কেদেরা), ছাবন (সাবান), আলমারী (আলমিরা)।

দেনমার্ক-দেশীয় ভাষার শব্দ যথা :—বারান্দি (ব্রাণ্ডী), ডেক।

ইতালী-দেশীয় ভাষার শব্দ যথা :—ছোদা (সোডা), কুম্পেনী (কোম্পানী), পিস্তল, লিস্তি (লিষ্ট), বুরুছ্‌ (ব্রুস্‌), কাপ্তান, ইত্যাদি নানা বিজাতীয় শব্দের দ্বারা চাক্‌মাভাষা ক্রমেই পরিপুষ্ট হইতেছে এবং কদর্য্য বাঙ্গলা শব্দগুলিও ক্রমে সংস্কৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। মূল শব্দের সন্ধান পাওয়া গেলে অপভ্রষ্টার নির্ব্বাসন স্বাভাবিক। অধুনা ইহাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহিত কথোপকথনে তাদৃশ কোন শব্দবিকৃতি সহজে ধরিতে পারা যায় না। আশা করা যায় শিক্ষার প্রভূত বিস্তার হইলে বাঙ্গালা ও চাক্‌মাভাষায় উপলব্ধি করিবার উপযোগী কোন তারতম্য থাকিবে না। বারান্তরে ইহাদের কবি ও কবিতা—বারমাস—ছড়া—হেঁয়ালী লইয়া আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ।

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা

আমার বক্তব্য বিষয় সামান্ত হইলেও বিষয়ের গুরুত্ব নিতান্ত অল্প নহে। সাহিত্য-পরিষদ্, মৃত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের প্রস্তাব অনুসারে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রণয়নের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, (১) এবং এপর্য্যন্ত পরিষৎ-পত্রিকাতে এ সম্বন্ধে কতিপয় প্রবন্ধও প্রকাশিত হইয়াছে ; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, পরিষদের এ বিষয় চেষ্টাতে এ পর্য্যন্ত আশানুরূপ ফললাভ হয় নাই। ভৌগোলিক, রাসায়নিক, জ্যোতিষিক কতকগুলি শব্দের পরিভাষা সঙ্কলিত হইয়াছে মাত্র ; কিন্তু জনসাধারণ এই সমস্ত শব্দ-সম্বন্ধে বিশেষ কোনও খোঁজ খবর রাখেন না এবং এই সমস্ত শব্দের প্রচলনের জন্ত বিশেষ কোন চেষ্টা হইতেছে বলিয়া বোধ হয় না। এই বৎসরের প্রারম্ভে পরিভাষা-সমিতি, ভাষাবিজ্ঞান-সমিতি ও শব্দ-সমিতি এই তিনটী সমিতিকে একত্র করিয়া ভাষাবিজ্ঞান-সমিতিতে পরিণত করা হইয়াছে এবং আশা আছে যে এই নব গঠিত সমিতিদ্বারা পরিভাষা-প্রচলন-সম্বন্ধে সাহায্য হইবে।

পরিষৎ এ পর্য্যন্ত অনেকগুলি নূতন পারিভাষিক শব্দের সৃষ্টি করিয়াছেন ; কিন্তু আমার যতদূর জানা আছে তাহাতে এই শব্দ প্রণয়নসম্বন্ধে কোন বিশেষ মূল নিয়ম স্থিরীকৃত হয় নাই এবং এই হেতু বোধ হয় আমাদের প্রণীত শব্দগুলি অনেক সময়ে ঠিক হইতেছে না এবং এ বিষয়ে যাহাদের কোন কার্য্য করার ইচ্ছা আছে তাহারাও বিশেষ কোন নিয়মের অভাবে কার্য্য করিতে উৎসাহ ও সাহস পাইতেছে না। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় তাঁহার রাসায়নিক পরিভাষার প্রবন্ধে চারিটী সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন (২) কিন্তু প্রত্যেক পরিভাষাকার নিজ নিজ স্বতন্ত্র মতানুসারে কাজ করিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস হয়। পরিষদের বয়ঃক্রম ১৩ বৎসর পূর্ণ হইতে চলিল, এখন ক্রমশঃ পরিষৎকে বাঙ্গালা ভাষার অধিনেতার পদ গ্রহণ করিবার জন্ত উৎসাহ ও সতর্কতার সহিত স্বীয় কার্য্য-প্রণালী স্থির করিতে হইবে। যদি দেশীয় প্রায় সমস্ত সাহিত্যসেবী পরিষদের সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে পরিষদের গৃহীত নিয়ম ও শব্দ দেশে কেন গৃহীত হইবে না তাহা আমি বুঝিতে পারি না।

সাধারণ ভাবে দেখিতে গেলে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা চতুর্ব্বিধ উপায়ে সঙ্কলিত হইতে পারে। প্রথমতঃ আমাদের দেশে প্রচলিত উপযুক্ত শব্দ-গ্রহণ ; দ্বিতীয়তঃ নূতন শব্দ-প্রণয়ন ; তৃতীয়তঃ অন্তান্ত দেশীয় বৈজ্ঞানিক শব্দ স্থানবিশেষে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিতভাবে গ্রহণ ও চতুর্থতঃ অন্তান্ত সমস্ত জাতি যে সমস্ত শব্দ বা সাঙ্কেতিক চিহ্ন কোন এক বিশেষ অর্থে ব্যবহার করে তৎসমুদয় কোনস্থলে কেবলমাত্র অক্ষরান্তরিতভাবে গ্রহণ ও কোন বিশেষ স্থানে অক্ষরান্তরিত না করিয়া গ্রহণ।

---

(১) সা-প-প ১।১ (পৃঃ ৫৭) (২) সা-প-প ২।২ (পৃঃ ১৩১)

কলিকাতা মেডিকেল কলেজে যাহারা বাঙ্গালা ভাষাতে অধ্যয়ন করিত, তাহাদের জন্য কি প্রণালীতে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করিতে হইবে, তাহা নির্দ্ধারণের জন্য বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট ১৮৭১ খৃঃ অব্দে একটী সমিতি গঠন করেন ও সেই সমিতির বিচারার্থ ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র একটী ক্ষুদ্র গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন। এই গ্রন্থ ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত হয়[৩]। ১৩০২ সালের প্রকাশিত সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকাতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এই গ্রন্থ উল্লেখ করেন[৪] ডাক্তার মিত্র পরিভাষার সঙ্কলন-সম্বন্ধে কতকগুলি মূল নিয়ম প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই নিয়মগুলি ও পরিভাষা-সম্বন্ধে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী আলোচনা, বর্ত্তমান প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

এ কথা ঠিক যে পৃথিবীর যাবতীয় ভাষার একতা সাধিত হইলে বিজ্ঞান আলোচনার যথেষ্ট সুবিধা হয়, কিন্তু কেবল বিজ্ঞানচর্চ্চাই জীবনের সার উদ্দেশ্য নহে। ভৌগোলিক ও শারীরিক যে সমস্ত কারণে ভাষার পার্থক্য লক্ষিত হয়, বিজ্ঞানের খাতিরে তাহা দূরে পলায়ন করিবে না। ইংলণ্ড, ফরাসী ও জর্ম্মান দেশীয় বৈজ্ঞানিক পরিভাষাতে সাদৃশ্যের প্রধান কারণ এই যে, এই সমস্ত পরিভাষা সাধারণতঃ গ্রীক ও লাটিন ভাষা হইতে সংগৃহীত। কিন্তু উদ্ভিদ্ ও প্রাণি-সমূহের দ্বিনাম সংজ্ঞা ও অন্য কতিপয় শব্দ ব্যতিরেকে অপর বিষয়ে যথেষ্ট প্রভেদ লক্ষিত হয়। আমাদের ভাষা গ্রীক ও লাটিন ভাষামূলক নহে, সুতরাং আমাদের প্রচলিত পরিভাষা পৃথক্ ও স্বাভাবিক।

অন্য দেশীয় বৈজ্ঞানিক শব্দ-গ্রহণ-সম্বন্ধে একটী প্রশ্ন প্রথমে মনে উদয় হয়। অন্য দেশীয় শব্দ গ্রহণ করিলে আমরা কোন্ দেশীয় শব্দ গ্রহণ করিব। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র এক শ্রেণীর শব্দকে 'Scientific Crude names' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। তিনি এই সমস্ত শব্দ অক্ষরান্তরিতভাবে ব্যবহার করার পক্ষপাতী ছিলেন। এই সমস্ত শব্দের মধ্যে কতকগুলি শব্দ ভিন্ন ভিন্ন দেশে সাধারণ ভাবে এক হইলেও তাহাদের মধ্যে বর্ণ-বিন্যাস-গত ও উচ্চারণ-গত পার্থক্য লক্ষিত হয়। যথা —

English	*German*	*French*
Quartz	Quarz	Quartz
Calcspar	Kalkspath	Calcite
Granite	Granit	Granát
Orthoclase	Orthoklas	Orthoclase.

ডাক্তার মিত্রের 'Scientific Crude names' এর মধ্যে কেবল মাত্র উচ্চারণগত পার্থক্য দৃষ্ট হয় না এবং অনেক সময়ে ভিন্ন দেশে ভিন্ন শব্দ পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হয়। যথা—

(৩) A Scheme for the rendering of European scientific term into the Vernacular of India by Rajendra Lal Mitra, L. L. D.

(৪) সা-প-প ২।২ (পৃঃ ১২৬)

English	German	English	German
Niccolite	Rothnickelkies	Pyrrholite	Magnetkies
Tetrahedrite	Fahlerz	Siderite	Eisenopath
Galena	Bleiglanz.		

এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। যে সমস্ত শব্দ আমরা ভিন্ন দেশ হইতে গ্রহণ করিব, তাহাদিগকে কোন্ দেশীয় শব্দ হইতে গ্রহণ করিব তাহা সর্ব্বাগ্রে স্থির করা কর্ত্তব্য। ইংরাজ আমাদের রাজা বলিয়াই যে ইংরাজি কোন শব্দের উচ্চারণগত অসুবিধা থাকিলেও আমরা অন্যদেশীয় ও অপেক্ষাকৃত সহজ উচ্চার্য্য শব্দ গ্রহণ করিব না, ইহা হইতে পারে না। ভিন্ন কোন্ দেশীয় কোন্ শব্দ উচ্চারণ করিতে আমাদের পক্ষে সুবিধা হইবে তাহা স্থির করিয়া বিদেশীয় শব্দ গ্রহণ করা উচিত। ডাঃ মিত্রের গ্রন্থ-পাঠে বোধ হয় তিনি এই সমস্ত নামের পরিবর্ত্তে ইংরাজি ভাষায় প্রচলিত শব্দগ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। আবার সমস্ত Scientific Crude নামেরই যে কেবলমাত্র অক্ষরান্তরই আবশ্যক এমত বোধ হয় না। দৃষ্টান্ত স্থলে Oxygen শব্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই শব্দটী ডাঃ মিত্রের মতে অক্ষরান্তরিত করিয়া ব্যবহার করা উচিত—কিন্তু এই সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে।[৫] Topaz, emerald প্রভৃতি শব্দের পরিভাষার জন্য পরের দ্বারস্থ হওয়ার আমাদের আবশ্যকতা নাই।

উদ্ভিদ্-বিদ্যাতে দ্বিনাম সংজ্ঞা প্রচলিত হওয়ার পর প্রাণী বিদ্যাতে এই নামকরণ-প্রথা প্রচলিত হয়। কিন্তু এই প্রথা প্রচলিত হইলে পরও কিছুকাল ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন দ্বিনাম প্রচলিত ছিল। ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত Deshayes কৃত Description descoquilles fossiles des environas de Paris' নামক গ্রন্থে দেখা যায় যে ফরাসি ভাষায় প্রচলিত অনেক দ্বিনাম সংজ্ঞা লাটিন ভাষাতে অনূদিত হইয়াছে। যথা—

Clavegella de Brongniart...Clavagella Brongniarti
Anitre dontense...[illegible]ea ambiqua
Téréoraluta a' den[illegible]uis...Ter besenuata
Pleurotoma a' gra[illegible]levre...Pleurotoma labriata
Bucorde demi st[illegible]Cardium Semistriatum.

ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে সমস্ত বৈজ্ঞানিক দ্বিনামের অনুবাদের কোন আবশ্যকতা নাই। বাঙ্গালা অক্ষরে এই সমস্ত শব্দ অক্ষরান্তরিত করাই যথেষ্ট। ডাঃ মিত্রের এই সিদ্ধান্ত

(৫) রামেন্দ্র বাবু বলেন যে "প্রাণধারণের জন্য Oxygen আবশ্যক। এই জন্য ৺ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র উহাকে 'প্রাণপদ' বায়ু অভিধান দিয়াছিলেন।" (সা-প-প-২।২ পৃঃ ১৫২) কিন্তু রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থে দেখিলাম লেখা আছে যে—'The third class will include such words as......in Chemistry the names of elementary substances......Thus *oxygen* being taken as the crude term, I would have *oxygenta* or the adjective and indicate the number of its atoms in a compound by vernacular numerals ek, du, tri. etc. [পৃঃ ২২-২৩]

অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। সমস্ত সভ্য দেশেই এক দ্বিনাম সংজ্ঞা প্রচলিত। ভাষার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা অত্যন্ত আবশ্যকীয় হইলেও সেই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে যাইয়া যাহাতে বিজ্ঞানালোচনার পক্ষে অন্তরায় উপস্থিত না হয় তাহা দেখা কর্ত্তব্য। প্রাণিতত্ত্ব-পুস্তকে হস্তী শব্দের পরিবর্ত্তে Elephas indicus আমাদিগের লেখা উচিত, নহিলে আমরা বৈজ্ঞানিক জগৎ হইতে বহুদূরে পড়িয়া থাকিব ও আমাদিগের দেশে বিজ্ঞানালোচনা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। প্রথমতঃ আমরা দেখিতেছি যে এই দ্বিনাম সংজ্ঞা গ্রহণ না করিলে যথার্থ বিজ্ঞানালোচনা হইবে না। যদি বট, অশ্বত্থ, পাকুড়, ডুমুর, যজ্ঞডুমুর ও রবারের পরিবর্ত্তে আমরা যথাক্রমে Ficus bengalensis, F. religiosa, F. infectoria, F. hispida, F. glomsata ও F. elastica লিখি, তাহা হইলে এই সমস্ত বৃক্ষের পরস্পরের সম্বন্ধ যত সহজে বোধগম্য হইতে পারে তত সহজে আর কিছুতে হইতে পারে না। সুতরাং এ সমস্ত দ্বিনাম সংজ্ঞা কেবলমাত্র অক্ষরান্তরিত করাই যথেষ্ট।

প্রায় ১২ বৎসর গত হইল, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় অনেকগুলি রাসায়নিক পরিভাষা সঙ্কলন করিয়াছেন।* তিনি অনেক মৌলিক পদার্থের নূতন নাম-করণ করিয়াছেন ও সম্পূর্ণ নূতন রাসায়নিক চিহ্ন ব্যবহার করিয়াছেন। রামেন্দ্র বাবুর এই প্রবন্ধ লইয়া কয়েক দিন বাগ্‌বিতণ্ডা চলিয়াছিল। (বাগ্‌বিতণ্ডার সময় বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখক সদ্যঃ কলেজ-পাঠাধিকারপ্রাপ্ত ছাত্রমাত্র। কিন্তু মনে পড়ে যে সে সময়ে রামেন্দ্র বাবুর প্রবর্ত্তিত 'দগ্ধহরিণ' ও ডাক্তার রায়ের 'roast venison' প্রসঙ্গ লইয়া সমপাঠীদের সহিত অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল)। কিন্তু আমার যতদূর জানা আছে, তাহাতে বোধ হয় কোন এক সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত স্থির হয় নাই। ইহা অতি দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। যাহাতে এ প্রসঙ্গে পুনরায় আলোচনা আরম্ভ হয় ও আমরা একটী কার্য্যকর স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি, তদ্বিষয়ে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। রসায়ন শাস্ত্রে মৌলিক পদার্থের কতকগুলি সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। রামেন্দ্র বাবু লৌহের সাঙ্কেতিক চিহ্ন 'ল' বলিয়াছেন ; কিন্তু আমাদের যেন বোধ হয় 'ল' না বলিয়া Fe বিলক্ষণ যুক্তিযুক্ত। বিভিন্ন ভাষাতে লিখিত রসায়নশাস্ত্রে ব্যবহৃত সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলির ঐক্য রাখাই এই অভি-মতের প্রধান কারণ। 'Fe' বাঙ্গালায় লেখা হইবে কি ইংরাজিতে লেখা হইবে, ইহা একটী আলোচ্য বিষয়। বাঙ্গালায় এই সাঙ্কেতিক চিহ্ন লিখিত হইলে কিঞ্চিৎ অসুবিধা আছে। ইংরাজি প্রভৃতি ভাষাতে দুই প্রকারের অক্ষর আছে—বাঙ্গালাতে সেরূপ নাই, তাহাতেই এই অসুবিধা। যথা :—

ফস্ফরাস্ বা স্ফুরক=পি

বোরণ বা বোরক=বি

এখন পি বি=সীসক না ফস্ফরাস্, বোরণ না স্ফুরক বোধক ?

দহক = ও

গন্ধক = এচ্

এখন ও এচ্ = দহক গন্ধক না অম্লিয়াম বা অম্লক ?

এ প্রশ্নের দুইটী মীমাংসা হইতে পারে :—(১) এই সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলি বাঙ্গালা ভাষাতে না লিখিয়া ইংরাজি ভাষাতে লেখা ও (২) বাঙ্গালা ভাষাতে বড় ও ছোট দুই প্রকার অক্ষরে লেখা। বাঙ্গালা ভাষাতে দুই প্রকার অক্ষরে লেখার বিরুদ্ধে প্রথম আপত্তি এই যে মুদ্রাকরের অনুগ্রহে অনেক সময়ে অর্থের ঢের গোলমাল হইতে পারে ও দ্বিতীয় আপত্তি এই যে অনেক সময়ে সঙ্কেতগুলি মূল-শব্দ অপেক্ষা বৃহদাকার ধারণ করিবে। সুতরাং আমার বোধ হয় যে সঙ্কেতগুলি রোমান অক্ষরে লেখাই যুক্তিসঙ্গত। ইংরাজি ভাষাতেও দেখা যায় যে উচ্চ-গণিত এবং জ্যোতিষ-সম্বন্ধীয় পুস্তকাদিতে এখনও বিশেষ বিশেষ অর্থে গ্রীক অক্ষর ব্যবহৃত হয়। সুতরাং বাঙ্গালা ভাষাতে লিখিত রাসায়নিক পুস্তকে বিশেষ কোন সাঙ্কেতিক চিহ্নরূপে রোমান অক্ষর প্রচলনে কোনও আপত্তির কারণ হইতে পারে বলিয়া বোধ হয় না।

ডাঃ মিত্রের মতে যন্ত্রাদির নাম কেবলমাত্র অক্ষরান্তরিত করা উচিত। তিনি এ মতের বিশেষ কোন কারণ দেখান নাই এবং এই ৩০ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষাতে অনেক বৈজ্ঞানিক যন্ত্র প্রভৃতির নামকরণ হইয়াছে। সুতরাং ডাঃ মিত্রের যন্ত্রঘটিত মতের আলোচনা অনাবশ্যক।

নূতন শব্দ প্রণয়ন ও প্রচলিত শব্দ-গ্রহণ-সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিতে চাই। এ পর্য্যন্ত আমাদের দেশে অনেক নূতন শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। নূতন শব্দ প্রণয়নের প্রলোভন কিঞ্চিৎ পরিত্যাগ করিয়া আমাদের কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া উচিত। আমাদের দেশে সংস্কৃত ভাষাতে লিখিত গ্রন্থাদিতে অনেক পারিভাষিক শব্দ আছে। কিন্তু যাঁহারা পরিভাষা প্রস্তুত করেন তাঁহারা অনেকেই এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ নন। Adventitious ও aerial শব্দের পরিবর্ত্তে আস্থানিক ও বায়ব্য শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। অথচ অনায়াসে এই দুইটী নূতন ও কিঞ্চিদদ্ভুত শব্দের পরিবর্ত্তে সিকা ও অবরোহ এই দুইটী প্রাচীন শব্দ বোধ হয় ব্যবহার করা যাইতে পারিত[৭]। সুতরাং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত এবং সংস্কৃত ভাষাতে বিশেষ অভিজ্ঞ এই দুই জনের সমবেত চেষ্টাতে পরিভাষাপ্রণয়ন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে বলিয়া বিশ্বাস। আমাদের দেশে প্রচলিত গ্রাম্য শব্দসমূহের সঙ্কলনও পরিভাষা-প্রণয়নের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এই বিষয়ে পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া-ছিলেন[৮]। নদীবহুল স্থান হইতে নদী সম্বন্ধীয়, পর্ব্বতময় স্থান হইতে পর্ব্বত ও প্রস্তর সম্বন্ধীয়, সমুদ্রকূলবর্ত্তী স্থান হইতে সমুদ্র সম্বন্ধীয়, ধীবরগণের নিকট হইতে মৎস্য সম্বন্ধীয় প্রভৃতি শব্দ সংগ্রহ করা ও উপযুক্ত বোধ হইলে সেই সমস্ত শব্দ পরিমার্জ্জিত ভাবে গ্রহণ করা উচিত।

(৭) সা-প-প-১১।১ (পৃঃ ২৪)।

(৮) সা-প-প-৭।৩ (পৃঃ ১৭০)।

এই প্রসঙ্গে আর একটী কথার অবতারণা করিতে চাই। ভারতে সার্ব্বজনীন ভাষা ও লিপি প্রচারের জন্য কেহ কেহ চেষ্টা করিতেছেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের ভাষাসমূহ সংস্কৃত-মূলক এবং সেই হেতু ইহাদের মধ্যে অল্প বিস্তর সাদৃশ্য বিদ্যমান আছে। পরিভাষা সম্বন্ধীয় যে সকল নূতন শব্দ প্রচলিত হইয়াছে ও হইতেছে তাহাদের যতদূর সম্ভব সংস্কৃতমূলক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে দেশীয় ভাষা প্রচলনের জন্য চেষ্টা করা হইতেছে এবং বোধ হয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নিয়মাবলী প্রাদেশিক ভাষা প্রচারের যথেষ্ট সহায়তা করিবে। প্রাদেশিক প্রত্যেক ভাষাতে বৈজ্ঞানিক পারিভাষিক শব্দ নূতন করিয়া গঠন করিতে হইবে। এই সময়ে আমাদের বিশেষভাবে দেখা উচিত যে এই বিভিন্ন প্রদেশের প্রচলিত বৈজ্ঞানিক শব্দগুলিকে আমরা এক করিতে পারি কিনা। পরিভাষা-প্রণয়নে সাহিত্য-পরিষদের এইটী লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করা উচিত ও তজ্জন্য অন্যান্য প্রাদেশিক পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত কথাবার্ত্তা চালান উচিত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এ পর্য্যন্ত সাহিত্য-পরিষৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত পারিভাষিক শব্দগুলি যথোপযুক্ত প্রচারিত হয় নাই। সাহিত্য পরিষদের গৃহীত শব্দগুলি একত্র মুদ্রিত করিয়া প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ও অন্যান্য স্থানে প্রেরণ করা উচিত। আজকাল ইংরাজি বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীতে বঙ্গভাষাতে লিখিত ছোট ছোট বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ অধীত হয়। নর্ম্মাল বিদ্যালয় সমূহেও বাঙ্গালা ভাষাতে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে। যাহাতে পরিষদের শব্দগুলি এই সমস্ত বিদ্যালয়ে প্রচলিত হয় তদ্বিষয়ে আবশ্যক হইলে গভর্ণমেণ্টের সাহায্য গ্রহণ করা উচিত।

আর কতিপয় দিবস পরে পরিষৎ নূতন বৎসরে পদার্পণ করিবেন। আশা করি পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষগণ আমার এই কয়েকটী কথা যথোপযুক্ত বিচার করিবেন এবং পরিষদের অভিজ্ঞ বহুদর্শী সভ্যগণের মত গ্রহণ করিয়া পরিভাষা সঙ্কলন সম্বন্ধে কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট নিয়ম গঠন করিবেন। এই নির্দ্দিষ্ট নিয়ম গঠিত হইলে পরে বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখার উপভাষা প্রণয়নের ভার অন্ততঃ ২ জন উপযুক্ত সভ্যের উপর ন্যস্ত করা উচিত। ইহাঁদের ১ জনের পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানে ও অপর ১ জনের সংস্কৃত ভাষাতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকা বাঞ্ছনীয়। এই সমস্ত সভ্যগণ সংস্কৃত ভাষা হইতে শব্দ সঙ্কলন করিবেন, দেশে প্রচারিত গ্রাম্য কথা যথাসম্ভব পরিমার্জ্জিত করিয়া গ্রহণ করিবেন ও বিভিন্ন প্রদেশের পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত পরামর্শ করিয়া সমস্ত ভারত-বর্ষে বৈজ্ঞানিক পরিভাষার একতা স্থাপন করিতে চেষ্টা কবিবেন। এই ভাবে বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখার পরিভাষা প্রস্তুত হইলে পর গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের সাহায্যে এই পরিভাষা প্রচারের জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করিবেন। পরিষৎ সমীপে আমার এই প্রার্থনা।

শ্রীহেমচন্দ্র দাস গুপ্ত।

কায়স্থ চাকাদাস, টঙ্গদাস ও ভুবনাকর শর্ম্মা

১৯০৩—০৪ খৃষ্টাব্দের তিব্বত-যুদ্ধের সময়ে গাংচি বিহার হইতে যে সকল উপাদেয় গ্রন্থ কলিকাতায় আনীত হইয়াছিল, উহাদের মধ্যে ত্যাংগ্যুর অন্যতম। ঐ সুবিপুল ত্যাংগ্যুর গ্রন্থের কয়েক খণ্ড আমি ইণ্ডিয়া গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে কিয়ৎকালের জন্য ধার করি। ঐ গ্রন্থের "দো" পরিচ্ছেদের "লে" খণ্ডে কায়স্থ চাকাদাস কৃত সম্বন্ধোদ্দেশ নামক এক খানি সংস্কৃত ব্যাকরণের তিব্বতীয় অনুবাদ লিপিবদ্ধ আছে। "লে" খণ্ডের ৮৩ পত্র হইতে ৮৬ পত্র পর্য্যন্ত ৪ পত্র বা ৮ পৃষ্ঠা সম্বন্ধোদ্দেশ গ্রন্থদ্বারা অধিকৃত। এই ৮ পৃষ্ঠা আমাদের মুদ্রিত পুস্তকের অনুমান ৩৬ পৃষ্ঠা হইবে। ইহাতে তিঙন্ত প্রক্রিয়া বিশেষ ভাবে বিবৃত আছে। সম্বন্ধোদ্দেশ গ্রন্থ চন্দ্রব্যাকরণের মতানুযায়ী।

গ্রন্থকার চাকাদাস বৌদ্ধ ছিলেন। তিনি গ্রন্থের প্রারম্ভে বুদ্ধকে নমস্কার করিয়াছেন। তাঁহার মঙ্গলাচরণ শ্লোকের তিব্বতীয় অনুবাদ এইরূপ :—

গঙ্-গি ফরোল্ জিন্-প-জোগ্।
গঙ্-সুঙ্ ডো-ল ভোন্-পর্ জে।
দে বর্ শেগ্-প চা-বা-চ্যে
ক্যোব্-প দে-ল ছগ্-ছুল্-লো॥ (ত্যাংগ্যুর, দো, লে, পঃ ৮৩)॥

"যিনি পারমিতাসমূহ সম্পন্ন করিয়াছেন, যাঁহার বচন জগৎকে শিক্ষা দিয়াছে, যিনি সুগত নামে খ্যাত, সেই ত্রাতাকে আমি নমস্কার করি"।

অনুবাদ গ্রন্থের শেষভাগে এইরূপ লিখিত আছে—

"কায়স্থ চাকাদাস কৃত সম্বন্ধোদ্দেশ গ্রন্থ পরিসমাপ্ত হইল। দ্বিভাষি-শ্রেষ্ঠ শোঙ্-তোন্-দো-র্জে-গ্যল-ছেন্ প্রদত্ত ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করিয়া পাল্-দেন্-লো-ডোই-তেন্-প, কল্যাণ মিত্র, তোগ্-শিঙ্-পোন্-পো ও দে-ওয়া-ছোই-ক্যি-জঙ্-পো প্রভৃতি শাব্দিক ইহা তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত ও প্রকাশিত করিলেন।"

সুবিখ্যাত শোঙ্-তোন্-দো র্জে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক। অতএব সম্বন্ধোদ্দেশ গ্রন্থ বর্ত্তমান সময় হইতে সাতশত বৎসর পূর্ব্বে তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল।

চাকাদাস স্বয়ং কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন তাহা নিশ্চিত জানা যায় নাই। অনুমান খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর প্রারম্ভে তিনি জীবিত ছিলেন।

তিব্বতীয় পাগ্-সাম্ জোন্-জাঙ্ নামক গ্রন্থে (১৪৪পৃঃ) টঙ্গদাস নামক এক কায়স্থ বৃদ্ধের উল্লেখ আছে। ইনি রাজা ধর্ম্মপালের লেখক ছিলেন। ধর্ম্মপাল ৮৭৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ৮৯৫

খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন, সুতরাং টঙ্গদাস খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর শেষ ভাগে বিদ্যমান ছিলেন।

বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরীতে এক খানি বোধিচর্য্যাবতারটীকার নেওয়ারী হস্তলিপি আছে। উহার লেখক (copyist) কায়স্থ ভুবনাকর শর্ম্মা।

মূল বোধিচর্য্যাবতার বা বোধিচর্য্যানির্দ্দেশ গ্রন্থ শান্তিদেবের বিরচিত। উহা ৬৩১ খৃঃ চীন ভাষায় অনুবাদিত হয়। তদনন্তর ১০৭৮ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত ভিক্ষু প্রজ্ঞাকরপাদ বোধিচর্য্যা-বতার গ্রন্থের একখানি টীকা প্রস্তুত করেন।

প্রতিলিপিকারক কায়স্থ ভুবনাকর শর্ম্মা লিখিয়াছেন :—

"অষ্টা নবতি সংযুক্তে শতে সরতি বৎসরে। কৃষ্ণে শ্রাবণপঞ্চম্যাং বাসরে কুজসাহ্বয়ে॥
শ্রীমচ্ছঙ্করদেবস্য রাজ্যে বিজয়শালিনঃ। বোধিচর্য্যাবতারাখ্যটীকামলিখদিতি শ্রুতম্॥
শ্রীললিতপুরে রম্যে শ্রীমানেশ্বরসংজ্ঞকে। যঃ শ্রীরাঘব নাম্নোঽস্য বিহারে সুগতালয়ে॥
ধন্যঃ স্থবিরভিক্ষোঽস্য বুদ্ধচন্দ্রস্য পুস্তকম্। তৎপুণ্যাদ্ বোধিসত্ত্বত্বং লভতে পরমং পদম্॥
বিসৃজন্তু সলিলং ঘনা যথেষ্টং ভবতু মহী বহুশস্যসংপ্রযুক্তা।
অবতু নরপতিঃ প্রজাবিনম্রা ভবতু নরপতেঃ সুখাতিবৃদ্ধিঃ॥
কায়স্থভুবনাকরশর্ম্মণা লিখিতমিতি॥"

১৯৮ সংবৎসরে (অর্থাৎ ১০৭৮ খৃষ্টাব্দে) শ্রাবণ মাসে কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে মঙ্গলবারে বিজয়শালী শ্রীমৎ শঙ্কর দেবের রাজ্যে বোধিচর্য্যাবতার টীকা লিখিত হইয়াছিল, ইহা শুনা যায়। রমণীয় ললিতপুরে (নেপালের প্রাচীন প্রসিদ্ধ নগর ললিতপত্তনে) শ্রীমানেশ্বর নামক বিহারে যেখানে সুগতের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে—শ্রীরাঘব নামধেয় যে স্থবির ভিক্ষু বিদ্যমান আছেন সেই বুদ্ধচন্দ্রের এই পুস্তক। এই পুস্তক রক্ষার পুণ্যে তিনি পরমপদ বোধিসত্ত্ব লাভ করেন।

মেঘসমূহ যথেষ্ট জলবর্ষণ করুক, পৃথিবী বহুশস্যশালিনী হউক, বিনম্র প্রজাগণকে রাজা রক্ষা করুন, এবং রাজার সুখ অতিশয় বর্দ্ধিত হউক। কায়স্থ ভুবনাকর শর্ম্মাকর্তৃক লিখিত ইতি॥

উপরে আমরা তিনজন কায়স্থের উল্লেখ পাইয়াছি—কায়স্থ চাকাদাস, কায়স্থ টঙ্গদাস ও কায়স্থ ভুবনাকর শর্ম্মা। এই তিন স্থলে "কায়স্থ" শব্দ জাতিবাচক কিনা নিশ্চিত বলা যায় না। টঙ্গদাস সম্ভবতঃ জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। তিব্বতীয় গ্রন্থে তাঁহাকে কায়স্থ বলা হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে কায়স্থ শব্দের অর্থও প্রদত্ত হইয়াছে। তিব্বতীয় গ্রন্থকার "কায়স্থ" শব্দের অর্থ করিয়াছেন "য়িগ্-খেন" অর্থাৎ লিপিকুশল বা লেখক। চাকাদাসকে তাংগ্যুর গ্রন্থে কায়স্থ বলা হইয়াছে, কিন্তু কায়স্থ শব্দের অর্থ প্রদত্ত হয় নাই।

ভুবনাকর শর্ম্মাকে কায়স্থ বলা হইয়াছে দেখিয়া বোধ হয় কায়স্থ শব্দ ঐ স্থলে গুণবাচক বা ব্যবসাবাচক, কিন্তু জাতিবাচক নহে। রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে কায়স্থ শব্দ কর্ম্মচারী বা লেখক অর্থে বহুবার ব্যবহৃত হইয়াছে। রাজতরঙ্গিণী ২:৮৩ শ্লোকের অনুবাদ ডাক্তার ষ্টাইন্ এই-রূপ করিয়াছেন :—

"About that time there died by strangulation that rogue of an official (Kayastha), the Brahman Sivaratha who had been a great intriguer"—Rajatarngini, Sect. VIII. 2383.

বস্তুতঃ ভুবনাকর নামের পরে "শর্ম্মা" উপাধি দেখিয়া বোধ হয় তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন।*

যম বলিয়াছেন :—

"শর্ম্মা দেবশ্চ বিপ্রস্য বর্ম্মত্রাতা চ ভূভুজঃ।
ভূতির্দত্তশ্চ বৈশ্যস্য দাসঃ শূদ্রস্য কারয়েৎ॥" (যম-বচনাৎ)

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

* শ্রদ্ধাস্পদ মহামহোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ মহাশয় কায়স্থভুবনাকর শর্ম্মাকে লক্ষ্য করিয়া মনে করেন যে ব্রাহ্মণেরও কায়স্থবৃত্তি ছিল। তাঁহার মত সমর্থনের জন্য তিনি ষ্টাইন সাহেবের রাজতরঙ্গিণীর অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। বাস্তবিক উক্ত ইংরাজী অনুবাদ পাঠ করিলে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের যুক্তিই সমর্থন করিতে হয়। কিন্তু রাজতরঙ্গিণীর মূল শ্লোক পাঠ করিলে আমরা ষ্টাইন সাহেবের অনুবাদের কখনই সমর্থন করিতে পারিব না। মূল শ্লোকটী এই—

"তদন্তরং শিবরথো দ্বিজঃ প্রচুরচাক্রিকঃ।
কায়স্থপাশঃ পাশেন গলং বদ্ধা ব্যপদ্যত॥" (৮।২৩৮৩)

এখানে শিবরথ 'দ্বিজ' ও 'কায়স্থপাশ' অর্থাৎ কায়স্থাধম বলিয়া অভিহিত। উক্ত শ্লোকের এইরূপ অনুবাদ হইতে পারে—তৎপরে প্রচুরচাক্রিক (বহু ষড়যন্ত্রী) দ্বিজ কায়স্থাধম শিবরথকে গলায় রজ্জু বাঁধিয়া নিহত করা হইয়াছিল।

ষ্টাইন্ সাহেব "কায়স্থপাশ" শব্দের Rogue of an official অর্থ অর্থাৎ কায়স্থের অর্থ Official করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা আদ্যোপান্ত রাজতরঙ্গিণী পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই দেখিতে পাইবেন যে, রাজতরঙ্গিণীর সর্ব্বত্রই কায়স্থ শব্দ জাতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কাশ্মীরের সকল রাজকীয় উচ্চ পদেই এই জাতীয় লোক নিযুক্ত হইত। উক্ত শ্লোকে শিবরথ 'দ্বিজ' বলিয়া গণ্য। সকলেই জানেন যে 'দ্বিজ' বলিলে কেবল ব্রাহ্মণকে বুঝায় না; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতিকেই বুঝাইয়া থাকে। কাশ্মীরে পূর্ব্বাপর এই তিন জাতিরই বাস, অদ্যাপি তথায় এই তিন জাতিই দ্বিজ বলিয়া পরিচিত। 'শূদ্রপাশ' বলিলে যেমন শূদ্রাধম বুঝায়, সেইরূপ উক্ত শ্লোকে 'কায়স্থপাশ' শব্দ দ্বারা কায়স্থজাতির মধ্যে অধম অর্থই সূচিত হইতেছে।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় মূল শ্লোক না দেখিয়া অনুবাদের উপর নির্ভর করাতেই বোধ হয় এরূপ ঘটিয়াছে। যাহা হউক, তিনি কায়স্থ ভুবনাকর শর্ম্মার 'শর্ম্মা' উপাধি দেখিয়া তাঁহাকে ব্রাহ্মণ ঠাহরাইয়াছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক যুগে যে ব্রাহ্মণের 'দাস' উপাধি ও কায়স্থজাতির 'শর্ম্মা' উপাধি ছিল, তাহা বোধ হয় তাঁহার জানা নাই। এই বঙ্গদেশেই বাহাত্তর ঘর কায়স্থের মধ্যে পূর্ব্বাপর শর্ম্মা উপাধি প্রচলিত রহিয়াছে। বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকাই তাহার প্রমাণ। ভারতের নানা স্থানে পূর্ব্বাপর ব্রাহ্মণের "দাস" উপাধি দেখা যায়। এই দাস উপাধি দেখিয়া যেমন ব্রাহ্মণকে আমরা শূদ্র বলিতে পারি না, সেইরূপ 'শর্ম্মা' উপাধি দেখিলেই কায়স্থ যে ব্রাহ্মণ হইবেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে। কায়স্থবৃত্তি ব্রাহ্মণের পক্ষে শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও পাতিত্যজনক, তাহা বোধ হয় বিদ্যাভূষণ মহাশয় অবশ্যই স্বীকার করিবেন।—সা০ প০ প০-সম্পাদক।

নবম মাসিক অধিবেশন

৫ই ফাল্গুন, ১৮ ফেব্রুয়ারী রবিবার, ৫টা।

উপস্থিত ব্যক্তিগণ

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (সভাপতি)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ
শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
" বিহারীলাল সরকার
" ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
" যোগেশচন্দ্র ঘোষ
" সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ
" অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি, এল,

শ্রীযুক্ত অনাথনাথ পালিত এম্ এ
" রমেশচন্দ্র বসু
" জীবনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
" ওয়াহেদ হোসেন
" জগদ্বন্ধু মোদক
" পণ্ডিত ক্ষেত্রনাথ চূড়ামণি
" ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ
" নিশিকান্ত সেন

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সম্পাদক
" ব্যোমকেশ মুস্তফী সহ-সম্পাদক

আলোচ্য বিষয়—

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সভানির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহার দাতাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ পাঠ—(১) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় কর্ত্তৃক "প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষায় জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যের স্থান", (২) পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রিকর্ত্তৃক "কবি দণ্ডী" এবং (৩) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক "কুক্কুটপাদগিরি"। ৪। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। নিম্নের সভ্যগণ যথারীতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী ২৫ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন
শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	২। ঠাকুর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন দেববর্ম্মা, আগরতলা।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী		৩। শ্রীযুক্ত সরোজকৃষ্ণ ঘোষ মৌলিক বি, এ পাঁচথুপী, মুর্শিদাবাদ

ডাঃ সরসীলাল সরকার শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী ৪। ডাঃ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
এম্ এ Professor of Pathology, Medical College.
শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার " ৫। " কুমুদরঞ্জন মল্লিক
বিএ, ৫১ শাঁখারিটোলা লেন
কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বিশেষ সভ্য পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
" রাজকুমার বেদতীর্থ

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ ও শ্রীযুক্ত রাজকুমার বেদতীর্থ কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অনুরোধে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফীর প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সমর্থনে সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে পরিষদের বিশেষ সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। নিম্নের পুস্তকগুলির উপহারদাতাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

১। শিক্ষাদর্পণম্—শ্রীকানাইয়া লাল ত্রিপাঠী, পাটনা কলেজ
২। বসন্তলতিকা—শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা, আগরতলা
৩। রচনানুবাদশিক্ষা—শ্রীগুরুনাথ কাব্যতীর্থ
৪। মহাব্রত
৫। বেদান্তবিষয়ক প্রবন্ধ
৬। স্বদেশিনী
৭। Theosophy
৮। পঞ্চাঙ্গ-প্রভাকর
৯। Sanskit in our Schools
১০। A handbook of Deductive logic.

৪। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার পদে নিয়োগের বার্ত্তা জ্ঞাপনে আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, মাননীয় বিচারপতি মহাশয় পরিষদের হিতৈষী বন্ধু ও অন্যতম সহকারী সভাপতি। তাঁহার মত বহুগুণশালী পণ্ডিতের ঐ উচ্চপদে নিয়োগে আমরা সকলেই আনন্দিত। পরিষৎ এই উপলক্ষে তাঁহাকে অভিনন্দন পত্রপ্রেরণ করুন।

মৌলবী ওয়াহেদ হোসেন এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদী বলিলেন, আমাদের পক্ষে এই উচ্চপদে নিয়োগ সর্ব্বদা ঘটে না। বাঙ্গালীর মধ্যে আমাদের সর্ব্বজনমান্য সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কয়েক বৎসর ঐপদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। আর এই দ্বিতীয়বার মাননীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই পদকে অলঙ্কৃত করিবেন এইরূপ প্রচারিত হইয়াছে। আমাদের জাতির পক্ষে ইহা আনন্দের বিষয়। পরিষদের পক্ষে বিশেষ আনন্দ যে, আশুতোষ বাবু আমাদের

সহকারী সভাপতি। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিজ ব্যয়ে কাশীদাসী মহাভারত সম্পাদনে উদ্যোগী হইয়াছেন ও সাহিত্য-পরিষৎকে ঐ গ্রন্থ প্রকাশের ভার দিয়াছেন। উহার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইতেছে এবং ঐ গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে, যিনি উহার সম্পাদনকর্ত্তা, তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় হইবে সন্দেহ নাই। পরিষৎ এই জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ ও তাঁহার এই উচ্চপদে নিয়োগে সুখী। যিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী চ্যান্সেলর এবং বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর সহকারী সভাপতি,তিনিই পরিষদের সহকারী সভাপতি,এই হেতু পরিষৎ গৌরবান্বিত।

সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বলিলেন, মাননীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সহিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিরূপ সম্পর্ক তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কে তিনি বহুবার আমাদের স্বজাতির স্বার্থরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে আইনের সংস্কার কালে তিনি ব্যবস্থাপক সভায় যে নির্ভীকতা দেখাইয়াছিলেন, তাহা সকলের স্মরণ আছে। পাশ্চাত্য শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও তিনি জাতীয় সাহিত্যে অনুরক্ত। নবসংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মাবলী প্রণীত হইতেছে; এই নূতন সংস্কারে জাতীয় ভাষার ও সাহিত্যের স্থান কোথায় হইবে তাহা জানিবার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব আছি। এই সময়ে আশুতোষ বাবুর মত জাতীয় সাহিত্যে অনুরক্ত ব্যক্তির ভাইস্ চ্যান্সেলার পদে নিয়োগে আমরা আনন্দিত হইয়াছি। কোন বৃহৎ কার্য্যে আমাদের নেতৃত্বগ্রহণের শক্তি নাই, আমাদের জাতীয়তা সম্বন্ধে এই অপবাদ প্রচলিত আছে। হয় ত ইহা সম্পূর্ণ অমূলক নহে। আশুতোষ বাবুর নেতৃত্বগ্রহণে ক্ষমতা বিষয়ে কাহারও সন্দেহ মাত্র নাই। আশুতোষ বাবুর ন্যায় ব্যক্তি উপস্থিত না থাকিলে এই শিক্ষাসঙ্কটের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে কোন বাঙ্গালীর নিয়োগ ঘটিত কি না সন্দেহ। মহামহোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাব এই জন্য আমি সম্পূর্ণ অনুমোদন করি।

ঐ প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৫। তৎপরে শ্রীযুক্ত অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষায় জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যের স্থান সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। ঐ প্রবন্ধের মর্ম্ম এই যে, সরকারি-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীতে আমাদের জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যের যথোচিত স্থান হওয়া যখন সম্ভাবনা নাই, তখন প্রস্তাবিত জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রবর্ত্তিত শিক্ষা প্রণালীতে উহার যথোচিত স্থান নির্দ্দেশ আবশ্যক। নিম্নশিক্ষায় বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের স্থান থাকিবে, মধ্যশিক্ষায় ও উচ্চশিক্ষায় সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যকে প্রধান স্থান না দিলে চলিবে না। ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যের স্থান তাহার নিম্নে থাকিবে। প্রধানতঃ ইংরাজ রাজার সহিত সম্পর্কের অনুরোধে বা জীবিকার জন্য আমাদের ইংরেজি শিক্ষা আবশ্যক, কিন্তু তৎপ্রতি ইংরেজী ভাষা শিক্ষাই যথেষ্ট। ইংরেজি সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি তেমন আবশ্যক নহে. মধ্যশিক্ষার ব্যবস্থায় বর্ত্তমানকালে যে ইংরেজি সাহিত্যগ্রন্থ পাঠনার ব্যবস্থা আছে, তাহা আমাদের জাতীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধ। সাহিত্য হিসাবে উহা সংস্কৃত সাহিত্য অপেক্ষা উচ্চ অঙ্গের পদার্থ নহে, সম্প্রতি

বিদ্যালয়ে যে ভাবে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হয়, সেই প্রণালীর সংস্কার আবশ্যক। কেবল ব্যাকরণের দিকে দৃষ্টিবদ্ধ না করিয়া প্রকৃত সাহিত্য শিক্ষার ব্যবস্থা প্রয়োজনীয়। সংস্কৃত সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য, আরবি, পার্শী সম্বন্ধেও তাহাই বলা যাইতে পারে।

প্রস্তাবিত জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশে যে Provisional Committee গঠিত হইয়াছে, তাঁহারা জাতীয় ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার বিষয়ে কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা জানাইবার জন্য সভাপতি কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলিলেন, ঐ কমিটি শিক্ষা সম্বন্ধে যে খসড়া তৈয়ার করিয়াছেন, তাহা এখনও সাধারণে প্রকাশিত না হইলেও, উহাতে গোপন করিবার কোন বিষয় নাই। কমিটি নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ ত্রিবিধ শিক্ষারই ব্যবস্থা করিয়াছেন। নিম্নশিক্ষা বাঙ্গলা ভাষার সাহায্যে দেওয়া হইবে, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। মধ্য শিক্ষায় ইংরেজি, সংস্কৃত ও বাঙ্গলা তিনেরই স্থান আছে। ইতিহাস, বিজ্ঞান, গণিত ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা এখনকার মত ইংরেজি ভাষার সাহায্যে না দিয়া বাঙ্গলার সাহায্যে দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। সাহিত্য-পরিষৎ এই ব্যবস্থার অনুমোদন করিবেন, এই প্রস্তাব লইয়া পরিষৎ এক কালে গবর্ণমেণ্টের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারস্থ হইয়া কোন ফল পান নাই। মধ্য শিক্ষায় সংস্কৃতকে যে স্থান দেওয়া হইয়াছে, তাহা সংস্কৃতের পক্ষে যথেষ্ট নহে। আরও উন্নত স্থান দেওয়া উচিত। এ বিষয়ে কমিটির খসড়ায় পরিবর্ত্তন আবশ্যক। উচ্চ শিক্ষার শিক্ষার্থীকে একটিমাত্র বিষয়ে আবদ্ধ রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্তু সেই বিষয়টি চারি বৎসর ধরিয়া ব্যাপকভাবে শিখিয়া যাহাতে প্রকৃত পাণ্ডিত্যলাভ হয়, তাহারই পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষার্থী ইংরেজি ও সংস্কৃত উভয়ই শিখিবেন, ইতিহাসশিক্ষার্থী স্বদেশের ও বিদেশের ইতিহাস উভয়ই শিখিবেন। দর্শনশিক্ষার্থী পাশ্চাত্য ও ভারতীয় দর্শনে অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন। সংস্কৃত ভাষার ও সাহিত্যের সম্যক্ আলোচনা ব্যতীত ইহা সম্ভবপর হইবে না। যাহা হউক, কমিটি যে খসড়া দিয়াছেন, প্রস্তাবিত বিদ্যালয় যদি কার্য্যে পরিণত হয়, তবে উহার কর্ত্তৃপক্ষ সেই খসড়ার কতটুকু গ্রহণ করিবেন তাহা এখনও বলা যায় না। তখন ঐ খসড়ার সমালোচনার সময় উপস্থিত হইবে। যদি এ সময়ে উহার কোন অংশ অসম্পূর্ণ বা অসঙ্গত বোধ হয়, তজ্জন্য চিন্তিত বা ভীত হইবার কোন কারণ নাই।

মৌলবি ওয়াহেদ হোসেন বলিলেন, হিন্দুদিগের শিক্ষণীয় ইংরেজি, সংস্কৃত ও বাঙ্গলা তিন ভাষা, মুসলমানের শিক্ষণীয় ভাষা পাঁচটি—ইংরেজি বাঙ্গলা ত আছেই, তাহার উপর আরবী, পার্সী ও উর্দ্দু। নিম্ন শিক্ষায় কতটুকু বাঙ্গলা ও কতটুকু উর্দ্দুতে হইবে তাহা বিবেচ্য। উচ্চ শিক্ষায় আরবি ও পার্সী উভয়কেই না রাখিলে চলিবে না। বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ আরবিতে অধিক, ঐতিহাসিক গ্রন্থ পার্সীতে অধিক। আবার পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানগণের নিম্নশিক্ষায় প্রাদেশিক ভাষার ব্যবহার উচিত কি না সে বিষয়ে কথা উঠিয়াছে। অনেকে উহার পক্ষপাতী। কাজেই শিক্ষা-সমস্যা হিন্দুগণের অপেক্ষা মুসলমানের পক্ষে আরও জটিল। ইহার মীমাংসা দুরূহ।

মহামহোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ মহাশয় টোলের শিক্ষাপ্রণালীর অসম্পূর্ণতা ও ইংরেজি শিক্ষার

বর্ত্তমান সময়ে প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করিয়া বলিলেন, প্রবন্ধলেখক ইংরেজি শিক্ষাকে যত নিম্ন স্থানে আনিতে চাহেন, তাহা উপযুক্ত কি না চিন্তনীয়। উচ্চ শিক্ষায় বাঙ্গলার তুলনায় সংস্কৃতের প্রাধান্য দিতে হইবে। প্রবন্ধলেখকের সহিত অন্য বিষয়ে তাঁহার মতান্তর নাই।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় জাতীয়তার গোঁড়ামি করিয়া ইংরেজির অনাদর করিলে চলিবে না। আবার জাতীয় ভাবে রক্ষার জন্য তদনুরূপ জাতীয় সাহিত্যেরও সমাদর করিতে হইবে। প্রাচীনকালে শিক্ষার গভীরতা ছিল, কিন্তু বিস্তার কম ছিল। একালে শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় ধীশক্তি কাহারও নাই, কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের ধীশক্তির ফল উপভোগ করিতে পারেন এরূপ লোক বহুতর আছেন। উচ্চ শিক্ষাতেও বাঙ্গালায় লেক্‌চার চলিতে পারে, তবে পাঠ্যগ্রন্থের সম্প্রতি অভাব। জাতীয় ভাবের প্রতি এতদিন যে উপেক্ষা ছিল, এখন সেই উপেক্ষা দূর করিয়া ইংরেজি ও সংস্কৃত উভয় শিক্ষারই ব্যবস্থা আবশ্যক।

সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বলিলেন, আমি ইংরেজি সংস্কৃত বুঝি না। সম্প্রতি বাঙ্গালীর মেরুদণ্ড উন্নত ও সমর্থ করা আবশ্যক হইয়াছে। তজ্জন্য যে শিক্ষা আবশ্যক, তাহারই ব্যবস্থা করিতে হইবে। স্বদেশী আন্দোলনে বাঙ্গালীর প্রকৃতিগত দৌর্ব্বল্যের প্রচুর পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। শিক্ষিত বাঙ্গালী আজ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া কাল প্রতিজ্ঞা ভুলিয়াছেন। তেজস্বী ব্রাহ্মণের হাতে সমাজের নেতৃত্ব থাকিলে স্বদেশী আন্দোলনে নেতাদিগকে ছুটাছুটি করিতে হইত না। বিদ্যাভূষণ মহাশয় সংস্কৃত শিক্ষার অসম্পূর্ণতার উল্লেখ করিয়াছেন। উহা বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর দোষ। ঐ অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও টোলের পণ্ডিতের দৃঢ়তা কলেজের অধ্যাপকের নাই। গবর্ণমেণ্ট দেশের টোলগুলিও সামান্য অর্থে কিনিয়া ফেলিয়াছেন, ইহা দুঃখের বিষয়। গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থায় এখন চতুষ্পাঠীর শিক্ষার ফলেও কুক্কুটমিশ্র শর্ম্মার আবির্ভাব হইবে। নব প্রস্তাবিত বিদ্যালয় এই পুরাতন টোলগুলিকে স্বাধীন করিবার চেষ্টা আগে করুন। ফিরিঙ্গিবিদ্যায় গোলামী না করিয়া উহার মধ্যে যে সার্ব্বভৌম ভাবটা আছে, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে ও উহার মধ্যে যে জাতীয়তার প্রতিকূল ভাব আছে, তাহা বর্জ্জন করিতে হইবে। মানবিকতা ইংরেজি কেন, সাঁওতালি হইতেও গ্রহণীয়। একালে ইংরেজি সাহিত্য imperialism বা সাম্রাজ্যতন্ত্রের ভাবে অনুপ্রাণিত। ইংরেজের imperialism আমাদের মৃত্যুস্বরূপ। আগে আমাদের জাতীয়তা রক্ষা অর্থাৎ জাতীয় জীবন রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া তৎসঙ্গে মানবিকতা শিক্ষা করিতে হইবে।

সময়াভাবে অন্যান্য প্রবন্ধ পাঠ স্থগিত থাকিল। তৎপরে সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
সম্পাদক।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সভাপতি।

পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন।

৮ই ফাল্গুন, ২০শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার।

এই দিন শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র সাংখ্যসাগর মহাশয়ের শেষ বক্তৃতা—"বৃত্তির উৎকর্ষ ও মুক্তি" নামক বক্তৃতা হয়। এই দিন শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সেন বি,এ সভাপতি ছিলেন। বক্তা অতি প্রাঞ্জল ভাষায় এই দর্শনশাস্ত্রীয় বিষয়নিচয় উপর্য্যুপরি বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃবর্গের বিশেষ তৃপ্তি-সাধন করিয়াছিলেন। বক্তৃতান্তে উপস্থিত শ্রোতৃবর্গের অনেকেই তাঁহার অপূর্ব্ব বাগ্মিতা, ব্যাখ্যাকৌশল, সরল ভাষা এবং সুপ্রণালীর প্রশংসা করিয়া সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী — সহঃ সম্পাদক।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত — সভাপতি।

দশম মাসিক অধিবেশন।

২০শে ফাল্গুন, ৪ঠা মার্চ্চ রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা।

উপস্থিত সভ্যগণ

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম,এ, বি,এল্ (সভাপতি)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম,এ

" বিহারীলাল সরকার

" রাজকৃষ্ণ দত্ত

" অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি,এল্

" সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

" নিখিলনাথ রায় বি,এল্

" নিশিকান্ত সেন

" রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

" বিজয়লাল দত্ত

" বরদাকান্ত সোম

" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—সম্পাদক।

" মন্মথমোহন বসু বি,এ

" ব্যোমকেশ মুস্তফী

সহঃ সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী

অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ

দীনেশচন্দ্র সেন বি,এ

হেমচন্দ্র সেন

রমেশচন্দ্র বসু

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

বীরেশ্বর পাঁড়ে

ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়

রাজকুমার বেদতীর্থ

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সভ্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহারদাতাদিগকে ধন্যবাদ-জ্ঞাপন। ৪। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনকর্ত্তৃক ৺কবিকঙ্কণের স্বহস্ত লিখিত দামুন্যায় পূজিত তেরেট পত্রের চণ্ডী পুঁথি প্রদর্শন। ৫। প্রবন্ধ পাঠ—(১) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক "কবিদণ্ডী" এবং (২) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক "কুক্কুটপাদগিরি"। ৬। শোক-প্রকাশ—(১) ৺হেমচন্দ্র মল্লিক, (২) সাঁখরাইলনিবাসী ৺আনন্দনাথ সেন মহাশয়ের মৃত্যু উপলক্ষে। ৭। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্,এ বি,এল্ মহাশয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। নিম্নের ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১। শ্রীরাসমোহন ঘোষ জমীদার, বাহুড়া, সোমপাড়া, মুর্শীদাবাদ
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	২। শ্রীশশিভূষণ বসু এম্,এ সিউড়ী
		৩। শ্রীঅক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় এম্,এ রিপন কলেজ
শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	৪। শ্রীমহেন্দ্রনাথ কুণ্ডু সবডেপুটী, বাঁকুড়া
শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ		৫। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে ১৮ হরিতকীবাগান
		৬। শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র এম্,এ হেডমাষ্টার এডওয়ার্ড ইনষ্টিঃ, মানিকতলা।

৩। নিম্নোক্ত পুস্তকের উপহারদাতাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

১। পল্লীসমিতি দর্পন—শ্রীচণ্ডীচরণ ঘোষ।

২। রঙ্গপুর হরিদেবপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত কালীমোহন রায়চৌধুরী মহাশয়ের জীবনচরিত ও বংশচরিত
৩। ছন্দোবোধ শব্দসাগর
} শ্রীকালীমোহন রায়চৌধুরী।

৪। শিবাজী—শ্রীআশুতোষ বসু।

৫। বসন্ত-লতিকা, ৬। স্বদেশী আন্দোলনে ছাত্রগণের কর্ত্তব্য, ৭। কল্‌কত্তেকে শ্বেতাম্বরী জৈন সম্প্রদায়কে শ্রীমন্দিরকা হিসাব ও চিট্টা
৮। শ্বেতাম্বরী জৈনসম্প্রদায়কে মন্দিরকা মুকর্দ্দমা
৯। Bhowani Mandir
} শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

৪। শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত সভাপতি-মহাশয়ের আহ্বান ক্রমে ৺হেমচন্দ্র মল্লিকের অকাল মৃত্যুর জন্ম শোকপ্রকাশে সভাকে অনুরোধ করিয়া হেমবাবুর দেশানুরাগ ও সাহিত্যানুরাগ সম্বন্ধে নানা কথা বলিলেন। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বলিলেন, কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি উন্নত সাহিত্য প্রচারের কল্পনা করিয়া বাঙ্গলার বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণকে গ্রন্থ প্রণয়নের ভার দিয়াছিলেন ও স্বয়ং তাহার ব্যয়ভার বহন করিতে প্রস্তুত ছিলেন। দীনেশ বাবু স্বয়ং বাঙ্গালা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনার ভার লইয়াছিলেন, এবং তজ্জন্য হেমবাবুর সহিত তাঁহার পত্র-ব্যবহার চলিত। হেমবাবুর আগ্রহের ত্রুটী ছিল না, কিন্তু লেখকের অনবকাশে উহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ দত্ত বলিলেন, হেমবাবু আমার ভগিনীপতি ও সমবয়স্ক। সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে হেমবাবু সমাজে যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা অনেকেই জানেন,—তাঁহার গার্হস্থ জীবনের কথা আমি যেরূপ জানি, তাহা সকলে না জানিতে পারেন, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার জীবনযাত্রায় ষোল আনা সাহেবী আনা ছিল; ইংরেজি ধরণে আহার করিতেন ও পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন। তিনি সাহেবিয়ানা একবারে পরিত্যাগ করিয়া আহার পরিচ্ছদ প্রভৃতি সকল বিষয়ে স্বদেশী প্রথা গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনে তিনি কিরূপ অনুরাগের সহিত যোগ দিয়াছিলেন এবং বিদেশী আচার ব্যবহারের প্রতি তাঁহার কিরূপ ঘৃণা জন্মিয়াছিল, তাহা সকলেই জানেন। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলিলেন, এই সভায় উপস্থিত অনেকেই আত্মীয়তা সূত্রে বা বন্ধুতা সূত্রে হেমবাবুর সম্পর্কযুক্ত, তাঁহার অকাল মৃত্যুর আকস্মিক সংবাদ সকলেরই মর্ম্মে ব্যথা দিয়াছে। এই দুর্ঘটনার জন্য আমরা কেহই প্রস্তুত ছিলাম না। তিনি পরিষদের অধিবেশনে উপস্থিত হইতে পারিতেন না, কিন্তু পরিষদের প্রতি অনুরাগ তাঁহার যথেষ্ট ছিল। কাশীমবাজারের মহারাজ পূর্ব্বে পরিষৎকে পাঁচ কাঠা ভূমি দিতে চাহিয়াছিলেন, আরও দুই কাঠা ভূমির জন্য মহারাজের নিকট ভিক্ষার্থী হইয়া যে কয়জন উপস্থিত হইয়াছিলেন, হেমবাবু তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। তাঁহার মত পদস্থ, সমৃদ্ধ লোকের এইরূপ ভিক্ষায় বাহির হওয়া পরিষদের প্রতি অনুরাগের পরিচয় দেয়। দীনেশবাবু উন্নত সাহিত্য প্রচার সম্বন্ধে যে ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, উহাতে আমিও লিপ্ত ছিলাম। ১৩১০ সালে অগ্রহায়ণ মাসে হেমবাবু কয়েকজন বন্ধুকে এ বিষয়ে পরামর্শের জন্য আহ্বান করেন। তন্মধ্যে আমিও ছিলাম, অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি আরও কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন। তাহাতে স্থির হয়, প্রায় ত্রিশখানি বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থ প্রকাশ করা হইবে। অধ্যাপক ডাক্তার জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ, হীরেন্দ্রবাবু দার্শনিক গ্রন্থ, বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ভারতবর্ষের ইতিহাস, রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস, রবীন্দ্রবাবু সংস্কৃত সাহিত্যের ও বাঙ্গলা বৈষ্ণব সাহিত্যের সমালোচনা ইত্যাদি রূপে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ গ্রন্থরচনার ভার লইবেন। হেমবাবু উহা প্রকাশের বন্দোবস্ত করিবেন। বক্তা নিজে পদার্থ-বিদ্যা বিষয়ে দুইখানি গ্রন্থের ও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাবলীর Introduction একখানি গ্রন্থ রচনার ভার লইয়াছিলেন। গত বৎসর ধরিয়া ঐ গ্রন্থাবলী প্রকাশের

উদ্যোগ হইতেছিল, এ বৎসর স্বদেশী আন্দোলনে কথাটি চাপা পড়িয়া যায়। হেমবাবুর অকাল মৃত্যুতে বাঙ্গালা সাহিত্যের এই গ্রন্থাবলীপ্রকাশ বোধ হয় আর ঘটিল না। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বলিলেন, হেমবাবুর এদিকে ইচ্ছা হইয়াছিল ঐ গ্রন্থাবলী সাহিত্য-পরিষদের দ্বারা ও তাঁহাদের কর্তৃত্বাধীনে প্রকাশ করাইবেন। সাহিত্য-পরিষৎও ঐরূপ গ্রন্থপ্রকাশের জন্য অনেকদিন হইতে উদ্যোগী আছেন। হেমবাবুর উদ্যোগ সফল হইতে পারিত। হেমবাবুর শোকার্ত্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনাসূচক পত্র পাঠাইবার প্রস্তাব গৃহীত হইল।

শ্রীযুত ব্যোমকেশ মুস্তফী সাঁকরাইলনিবাসী ৺আনন্দনাথ সেনের মৃত্যু উপলক্ষে দুঃখপ্রকাশ করিয়া বলিলেন, ইনি প্রথমে সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার গ্রাহক ও পরে সভ্য হইয়াছিলেন। পরিষদের প্রতি ইঁহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। নব্যভারত পত্রিকায় ইঁহার যে সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত প্রকাশ হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় ইনি শেষ পর্য্যন্ত পরিষৎ-পত্রিকা যত্নপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিতেন।

৫। শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় কবিকঙ্কণের স্বহস্তলিখিত পুঁথি প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, এই পুঁথির বর্ত্তমান অধিকারী কবিকঙ্কণের বংশধর দামুন্যাবাসি শ্রীযুত যোগীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এই সভাস্থলে উপস্থিত আছেন। [যোগীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সভায় দণ্ডায়মান হইলেন] এই পুঁথির শেষার্দ্ধ নাই; এই হেতু পুঁথির লিপিকারকের নাম ও নকলের তারিখের কোন নিদর্শন নাই। তথাপি ঐ পুঁথি যে প্রামাণিক, সে বিষয়ে নানা প্রমাণ রহিয়াছে।

(১) ইহা তেরেটের পাতায় লেখা; এ পর্য্যন্ত তেরেটের পাতায় লেখা বাঙ্গালা গ্রন্থ আমি দেখি নাই। ইহা প্রাচীনতার নিদর্শন।

(২) ইহা দামুন্যার কবিকঙ্কণের বংশধরদের গৃহে কবিকঙ্কণের ইষ্টদেবতা ৺সিংহবাহিনীর মন্দিরে বংশপরম্পরাক্রমে রক্ষিত ও কবির স্বহস্তলিখিত গ্রন্থ বলিয়া পূজিত হইয়া আসিতেছে। তাঁহারা প্রচুর অর্থের বিনিময়েও ইহা হস্তান্তরিত করিতে সম্মত নহেন।

(৩) এই পুঁথির মধ্যে একখানি প্রাচীন দলীল রক্ষিত আছে। উহা শিবরাম চক্রবর্ত্তীর নামে ব্রহ্মোত্তরভূমি-দান-পত্র, উহার তারিখ ১০৪৭ সাল। শিবরাম চক্রবর্ত্তী কবিকঙ্কণের পুত্র; চণ্ডীগ্রন্থেই তাঁহার নাম পুনঃ পুনঃ পাওয়া যায়।

(৪) পুস্তকের নানাস্থানে সংশোধন আছে, উহা গ্রন্থকর্ত্তারকৃত সংশোধন ভিন্ন নকল কারকের সংশোধন হইতে পারে না।

কিংবদন্তী আছে, কবিকঙ্কণের বংশধরেরা সম্পত্তিবিভাগের সময় এই গ্রন্থও ভাগ করিয়াছিলেন। শেষার্দ্ধ কোথায় আছে, তাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

কবিকঙ্কণের স্মরণচিহ্নস্বরূপ তাঁহার বাসস্থানে সিংহবাহিনীর মন্দিরটী পাকা করিয়া দেওয়ার জন্য দীনেশ বাবু পরিষৎকে প্রার্থনা করিলেন। বর্ত্তমান কাঁচাঘর বহুবার জলমগ্ন হইয়াছিল; এই গ্রন্থখানি বহুকষ্টে বংশধরেরা বন্যার হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলিলেন, এই গ্রন্থপ্রাপ্তির একটু ইতিহাস আছে। দীঘাপতিয়ার কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় কবিকঙ্কণের গ্রন্থপ্রকাশের ভার গ্রহণ করিলে উহার জন্ত পুঁথি সংগ্রহ হইতেছিল। আমার বালককালের সংস্কৃতশিক্ষক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিবাস দামুন্তার নিকট মলয়পুর গ্রামে, তিনি আমাকে ঐ গ্রন্থের সন্ধান দেন এবং ঐ গ্রন্থ উপস্থিত করিবার ভার গ্রহণ করেন। সম্প্রতি তিনিই চেষ্টা করিয়া যোগীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়া পুঁথির মালিককে পুঁথিসমেত কলিকাতায় উপস্থিত করিয়াছেন। মূল কথা, কুমার শরৎকুমারের আগ্রহ ও যত্ন ভিন্ন এই গ্রন্থ বাহির হইত না। পরিষদের সভাপতি মাননীয় সারদা বাবু এই গ্রন্থ আনাইবার জন্ত উদ্যোগী ছিলেন ও যত্ন করিয়াছিলেন। আমরা সকলেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

সভাপতি মহাশয় এই পুথি আবিষ্কারের জন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, সিংহবাহিনীর মন্দিরটির নির্ম্মাণ সম্বন্ধে দীনেশ বাবুর প্রস্তাব সাহিত্যসেবীদের বিবেচ্য।

৬। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় "কবি দণ্ডী" সম্বন্ধে গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

[ঐ প্রবন্ধ ১৩১২ সালের উপাসনায় প্রকাশিত হইয়াছে।]

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় প্রবন্ধপাঠককে ধন্তবাদ দিয়া বলিলেন, দণ্ডীর দশকুমারচরিতের ভাষা কাদম্বরীর অপেক্ষা সরল, তাঁহার কাব্যাদর্শকে অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রথম গ্রন্থ বলা চলে। দণ্ডী কালিদাসের পরবর্ত্তী সন্দেহ নাই, কিন্তু কালিদাসের সময় নির্ণয় লইয়া এখনও নানা মত আছে।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন, সম্প্রতি তিব্বত হইতে আনীত গ্রন্থ মধ্যে দণ্ডী প্রণীত কাব্যাদর্শের একখানি তিব্বতী অনুবাদ ছিল। ভারত-গবর্ণমেন্টের অনুমতিতে উহা আমি দেখিয়াছিলাম। উহা এখন ব্রিটীস মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে নেপাল হইতে হজসন সাহেব যে সমস্ত গ্রন্থ আনেন, তন্মধ্যে কাব্যাদর্শের অনুবাদ ছিল, উহা ইণ্ডিয়া আপিসের লাইব্রেরীতে আছে। স্রঙ্গচন্ গংপো রাজার সময়ে তিব্বতী পণ্ডিতেরা ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতদের সাহায্য লইয়া ঐ গ্রন্থ অনুবাদ করেন। পণ্ডিতদের নাম দেওয়া আছে। ভারতীয় সাহিত্যের রীতি তিব্বতী সাহিত্যে কতদূর চলিতে পারে, তাহার পরীক্ষার উদ্দেশে কাব্যাদর্শের অনুবাদ হইয়াছিল। ঐ অনুবাদ সপ্তম শতাব্দীতে ঘটে। অতএব দণ্ডী তৎপূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। মাঘের শ্লোক উহাতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখকের নিকট সভার কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বলিলেন, তিনি দশকুমারচরিত আশ্রয় করিয়া তাৎকালিক সমাজের যে চিত্র দিয়াছেন, তাহা শিক্ষাপ্রদ ও মনোজ্ঞ হইয়াছে।

ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে নেপালের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ জং বাহাদুরের

পৌত্র ও বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী সমসের বাহাদুরের ভ্রাতুষ্পুত্র সভায় অকস্মাৎ উপস্থিত হইয়াছিলেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহাকে সম্যক্‌রূপে অভ্যর্থনা করিলে তিনি উপস্থিত ব্রাহ্মণ-দিগকে প্রণাম জানাইয়া বলিলেন, আমি শিশোদীয় বংশোদ্ভূত রাজপুত ক্ষত্রিয়, কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া সহসা ঈশ্বরপ্রেরিত হইয়া এই সভায় উপস্থিত হইয়াছি ও সভার কার্য্য দেখিয়া ও আপনাদের আদরে, তৃপ্ত হইয়া পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছি। আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

তৎপরে অন্য কার্য্য স্থগিত থাকিল। সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন
সভাপতি
১১ই চৈত্র

৬ষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন

১১ই চৈত্র, ২০ মার্চ্চ, অপরাহ্ণ ৫টা

উপস্থিত ব্যক্তিগণ

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ, (সভাপতি)

রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত এম্ এ,
" জগদ্বন্ধু মোদক
" বিজয়লাল দত্ত
" বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
" যতীশচন্দ্র বসু এম্ এ,
" নিশিকান্ত সেন
" মহীন্দ্রলাল দাস
" কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি,এ
" পঞ্চানন ঘোষাল এম্, এ
" গোপালদাস চৌধুরী

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি,এল
" শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
" বিহারীলাল সরকার
" নৃত্যগোপাল বিশ্বাস
" শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
" তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়
" কালিদাস সন্ন্যাসী
" ক্ষীরোদবিহারী পাল
" অতুলচন্দ্র বসু
" কেদারনাথ দাস গুপ্ত
" কুমারকৃষ্ণ দত্ত
" যাদবচন্দ্র মিত্র
" সতীন্দ্রসেবক নন্দী

শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি, এল্
" যতীশচন্দ্র সমাজপতি
" অবিনাশচন্দ্র ঘোষ
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—সম্পাদক।
" ব্যোমকেশ মুস্তফী } সহ-সম্পাদক।
" মন্মথমোহন বসু }
শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম্ এ, বি এল্
" বামাচরণ চট্টোপাধ্যায়
" প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি

আলোচ্য বিষয়—

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সভ্যনির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহারদাতা-দিগকে ধন্যবাদজ্ঞাপন। ৩। প্রবন্ধ—রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই মহাশয় কর্ত্তৃক "তিব্বতের লামা ও তাহাদের ধর্ম্ম" নামক প্রবন্ধপাঠ। ৫। প্রদর্শন—তিব্বতের তাসিলাম্পো বিহারের বৃহৎ ছবি। ৬। শোক প্রকাশ।—

(১) ৺রমণীমোহন সিংহ (ভাগলপুর) (২) ৺কুমার বীরেন্দ্র দেব রায়, (৩) ৺কুমার দক্ষিণেশ্বর মালিয়া, এবং (৪) ৺কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, ৭। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। নিম্নোক্ত সভ্যগণ যথারীতি নির্ব্বাচিত হইলেন—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১। শ্রীযুক্ত মৌলবি নুর আহম্মদ ২৬ গোরস্থান লেন।
		২। " সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১০ আনন্দ চাটুর্য্যের লেন।
		৩। " কুলদাপ্রসাদ চৌধুরী কুমারখালী।
শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৪। " নৃত্যগোপাল বিশ্বাস ৭ লালওয়াগর্স লেন।
শ্রীসতীন্দ্রসেবক নন্দী		৫। " সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উকীল, বালেশ্বর।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী		৬। " পূর্ণানন্দ ঘোষ রায়, জমিদার, পাঁচথুপী

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল	"	৭। " ডি, ডি, মিত্র, L. R. C. P. & L. R. C. S. (Edin) L. F. P. S. (Glasgow) ২০ গ্রে ষ্ট্রীট।
"	"	৮। " রসময় লাহা ৭২ কালী-প্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট।
শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	৯। " শরচ্চন্দ্র সর্ব্বাধিকারী
		১০। " গিরিশচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বহরমপুর কলেজ।
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি	শ্রীমন্মথমোহন বসু	১১। " সত্যেন্দ্রকুমার বসু বি,এ বঙ্গবাসী আফিস।
		১২। " বরদাদাস বসু ডেঃ মাঃ ৩৭ সিকদার বাগান ষ্ট্রীট
শ্রীহেমচন্দ্র দাস গুপ্ত	শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত	১৩। " পদ্মিনীমোহন নিয়োগীএম্এ Sub Editor Indian Worlds ১২১ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট।
		১৪। " ললিতচন্দ্র গুহ এম্ এ সিরাজ গঞ্জ
		১৫। " বিপিনচন্দ্র দাস গুপ্ত ৬৫।৩ হ্যারিসন রোড
মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাঃ	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১৬। " কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এম্এ অধ্যাপক, প্রেঃ কলেজ।

৩। নিম্নোক্ত পুথি ও পুস্তকের উপহার-দাতাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।—

১। নিশীথচিন্তা—শ্রীরাজকুমার বেদতীর্থ, ২। A Descriptive Catalougue of Sanskrit Mss—মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট ৩। ধর্ম্মবাদ, ৪। মহাপুরুষচরিত ৫। যমজ-ভগিনী ৬ সঙ্গীত-গৌড়েশ্বর ৭। চমৎকার-চন্দ্রিকা ৮। ফেলাবাবু ৯। Report of the Committee appointed by the Senate on the 17th August 1906 ১০। শিক্ষাসঙ্কট ১১। রসায়ন-পরিচয় ১২। Model Selections from English Literature ১৩। বীণা ১৪। সন্ধিক্ষণ ১৫। ভক্তিসাধন ১৬। ভূত ও শক্তি ১৭। বিজ্ঞানপাঠ ১৮। গীতগোবিন্দ ১৯। মানবতত্ত্ব ২০। বেদসংহিতা ২১। ভাস্করানন্দ-চরিত ২২। আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ ২৩। জ্ঞানবৃদ্ধি এবং কতকগুলি মাসিকপত্র—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর

ত্রিবেণী ২৪। ধর্ম্মপদ ২৫। বৃহৎ তন্ত্রসার ২৬। কল্কিপুরাণ ২৭। মহাভারত পুরাণ ২৮। রামপ্রসাদের পদাবলী ২৯। শকুন্তলা ৩০। বঙ্গরহস্য ৩১। সমালোচনা ৩২। হুতোম পেঁচার নক্সা ৩৩। রামচন্দ্রমাহাত্ম্য ৩৪। রামকৃষ্ণ-জীবনচরিত ৩৫। তন্ত্রমীমাংসা ৩৬। চৈতন্যভাগবত ৩৭। যোগশাস্ত্র ৩৮। হরিনাথ গ্রন্থাবলী ৩৯। নন্দ বিদায় ৪০। জ্যোতিষরত্নাকর ৪১। কথাসরিৎসাগর ৪২। পদাঙ্কদূত ৪৩। হংসদূত ৪৪। বরাহমিহির ও খনা ৪৫। রহস্যমুকুর ৪৬। রূপসী মরুবাসিনী ৪৭। অদ্ভুত রামায়ণ ৪৮। মঞ্জুষা ৪৯। আনন্দলহরী ৫০। বাণবিজয় ৫১। নৈবেদ্য ৫২। বিক্রমোর্ব্বশী ৫৩। মালিনী ৫৪। কামরূপ কামলতা ৫৫। রাজবল্লভীয় দ্রব্যগুণ ৫৬। শুকগীতা ৫৭। পদ্মিনী উপাখ্যান ৫৮। সংসারচিত্র ৫৯। আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা ৬০। শোভনা ৬১। বাবুচোর ৬২। ব্যবস্থাসার ৬৩। সৎনাম ৬৪। স্নেহময়ী ৬৫। সাজি ৬৬ প্রেমগাথা ৬৭। মর্ম্মগাথা ৬৮। অমিয়গাথা ৬৯। বসন্তগাথা ৭০। ব্রজগাথা ৭১ গার্হস্থ্যধর্ম্ম ৭২। হিন্দুধর্ম্ম ৭৩। উপন্যাসসংগ্রহ ৭৪। বিচিত্রবিচার নাটক ৭৫। আনন্দলহরী ৭৬। ইচ্ছামূলাকর্ষণ ৭৭। দোঁহাবলী ৭৮। নিহিলিষ্ট রহস্য, ৭৯। পবনবিজয় স্বরোদয় ৮০। বিবেকচূড়ামণি ৮১। শাণ্ডিল্যসূত্র ৮২। ধনবান্ হইবার সহজ উপায় ৮৩। বেদান্তসার ৮৪। পঞ্চতীর্থমাহাত্ম্য ৮৫। শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায় ৮৬। শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্ ৮৭। গাভীপরিচর্য্যা ৮৮। রামচন্দ্রের বক্তৃতাবলী ৮৯। লীলামৃত ৯০। নারীনীতি ৯১। নবকথা ৯২। চোখের বালি ৯৩। জাতীয় উচ্ছ্বাস ৯৪। মায়াপুরী ৯৫। ফরাসী গোয়েন্দা ৯৬। মার্কিন গোয়েন্দা ৯৭। সন্তপ্ত সয়তান ৯৮। কল্পতরু ৯৯। ইন্দু ১০০। মায়ার বন্ধন ১০১। একটি বসন্ত প্রাতের প্রস্ফুটিত সকুরা পুষ্প—বুদ্ধমতীর সম্পাদক। ১০২। শ্রীরামবনবাস ১০৩। কবিকঙ্কণ চণ্ডী—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ। ১০৪। ভক্তজীবনে বেদান্ত—দৈবকীনন্দন প্রেস। ১০৫। সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়—মহারাজ কাশীমবাজার। ১০৬। শ্রীমদ্ভাগবত ২য় খণ্ড—শ্রীপ্রমথনাথ বিশ্বাস। ১০৭। কণিক—রাজকুমারী শ্রীমতী অনঙ্গমোহিনী দেবী, আগরতলা। ১০৮। বক্তৃতা—শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্, এ। ১০৯। ভাষাবোধ ব্যাকরণ—শ্রীনকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ।

নিম্নলিখিত প্রাচীন হস্তলিখিত পুথিগুলি শান্তিপুরের ৺যশোদানন্দন প্রামাণিকের বিধবা পত্নীকর্ত্তৃক উপহার প্রদত্ত হইয়াছে।

১। লীলাশুক বিরচিত কৃষ্ণকর্ণামৃত, ২। ভট্টিকাব্য, ৩। মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ (১৩১০), ৪। দুর্গসিংহকৃত কাতন্ত্রবৃত্তি, ৫। ভাবার্থদীপিকা সমেত ভাগবত (১ম-৯ম, ১১শ, ১২শ স্কন্ধ), ৬। শ্রীধর স্বামিকৃত ভাবার্থদীপিকা টীকা সমেত ভাগবত (১ম, ৭ম ও ৯ম), ৭। মন্বর্থমুক্তাবলী সমেত মনুসংহিতা, ৮। সারার্থদর্শিনী টীকা সমেত ভাগবত (১ম, ২য় ও ১০ম) ৯। সটীক আনন্দলহরী, ১০। সটীক চৌরপঞ্চাশৎ, ১১। সটীক সম্মোহনতন্ত্রোক্ত গোপালসহস্রনাম, ১২। নাগরাক্ষরে কৃষ্ণকর্ণামৃত, ১৩। ১২৭৬ শকে রচিত সটীক ভক্তিরত্নাবলী, ১৪। সটীক পদাঙ্কদূত, ১৫। রাগানুগা স্মরণপদ্ধতি, ১৬। পুরুষোত্তমদেব কৃত একাক্ষরকোষ, ১৭। দ্বিরূপকোষ, ১৮। গদসিংহকৃত নানার্থধ্বনিমঞ্জরী, ১৯। ভরতমল্লিককৃত অমরকোষ টীকা

২০। রামানন্দের অঙ্ক সংখ্যা, ২১। কাশীদাসী মহাভারত (আদি), ২২। ঐ আদি, সভা, বন, বিরাট, ২৩। ঐ কর্ণপর্ব্ব, ২৪। গুণরাজ খাঁর গোবিন্দ বিজয়, ২৫। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, ২৬। সিদ্ধান্তকৌমুদী, ২৭। ভাগবত (দশম), ২৮। দ্বিজ মাধব কৃত ভাগবতের অনুবাদ, ২৯। চৈতন্যচরিতামৃত, ৩০। ঐ।

৪। শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই, তিব্বতের লামা ও লামাধর্ম্ম বিষয়ে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতার সহিত টাসিলুম্পো নগরের বৌদ্ধবিহার পরিপূর্ণ ও বৌদ্ধগণের ভবচক্রের ও তান্ত্রিক দেবদেবীর অনেকগুলি চিত্র প্রদর্শিত হইল। বক্তার সঙ্কলিত Tibetan-English Dictionary হইতে লামা শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ পড়িয়া শুনাইলেন। বক্তৃতার মর্ম্ম এই—

'লামা' শব্দের অর্থ উচ্চ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি। মুখ্যতঃ ঐ শব্দে বৌদ্ধবিহারের যে কোন পণ্ডিত ভিক্ষুকে বুঝায় ও গৌণতঃ সংস্কৃত গুরুশব্দ 'লামা' শব্দের অনুবাদে ব্যবহার হইতে পারে। তিব্বতে টাসিলুম্পো নগরে বহুসংখ্যক বৌদ্ধবিহার আছে। টাসি শব্দের অর্থ মঙ্গল, লুম্পো শব্দের অর্থ স্তূপ বা কুট। টাসিলুম্পো অর্থে মঙ্গলকুট, ইংরাজিতে Heap of Glory বলা যাইতে পারে। টাসিলুম্পো বিহারের প্রধান লামার নাম টাসিলামা। লাসা নগরের প্রধান লামা এক্ষণে ডালাই লামা নামে পরিচিত। ইনি পূর্ব্বে প্রজ্ঞাসাগর উপাধিতে ভূষিত হইতেন। আলটাই খাঁ নামক মোগল-ভূপতি ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া প্রজ্ঞাসাগর নামের 'সাগর' শব্দটির অনুবাদে টালাই শব্দ ব্যবহার করেন। তদনুসারে তাঁহার নাম টালাই লামা, ইংরেজিতে ডালাই লামা হইয়া গিয়াছে। ডালাই লামা টাসি লামার গুরুস্থানীয়। বক্তা টাসি লুম্পো নগরের চিত্র দেখাইয়া তদন্তর্গত টাসি লামার রাজধানী ও অন্যান্য বিহারের সবিস্তার বিবরণ দিলেন। বক্তা স্বয়ং বহুকষ্টে গবর্ণমেন্টের অনুমতি পাইয়া ২২০০০ হাজার ফুট্ উচ্চ হিমমণ্ডিত পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া টাসি লুম্পোতে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং সেখানে বৌদ্ধবিহারে অধ্যয়নাদি করিয়াছিলেন ও ভিক্ষুগণের উপাসনায় উপস্থিত থাকিতেন। কোন কোন বিহারে চারি হাজার ভিক্ষু সমবেত হইয়া উপাসনা করেন। প্রাতঃকালে যখন উষ্ণতা শূন্য অঙ্কের ২০ ডিগ্রী নীচে থাকে, তখনও ভিক্ষুদিগকে খালি পায়ে উপাসনার জন্য সমবেত হইতে হয়। উপাসনার পর সকলে মন্দির প্রদক্ষিণ করেন। বুদ্ধের মৃত্যুর প্রায় দুইশত বৎসর পরে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রথম প্রচলিত হয়। হুনেরা বান্ ধর্ম্ম বা স্বস্তিক ধর্ম্ম প্রচলিত করেন। তিব্বতীরা আপনাদিগকে হনুমানের বংশধর বলিয়া বিবেচনা করে। এই হনুমান সম্ভবতঃ হুনবীর ছিলেন।

বৌদ্ধধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকালে সিদ্ধ নাগার্জ্জুন-প্রণীত মহাযান মতের প্রবর্ত্তনা হয়। নাগার্জ্জুন বিদর্ভদেশের অমরাবতী নিবাসী ব্রাহ্মণ ছিলেন। মহাযান মতে একমাত্র সৎপদার্থ শূন্য। আত্মার অস্তিত্ব নাই। কর্ম্মফলে মনুষ্য স্বর্গ বা নরক ভোগ করে। কর্ম্মক্ষয়ের পর নরলোকে ফিরিয়া আসিতে হয়। অনন্তকাল ধরিয়া স্বর্গ বা নরকবাস বৌদ্ধধর্ম্মবাদীরা স্বীকার

করেন না। খৃষ্টানীমত অপেক্ষা এই মত সমীচীন। বৌদ্ধগণ হিন্দুর দেবদেবীর অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাঁহারা কর্ম্মফলে এক্ষণে স্বর্গবাসী, এবং কর্ম্মফলের ক্ষয় হইলে আবার নরলোকে ফিরিয়া আসিবেন। কর্ম্মানুসারে দেব, নর, তির্য্যক্, প্রেত, অসুর, ও নরক এই লোকে জীবকে ভ্রমণ করিতে হয়। বক্তা ভবচক্রের চিত্র প্রদর্শন করিলেন, ঐ চিত্রে ঐ লোক-সমূহের প্রতিকৃতি এবং মনুষ্যের জন্ম গ্রহণ হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত নানা দশার প্রতিকৃতি আছে। ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে বৌদ্ধবিহারসমূহের যে সকল অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল, তিব্বতের বিহারে এখনও তাহার প্রচলন রহিয়াছে।

ওয়ারেণ হেষ্টিংসের প্রেরিত সেনা কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া তৎকালের ভুটানরাজ তাঁহার গুরু টাসি লামার শরণাপন্ন হন। টাসি লামা পূর্ণগিরি নামক মহান্তকে হেষ্টিংসের নিকট প্রেরণ করেন এবং হেষ্টিংসের প্রেরিত বগ্‌ল্ (Bogle) সাহেব বহুদিন তিব্বতে বাস করিয়া আসেন। টাসি লামা সুভূতি নামক বৌদ্ধ স্থবিরের অবতার। যৌবন প্রাপ্ত হইলে অধীন ভিক্ষুগণ ষড়্‌যন্ত্র করিয়া বিষপ্রয়োগে টাসি লামাকে জন্মান্তর গ্রহণে বাধ্য করিবার চেষ্টা করে। তাঁহার মৃত্যুর পর নানা স্থান হইতে তাঁহার জন্মান্তরগ্রহণের সংবাদ আইসে। ঐ সকল শিশুকে নানারূপ পরীক্ষা করিয়া কোন্ শিশু প্রকৃত অবতার তাহা নির্ণয় করা হয়। তিব্বতের শাসনপ্রণালীর এরূপ সুব্যবস্থা যে, এইরূপে লামার স্থান শূন্য থাকিলেও কোনরূপ সমাজ বিশৃঙ্খলা বা বিপ্লব উপস্থিত হয় না। তিব্বতবাসী লামাদের প্রধান খাদ্য যবের ছাতু, চা, দধি, শুষ্ক ছানা এবং মেষ, ছাগ, ও চমরীর কাঁচা, রাঁধা ও শুষ্ক মাংস। বক্তৃতার পর বক্তা বৌদ্ধ-গণের উপাস্য তান্ত্রিক দেবদেবীগণের কতকগুলি চিত্র দেখাইলেন।

বক্তৃতা শেষ হইল, সম্পাদক বক্তার এই শিক্ষাপ্রদ ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতার জন্য পরি-ষদের কৃতজ্ঞতা জানাইয়া তিনি ভবিষ্যতে অবকাশমত পরিষৎকে এইরূপ উপকৃত ও আনন্দিত করিবেন এইরূপ প্রার্থনা জানাইলেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন, তিব্বত সম্বন্ধে বিস্তার গভীরতায় রায় শরচ্চন্দ্র দাস বর্ত্তমানকালে পৃথিবী মধ্যে অদ্বিতীয়, তাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও স্বীকার করিয়া থাকেন। তিনি যেরূপ বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তিব্বত সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন ও তিব্বতীদের ভাষা ও শাস্ত্র অধ্যয়নে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা অন্য কোন পণ্ডিতের ভাগ্যে ঘটে নাই। তাঁহার বক্তৃতার জন্য কৃতজ্ঞতা ভিন্ন অন্য বক্তব্য নাই।

৫। তৎপরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১) ৺রমণীমোহন সিংহ (২) ৺কুমার বীরেন্দ্রদেব রায় (৩) ৺কুমার দক্ষিণেশ্বর মালিয়া (৪) কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, পরিষদের এই কয়জন সভ্যের মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, ইঁহাদের অধিকাংশেরই অকাল মরণে পরিষৎ ব্যথিত। ৺রমণীমোহন সিংহ ভাগলপুরের প্রসিদ্ধ উকীল ৺রায় বাহাদুর সূর্য্যনারায়ণ সিংহের পুত্র, তিনি অল্পদিন হইল পিতার ত্যক্ত অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছিলেন, কিন্তু এত ধনসম্পত্তির অধিকারী হইয়াও তিনি বিনয়ী অমায়িক ও নিরহঙ্কার প্রকৃতির লোক ছিলেন।

স্বজাতীয় দরিদ্র বালকগণের শিক্ষাদানের ও উপকারের জন্য ব্যয়ে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। সর্ব্ববিধ সৎকর্ম্মে তাঁহার অনুরাগ ছিল। তাঁহার পিতা এদেশে বিজ্ঞানশিক্ষার উন্নতিকল্পে এক লক্ষ টাকা দানের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন। রমণী বাবু ঐ টাকা গবর্ণমেণ্টের বা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের হস্তে প্রদান করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন। দেশস্থ সুধীগণের সহিত পরামর্শ করিয়া উহার ব্যবস্থা করিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল। প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষাপরিষদের কর্ত্তৃপক্ষগণের হস্তে উহা দিবেন কি না, এসম্বন্ধে তাঁহার সহিত পরিষৎ-সম্পাদকের পত্র-বিনিময় হইতেছিল, এবং এ সম্বন্ধে রমণী বাবুর পৌষমাসে লিখিত শেষ পত্র এখনও পরিষৎ সম্পাদকের নিকট রহিয়াছে। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে দেশের বিশেষতঃ উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজের বিশেষ ক্ষতি হইল।

৺কুমার বীরেন্দ্রদেব রায়, উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজের অন্তর্গত বিখ্যাত বাঁশবেড়িয়ার রায় মহাশয় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশ নানা কারণে সমাজে সুবিখ্যাত। কুমার বীরেন্দ্র দেব অল্প দিন হইল পরিষদে যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহার আকস্মিক অকাল মৃত্যুতে আমরা দুঃখিত।

শিয়ারশোলের ৺কুমার দক্ষিণেশ্বর মালিয়া বহুদিন হইতে পরিষদের হিতৈষী সভ্য ছিলেন। তিনি পরিষদের গৃহনির্ম্মাণকল্পে ২০০৲ টাকা দানে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন এবং আরও দান করিবেন এইরূপ আশা দিয়াছিলেন। পরিষৎ তাঁহার ন্যায় উচ্চপদস্থ মিত্রের অকাল মৃত্যুতে অতিশয় দুঃখিত। ৺কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় একজন পরিষদের পুরাতন হিতৈষী সভ্য ছিলেন ও পরিষৎকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন।

ইঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারদিগকে সমবেদনা জানাইবার প্রস্তাব গৃহীত হইল।

৬। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রেরিত একজন জাপানী চিত্রকরের অঙ্কিত লাসা নগরের চিত্র দেখাইলেন, পরিষৎ গগন বাবুকে ধন্যবাদ দিলেন।

৭। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী বরিশালে প্রস্তাবিত সাহিত্যসম্মিলনের কথা উপস্থিত করিয়া তৎসম্পর্কে শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরীর নিমন্ত্রণপত্র পড়িয়া পরিষদের সভ্যগণকে ঐ সাহিত্যসম্মিলনে উপস্থিত হইতে অনুরোধ করিলেন। সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ঐ সম্পর্কে বলিলেন, যে স্বদেশী আন্দোলনের সময় পূজার পূর্ব্বে টাউনহলে রবীন্দ্র বাবু বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বার্ষিক সাহিত্যসম্মিলনের প্রস্তাব উপস্থিত করেন। তিনি পরিষৎকে ঐরূপ অনুষ্ঠানের আয়োজন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। উহাতে ব্যবচ্ছিন্ন বঙ্গের বিভিন্ন স্থানের সাহিত্যসেবীরা সম্মিলিত হইলে সাহিত্যের বন্ধনে জাতীয়তার বন্ধন দৃঢ়ীকৃত হইবে; তদ্ব্যতীত বিলাতে British Association যেরূপ ব্রিটিস সাম্রাজ্যের বিভিন্ন নগরে বর্ষে বর্ষে মিলিত হইয়া বিজ্ঞানচর্চ্চা ও বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন করেন; সেইরূপ বঙ্গের সাহিত্যিকগণও স্থানীয় তথ্য স্থানীয় ইতিহাস প্রভৃতির সঙ্কলনে সুযোগ পাইবেন। তদনুসারে পরিষৎ ঐ

অনুষ্ঠানে উদ্যোগী ছিলেন। এবং পরিষদের রঙ্গপুরের শাখা মূল পরিষৎকে ও অন্যান্য সাহিত্য-সভাকে নিমন্ত্রণ দ্বারা রঙ্গপুরেই ঐরূপ সাহিত্যসম্মিলনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। বঙ্গের বিভিন্ন জেলার লোককে এ বৎসর রঙ্গপুর উপস্থিত করা সুসাধ্য হইত না। Provincial Conference উপলক্ষে বাঙ্গালার নানা স্থান হইতে প্রতিনিধিগণ ঈষ্টারের সময় বরিশালে উপস্থিত হইবেন। ঐ সময়ে সাহিত্যিক সম্মিলনের প্রস্তাব করিয়া বরিশালবাসীরা পরিষদের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করা সুসাধ্য করিয়াছেন। এইজন্য পরিষৎ তাঁহাদের নিমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করিয়া পরিষদের সকল সভাকে বরিশালে পরিষদের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হইতে অনুরোধ করিতেছেন। যাঁহারা ইচ্ছুক, তাঁহাদের নাম দেবকুমার বাবুর নিকট প্রেরিত হইবে। বলা বাহুল্য, এই সাহিত্যিক-সম্মিলনের সহিত কোন রাজনৈতিক আলোচনার সম্পর্ক থাকিবে না।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী — শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সভাপতি

৭ম বিশেষ অধিবেশন।

২০ চৈত্র ৩রা এপ্রিল মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৫॥০টা।

স্থান—মিনার্ভা থিয়েটার।

উপস্থিত ব্যক্তিগণ।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতি।

শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী	শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ দত্ত
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ বি এল্	" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
" বিপিনচন্দ্র পাল	" অমৃতলাল বসু
" ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ	" ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ
" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ বি এল্	" বাণীনাথ নন্দী
" অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ	" সতীন্দ্রসেবক নন্দী
" গৌরহরি সেন	" রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী
" ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ	" গোবিন্দলাল দত্ত

শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর মিত্র এম্ এ
" মহেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
" মহেন্দ্রলাল মিত্র
" যতীশচন্দ্র সমাজপতি
শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রকৃষ্ণ বসু
" পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
" পূর্ণচন্দ্র বসু
" অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল্
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম এ—সম্পাদক।
" মন্মথমোহন বসু বি এ }
" ব্যোমকেশ মুস্তফী } সহ সম্পাদক।

কলিকাতায় উপস্থিত পরীক্ষার্থী ও অন্যান্য ছাত্রগণকে অভ্যর্থনার জন্য এই বিশেষ অধিবেশন আহূত হইয়াছিল। মিনার্ভা থিয়েটারে সভার অধিবেশন হয়। উপস্থিত ছাত্রগণে থিয়েটার গৃহ পূর্ণ হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে "বন্দে মাতরম্" সম্প্রদায় "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীত শুনাইলেন। শ্রোতৃবর্গ দণ্ডায়মান হইয়া মাতৃসঙ্গীত শুনিলে পর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় একটী জাতীয় সঙ্গীত ও জয়দেবের দশাবতারস্তোত্র গান করিলেন।

শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ দত্ত মহাশয় ছাত্রগণকে সম্বোধন করিয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া স্বরচিত একটি কবিতা আবৃত্তি করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসু মহাশয় "সোণার বাংলা" সঙ্গীত গান করিলেন।

সভাপতির আদেশক্রমে সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ছাত্রগণকে সাদরে আহ্বান করিয়া গতবৎসরের শেষে পরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক ছাত্রগণের প্রতি আবেদনের উল্লেখপূর্ব্বক অতীত বৎসরে ছাত্রগণের স্বদেশসেবার কথা বিশেষরূপে উল্লেখ করিলেন, আগামী বৎসর সাহিত্য-পরিষদের জন্য প্রাদেশিক সাহিত্যসঙ্কলন ও প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ ইত্যাদি বিষয়ে উদ্যোগী হইতে বলিলেন।

তৎপরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দীর্ঘ বক্তৃতায় ছাত্রগণকে কোন্ পথে কিরূপে বাঙ্গলা সাহিত্যের সেবায় নিযুক্ত হইতে হইবে তাহা বুঝাইয়া দিলেন।

[ঐ বক্তৃতার মর্ম্ম ১৩১৩ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে]

হাস্যরসিক শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় হাস্যরসের প্রবাহে সভাস্থল ভাসাইয়া ছাত্রগণকে আগামী ছুটির বিশ্রাম উপলক্ষে প্রাদেশিক সাহিত্য সংগ্রহ দ্বারা আনন্দ লাভের জন্য উৎসাহিত করিলেন।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বাঙ্গলা সাহিত্যের সেবা স্বদেশের সেবা ও স্বদেশী আন্দোলনের অঙ্গ, ইহা বিশদরূপে বুঝাইয়া ছাত্রগণকে দেশের জন্য পরিশ্রম ও ত্যাগস্বীকারে উৎসাহিত করিলেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনিবার্য্য কারণে উপস্থিত হইয়া ছাত্রগণকে সম্ভাষণ করিতে পারিলেন না, এ বিষয়ে যে পত্র লেখেন, সম্পাদক তাহা পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় স্বীয় ওজস্বিনী ভাষায় বাঙ্গলা সাহিত্যের আলোচনায় ছাত্রগণকে নিযুক্ত হইতে আহ্বান করিলেন।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু ছাত্রগণকে পরিষদের উদ্দেশ্য ও তৎসাহায্যার্থ তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় কতিপয় সারগর্ভ কথায় ছাত্রগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করিলেন।

শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু মহাশয় একটী জাতীয় সঙ্গীত গান করিলে সভাপতিকে, মিনার্ভা থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণকে, বন্দে মাতরম্ সম্প্রদায়কে ও গায়ক মহাশয়গণকে পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইয়া পরে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
সম্পাদক।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সভাপতি।

দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশন।

গত ৬ই জ্যৈষ্ঠ (১৩১৩), ২০শে মে (১৯০৬), রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥০টার সময়, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন,—

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
" অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
" রমেশচন্দ্র বসু
" যতীশচন্দ্র সমাজপতি
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
" মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী
" জগদ্বন্ধু মোদক
" নিশিকান্ত সেন
" যাদবচন্দ্র মিত্র
" কিরণচন্দ্র দত্ত
" চারুচন্দ্র মিত্র
" সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু
" গোবিন্দলাল দত্ত
" নগেন্দ্রনাথ বিদ্যাম্বুধি
" প্রবোধচন্দ্র বিদ্যার্ণব
" ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ
" অক্ষয়কালী কোঙার
" নিবারণচন্দ্র চৌধুরী
" দীনেশচন্দ্র সেন
" তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
" মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" যোগেশচন্দ্র বসু

ছাত্র সভ্য—শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্র
" হৃষীকেশ মিত্র
" মন্মথনাথ সুর

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
" মন্মথমোহন বসু বি, এ
} সহকারী সম্পাদক।

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল,—

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সভ্য-নির্ব্বাচন। ৩। গ্রন্থোপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৪। দ্বাদশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ৫। ত্রয়োদশ বর্ষের কর্ম্মচারি নিয়োগ ও কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি গঠন। ৬। শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরমহাশয় কর্ত্তৃক জাপানী চিত্রকরের অঙ্কিত মেঘদূতের কয়েকখানি চিত্র-প্রদর্শন। ৭। শ্রীযুক্ত অমূল্য-চরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক ১৩১২ সালের বাঙ্গালা সাহিত্য-বিবরণ পাঠ। ৮। শ্রীযুক্ত

নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কর্ত্তৃক "প্রাচীন বাঙ্গালা" নামক প্রবন্ধ পাঠ। ৯। মিউনিসিপ্যালিটি কর্ত্তৃক গৃহনির্ম্মাণের নক্শা অনুমোদন সংবাদ। ১০। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সমগ্র সভার অনুমোদনে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

তৎপরে গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	১। শ্রীসুবোধচন্দ্র রায় বি, এ, ২৯।৪ কৃষ্ণদাস পালের লেন
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	"	২। শ্রীশ্যামলাল বসাক, ৪১ রতন সরকার্স্ গার্ডেন লেন
"	"	৩। শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী জমীদার, ঘুঘুডাঙ্গা
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	৪। ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ বসু এম্, বি, হোগলকুড়িয়া
"	"	৫। শ্রীযোগেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি,এ ইছাপুর, লালবাড়ী, ঢাকা
"	"	৬। শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত, আগরতলা, ত্রিপুরা
"	"	৭। শ্রীজগদীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রতন সরকার্স্ গার্ডেন লেন
"	"	৮। শ্রীচারুচন্দ্র বসু, ২৮কালীপ্রসন্ন দত্তের ষ্ট্রীট
"	"	৯। শ্রীঅক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, ৬৪ কলেজ ষ্ট্রীট
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	১০। শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্, কৃষ্ণগঞ্জ, নদীয়া
মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	শ্রীরমেশচন্দ্র বসু	১১। শ্রীমন্মথনাথ বসু এম্, এ, ব্যারিষ্টার, ভবানীপুর
শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	১২। শ্রীহরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এল্ হরীতকী বাগান

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	১৩। শ্রীপ্রতুলচন্দ্র দত্ত এম্, এ, বি, এল্ ৪ গঙ্গাধর বসুর লেন
„	„	১৪। শ্রীঅতুল্যচরণ বসু বি, এল্, ৩৬ চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের লেন
„	„	১৫। শ্রীবৈদ্যনাথ দত্ত বি, এল্, ১৭ গোপীকৃষ্ণ পালের লেন
„	„	১৬। শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস এম্, এ, বি, এল্ ৩৯ চক্রবেড় রোড, ভবানীপুর
„	„	১৭। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মজুমদার এম্এ বিএল্ ২০ শাঁখারিপাড়া রোড, ভবানীপুর
„	„	১৮। শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ বি, এল্ ৫৯ সুকিয়া ষ্ট্রীট
„	„	১৯। শ্রীবিপিনচন্দ্র মল্লিক, এম্এ, বিএল্ ১৫ শ্রীনাথ দাসের লেন
„	„	২০। শ্রীভুজগেন্দ্র মুস্তফী বি, এল্, ১৫।১ রাজা বাগান জংসন রোড
„	„	২১। শ্রীদ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী এম্এ বিএল ৭২ রসা রোড
„	„	২২। শ্রীদাশরথী সান্যাল বি,এল, ৭১ষ্ট্রাণ্ডরোড
„	„	২৩। শ্রীদ্বারকানাথ মিত্র এম্, এ বি, এল ২৫ নন্দরাম সেনের ষ্ট্রীট
„	„	২৪। শ্রীগিরিশচন্দ্র পাল বি, এল, ১০।৩ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
„	„	২৫। শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দেরায় এম্এ, বিএল ২৫ পদ্মপুকুর রোড
„	„	২৬। শ্রীহরেন্দ্রনারায়ণ মিত্র এমএ, বিএল ৯৯ কাঁসারিপাড়া রোড
„	„	২৭। শ্রীহেমচন্দ্র মিত্র বি, এল, ২৯ হজুরীমলস্ লেন
„	„	২৮। শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল এমএ বিএল [illegible]

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
"	"	২৯। শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সেন বি, এল, ৭৬ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট
"	"	৩০। শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এমএ বিএল ৮ চন্দ্রনাথ চাটুর্য্যের লেন
"	"	৩১। শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম,এ, বি,এল, ৭০ শাঁখারীটোলা
"	"	৩২। শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এমএ, বিএল, ১৩ জেলেপাড়া লেন
"	"	৩৩। শ্রীকৃতান্তকুমার বসু এমএ, বিএল, ৫ চন্দ্রনাথ চাটুর্য্যের লেন
"	"	৩৪। শ্রীলালমোহন দাস এমএ, বিএল, ১১০ রসা রোড, ভবানীপুর
"	"	৩৫। শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায় এম, এ, বিএল, ২ বলরাম বসুর ১ম লেন
"	"	৩৬। শ্রীমোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী এমএ, বিএল, ৩১ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট
"	"	৩৭। শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বিএল, ৪৪ মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীট
"	"	৩৮। শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র বসু বি, এল, ৫৯ পদ্মপুকুর রোড
"	"	৩৯। শ্রীনরেন্দ্রকুমার বসু বি, এল, ১৮ বেনীয়াটোলা লেন
"	"	৪০। শ্রীনরেন্দ্রনাথ শেঠ বিএল, ৭৮ বীডনষ্ট্রীট
"	"	৪১। শ্রীপ্রমথনাথ সেন এম, এ, বি এল, ২৩ নেবুতলা লেন
"	"	৪২। শ্রীপ্রিয়নাথ সেন এম, এ, বি, এল, ২২ শাঁখারীপাড়া রোড
"	"	৪৩। শ্রীরমাকান্ত ভট্টাচার্য্য বি, এল, ৬ ল্যান্সডাউন রোড
"	"	৪৪। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ পালিত বি, এল, ১৩ বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মল্লিক	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৪৫। শ্রীশরৎচন্দ্র খাঁ বি, এল, ৫১।৩ রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট
”	”	৪৬। শ্রীশরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম,এ, বি,এল ৬৩ পদ্মপুকুর রোড
”	”	৪৭। শ্রীশরচ্চন্দ্র রায়চৌধুরী এম,এ, বি,এল, ৪২ মদন বড়ালের লেন,
”	”	৪৮। শ্রীশরচ্চন্দ্র লাহিড়ী এম,এ বি, এল, ৪।১ কুণ্ডু রোড
”	”	৪৯। শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ বি, এল, ৮ চন্দ্রনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট
”	”	৫০। শ্রীমৌলবী সামসুল হুদা এম,এ, বি,এল ৩ নূরউল্লা ডক্টর্স লেন, বালীগঞ্জ
”	”	৫১। শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু বি, এল, ৫৯ পদ্মপুকুর রোড
”	”	৫২। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর বি,এল,১৬ রসারোড
”	”	৫৩। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম,এ, বি,এল ৪২ কাঁসারি পাড়া রোড
”	”	৫৪। শ্রীতারকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এল, ৫২।৫ কাঁসারি পাড়া রোড
”	”	৫৫। শ্রীতারাকিশোর চৌধুরী এম,এ বি,এল ৪৭ বসুপাড়া লেন
”	”	৫৬। শ্রীউমাকালী মুখোপাধ্যায় বি, এল, ১০।১ গড়বাড়ী রোড
”	”	৫৭। শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়া, হুগলী
”	”	৫৮। মৌঃ জাহুয়াদ্দব রহিম জাহেদ এম,এ, বি,এল, ৩৪ ইলিয়ট রোড
”	”	৫৯। শ্রীযদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কবিরত্ন, সাউথগড়িয়া, ২৪ পঃ
”	”	৬০। জানকীনাথ গুপ্ত এম, এ, ৩১ ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মল্লিক	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৬১। মৌঃ নূর আহম্মদ, ২৬কড়েয়া গোরস্থান
”	”	৬২। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র হালদার, ৬৩ কলেজষ্ট্রীট
”	”	৬৩। শ্রীবরদাপ্রসাদ বসু, ৭৯ হ্যারিসন রোড কলিকাতা
”	”	৬৪। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, ১০৩ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা
”	”	৬৫। শ্রীবিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়, ২৬ কালিপ্রসাদ দত্তর ষ্ট্রীট
”	”	৬৬। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল, মলঙ্গা লেন
”	”	৬৭। শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায় এম, এ
”	”	৬৮। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল গুপ্ত এম,এ

৩। অতঃপর নিম্নলিখিত উপহৃত পুস্তকগুলির উপহারদাতৃগণকে পরিষদের কৃতজ্ঞতা জানাইয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

পুস্তক	উপহারদাতা
১। তীর্থ-মঙ্গল (পুঁথি)	শ্রীশিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
২। লাট কর্জ্জন	শ্রীমতী জগৎতারিণী দেবী
৩। বন্দে মাতরম্ (যুবরাজের ভারত আগমন উপলক্ষে)	শ্রীনারায়ণদাস তুলসী
৪। শ্রীশ্রী-উপাসনা-চন্দ্রামৃত	শ্রীমুরারিরঞ্জন সিংহ
৫। আনন্দলহরী	শ্রীপূর্ণানন্দ ঘোষ রায়
৬। সাকার ও নিরাকার তত্ত্ববিচার ৭। উড়িষ্যার চিত্র	শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ
৮। অবধূতগীতা ৯। ধর্ম্মের জয় ১০। জিজ্ঞাসা	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
১১। Bengali Spoken and written	শ্রীশ্যামাচরণ গাঙ্গুলী
১২। মুণ্ডকোপনিষৎ (in English) ১৩। সমাজীত মায়ের বিধান ১৪। স্বদেশ রেণু	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
১৫। দুর্গালীলা তরঙ্গিণী	শ্রীসুবোধচন্দ্র রায়
১৬। University Minutes, Calcutta	Registrar, Calcutta University
১৭। Henry Derozio	শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ

১৮। সংক্ষিপ্ত শরীরতত্ত্ব
১৯। ভৈষজ্যরত্নাবলী
২০। ভিষক্ সুহৃদ্
২১। কল্পসংহিতা
২২। সংক্ষিপ্ত ভৈষজ্যতত্ত্ব
২৩। প্লেগ
২৪। রোগিপরিচর্য্যা

} ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর

তৎপরে দ্বাদশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল। এই বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ হইতে জানা যায় :—

আলোচ্য বর্ষে—পরিষদের শতাধিক নূতন সভ্য বৃদ্ধি হইয়াছে। পুস্তকালয়ে ৩৭৯০ খানি পুস্তক জমিয়াছে—৪৬৫খানি পুথি ও প্রায় তিন শতাধিক দুষ্প্রাপ্য পুস্তকও সংগৃহীত হইয়াছে। মাসিক পত্র (নব্য ও প্রাচীন, লুপ্ত ও চলিত) প্রায় তিনশত সংগৃহীত হইয়াছে। গত বৎসরে পরিষদের আয় ৪০২০৲, ব্যয় ৪০০১৲ ও উদ্বৃত্ত ১৯৲ টাকা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল দত্ত মহাশয়ের সমর্থনে এবং সমগ্র সভার অনুমোদনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ১৩১৩ বঙ্গাব্দের জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলেন।

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্, এ, বি, এল, (সভাপতি)
" " " আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এম্,এ,বি,এল
" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
" ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল
} সহকারী সভাপতি

অধ্যাপক " রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ (সম্পাদক)
" মন্মথমোহন বসু বি, এ
" ব্যোমকেশ মুস্তফী
} সহকারী সম্পাদক

" নগেন্দ্রনাথ বসু—পত্রিকা-সম্পাদক
" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল—ধন-রক্ষক
" অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ—গ্রন্থ-রক্ষক
" নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম্, এ, বি, এল্—ছাত্র-সভ্যগণের পরিদর্শক
" গৌরীশঙ্কর দে এম্, এ, বি, এল্
" ললিতচন্দ্র মিত্র এম্, এ
} আয়-ব্যয়-পরীক্ষক

অতঃপর সমগ্র সভ্যের নির্ব্বাচনে যাঁহারা ১৩১৩ বঙ্গাব্দের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহাদের নাম :—

কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম, এ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম,এ,বি,এল
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম,এ	" অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি,এল
" ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম,এ	" বিহারীলাল সরকার
" হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত এম,এ	" শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
রায় " বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর	" সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই দ্বাদশ জন সভ্য ও কর্ম্মচারীর মধ্যে আয়-ব্যয়-পরীক্ষকদ্বয় ব্যতীত অপর ত্রয়োদশ জন কর্ম্মচারীকে লইয়া ১৩১৩ বঙ্গাব্দের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইল।

৭। তৎপরে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ১৩১২ সালের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ পাঠ করিলেন। এ বৎসর আজিও গবর্মেণ্টের তালিকা সম্পূর্ণ প্রকাশিত না হওয়ায় অমূল্য বাবুর বিবরণও সম্পূর্ণ হয় নাই। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় অমূল্য বাবুর সাহিত্য-বিবরণী সংগ্রহের প্রণালীর প্রশংসা করিয়া ধন্যবাদ জানাইলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় গগন বাবুর প্রেরিত মেঘদূতের ছবিগুলি এবং হরধ্যানভঙ্গের ছবি সভাস্থলে উপস্থিত করিয়া উহা ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে দেখাইলেন এবং গগনেন্দ্র বাবুকে পরিষদের ধন্যবাদ জানাইবার প্রস্তাব করিলে তাহা গৃহীত হইল।

৮। তৎপরে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় প্রাচীন বাঙ্গালার পুরাতত্ত্ব আলোচনায় যে সকল অপ্রকাশিত ঐতিহাসিকতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাই বিজ্ঞাপন করিয়া "প্রাচীন বাঙ্গালা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। নগেন্দ্র বাবু প্রাচীন বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে যে ধারাবাহিক প্রবন্ধ পরিষদে পাঠ করিতে প্রতিশ্রুত আছেন, বর্ত্তমান প্রবন্ধ তাহারই মুখবন্ধ স্বরূপ।

তৎপরে মিউনিসিপালিটী হইতে পরিষদের গৃহনির্ম্মাণের নক্সা অনুমোদিত হইয়াছে, এই সংবাদ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় সকলকে জানাইলেন এবং নক্সা সকলকে দেখাইলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতিরূপে গত বর্ষের কর্ম্মচারিবৃন্দ এবং হিতৈষিবর্গকে ধন্যবাদ জানাইয়া উপস্থিত সভ্যমণ্ডলীকে গৃহনির্ম্মাণকার্য্যে সাহায্য দান ও সাহায্য সংগ্রহ করিয়া দিবার অনুরোধ করিলেন, তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সহঃ সম্পাদক।	সভাপতি।

প্রথম মাসিক অধিবেশন

৩ আষাঢ়, ১৭ জুন, রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥০ টা

উপস্থিত ব্যক্তিগণের নাম।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল, (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি, এল,	শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল,
" বোধিসত্ত্ব সেন এম, এ,	শ্রীযুক্ত হরিপদ চট্টোপাধ্যায়
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়,	" বিহারীলাল সরকার
" নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম, এ,বি,এল,	" অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
" দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ	" চারুচন্দ্র মিত্র এম, এ,
" ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম,এ,	" নিশিকান্ত সেন
" নরেন্দ্রনাথ দত্ত,	" বাণীনাথ নন্দী
" যতীশচন্দ্র বসু এম, এ,	" সুরেন্দ্রনারায়ণ রায় বি, এ,
" শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরী এম,এ,বি,এল,	" নগেন্দ্রনাথ বসু
" রমেশচন্দ্র বসু	" রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী }
" মন্মথমোহন বসু বি, এ, } সহঃ সম্পাদক।

আলোচ্য বিষয়:—

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সভ্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহার-দাতাদিগকে ধন্যবাদজ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ। (১) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত "কুক্কুট-পাদ গিরি"। (২) শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দোপাধ্যায় বি, এ, লিখিত "এদেশের ভাস্করশিল্প ও ভাস্করগণের বিবরণ"। ৫। ৺যোগীন্দ্রনাথ সেন এম, এ, বি, এল, ৺মোহিত চন্দ্র সেন এম, এ, ৺নৃত্যগোপাল কবিরাজ, ৺চণ্ডীচরণ সেন বি, এ, ও ৺নগেন্দ্রবালা সরস্বতীর অকালমৃত্যুতে শোক-প্রকাশ। ৬। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। তৎপরে গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীসরসীলাল সরকার	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১। P Bruhl Esq M. I. E. E. Professor Sibpore College.

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীসরসীলাল সরকার	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	২। শ্রীবিপিনবিহারী দাস এম্, এ, শিবপুর কলেজ। শিবপুর।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীমন্মথমোহন বসু বি,এল	৩। শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি,এল, ১৩০ রামকৃষ্ণপুর লেন, শিবপুর
”	”	৪। শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মিত্র ৩৬ ক্রাইপার্স রোড কোন্নগর, ৭৮ ক্রস ষ্ট্রীট কলিকাতা।
শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীনিখিলনাথ রায়	৫। শ্রীপান্নালাল সিংহ জিয়াগঞ্জ মুর্শিদাবাদ
”	”	৬। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মিত্র, মেদিনীপুর।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	৭। ডি, এল, রায় এম, এ, বিএল,
”	”	৮। শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত ভান্দাঘোড়া হুগলী

৩। নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির উপহারদাতাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

(১) East India and Colonial Magazine, শ্রীরমেশচন্দ্র বসু।

(২) গৌড়ে ব্রাহ্মণ—শ্রীআশুতোষ মজুমদার রঙ্গপুর।

(৩) হিন্দুবিজ্ঞানসূত্র—শ্রীরেবতীমোহন চক্রবর্ত্তী চিথলিয়া, মিরপুর, নদীয়া।

৪। তৎপরে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "কুক্কুট-পাদগিরি" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। গয়ার নিকটবর্ত্তী গুর্পা বা গুরুপা (অর্থাৎ গুরুপাদ গিরি ?) যে মহাকশ্যপের নির্ব্বাণপ্রাপ্তির প্রকৃত স্থান বক্তা প্রমাণ ও যুক্তিদ্বারা এই প্রবন্ধে তাহাই নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, এবং এতদ্দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব মতের নিরসন করিয়াছেন। এই প্রবন্ধ "বাণী" পত্রিকার ৬ষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে)। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় প্রবন্ধের বিশেষ প্রশংসা করিয়া বলিলেন, প্রবন্ধলেখকের একটা কথা বড় চিত্তাকর্ষক। গুরুপাদ-গিরির ধূলিতে সকল রোগ আরাম হয়। ইহা যেমন রোগীর পক্ষে মহা আশ্বাসের কথা তেমনি পেটেণ্ট ঔষধ বিক্রেতাদিগের পক্ষে মহান্ প্রলোভনজনক। তৎপরে শ্রীযুক্ত নিখিল-নাথ রায় মহাশয়ও প্রবন্ধলেখককে প্রশংসা করিয়া ধন্যবাদ জানাইলেন।

৫। তৎপরে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় (১) ঢাকা ট্রেনিং স্কুলের প্রধান শিক্ষক অধ্যাপক কিশোরীমোহন গুপ্ত এম, এ, মহাশয়ের অকালমৃত্যুতে শোক-প্রকাশ করিয়া বলিলেন, কিশোরীবাবু সাহিত্য-পরিষদের পুরাতন সভ্য এবং ইহার প্রতি সদা স্নেহশীল ছিলেন। তিনি ঢাকা ট্রেনিং স্কুল হইতে পরিষৎ পত্রিকা গ্রহণের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া পরিষদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে পরিষৎ বিশেষ দুঃখিত (২) হাইকোর্টের উকীল ৺যোগেন্দ্রনাথ সেন এম, এ, বি, এল, সুকবি ছিলেন, পূর্ব্বে পরিষদের সভ্য ছিলেন, এবং সর্ব্বদা পরিষদের হিতকামনা করিতেন। মোটর গাড়ির আঘাতে তাঁহার শোচনীয় অপমৃত্যু পরিষদের পক্ষে ক্ষোভের কারণ হইয়াছে।

(৩) ৺মোহিতমোহন সেন এম, এ, মহাশয় সাহিত্য সেবী, অমায়িক, বিনয়ী, বিদ্বান্ সুচরিত্র ও সাহিত্য-পরিষদের হিতৈষী সভ্য ছিলেন। তাঁহার লিখিত ইংরাজি দর্শনশাস্ত্রের পুস্তক বিএ, পরীক্ষার পাঠ্য পুস্তক হইয়াছে। ৩৭ বৎসর বয়সে অধ্যাপক রূপে তিনি ছাত্রগণের নিকট দেবতুল্য শ্রদ্ধাভক্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইহার অল্প বয়সে মৃত্যু হওয়ায় ছাত্রসমাজ একজন সুবিজ্ঞ ও সুশিক্ষিত শিষ্যবৎসল অধ্যাপক হারাইয়াছেন, পরিষৎ ইহার অকালমৃত্যুতে বিশেষ দুঃখিত হইয়াছেন।

(৪) গত বৈশাখ মাসে একজন মহিলা কবির মৃত্যু হইয়াছে। ইহার নাম নগেন্দ্রবালা সরস্বতী, ইনি শেষাবস্থায় গদ্য প্রবন্ধ রচনায়ও বেশ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ইহার কাব্যগুলির পাঠকসংখ্যা বড় অল্প নহে। ইঁহার অকালমৃত্যুতে পরিষৎ দুঃখিত হইয়াছেন।

(৫) ঐতিহাসিক উপন্যাসমালার লেখক প্রবীণ সবজজ চণ্ডীচরণ সেন মহাশয়ও গতমাসে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। রমেশ বাবুর শতবর্ষের পর ঐতিহাসিক বিষয় লইয়া উপন্যাস লিখিতে চণ্ডীবাবুই পটুতা লাভ করিয়াছিলেন। বিদেশীয় উপন্যাস অনুবাদেও তাঁহার বেশ কৃতিত্ব ছিল। যদিও চণ্ডীবাবু পরিষদের সভ্য ছিলেন না, তথাপি তাঁহার ন্যায় প্রথিতনামা সাহিত্যসেবকের মৃত্যুতে পরিষৎ দুঃখিত হইয়াছেন।

(৬) তৎপরে শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় বলিলেন, পণ্ডিত নৃত্যগোপাল কবি-রত্নের অকালমৃত্যুতে আমি পরিষদের পক্ষ হইতে শোক-প্রকাশ করিতেছি। কবিরত্ন মহা-শয়ের সুচিকিৎসার কথা সর্ব্বত্র যেমন প্রশংসিত তেমনি কাব্যে ও নাটকে অসাধারণ অধিকার ছিল। সংস্কৃত নাটকগুলির প্রতি লোকের প্রীতি আকর্ষণের জন্য তিনি বাণীবিলাস নাট্যসম্প্রদায় স্থাপন করিয়া কয়েকখানি নাটকের অভিনয় করান। তিনি স্বয়ং শিক্ষা দিতেন। তিনি সিটিকলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক ছিলেন, তাঁহার অধ্যাপনায় ছাত্রেরা প্রীত ও সুশিক্ষিত হইত। বাঙ্গলা নাটকের প্রতিও তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল। তিনি নিজে কয়েকখানি বাঙ্গলা ও সংস্কৃত নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত নাটকগুলিও সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হইয়াছিল। তাঁহার কাব্য রচনা এত মধুর ও নির্দোষ যে, তাহার প্রণীত রামাবদান কাব্য জর্ম্মনীতে বিদ্যালয়ে পাঠ্য হইয়াছে। এ সৌভাগ্য অধুনাতন কোন ভারতবর্ষীয় লেখকের অদৃষ্টে ঘটে নাই। এই গুণশালী সাহিত্য-সেবককে হারাইয়া আমরা বিশেষ শোকানুভব করিতেছি।

এই সকল মৃত ব্যক্তিবর্গের পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাইয়া পত্র লিখিবার প্রস্তাব গৃহীত হইলে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়
সম্পাদক। সভাপতি।

১ম বিশেষ অধিবেশন

৯ই আষাঢ় ২৩শে জুন শনিবার, অপরাহ্ন ৫টা

উপস্থিত ব্যক্তিগণ।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার, (সভাপতি)

সার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌এ,ডিএল্ নাইট
" চন্দ্রনাথ বসু, এম্, এ, বি, এল্,
" ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এল,
" পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এল্,
" ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্, এ,
" শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, বি, এ,
রায় " শরচ্চন্দ্র দাসবাহাদুর, সি, আই, ই,
" ব্রজেন্দ্রকুমার শীল, এম্, এ,
পণ্ডিত " শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
" বিপিনচন্দ্র মল্লিক, বি, এল্,
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্, এ,
শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মিত্র, এম্, এ, বি, এল,
" হেমেন্দ্রনাথ সেন, বি, এ,
" শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, বি, এল্,
রায় " বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর
" নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
" অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
" নরেন্দ্রনাথ দত্ত
" সরলচন্দ্র ঘোষ (ছাত্র-সভা)
" নিশিকান্ত সেন
" বীরেশ্বর পাঁড়ে

শ্রীযুক্ত অমরাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়
" জানকীনাথ গুপ্ত, এম্, এ,
" প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি
ডাঃ সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু
বিহারিলাল সরকার
তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায়
নৃপতিনাথ ত্রিবেদী
রমেশচন্দ্র বসু,
চারুচন্দ্র মিত্র, এম্, এ,
ললিতচন্দ্র মিত্র, এম্, এ,
রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্‌এ,বি,এল্
কান্তিচন্দ্র সিংহ
বিরজাকান্ত রায়
সুরেন্দ্রনারায়ণ রায়, বি, এ
যাদবচন্দ্র মিত্র
রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী
গৌরহরি সেন
বাণীনাথ নন্দী

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্, এ, সম্পাদক।
" মন্মথমোহন বসু, বি, এল্,
" ব্যোমকেশ মুস্তফী
সহঃ সম্পাদক।

পরিষদের সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক বাঙ্গালা

বর্ণমালা ও বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য এই বিশেষ অধিবেশন হয়। সভাস্থল জনপূর্ণ হইয়াছিল, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় পরিষদের অধিবেশনে এতগুলি প্রাচীন খ্যাতনামা সাহিত্যসেবকের উপস্থিতির জন্য আনন্দপ্রকাশ করিয়া শ্রীযুক্ত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সভাপতির আসনগ্রহণে অনুরোধ করিলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতিত্বগ্রহণে সম্মত না হইয়া শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়কে সভাপতিত্বগ্রহণে অনুরোধ করিয়া ঐ প্রস্তাব সভাকর্ত্তৃক আহ্লাদসহকারে অনুমোদিত হইল।

অক্ষয় বাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে নিম্নলিখিত সভ্যগণ যথারীতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	১। ডাঃ শ্রীঅম্বিকাচরণ মজুমদার এল,এম্,এস ৯ সিকদারবাগান ষ্ট্রীট।
„	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	২। শ্রীবিধিনাথ চট্টোপাধ্যায় ৫।১১ আশুতোষ দের লেন।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীকিশোরীলাল সরকার	৩। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাগ্‌চী, বি, এ ৪৩।১ বাগবাজার ষ্ট্রীট।
শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৪। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৭।১ হৃদয়কৃষ্ণ ব্যানার্জির লেন, খ্যাটরা।
„	„	৫। শ্রীকিশোরীলাল সরকার এম্, এ বি, এল্ ১২১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
„	„	৬। যোগেন্দ্রনাথ মিত্র
„	„	৭। সরলচন্দ্র ঘোষ (ছাত্রসভ্য) ১ রাজাবাগান জংসন রোড।

তৎপরে শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার সভাপতি মহাশয় নিম্নের কবিতাটী সাহিত্যপরিষদকে উপহার দিলেন। ৺ভূদেব বাবুর পুস্তকালয়ে একখানি পুরাতন পুস্তকে ঐ কবিতাটী ভূমিকারূপে মুদ্রিত ছিল। সভাপতি মহাশয়ের মুখে কবিতা পাঠ শুনিয়া সভ্যগণ আনন্দিত হইলেন।

কবিতা

ইঙ্গ্‌লিশ দর্পণ নাম, নব্যগ্রন্থ অনুপাম

রচিত "গ্রেমের" সমুদ্ধৃত

বাক্য কোষের মত উচ্চারণ বিশেষিত

শ্রীরামচন্দ্রকৃত বিরচিত

গুরুসহ বাস লহ স্বরে কই পরংমহ
মহা মাংষ সংঘ দহ রঙ্গেতে
বৈশ্বানর দণ্ডধর নরকর নিশাকর
শাক বঙ্গশন করশঙ্কেতে
কলাবিদ্যাবিশারদ মহাশয় সব
ক্রীষ্টীয়েন শকাব্দা করিবে অনুভব
কলিকাত্তা মধ্যে লালবাজার প্রদেশে
মুদ্রাঙ্কিত হৈল তথি হিন্দুস্থানী প্রেসে

তৎপরে শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গলা বর্ণমালা সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করিলেন তাহার মর্ম্ম এই।

বাঙ্‌লা বর্ণমালা

আজিকার আলোচ্যবিষয়ের সম্যক্ আলোচনার জন্য নানা ভাষায় অভিজ্ঞতা আবশ্যক; আমার সেরূপ অভিজ্ঞতা না থাকিলেও আমি পরিষদের সম্মুখে আলোচনার প্রস্তাব করিতেছি মাত্র; পরিষদের মত, পণ্ডিতমণ্ডলী ইহার মীমাংসা করিবেন, আমার এই উদ্দেশ্য। ভাষার প্রয়োগের যথেচ্ছাচার দমন আবশ্যক হইয়াছে; পরিষৎ দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণের সভা, পরিষৎ এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করুন। আমি আজ কেবল বর্ণমালা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য উপস্থিত করিব। বাঙ্‌লার প্রচলিত বর্ণমালা সংস্কৃত হইতে গৃহীত; উহা বাঙলাভাষার উপযোগী কি না এবং উহার সংশোধন আবশ্যক কি না, তাহাই বিচার্য্য।

সংস্কৃত ও বাঙ্‌লা স্বতন্ত্র ভাষা; যাহা সংস্কৃতের পক্ষে উপযোগী, তাহা বাঙ্‌লার পক্ষে উপযোগী না হইতেও পারে। 'বর্ণ' শব্দ কি অর্থে প্রয়োগ করিতেছি, প্রথমে নির্দ্দেশ করা উচিত। উহা শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়। উদান বায়ু কণ্ঠনালী হইতে নিঃসৃত হইয়া শ্রবণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য শব্দের উৎপাদন করে; ঐ শব্দের অস্ফুট অবস্থার নাম 'ধ্বনি', স্ফুট অবস্থার নাম 'বর্ণ'। 'বর্ণের' যে সাঙ্কেতিক চিহ্ন দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয়, তাহা বর্ণ নহে, তাহা 'লিপি'। একই বর্ণের বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন লিপি প্রচলিত আছে। ভাষায় যতগুলি বর্ণের ব্যবহার আছে, ততগুলি সাঙ্কেতিক চিহ্ন অর্থাৎ এক এক বর্ণের জন্য এক এক চিহ্ন নির্দ্দিষ্ট থাকিলে লিপি সম্পূর্ণতা লাভ করে। সেরূপ সম্পূর্ণ লিপি এক সংস্কৃত ভিন্ন অন্য কোথাও নাই। ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় এক রোমান লিপি গ্রহণ করিয়া কাজ চালান হইতেছে, এক চিহ্ন বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন বর্ণের জ্ঞাপনার্থ প্রযুক্ত হয়। এক ভাষাতেও একই চিহ্নে নানাবর্ণ জ্ঞাপন করে; আবার এক বর্ণের জন্যও একাধিক চিহ্নের প্রয়োগ আছে। এই সকল কারণে ইউরোপের লিপিপ্রণালী অসম্পূর্ণ। সংস্কৃত-ভাষার লিপিতে সেরূপ অসম্পূর্ণতা নাই। তদ্ভিন্ন সংস্কৃত বর্ণগুলি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এমন সুসজ্জিত যে, উহাকেই প্রকৃত 'বর্ণমালা' বলা যাইতে পারে। সংস্কৃত বর্ণমালায় স্বর

ও ব্যঞ্জন এই দুই বিভাগ। মূল স্বরবর্ণ প্রকৃতপক্ষে পাঁচটি অ, ই, উ, ঋ, ঌ; ইহাদের হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত তিন মাত্রাভেদ আছে। এই কয়টি মূলস্বর ব্যতীত আর কতকগুলি সন্ধ্যক্ষর বর্ণ আছে। উহাদিগকে সঙ্করবর্ণ বলিতে পারা যায়। একাধিক স্বরবর্ণের সন্ধিতে এই সঙ্কর বর্ণগুলি উৎপন্ন। অনুলোম ও প্রতিলোম উভয় প্রণালীতে সন্ধি দ্বারা দ্বিবিধ সঙ্কর স্বরবর্ণের উৎপত্তি হয়। অনুলোম প্রণালীতে উৎপন্ন স্বর যথা—

অ+ই=এ অ+উ=ও

অ+এ=ঐ অ+ও=ঔ

প্রতিলোম সন্ধিদ্বারা উৎপন্ন যথা—

ই+অ=য় ঋ+অ=র

ঌ+অ=ল উ+অ=ব

সংস্কৃত বর্ণমালার এই চারিটির স্থান ব্যঞ্জনের মধ্যে। উহার কারণ পরে বলা যাইবে।

বর্ণমালার মধ্যে বর্ণগুলি যথাস্থানে সজ্জিত আছে; এই সজ্জার প্রণালী দেখিলে মনে হয়, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম যাঁহাদের, তাঁহারাই এই বর্ণমালার উদ্ভাবক।

কোন্ বর্ণের উচ্চারণ স্থান কোথায়, প্রাচীন শাব্দিকেরা সে বিষয়ে সূক্ষ্ম বিচার করিয়াছেন, সন্ধির নিয়ম আলোচনা করিলেও উহা বুঝা যায়। বাঙ্‌লাতে অনেকগুলি বর্ণের উচ্চারণের ব্যতিক্রম হইয়াছে। সংস্কৃত ব্যাকরণের আলোচনাদ্বারা উহাদের বিশুদ্ধ উচ্চারণের এখনও আবিষ্কার চলিতে পারে।

উদানবায়ু মুখগহ্বরে উপস্থিত হইলে মুখগহ্বরের তাৎকালিক আকৃতি অনুসারে উহা বিভিন্ন স্থানে অভিহিত হইয়া বিভিন্নবর্ণের সৃষ্টি করে। কণ্ঠ, তালু, মূর্দ্ধা, দন্ত ও ওষ্ঠ এই কয়েক স্থানের অভিঘাতে যথাক্রমে অ, ই, ঋ, ঌ, উ এই কয় স্বরের ও তাহাদের দীর্ঘ ও প্লুত রূপের উৎপত্তি হয়। উহার মধ্যে ঋ ও ঌ আছে। ঋ ও ঌ বিশুদ্ধ স্বর নহে 'ঋ' উচ্চারণে জিহ্বা মূর্দ্ধাস্পর্শের চেষ্টা করে, একবারে স্পর্শ করে না। সম্পূর্ণ স্পর্শ করিলে উহা মূর্দ্ধন্য ব্যঞ্জনবর্ণ হইত। ঐ রূপ 'ঌ' উচ্চারণে জিহ্বা দন্ত-স্পর্শের চেষ্টা করে। অ, ই, উ, এই তিনটি বিশুদ্ধ স্বর; এইজন্য ঋ ও ঌ কে অ, ই, উ এই তিনের পরে বসান হইয়াছে। তৎপরে সঙ্করবর্ণগুলির স্থান। কাজেই সংস্কৃতবর্ণমালায় স্বরবর্ণের স্থান যথাক্রমে অ, ই, উ, ঋ, ঌ, এ, ঐ, ও, ঔ।

বাঙ্‌লায় এই সকল বর্ণের উচ্চারণ বিকৃত হইয়া গিয়াছে। 'অ' প্রকৃতপক্ষে 'হ্রস্ব 'আ'। উহা কণ্ঠ্যবর্ণ; বর্ণমালায় উহার স্থান দেখিয়া ও স্বরসন্ধির নিয়ম দেখিয়া উহার প্রকৃত উচ্চারণ বুঝা যায়। বাঙলায় উহার উচ্চারণে ওষ্ঠ্যবর্ণের ভাব আসিয়াছে। ইংরেজি au বা aw চিহ্নদ্বারা যে বর্ণ নির্দ্দিষ্ট করা হয়, বাঙ্‌লা অ এখন সেই বর্ণের সাঙ্কেতিক হইয়াছে। ও এবং ঔ এই উভয়ের সহিত উহা এক শ্রেণিভুক্ত। এইরূপে বাঙলাতে 'ঋ' উচ্চারণ বিকৃত হইয়া 'রি'তে অর্থাৎ ব্যঞ্জনে পরিণত হইয়াছে। ঌও সেইরূপ।

এ, ঐ, ও, ঔ, প্রভৃতির উচ্চারণও ঐরূপ বিকৃত হইয়াছে। 'এ' এবং 'ও' এই দুই বর্ণের প্রায় অধিকাংশ স্থানে দীর্ঘত্ব লোপ পাইয়াছে; 'ঐ' এবং 'ঔ' এই দুই বর্ণের উচ্চারণও বাঙ্‌লায় ঠিক্ নাই; হিন্দী প্রভৃতিতে বরং আছে।

সংস্কৃত বর্ণমালার অন্তর্গত স্বরবর্ণগুলি বাঙ্‌লার প্রয়োগে কতক লুপ্ত ও কতক বিকৃত হইয়াছে। বাঙ্‌লার কেবল সাতটি স্বরবর্ণের ব্যবহার আছে, তন্মধ্যে একটি কণ্ঠ্য 'আ', তিনটি ওষ্ঠ্য যথা—'অ', 'ও', 'উ', আর তিনটি তালব্য যথা—'(অ্যা)' 'এ' 'ই' এই তালব্য তিনটি বর্ণের মধ্যে প্রথমটির উচ্চারণ বাঙ্‌লাসাহিত্যে সাধুপ্রয়োগেও আছে ও প্রাদেশিক অসাধুপ্রয়োগেও আছে; কিন্তু উহার পৃথক্ লিপির অভাবে 'য়া' 'অ্যা' ইত্যাদি চিহ্নদ্বারা উহা নির্দ্দেশ করিতে হয়।

দেখা গেল, সংস্কৃত বর্ণমালার মধ্যে কতকগুলি বর্ণ বাঙ্‌লার অনাবশ্যক, যথা—ঋ, ৯; কতকগুলি বর্ণের উপযুক্ত লিপি নাই যথা—'অ্যা'। যে সংস্কৃত বর্ণমালা বাঙলাতেও চলিতেছে, উহাতে বাঙ্‌লার অভাবমোচন হইতেছে না। উহার সংস্করণ আবশ্যক। বর্ণমালার এই অসম্পূর্ণতার জন্য নানা অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। দুই একটি উদাহরণ যথা—'বেশ' এস্থলে 'এ' হ্রস্ব, উহা দীর্ঘ নহে। এইরূপ অন্যত্র। 'কি' বিস্ময়সূচক অর্থে প্রযুক্ত হইলে উহার 'ই' দীর্ঘ বা প্লুতভাবে উচ্চারিত হয়। 'বউ' 'বৌ', 'কই' 'কৈ', ইত্যাদি স্থলে একই শব্দের দুইরূপ বানান চলিত আছে।

ফলে বাঙ্‌লায় সাতটিমাত্র স্বরের দরকার; উহাদের হ্রস্ব দীর্ঘ ভেদে যে কয়টি বর্ণ উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারা বাঙ্‌লার সমস্ত কাজ চলিতে পারে।

তৎপরে ব্যঞ্জনবর্ণ। সংস্কৃত বর্ণমালায় ব্যঞ্জনবর্ণগুলিও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সজ্জিত। প্রথমে কণ্ঠ্যাদিক্রমে পাঁচটি বর্গের পাঁচ পাঁচটি স্পর্শবর্ণ রহিয়াছে। প্রতিবর্গের পঞ্চম বর্ণ অনুনাসিক। উহাদের উচ্চারণে জিহ্বা, কণ্ঠ, তালু, মূর্দ্ধা, দন্ত এই কয় স্থান স্পর্শ করে, ওষ্ঠ্য বর্ণের উচ্চারণে উভয় ওষ্ঠের স্পর্শ বা সংযোগ ঘটে। ক, খ, গ, ঘ, ঙ এই পাঁচটিকে একই কণ্ঠ্য বর্ণের অল্পপ্রাণ, মহাপ্রাণ বা অনুনাসিক ভেদে বিভিন্ন রূপ বলা যাইতে পারে। এইরূপ অন্যত্র। য, র, ল, ব এই চারিটি সন্ধরবর্ণ। উহারা দুই দুই স্বরবর্ণের প্রতিলোমক্রমে সন্ধিদ্বারা উৎপন্ন।

তৎপরে শ, ষ, স, হ এই কয়টি উষ্মবর্ণ; এই বর্ণগুলি অনেকাংশে প্রাকৃতিক অস্ফুট ধ্বনির শ্রেণিভুক্ত। সাপে শোঁ শোঁ করে, বাতাসে সর সর করে, সেই সকল অস্ফুট ধ্বনির সহিত ইহাদের মিল আছে। ইহাদের স্থান বর্ণমালায় সকলের শেষে। এখন উহাদের বাঙ্‌লায় ব্যবহার দেখা যাউক।

স্পর্শবর্ণের উচ্চারণে বিশেষ গোল নাই; অনুনাসিকগুলিতে গোল আছে। 'ঙ' এর উচ্চারণ 'কাঙাল' 'বাঙালী' প্রভৃতিতে বর্ত্তমান। 'যাচ্ঞা'র বাঙ্‌লা উচ্চারণে 'ঞ'র প্রকৃত উচ্চারণ নাই; 'অজ্ঞ' 'বিজ্ঞান' প্রভৃতির 'জ্ঞ'তে জ ও ঞ উভয়ের উচ্চারণই বিকৃত

হইয়াছে। উচ্চারণ দেখিয়া বোধ হয়, ঙ=ং+অ, ঞ=ঁ+অ 'বিজ্ঞান' শব্দের বাঙ্‌লা উচ্চারণ এখন 'বিগ্গ্যান'।

'ণ' ইহার উচ্চারণ মান্দ্রাজে ও উড়িষ্যায় আছে; বাঙলায় 'গণেশ' এখন 'গড়েঁশ' উচ্চারণ ছাড়িয়া 'গনেশ' হইয়াছেন। 'ণ' ইহার উচ্চারণ যখন বাঙ্‌লায় নাই, তখন উহাকে রাখার প্রয়োজন কি?

তৎপরে 'য' 'র' 'ল' 'ব'। 'য' ও জ উচ্চারণে অভিন্ন, অতএব 'য' রাখিবার দরকার কি? 'ঐক্য' 'বাক্য' নয়ন, রয় প্রভৃতিতে 'য়' উচ্চারণ আছে। 'য়' রাখিলেই চলিতে পারে। অন্তস্থ 'ব' উহার স্বতন্ত্র রূপ হারাইয়াছে, কিন্তু উহার উচ্চারণ 'ওয়াশীল' 'ওয়াদা' প্রভৃতি মধ্যে বর্ত্তমান। পূর্ব্বে বাঙলায় পেটকাটা ব প্রচলিত ছিল, উহা উঠিয়া যাওয়ায় এই অসুবিধা দাঁড়াইয়াছে। ইংরেজি v বাঙলায় লিখিতে ভ ব্যবহার করিতে হয়, উহা অনুচিত; ইংরেজি wa লিখিতে 'ওয়া' লিখিতে হয়, অথচ উহার 'য়'টি অর্থশূন্য।

তৎপরে 'শ' 'ষ' 'স' 'হ'।

'শ' ইহার তালব্য উচ্চারণ বাঙ্‌লায় নাই। 'স' এর দন্ত্য উচ্চারণ যুক্তবর্ণে আছে, যথা—অস্ত, ষণ্ডা ইত্যাদি। 'শ' ত্যাগ করিয়া 'ষ' ও স' এই দুই বর্ণ রাখিলেই বাঙলায় চলিবে।

উষ্মবর্ণের মধ্যে 'শ' তালব্য, 'ষ', মূর্দ্ধন্য, 'স' দন্ত্য। তন্মধ্যে তালব্য 'শ' বাঙ্‌লায় আবশ্যক নহে। কিন্তু আরও দুইটি উষ্মবর্ণ—কণ্ঠ্য ও ওষ্ঠ্য, অন্য ভাষায় রহিয়াছে, মৌলিক সংস্কৃত ভাষায় নাই। যথা—ইংরেজি f ওষ্ঠ্য উষ্মবর্ণ। কাবুলিদের উচ্চারিত 'আখ্‌রোট' 'খিদমদ' প্রভৃতিতে কণ্ঠ্য উষ্মবর্ণ দেখা যায়। বাঙলাতে উহাদের উপযুক্ত বর্ণ আবশ্যক হইতে পারে।

'হ' এই বর্ণ বিসর্গ হইতে অভিন্ন। 'ক' এর সহিত 'খ' এর যে সম্বন্ধ ':' সহিত 'হ' এর সেই সম্বন্ধ।

দেখা গেল সংস্কৃত ব্যঞ্জন বর্ণমালাও বাঙ্‌লার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী নহে। বাঙ্‌লা বর্ণমালা নূতন করিয়া সংশোধিত ও পুনর্গঠিত করা আবশ্যক হইতে পারে। যাঁহারা সংস্কৃতের পক্ষপাতী তাঁহারা আপত্তি তুলিবেন। কিন্তু ঐ আপত্তি বৃথা। পাণ্ডিত্যের অনুরোধে বা ধর্ম্মশাস্ত্রালোচনার অনুরোধে যাঁহারা সংস্কৃতভাষা শিখিবেন, তাঁহারা প্রকৃত বিশুদ্ধ উচ্চারণ অভ্যাস করিয়া সংস্কৃত বর্ণমালা ব্যবহার করিবেন। তাঁহাদিগকে সেই কষ্টস্বীকারে প্রস্তুত হইতে হইবে। আমরা ইংরেজি প্রভৃতি বৈদেশিক ভাষার বিশুদ্ধ উচ্চারণ যখন শিখিতেছি, তখন সংস্কৃতের বিশুদ্ধ উচ্চারণ শিখিবনা কেন? কিন্তু দেশের অধিকাংশ লোকের সংস্কৃতভাষা চর্চ্চা আবশ্যক কি না বিবেচ্য। তাঁহারা বাঙ্‌লায় কথা কহেন ও বাঙ্‌লা লেখেন। তাঁহাদের জন্য বাঙ্‌লা উচ্চারণের অনুযায়ী বাঙ্‌লা বর্ণমালা আবশ্যক কিনা বিবেচ্য। তাঁহাদিগকে সংস্কৃত বর্ণমালা শিখিবার ক্লেশ দেওয়ার প্রয়োজন

কি ও উচ্চারণের সহিত লিপির অসামঞ্জস্য হেতু বানান ভুলের জন্য দায়ী করা হয় কেন? সংশোধিত বর্ণমালা চলিত হইলে, শিক্ষার্থীরা বানান ভুল করিবে না তাহাদিগকে এক্ষণে বানান মুখস্থ করিতে যে অকারণ পরিশ্রম করিতে হয়, সেই পরিশ্রম হইতেও অব্যাহতি দেওয়া হইবে।

বক্তা উপবেশন করিলে শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয় বলিলেন, ইন্দ্রবাবুর প্রস্তাব গৃহীত হইলে, বাঙ্গালাভাষায় গৃহীত সংস্কৃত শব্দগুলি লিখিবার ব্যবস্থায় গণ্ডগোল উপস্থিত হইবে। ইন্দ্রনাথ বাবু এ বিষয়ে তাঁহার বক্তব্য পরে বলিবেন, এই আশা দেওয়ায় এ সম্বন্ধে আলোচনা স্থগিত থাকিল। শ্রীযুক্ত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে ও শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় প্রভৃতির সমর্থনে স্থির হইল যে আগামী শনিবার ৫টার সময় পরিষদের দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন আহূত হইবে। তাহাতে শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন ও ইন্দ্রনাথ বাবু বাঙ্গালাভাষা সম্বন্ধে তাঁহার অন্যান্য বক্তব্য বুঝাইবেন। সেইদিন এ বিষয়ের আলোচনা হইবে। এই বলিয়া তিনি ইন্দ্রনাথবাবুকে অদ্যকার বক্তৃতার জন্য ধন্যবাদ দিলেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে সভাভঙ্গ হইল।

সম্পাদক	সভাপতি
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন

২৬ আষাঢ়, ৩০ জুন, শনিবার অপরাহ্ণ ৫টা

উপস্থিত সভ্যগণ।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার—সভপতি

সার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নাইট, এম এ,বি,এল, শ্রীযুক্ত বিলহারী সরকার

„ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল,	„ নগেন্দ্রনাথ বসু
„ চন্দ্রনাথ বসু এম, এ, বি, এল,	„ রমেশচন্দ্র বসু
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম, এ, বি, এল,	„ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল,	„ বাণীনাথ নন্দী
„ ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ,	„ রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী
„ ললিতচন্দ্র মিত্র, এম, এ,	„ বিপিনচন্দ্র মল্লিক

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র মিত্র এম, এ,
" যতীশচন্দ্র মিত্র এম, এ,
" জানকীনাথ মিত্র, এম, এ,
" কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ,
" দ্বারকানাথ মিত্র, এম, এ বি, এল,
" যদুনাথ মিত্র, এম, এ, বি, এল,
" ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ,
" দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ,
" যতীন্দ্রমোহন সিংহ বি, এ,
" চিত্তসুখ সান্যাল
" শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি এল,
" প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ,
" পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,

শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল
" রাজকৃষ্ণ দত্ত
" নিশিকান্ত সেন
" যোগেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গোবিন্দলাল দত্ত
নরেন্দ্রনাথ দত্ত
নৃপতিনাথ ত্রিবেদী
মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম,এ
পণ্ডিত মুনীন্দ্রনাথ সাংখ্যরত্ন
তারকচন্দ্র সাংখ্যরত্ন
পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
নগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার
বীরেশ্বর পাঁড়ে।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম, এ, সম্পাদক।
" ব্যোমকেশ মুস্তফী
" মন্মথমোহন বসু
} সহকারী সম্পাদক

শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক বাঙ্গলা বর্ণমালা ও বাঙ্গলা ভাষা সম্বন্ধে বক্তৃতার শেষাংশ শুনিবার জন্য পূর্ব্ব অধিবেশনের নির্দ্দেশ মতে এই দ্বিতীয় অধিবেশন আহূত হইয়াছে।

পূর্ব্ব অধিবেশনের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর নিম্নলিখিত সভ্যগণ যথারীতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রঃ কালীকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় (তত্ত্বপ্রকাশ কার্য্যালয়) সং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ১। শ্রীযুক্ত তারানাথ দত্ত। Chairman Cossipore Municipality, ১২ কালীকুমার বানার্জ্জির লেন।

নগেন্দ্রনাথ বসু সং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ২। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মিত্র জমিদার মেদিনীপুর।

৩। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দত্ত। Arckeological reporter, ময়ুরভঞ্জ।

শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পূর্ব্ব দিনের বক্তৃতার উল্লেখ করিয়া বলিলেন, আমি সেদিন জিজ্ঞাসু হইয়া পরিষদের সভার উপস্থিত হইয়াছিলাম; কোন মীমাংসা নির্দ্দেশ করি নাই। অনেকে সেইটুকু না বুঝিয়া আমার উপর নানা মতের আরোপ করিয়াছেন। আজিও আমি নিজের মত কিছুই বলিব না; আমার সংশয় মাত্র সভাস্থলে উপস্থিত

করিব। যথাসাধ্য অপক্ষপাতে প্রশ্নগুলি উত্থাপন করিয়া আপনাদিগকে তাহার মীমাংসার ভার দিব।

কাহারও মতে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাষা, অন্যের মতে বাঙ্গলা পৃথক্ ভাষা আছে, উহা সংস্কৃতের বিকৃতি মাত্র; উহা প্রাকৃত ভাষা, অর্থাৎ প্রাকৃত জনের মুখে উচ্চারিত হওয়ায় সংস্কৃতের বিকৃত রূপান্তর মাত্র।

ফলে দেখা যায়, সংস্কৃত ব্যাকরণের সন্ধিপ্রকরণ, সুবন্তপ্রকরণ, তিঙন্তপ্রকরণ, সমাস-প্রকরণ প্রভৃতির বাঙ্গলার ব্যাকরণে চলিবে না। ধাতুপ্রকরণও বাঙ্গলা ব্যাকরণে স্বতন্ত্র। "করছি" এই ক্রিয়াপদ 'কৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন নহে; 'কর' এই ক্রিয়ামূলটি ইহার মূলে আছে। সকল ভাষারই কতকগুলি সাধারণ মিল আছে। কোন কোন বিষয়ে সংস্কৃতে ও বাঙ্গলায় সাদৃশ্য দেখিয়া উভয়কে একভাষা বলা যাইতে পারে কি না?

অতএব বাঙ্গালাকে স্বতন্ত্র ভাষা ধরিয়া ইহার ব্যাকরণ ও বর্ণমালার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার চলিবে কি না?

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্প্রতি একটী ইংরেজি প্রবন্ধে Colloquial Bengaliকেই good Bengali বলিয়াছেন, উহা সংস্কৃত হইতে হইতে স্বতন্ত্র। বাঙ্লা আনুবাদ ঐ বাঙ্গলা ব্যবহার হয় না। উহাতে সংস্কৃতের প্রাচুর্য্য থাকে বলিয়া তিনি আক্ষেপ করিয়াছেন।

শিশুর ভাষায় উচ্চারণ অস্পষ্ট ও বিবৃত হইলেও উহাকে লোকের ভাষা হইতে স্বতন্ত্র বলা যায় না। প্রাকৃত লোকে "রাত্রি" উচ্চারণ করিতে না পারিয়া "রাত" বলে; তাহা বলিয়া প্রাকৃতজনের ব্যবহৃত ভাষাকে পৃথক্ ভাষা বলিব কেন? বাঙ্গালা ভাষার স্বাতন্ত্র্য যাঁহারা স্বীকার করেন না, তাঁহাদের এইরূপ যুক্তি।

বস্তুতঃ বাঙ্গালার অধিকাংশ শব্দই সংস্কৃত হইতে গৃহীত। আপাততঃ যাহা দেশজ বলিয়া বোধ হয়, অনুসন্ধানে তাহারও সংস্কৃত মূল পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গলা ভাষার প্রকৃতি সম্বন্ধে বহুদিন পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রবন্ধ বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ। তিনি সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী নহেন। তিনি অনেক উচ্চারণ দিয়াছেন; তাহার মতে "বৃষগণ তৃণ খায়" না বলিয়া "ষাঁড়গুলো ঘাষ খায়" বলা উচিত; কৃষকে ভূমি কর্ষণ করে" না বলিয়া "চাষাতে ভুঁই চষে" বলা উচিত। কিন্তু ষাড়, ঘাস চাষা (সং-চর্ষণ) ভুঁই প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত মূলক; পণ্ডিতেরা বলিবেন উহা সংস্কৃতেরই বিকৃত উচ্চারণের ফল; "ভেক ডাকিতেছে" ইহার "ডাকা" শব্দ সংস্কৃত মূলক কি না জানি না, কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় মহাসাগরে কোন্ শব্দ আছে না আছে তাহা সাহস করিয়া কেহ বলিতে পারে না, সম্ভবতঃ "ডাকা" শব্দ সংস্কৃত মূলক। শ্যামাচরণ বাবুর প্রবন্ধ সম্বন্ধে এই শ্রেণীর পণ্ডিতেরা এই আপত্তি করিবেন। ইঁহারা বলিবেন, বাঙ্গলা শিক্ষার জন্য শিশু যখন সংস্কৃত পড়ে না, তখন অপরেই বা পড়িবে কেন? সংস্কৃত শব্দ

বহুল বাঙ্গলা ও চলিত বাঙ্‌লার মধ্যে পার্থক্য-নির্দ্দেশক রেখা টানা অসম্ভব। শ্যামাচরণ বাবু বলেন, বাঙ্‌লা ভাষার ধাতু পৃথক্; "সাল" ও "নকল" শব্দের বদলে "বৎসর" ও "অনুলিপি" শব্দ ব্যবহার অস্বাভাবিক; কোন বাঙ্গালাই স্বভাবতঃ ঐ ভাষা ব্যবহার করে না।

বৈদেশিক শব্দ অনর্গল আমাদের ভাষায় প্রবেশ করিতেছে; কেহ উহাদের অনুবাদের চেষ্টা করে না। ষ্টেশন, টিকিট, চেয়ার প্রভৃতি শব্দ বাঙ্গলা হইয়াছে; উহাদের অনুবাদ চলে নাই। তবে যেখানে সেখানে বৈদেশিক শব্দের অনুবাদের চেষ্টা হয় কেন?

নিতান্তই যদি অনুবাদ করিতে হয়, তবে অনুবাদে গৃহীত সংস্কৃত শব্দটির শাব্দিকসম্মত অর্থ গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু তাহা হয় না। আজকালি ইংরেজি শব্দের অনুবাদে যে সকল সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাদের ঐ সকল অর্থে প্রবেশ কোন শাব্দিক পণ্ডিত স্বীকার করিবেন না। Speech=বক্তৃতা, Secretary—সম্পাদক, Resolution—প্রস্তাব ইত্যাদি অনুবাদ উহার উদাহরণ। এরূপ অনুবাদের চেষ্টার ফলে "বদ্ধপরিকর হওয়া" প্রভৃতি অদ্ভুত শব্দসমষ্টির সৃষ্টি হইতেছে।

আমরা নানারূপে বাঙ্গলা ভাষার উন্নতির চেষ্টায় ব্যাপৃত। উন্নতির চেষ্টার ফলে নানা স্থানে হাস্যজনক হইতেছে।

আমরা বর্ণাশ্রমী, ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষ আমাদের পুরুষার্থ, ধর্ম্ম ও মোক্ষ হইতে সাবধানে দূরে থাকিয়া অর্থ ও কামের জন্য বাঙ্গলা ভাষার উন্নতির চেষ্টা করুন। সংস্কৃত 'দর্শন' শাস্ত্র মোক্ষসন্ধানে নিযুক্ত। ইংরেজের Philosophyর সহিত মোক্ষের সম্বন্ধ নাই। "দর্শন" শব্দের অনুবাদ Philosophy শব্দ প্রয়োগে আপত্তি আছে। অর্থকামঘটিত শব্দের অপব্যবহারে তেমন আপত্তি ঘটিবে না।

সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গলায় প্রয়োগ করিতে গিয়া নানা বিপত্তি উপস্থিত হয়। "গুণীদিগের" লিখিব না "গুণিদিগের" লিখিব "যশস্" ও "মনস্" শেষ বর্ণের লোপ করিয়া আমরা "যশ" ও "মন" করিয়াছি। কিন্তু "যশোভাগ্য" ও "মনোযোগ" লিখিতে সংস্কৃতের নিয়ম চালাই।

সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা অধিক লোকের দুঃসাধ্য। সংস্কৃত শব্দের বিভক্তির বর্জ্জন করিয়া লইতে এক শ্রেণির আপত্তি নাই। অন্যের মতে সংস্কৃত শব্দ বর্জ্জন করিয়া উহার প্রাকৃত বিকাশের ব্যবহারই সমুচিত।

আমি মীমাংসার জন্য আসি নাই। পণ্ডিতেরা মীমাংসা করিবেন; আমি প্রশ্ন তুলিলাম মাত্র। পরিষৎ এজন্য বহু ভাষাতে পণ্ডিত সমিতি নিযুক্ত করুন। তাঁহারা আপনাদের আলোচনায় চিন্তার ফল প্রকাশ করিবেন। বাঙ্গলা ভাষা বঙ্গদেশবাসী সকল লোকেরই ভাষা, কি কেবল হিন্দুর ভাষা তাহাও তাঁহারা আলোচনা করিবেন।

৩। শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে,—বক্তা যখন নিজের মত প্রকাশ করিলেন না, তখন সমালোচনা চলিতে পারে না। সেদিন বুঝিয়াছিলাম তিনি বর্ণমালা সম্বন্ধে নিজের মতই

ব্যাখ্যা করিতেছেন। আমার মতে সাধু বাঙ্গলা সংস্কৃতবহুল হইবেই। প্রাকৃত লোক মুখে যে তুচ্ছ ভাষা উচ্চারিত হয়, ইহা সাধু ভাষার রূপে গৃহীত হইতে পারে না। সংস্কৃত শব্দের বহুল ব্যবহারেও সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রণালী অনুসরণে ভারতবর্ষের প্রাদেশিক বিচ্ছেদ ক্রমশঃ কমিবে ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকের ঐক্যবন্ধনে সাহায্য হইবে। সাহিত্যপরিষৎ প্রাচীন পুথিগুলি বর্ণাশুদ্ধি সহ ছাপাইয়া উহাকেই প্রাচীন রীতি বলিতে চাহিতেছেন, উহা আমি অনুমোদন করি না। আমরা কালিদাসের বংশধর, নরোত্তমের "প্রেম" লইয়া আমরা গৌরব করিতে চাহি না।

শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র সাংখ্যসাগর বলেন,—বাঙ্গলা ভাষা স্বয়ং দুর্ব্বল, বলবান্ জাতির সাহায্যে উহার দৌর্ব্বল্য দূর হইবে। সংস্কৃতের সাহচর্য্যের যত আত্মসাৎ করিতে পারেন, বাঙ্গলার পক্ষে ততই মঙ্গল।

শ্রীযুক্ত যদুনাথ কাঞ্জিলাল বলেন,—ইন্দ্রবাবু নিজের মত গোপন করিতে চাহিলেও গোপন করিতে পারেন নাই। বাঙ্গলার সহিত সংস্কৃতের সাদৃশ্য ও পার্থক্য দুইই আছে। কৃষকের ভাষাও না শিখিলে ব্যবহার চলে না। দশজনে পরামর্শ করিয়া ভাষা সৃষ্টি করিতে পারে না। উহার স্বাভাবিক গতি আছে।

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঙ্গলা ভাষার গঠনের ইতিহাসে দুইটি প্রধান পরিচ্ছেদ। প্রথম পরিচ্ছেদে বৈষ্ণব সাহিত্যের ভাষা বৈষ্ণবেরা ভক্তিধর্ম্মপ্রচারের জন্য ভাষার কলেবর পুষ্ট করিয়াছিলেন; উহারা পৈতৃক সামগ্রীই ব্যবহার করিয়াছিলেন। কাজেই তাঁহাদের হাতে ভাষার অস্বাভাবিক কৃত্রিমতা আসে নাই। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা ফোর্ট-উইলিয়ম কালেজের জন্য ইংরেজির অনুবাদ করিয়াছিলেন। এ সময় নূতন অভাবের জন্য নূতন চেষ্টা হইয়াছিল। বঙ্কিমবাবু তাঁহারই জের চালাইয়াছিলেন। বৈদেশিক ভাব এদেশে ছিল না। তাহা এদেশে আমদানি করিতে গিয়া কৃত্রিমতার সৃষ্টি হইয়াছে। বঙ্কিমবাবু ও তাঁহার অনুচরেরা আমাদিগকে যাহা দিয়াছেন, আমরা তাহাই ব্যবহার করিতেছি, আজ আবার সেই অনুচরেরাই আমাদিগকে তিরস্কার করিতেছেন। একালের নূতন অভাব পূরণের জন্য এই কৃত্রিমতার সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী, খবরের কাগজে আমরা পুরা দমে এই বৈদেশিক ভাবকে স্বদেশে চালাইতে বাধ্য হইয়াছি: পরিষৎ অন্ত এই কৃত্রিমতার ও উচ্ছৃঙ্খলতার শাসন চেষ্টা করিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু বলেন,—ইন্দ্রবাবু আশা করেন, আলোচনা দ্বারা ভাষার উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ হইবে। আমার সে আশা নাই। ফল পাইতে হইলে যে মনুষ্যত্ব আবশ্যক, আমাদের তাহা নাই। ইংরেজলেখকদের রচনায় বৈচিত্র আছে, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতা নাই। উহাদের মধ্যে সাধু Style এর একটা আদর্শ আছে আমাদের মধ্যে তাহা নাই। মনুষ্যত্ব না থাকিলে ঐরূপ আদর্শ উপস্থিত করা চলে না। উহাতে চরিত্রের দৃঢ়তা আবশ্যক। সমিতি স্থাপনাদ্বারা ফললাভের আশা নাই।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ বলেন—বর্ণমালা সংশোধন আবশ্যক ; অন্যদেশে অভাবমোচনের জন্য diacritical marks ব্যবহার করে ; আমরাও তাহা করিতে পারি। স্বরবর্ণের অভাব পূর্ব্বে সকল ভাষাতেই ছিল, বাঙ্‌লাতে আছে। বিষয়টি বড়ই গুরুতর ; সাহিত্য-পরিষদের সমিতি না বসাইয়া বাঙ্‌লায় সমুদায় সাহিত্য-সভাকে এ কার্য্যের জন্য আহ্বান করা উচিত। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশেরও যখন ভাষাগত সম্বন্ধ আছে, তখন অন্য প্রদেশের পণ্ডিতদিগকেও আহ্বান করা উচিত। National Congress এর যেমন Industrial Section হইয়াছে, তেমনি Literary Section স্থাপন করিয়া সমুদয় ভারতবর্ষে যাহাতে একই ভাবে সংস্কার ও সংশোধন জন্য আলোচনা চলে, তাহার ব্যবস্থা কর্ত্তব্য।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বলেন—বিদেশের জিনিষ আত্মসাৎ করা আমাদের আবশ্যক হইয়াছে। যাহা আমরা আত্মসাৎ করি তাহাই আমাদের নিজস্ব হয়, মেষমাংস আত্মসাৎ করিলে উহা নিজ মাংসে পরিণত হয়। ইংরেজের ভাষায় অনুবাদ দ্বারা ইংরেজি ভাব আমরা আত্মসাৎ করিব। আরবি "আমির-উল-মা" শব্দকে ইংরেজেরা আত্মসাৎ করিয়া "আলমাইরা" করিয়া লইয়াছেন ; উহা এখন খাঁটি ইংরেজি শব্দ। National শব্দের অনুবাদে "জাতীয়" শব্দ ব্যবহারে দোষ কি ? আমরা বিদেশের জিনিষ হজম করিব ; ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার উপক্রম হইলে স্বভাবের নিয়মে আপনা হইতেই অজীর্ণ দ্রব্য পরিত্যক্ত হইবে। সংস্কৃত বর্ণমালা বজায় রাখিয়া নূতন অভাবমোচনের চেষ্টা করিতে হইবে। Diacritical marks চালান উচিত।

শ্রীযুক্ত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন,—আজিকার আলোচনা শেষ পর্য্যন্ত একটু ঝগড়ার মত হইয়াছে, আমি ধামা চাপা দিব। ইন্দ্রবাবু যে জ্ঞানদান ও আনন্দদান করিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ। তিনি হাস্যরসরসিক, ক্রীড়াচ্ছলে আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। গুরুভার কথাগুলির গুরুত্ব আমরা অনুভব করিতে পারি নাই। ইন্দ্রবাবু পরিষদের সমিতি গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন ; বিদ্যাভূষণ মহাশয় ভারতব্যাপী পরিষৎ বসাইতে চাহেন। ফ্রেঞ্চ আকাডেমী ফরাসীভাষাকে অনুশাসিত করিতে চাহিয়াছিলেন, সফল হন নাই ; তাঁহাদের শাসন সকলে মানে নাই। শাসনের জন্য সমিতিতে ফল না হইলেও আলোচনার জন্য সমিতি গঠিত হইতে পারে। ভাষা কেহ গড়িতে পারে না। উহা জীবন্ত ও দীর্ঘজীবী পদার্থ। উহা কাহারও শাসন মানে না। ইহা মনে রাখিয়া যত আলোচনা চলে চলুক। উভয় পক্ষই আপন দিক্ টানিয়া চলিতে চলিতেই মীমাংসা হইবে। একপক্ষ শাসনের পক্ষপাতী—তাঁহারা চাহেন সুনির্ব্বন্ধ, অন্যপক্ষ স্বেচ্ছাচারের পক্ষপাতী—তাঁহারা চাহেন সুবিধা। মনে কর, একটা বৃত্তক্ষেত্রের অভ্যন্তরে একটা ত্রিভুজ টানিতে হইবে, কিরূপে টানিলে উহার বর্গফল বৃহত্তম হয় ? ত্রিভুজের ভূমি ঐ ভূমির উপর লম্ব যাহাকে বাড়াইবে বর্গফল তাহাতেই বাড়িবে। কিন্তু দুইকেই

যথেচ্ছক্রমে বাড়ান চলে না। একটা বাড়াইতে গেলে ক্রমে এমন অবস্থা আসে, যখন অন্যটা খর্ব্ব হয়। যে অবস্থায় ত্রিভুজের তিনবাহু সমান হয়, তখনই ত্রিভুজের বর্গফল বৃহত্তম হয়। এইখানে উভয়পক্ষে সামঞ্জস্য ঘটে। আমাদের আলোচনাও একটা ত্রিভুজ; ইহার একভুজ সুগমতা বা সুবিধা; দ্বিতীয় ভুজ সুশৃঙ্খলতা বা সুনিয়ম; দুইদিকে সামঞ্জস্য রাখিতে হইবে, একটা যথেচ্ছমাত্রায় বাড়াইতে গেলে অন্যটা খর্ব্ব হইবে, ত্রিভুজও ছোট হইবে। ত্রিভুজের আর একটা তৃতীয় ভুজ আছে, উহা সৌষ্টব। এই তিন ভুজে সামঞ্জস্য স্থাপন করিলে তবে কার্য্য সিদ্ধ হইবে। ভাষার সৌষ্টবের দিকে যেন নজর থাকে। ইন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, এক সাহেব চাপরাসীকে হুকুম করিয়াছিল, মেমসাহেবকা মাফিক গাধা লে আও। চাপরাসী তদ্রূপ গাধা আনিয়াছিল, সাহেবের কাজও চলিয়াছিল; ভাষার অজ্ঞতার দরুণ কাজ আটকায় নাই, কাজ চলিয়াছিল বটে, কিন্তু সস্ত্রীক সাহেবের গাধাত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল কি না ইন্দ্রবাবু বলেন নাই। ভাষাদ্বারা কেবল কাজ চলিলে চলিবে না। শৃঙ্খলা ও সৌষ্টব চাই। সংস্কৃতের সহিত সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ চলিবে না। কথকেরা সংস্কৃতবহুল ভাষা ব্যবহার করেন, কিন্তু উহা সাধারণের অবোধ্য হয় না।

ইন্দ্রনাথ বাবু বলিলেন—আমাকে উত্তর দিতে হইবে। চন্দ্রনাথ দাদা বলিয়াছেন আমাদের মনুষ্যত্ব নাই, ইহা কি সত্য? সত্য না হইলে দাদার মুখে চুণকালি পড়িবে। আপনারা চেষ্টা করুন, যাহাতে দাদার মুখে চুণকালি পড়ে। আমি প্রস্তাব করিতেছি বাঙ্‌লা ভাষা ও বর্ণমালার জন্য পরিষদের একটি সমিতি গঠিত হউক।

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, এই প্রস্তাবের যুক্তিযুক্ততা দেখাইলেন।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলিলেন, ভাষাতত্ত্ব আলোচনার জন্য আমাদের কয়েকটি সমিতি ছিল, যথা—পারিভাষিক-সমিতি, ঐতিহাসিক-শব্দসমিতি, শব্দসংগ্রহ-সমিতি, ব্যাকরণ-সমিতি ইত্যাদি। ভাষাতত্ত্বের আলোচনার গুরুত্ব বুঝিয়া পরিষৎ স্থাপন-কাল হইতেই এই সকল কাজে হাত দিয়াছেন; ভাষাতত্ত্ব-ঘটিত আলোচনাও পরিষদে অনেক হইয়াছে। বৈদেশিক শব্দের অনুবাদের জন্য পরিষৎ অনেক চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু নানা কারণে এতগুলি সমিতির যথারীতি অধিবেশনাদি ঘটে না, এ জন্য সম্প্রতি প্রস্তাব হইয়াছে, ঐ সকল সমিতি উঠাইয়া ভাষাতত্ত্বের আলোচনার জন্য একটিমাত্র সমিতি গঠিত হউক। এই প্রস্তাব গত বৎসরই অনুমোদিত হইয়াছে। সত্বর তদনুযায়ী কার্য্য চলিবে। কাজেই ইন্দ্রনাথ বাবুর প্রস্তাবিত সমিতি যে কাজ করিবেন, পরিষদের অনুমোদিত সমিতিরও সেই কাজ। পরিষদের প্রস্তাবই ইন্দ্রবাবু নূতনভাবে আনিয়াছেন; শীঘ্রই ঐ প্রস্তাব-মত কার্য্য আরম্ভের চেষ্টা হইবে। কিন্তু কেবল সমিতি গঠনেই কাজ হয় না। সমিতির সভ্যেরা যদি পরিশ্রম স্বীকার করিয়া পত্রিকায় প্রবন্ধাদির দ্বারা বা অন্যরূপে এ বিষয়ে আলোচনা করেন, তবেই প্রকৃত কাজ হইবে। অতঃপর ইন্দ্রবাবুর প্রস্তাব পরিষদের প্রস্তাব এক বলিয়া স্থগিত হওয়ায় নূতন সমিতি স্থাপন আবশ্যক হইল না।

সভাপতি শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় বলেন—ইন্দ্রবাবু ইঙ্গিতে অনেক কথা বলিয়াছেন। অনেক কথার আজ আলোচনা হইয়াছে, একটা কথা ইন্দ্রবাবু ইঙ্গিতে তুলিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার আলোচনা হয় নাই। উহা ধর্ম্মের কথা। আমরা চাই স্থিতি, উহারা চায় উন্নতি। স্থিতি ধর্ম্মসাপেক্ষ। ভাষা বিচারেও উহার অপেক্ষা আছে। বর্ণমালাতে ইন্দ্রবাবু বর্ণাশ্রমীয় হাত দেখাইয়াছেন। চন্দ্রনাথ বাবু মনুষ্যত্বের কথা তুলিয়াছিলেন। সমিতি যেন ইহা মনে রাখেন। স্থিতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, বর্ণমালা-সংস্কার ভাষা-সংস্কার করিতে হয় করুন।

যুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে সভা ভঙ্গ হয়। ২৭শে শ্রাবণ।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়
সম্পাদক।	সভাপতি।

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন।

১৭ আষাঢ়; ১লা জুলাই রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥ টা—

উপস্থিত ব্যক্তিগণ

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ,—সভাপতি

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ,	শ্রীযুক্ত জানকীনাথ গুপ্ত এম, এ,
" যদুনাথ কাঞ্জিলাল এম, এ বি, এল	" ললিত কুমার বন্দোপাধ্যায় এম, এ
" রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়	" রমেশচন্দ্র বসু
" যাদবচন্দ্র মিত্র	" নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
" নিশিকান্ত সেন	" হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত এম, এ,
" নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ বি এল
" শিবচন্দ্র শীল	" মন্মথমোহন বসু বিএ } সহ সম্পাদক।
	" ব্যোমকেশ মুস্তফী } সহ সম্পাদক।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র চৌধুরী ১৭।১ কামাপুকুর লেন।
	"	২। বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ ১০ কালীদাস সিংহের লেন।
শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ চৌধুরী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৩। ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ২৩।৫ কটন লেন।
শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ	"	৪। ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দে বি, এ, ৩৮।১ নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় জানাইলেন—

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ, মহাশয়—"বঙ্গভাষার ক্রমোন্নতি" সম্বন্ধে ধারাবাহিক কএকটী বক্তৃতা করিবেন, ইহা পূর্ব্বে স্থির হইয়াছিল। অদ্য তাঁহার বক্তৃতামালার প্রথম বক্তৃতা করিবেন। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান, অনুসন্ধিৎসা এবং অভিজ্ঞতা অসাধারণ। আমরা অদ্য তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া আরও অনেক নূতন বিষয় জানিতে পারিব।

তৎপরে দীনেশ বাবু বলিলেন—বঙ্গভাষার ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে আমি আর একখানি বহি লিখিতেছি। আমার এই বক্তৃতামালার বিষয়গুলি সমস্তই সেই পুস্তকের। বহি খানি অনেকটা লেখা হইয়াছে। তাহা ধারাবাহিক পড়িতে গেলে ধৈর্য্য থাকিবে না, আমি সেই জন্য পুস্তকের উদ্দেশ্য ২।৩টা বক্তৃতায় বলিবার চেষ্টা করিব। বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস অনুসন্ধান করিতে করিতে আমি নূতন মাল মসলা পাইয়াছি, সেগুলি বিশদভাবে আলোচনা করিলে কতকগুলি বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে অনেক নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবে এবং অনেক নূতন বিষয় আলোচনা করিবার সুবিধা হইবে। এই বাঙ্গালা ভাষা প্রাচীন-কালে কিরূপ ছিল? প্রথমে সংস্কৃত পরে পালি, পরে বর্ত্তমানরূপে ভাষার পরিবর্ত্তন হইয়াছে কি না? এরূপ যান-বাহনের কথা আমি কিছু বলিব না। ঐরূপে বিশদভাবে বলিতে পারি, এরূপ শিক্ষাও আমার কই। এই বলিয়া দীনেশবাবু ডাকের ও খনার বচন হইতে আরম্ভ করিয়া গোপীচাঁদের গান, মহীপালের গান ইত্যাদির বিষয় অবলম্বন করিয়া, মনসা, শীতলা, চণ্ডী প্রভৃতি দেবীর মঙ্গল গান এবং সত্যনারায়ণ, শুভচণ্ডী, শনৈশ্চর প্রভৃতির ব্রতকথা প্রভৃতি বিষয় অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালা ভাষার আদিম অবস্থার ও পুষ্টি উন্নতি সম্বন্ধে অতি উপাদেয় বক্তৃতা করিলেন। (এই বক্তৃতার বিষয়াদি শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে।)

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—কোন্ সময়ে কোন্ ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে;—বিশেষতঃ এই সকল প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তি নির্ণয় করা নাই ল বা ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তিস্থাননির্ণয়ের ন্যায় দুরূহ। যখন বিশেষ কোন ভাব কোন জাতির মধ্যে ফুটিয়া উঠে, তখন তদুপযুক্ত ভাষার উৎপত্তি হয়। বাঙ্গালা অক্ষরের উৎপত্তি অনেক কাল হইয়াছে। তন্ত্রের মন্ত্রোদ্ধার প্রণালীতে যে অক্ষরের বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহা বাঙ্গলা অক্ষরের বর্ণনা। তখন লৌকিক ব্যবহারে বাঙ্গালা ভাষা ও বিদ্বৎসমাজে সংস্কৃত ভাষা চলিত ছিল। বুদ্ধদেব ধর্ম্মভাবপ্রচারের জন্য পালি বা পল্লীভাষার সাহায্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। ধর্ম্ম-ভাবের বর্ণনায় পল্লীভাষার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি হইতে লাগিল। উত্তর কালে নূতন নূতন ধর্ম্মের ভাবে বৈষ্ণব ধর্ম্মের, শৈবধর্ম্মের ও শাক্তধর্ম্মের স্রোতে ভাষার সৌষ্ঠব বর্দ্ধিত হইয়াছে। সেই সময় হইতে বাঙ্গালা ভাষায় পুষ্টি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এখন আবার ইংরাজদের সংস্রবে ইংরাজী ভাবের সমন্বয় বাঙ্গালা ভাষায় হইতেছে, কিন্তু ইহার আধিক্য বশতঃ যদি

দেশী ভাবের সঙ্গে ভাষার সম্বন্ধ লোপ হয়, তবে কি অদ্ভুত আকার ধারণ করে। আমাদের ফ্রেঞ্চ একডেমী হওয়া সম্ভব নহে। রাজশক্তিতে ভাষার অনেকটা উন্নতি সাধন করে। ভাষার প্রাণ ভাব, ভাব আসিলে ভাষার গতি স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে। ভাবের উচ্ছ্বাসে ভাষার গতি অনেক স্থলে নিয়ম মানিয়া চলে না। নিয়ম করিলেও কেহ শুনে না। বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে রমেশ বাবু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দীনেশ বাবু প্রভৃতি অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা যথেষ্ট অনুসন্ধান করিতেছেন, সমস্ত বিদ্বৎসমাজ তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

শ্রীযুক্ত যদুনাথ কাঞ্জিলাল এম,এ, বি,এল, মহাশয় বলিলেন—সাহিত্যের মন্দিরে দীনেশ বাবু তিন দিন ব্যাপী উৎসবের আয়োজন করিয়াছেন। আজ তাঁহার প্রথম পূজা। আমরা আজ নিমন্ত্রণে নূতন আসিয়া অনেক নূতন কথা শুনিলাম এবং জানিলাম। এস্থলে আমাদের অপ্রস্তুত হইয়া কিছু বলা উচিত নহে।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত এম,এ, এম্ আর এ এস্ মহাশয় বলিলেন—এই সকল বিষয়ের দুইটা দিক্ আছে। যাঁহারা প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু জানেন আর যাহারা কিছু জানেন না। এই উভয়ের নিকট দীনেশ বাবুর গ্রন্থ অপেক্ষা দীনেশ বাবুর এইরূপ বক্তৃতা বেশী উপকারজনক হয়। যাঁহারা কিছুই জানেন না, তাঁহারাই বেশী উপকার পাইয়া থাকেন।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বলিলেন,—প্রথম পূজা হলেও আমায় আজ সপ্তমীতে বিসর্জ্জন করিতে হইবে। আমি আজ ভিন্ন আর শুনিতে পাইব না। দীনেশ বাবুর সঙ্গে একটু মত ভেদ হইতেছে, শৈবধর্ম্মের শিবোহং ভাব সাধারণে গ্রহণ করিতে পারে নাই। প্রত্যেক ধর্ম্মেরই সকাম ও নিষ্কাম ভাব আছে। নিষ্কাম ভাব উচ্চ শ্রেণীতেই আবদ্ধ থাকে। শিবের মানত শিবের গাজন ইত্যাদি সকাম ভাবের ব্যবস্থা। ষষ্ঠ শতাব্দীতে যখন ভুবনেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন শৈবধর্ম্ম নিষ্কামপ্রধান হইলেও তত বেশী প্রচার ছিল না।

শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয় বলেন,—গোপীচাঁদের গীত প্রভৃতি অতি প্রাচীন। যোগীপাল, ভোগীপাল, মহীপালের গীত ঐরূপ গীতের আদর্শ। ইহার পরে শৈবধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব। শিবের গাজন ধর্ম্মের গাজনের নকল।

শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায় বলেন—প্রাচীন বাঙ্গালালিপি কত কালের?—নগেন্দ্র বাবু বলেন, চন্দ্রবর্ম্মদেবের লিপি বঙ্গাক্ষরের আদিম নিদর্শন—কিন্তু উহাতেও দেবনাগর অক্ষরের ভাগ বেশী আছে। উত্তর বা দক্ষিণ হইতে যে সকল দেবনাগর লিপি পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে হর্ষবর্দ্ধন ও শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্ত পর্য্যন্ত ৬১৯ হইতে ৬৩১ অব্দের মধ্যে Votive Inscriptions সমস্ত কুটিল ও নাগর অক্ষরে খোদিত। বর্ত্তমান আকারের বঙ্গাক্ষরের খোদিত লিপি বুদ্ধগয়ার দুখানা ইষ্টকে প্রথম পাওয়া যায়, একটীতে "গোপাল পাল" ও একটীতে "ধর্ম্মসিংহ" লেখা আছে। এখন আরও দুখানা ইষ্টকে ঐ দুই নাম খোদা পাওয়া গিয়াছে। আর কতকগুলিতে বর্ম্মিজ লেখা আছে। বর্ম্মীয়া ১২শ শতাব্দীর মধ্যভাগে

এদেশে আসিয়া বুদ্ধগয়ার মন্দিরের সংস্কার করিয়া দেয় (১১৪৮ খৃষ্টাব্দে)। ব্লক বলেন, হর্ষবর্দ্ধনের পর হইতে বঙ্গাক্ষর ও বঙ্গভাষা প্রচলিত হয়। হর্ষবর্দ্ধনের পর হইতে সমস্ত শিলালিপিতে বঙ্গাক্ষরের প্রাধান্য দেখা যায়।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ, মহাশয় বলেন—দীনেশ বাবুকে তাঁহার এই উপাদেয় বক্তৃতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি কবে হইয়াছে, তাহা বলিতে পারেন নাই। বোধ হয়, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। তিনি বাঙ্গালা ভাষার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে যে নূতন থিওরি করিয়াছেন, তাহার আলোচনা হইতে পারে। ভাষার গতি নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। Period যখন পৃথক্ পৃথক্, তখন ধারাবাহিক আলোচনা বেশ ভালরূপে করা যাইতে পারে। প্রত্যেক Period অনুসারে গ্রন্থ-তালিকা প্রস্তুত হইলে এরূপ আলোচনার আরও সুবিধা হয়। ১০২৮ খৃষ্টাব্দের তিব্বতীয় গ্রন্থে কএকটী বাঙ্গলা শব্দ পাওয়া যায়। শ্রীজ্ঞান অতীশ "বিক্রমশিপুর বাঙ্গলা" হইতে তিব্বতে ধর্ম্মপ্রচার করিতে গিয়াছিলেন। তিব্বতের রাজা তাহাকে তিনবার আহ্বান করিয়াও লইয়া যাইতে পারেন নাই। অবশেষে তিনি ১০২৮ খৃষ্টাব্দে গিয়াছিলেন। তিব্বতীয় মন্ত্রীর সহিত কথোপকথন কালে তিনি "ভালো ভালো" এইরূপ দুই চারিটী বাঙ্গলা কথা বলিয়াছিলেন, তাহা ব্লক-প্রিন্‌টিংএর গ্রন্থে পাওয়া যায়। ব্লক-প্রিন্‌টিংএ প্রক্ষিপ্ত হইবার উপায় নাই। সংস্কৃত ও বাঙ্গলার মিশাইয়া কোন Intermediate অবস্থা মনে করা ভুল। সংস্কৃত কোন দিন কথিত ভাষা ছিল না। পালিও নহে। মাগধীকে নিয়মাদি দ্বারা বিশুদ্ধ করিয়া পালি ভাষা হইয়া থাকিবে। ভাষার পরিপুষ্টির বিষয় দীনেশ বাবু বেশ বলিয়াছেন। আকবরের সময়ে লামা তারানাথ তাঁহার কাবাবছুন্দন গ্রন্থে শৈবের কথা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। বুদ্ধদেব নিজ ধর্ম্ম শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য শিবকে ভার দেন। শিব অপারক হইলে চামুণ্ডা ভার গ্রহণ করেন। বুদ্ধদেব তখন ধর্ম্মরক্ষার বিষয়ে নিরুদ্বেগ হইলেন। এই উপলক্ষে তখন কোথায় কোথায় শিবমন্দির ছিল, তারানাথ তাহার বিবরণ দিয়াছেন। তিব্বতীয় গ্রন্থে এইরূপ বাঙ্গলা ভাষার সামান্য বিবরণ পাওয়া যায়। অবশেষে আমরা অদ্যকার বক্তৃতার জন্য দীনেশ বাবুকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাইতেছি। তিনি বহু পরিশ্রমে ও গবেষণায় আমাদের অনেক নূতন কথা শুনাইয়াছেন। তাঁহার এই নূতন পুস্তক খানি প্রকাশিত হইলে তাঁহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ন্যায় বাঙ্গলাভাষার আর একখানি অপূর্ব্ব ও উৎকৃষ্ট পুস্তক হইবে সন্দেহ নাই।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল। ২৭শে ভাদ্র।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
সম্পাদক

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়
সভাপতি

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন

২৪ আষাঢ়, ৮ জুলাই রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিত ব্যক্তিগণ

শ্রীযুক্ত দামোদর মুখোপাধ্যায়—সভাপতি.

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়,	শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মিত্র,
যদুনাথ কাঞ্জিলাল এম্ এ,বি,এল,	" হৃষীকেশ মিত্র,
হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত এম্ এ,	" শিবরতন মিত্র,
রমেশচন্দ্র বসু,	" প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ,
যাদবচন্দ্র মিত্র,	" দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ,
নিশিকান্ত সেন,	" নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
বাণীনাথ নন্দী,	" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল,
যতীশচন্দ্র সমাজপতি,	" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল,
শিবচন্দ্র শীল,	" অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ,
চিত্তসুখ সান্যাল,	" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম,এ, (সম্পাদক)
	" মন্মথমোহন বসু বি, এ, (সহঃ সম্পাদক)

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের বঙ্গভাষার ক্রমোন্নতিসম্বন্ধে বক্তৃতা শুনিবার জন্য এই বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়।

শ্রীযুক্ত দামোদর মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

দীনেশ বাবু পূর্ব্বদিনের বক্তৃতার সারাংশ সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি করিয়া অদ্য বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতিতে বৈষ্ণব প্রভাবসম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ করিলেন।

চৈতন্য দেব দেখাইয়াছেন যে, আমরা ঈশ্বরকে আপনার স্ত্রী পুত্রের ন্যায় ভাল বাসিতে পারি। এই তত্ত্বের আবিষ্কারে ধর্ম্মে নূতন প্রাণের সঞ্চার হইল। পূর্ব্বে সাধারণ লোকে দেবতাকে কেবল ভয় করিত, ভক্তি করিত, এবং তাঁহাকে লাভ করিতে তপস্যা করিত, এখন ভাল বাসিতে শিখিল। মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবানের প্রেমিক ও বিরহী সাজিয়া অভিনব উন্মাদনার সৃষ্টি করিলেন।

সাধারণের মধ্যে ধর্ম্মনৈতিক অবস্থা তখন ভাল ছিল না। মহীপালের গান, বাশুলি-পূজা ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ ছিল, তান্ত্রিকেরা মদ্যপান করিয়া কাটা নরমুণ্ড লইয়া নাচিত। গোমাংস ভক্ষণে হয়ত পাতিত্য ঘটিত না। ব্রাহ্মণে ভক্তি প্রধান ধর্ম্ম ও মুলা ভোজন মহাপাপ বলিয়া গৃহীত হইত।

চৈতন্যদেব বলিলেন, স্থল বিশেষে ভোগের অন্ন খাওয়া চলে; চণ্ডালকে আলিঙ্গন করা চলে। নূতন ভাবের প্রবাহ ছুটিল, সাহিত্য তাহাতে পুষ্ট হইয়া উঠিল।

১। সংস্কৃতসাহিত্যের অনুকরণে তাৎকালিক বাঙ্গলা-সাহিত্য কৃত্রিমতাদুষ্ট ছিল। বৈষ্ণবকবিরা অলঙ্কারশাস্ত্রের বন্ধন খুলিয়া স্বাভাবিকভাবের স্রোতে সাহিত্যকে ঢালিয়া দিলেন। ভাব ইহাতে স্বাধীনতার স্ফূর্ত্তি পাইল।

২। পূর্ব্বে দেবতার আদেশ বা ধনীর আশ্রয় ভিন্ন লোকে কাব্য রচনায় সাহসী হইত না। বৈষ্ণব কবিরা আত্মনির্ভরশীল ছিলেন। তাঁহারা স্বাধীনভাবে কাহারও দোহাই না দিয়া কাব্য রচনা করিলেন।

৩। পূর্ব্বে পৌরাণিক দেবতার বা দেবতুল্য মনুষ্যের উপাখ্যানই কাব্যের বিষয় ছিল, এখন মনুষ্যচরিত্র অবলম্বনে কাব্য লিখিত হইল। ত্যাগী ধর্ম্মবীরগণের জীবনচরিত লিখিত হইল।

৪। প্রাচীনেরা বাঙ্গলাকে ঘৃণা করিতেন। বৈষ্ণবেরা বাঙ্গলা কাব্যের টীকা লিখিয়া উহার মর্য্যাদা বাড়াইলেন।

৫। প্রণয়চিত্র বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবিধ-বৈচিত্র্যে চিত্রিত হইয়াছে। কিন্তু উহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা নিতান্ত কবিকল্পনা নহে। রাধার রূপ বর্ণনায়, রাধার বিরহ বর্ণনায়, আমরা চৈতন্যের জীবনের অনুকৃতি দেখিতে পাই। বৈষ্ণব কবির রাধিকা যেমন চৈতন্যের প্রতিবিম্ব, বৈষ্ণব-কাব্যে চন্দ্রাবলির মিলনপ্রসঙ্গে ভগবানের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষত বিক্ষতভাবে বর্ণিত হয়; চন্দ্রাবলি আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতির উদ্দেশে শ্রীকৃষ্ণকে কামনা করিয়াছিলেন। ভগবান্ তাহাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিলেন। রাধিকার মিলনপ্রসঙ্গে ঐরূপ বর্ণনা দেখা যায় না; কেননা রাধিকার আত্মেন্দ্রিয় প্রীতির ইচ্ছা ছিল না। ইহা একটু গভীর তত্ত্ব। রাধিকা চৈতন্যের মতই ধূলায় লুটাইতেন, গাছ জড়াইয়া ধরিতেন, নীল আকাশের পানে চাহিয়া থাকিতেন, যার তার পায়ে ধরিতেন, চৈতন্যের ঈশ্বরভক্তির ও রাধার কৃষ্ণপ্রেম একই জিনিষ; কাজেই বৈষ্ণবসাহিত্যে চৈতন্যের মানবজীবনের একটা প্রভুত্ব।

৬। শাক্তেরা বৈষ্ণবদিগকে বিদ্রূপ করিতেন। স্বয়ং রামপ্রসাদ সেন বৈষ্ণবদিগকে বিদ্রূপ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা বৈষ্ণব-প্রভুত্ব এড়াইতে পারেন নাই। শাক্তের মেনকা বৈষ্ণবের যশোদার পুনঃসংস্করণ। রামপ্রসাদ সেনই ইহার প্রধান উদাহরণ।

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ বক্তার বহু প্রশংসাবাদ করিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইলেন।

শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল বলিলেন, প্রাচীন বঙ্গে বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের নিদর্শন ব্যতীত জৈন নিদর্শনও পাওয়া যায়। ভাগবতের চতুর্ব্বিংশতি অবতারের সহিত জৈনদের ২৪ জন তীর্থঙ্করের কোন সম্পর্ক আছে কি না বিবেচ্য। বর্দ্ধমানের সাতদেউলে জৈন

নিদর্শন পাওয়া যায়। মথুরায় আবিষ্কৃত শিলালিপিতে বাঙ্গালী উপাসকের উল্লেখ আছে। মহাবীর বর্দ্ধমানে আসিয়া ছিলেন।

শ্রীযুক্ত যদুনাথ কাঞ্জিলাল এম,এ, বি, এল, বক্তার বহু প্রশংসা করিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করিলেন।

সভাপতি শ্রীযুক্ত দামোদর মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, দীনেশ বাবুর খ্যাতির উপর নির্ভর করিয়া প্রলুব্ধ হইয়া আজি সভায় আসিয়াছিলাম, আশাতীত আনন্দ পাইলাম। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আলোচনায় ধর্ম্মপূজায় বৌদ্ধ নিদর্শন দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। বৈষ্ণবেরা তাৎকালিক সমাজের যে দুর্গতি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা কিছু অতিরঞ্জিত তবে একবারে অপ্রকৃত নহে, নতুবা ভগবান্ তখন অবতীর্ণ হইবেন কেন? ভগবানের অবতারের আবার সময় আসিয়াছে। ৫টী গ্রহ তুঙ্গস্থ হইলে ভগবান্ অবতীর্ণ হয়েন। লঘু পরাশর জ্যোতিষ গ্রন্থে উল্লেখ আছে, ভগবান্ বিজয় সিংহ নামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। জ্যোতিষের প্রমাণে বোধ হয় তিনি গত ৭|৮ বৎসরের মধ্যে কোন স্থানে আবির্ভূত হইয়াছেন। তৎপরে সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী — সম্পাদক।
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় — সভাপতি।

২৭ শ্রাবণ, ১৩১৩।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

২৭ শ্রাবণ, ১২ আগষ্ট, রবিবার অপরাহ্ন ৬টা

ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডি, এস সি, (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ,
" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
" অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি, এল,
" হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত এম,এ,এম,আর,এ,এস,
" কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,
" শিবচন্দ্র শীল,
মৌলবী ওয়াহেদ হোসেন বি, এল,
শ্রীযুক্ত চিত্তসুখ সান্যাল,
" সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়,
শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ শাস্ত্রী (রঙ্গপুর শাখা)
" যাদবচন্দ্র মিত্র,
" কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি, এ,
" ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ,
" পূর্ণচন্দ্র দে বি, এ,
" ললিতচন্দ্র মিত্র এম, এ,
" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম,এ,বি, এল,
" ক্ষেত্রনাথ বসু,
" অনাথনাথ পালিত এম, এ,

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী এম, এ, (সম্পাদক)

আলোচ্য বিষয়—

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সভ্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৪। বক্তৃতা—শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ, মহাশয় কর্ত্তৃক "বাঙ্গালা ভাষার ক্রমোন্নতি" বিষয়ে তৃতীয় বক্তৃতা, ৫। শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়কে পরিষদে স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তৈলচিত্র উপহার প্রদান জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন ৬। বিবিধ।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডি, এস্ সি, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। তৎপরে গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
কবিরাজ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি	শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত এল্,এম্,এস্, হ্যারিসন রোড
শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সেন	"	" হরেন্দ্রকুমার মজুমদার, ২৩ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট

৩। নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির উপহারদাতাগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

পুস্তক	উপহারদাতা
(১) লেখা	শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী বি, এ,
(২) রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কাশীবাস—	শ্রীশশিভূষণ ভট্টাচার্য্য,
(৩) ব্যথা—	শ্রীসুশীলগোপাল বসু,
(৪) কালার কথা—	শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।
(৫) সুরাপান বা বিষপান	
(৬) Lavater's Essays on Physiognomy	শ্রীজ্ঞানচন্দ্র বসাক।
(৭) Alliance Prize Essays	
(৮) বিজ্ঞান পাঠ	
(৯) সুখ পাঠ	
(১০) বাল্যসখা	
(১১) Report of the Howrah Amta Light Railway	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
(১২) Do, of the National Council of Education	
(১৩) Scheme of Examination, National Council of Education	
(১৪) The Calendar for the year 1906.—Registrar Calcutta University.	
(১৫) সত্যবেদ,	শ্রীলক্ষণচন্দ্র মজুমদার।
(১৬) নব্য রসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি, ৫ খণ্ড	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

৪। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার বাঙ্গালা ভাষার ক্রমোন্নতি বিষয়ে তৃতীয় বক্তৃতা দিলেন ; বক্তৃতার মর্ম্ম এই—

আজিকার আলোচ্য বিষয় কথাসাহিত্য। চৈতন্য ভাগবতে দেখা যায়, সে সময়ে বিষহরী ও মঙ্গলচণ্ডীর গীত সাদরে শ্রুত হইত। ঐ সকল গীত কথাসাহিত্যের অন্তর্গত। এককালে বাঙ্গালা দেশে বৈষ্ণব সাহিত্য প্রধান ছিল, শিবভক্তেরা অন্য দেবদেবীর নিকট মাথা নোয়াইতে সম্মত হইতেন না। চণ্ডী বা মনসা তাঁহাদের পূজা পাইবার জন্য লালায়িত, তাঁহারা সামান্য সম্মানেই সন্তুষ্ট হইবেন আশা দিতেছেন, এবং সেই সম্মানটুকু না পাইয়া শিবভক্তদিগকে যারপরনাই উৎপীড়িত ও বিপন্ন করিতেছেন, অথচ চাঁদসদাগরের মত ভক্ত কিছুতেই তাঁহাদিগকে পূজা করিবেন না। আশ্চর্য্য এই, শিব তাঁহার একান্ত ভক্তদিগকে ঐ অত্যাচার হইতে রক্ষার জন্য কিছুই ব্যবস্থা করিতেছেন না। ইহা মহাদেবের পক্ষে অসঙ্গত নহে। মহাদেব বৈদান্তিকের নিকট ব্রহ্মের রূপভেদ, তিনি নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নিশ্চেষ্ট, তিনি আপনার ভক্তকেও রক্ষা করিতে প্রস্তুত নহেন। এই নির্গুণ দেবতার উপাসনায় সেকালে জনসাধারণ তৃপ্তি লাভ করে নাই। তাহারা সগুণ উপাস্যের অনুসন্ধান করিতেছিল, যিনি সর্ব্বদা সচেষ্ট ও সক্রিয় থাকিয়া, আপনার উপাসকদিগকে সকল বিপৎ হইতে রক্ষা করিতে পারেন, যাঁহার তুষ্টিতে সকল পরমার্থ সিদ্ধ হইয়া থাকে এইরূপ দেবতা লোকে খুঁজিতেছিল। ইহা সম্ভবতঃ মুসলমান বিজয়ের পর। মুসলমান যে ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন, তিনি সদা জাগ্রত, সচেষ্ট ও সক্রিয় ; পরম ভক্তির সহিত অনন্যমনে তাঁহার উপাসনা আবশ্যক। হিন্দুর পক্ষেও সেইরূপ দেবতার প্রয়োজন হইয়াছিল। কাজেই শিবোপাসনা ত্যাগ করিয়া লোকে চণ্ডী বা মনসার মত অল্পে-রুষ্ট অল্পে-তুষ্ট দেবতার প্রার্থনা করিল। এই শ্রেণীর দেবতার সহিত উপাসকজীবের খুব নিকট সম্বন্ধ ; তাঁহারা সর্ব্বদা উপাসকের কার্য্যের প্রতি চাহিয়া থাকেন। মহাদেবের নিষ্ক্রিয়তা এ সময়ে লোকের অনুরাগ আকর্ষণ করিতে পারে না।

তাৎকালিক সাহিত্যে শিবচরিত্র অতি হীনভাবে চিত্রিত হইয়াছে। কৃত্তিবাসাদি অতি প্রাচীন কাব্যে পৌরাণিক শিবচরিত্রের মাহাত্ম্যের নিদর্শন কতকটা পাওয়া যায় ; কিন্তু পরবর্ত্তী কবিদিগের হাতে সেই আদর্শ অত্যন্ত হীন হইয়া পড়িয়াছে। শিবায়নাদি গ্রন্থে তাহার উদাহরণ পাওয়া যায়। এমন কি ভারতচন্দ্রও মহাদেবকে নিতান্ত হাস্যাস্পদ-রূপে চিত্রিত করিয়াছেন।

দেবচরিত্রের মত পুরুষচরিত্রও এই সকল কবির হাতে হীন হইয়া পড়িয়াছে। চাঁদসদাগর অতি তেজস্বী পুরুষ ; মনসা তাঁহার সর্ব্বনাশ করিয়াও তাঁহাকে টলাইতে পারেন নাই। কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দ তাঁহার তেজস্বিতার মর্য্যাদা না করিয়া পদে পদে তাঁহাকে উপহাস করিয়াছেন। কালকেতু যেমন বীর তেমনি চরিত্রবলযুক্ত ; দেবীর সহিত সাক্ষাৎকারের সময় তাহার প্রচুর পরিচয় আছে। অথচ কবিকঙ্কণ তাহাকে

কলিঙ্গে রাজার সহিত যুদ্ধে নিতান্ত কাপুরুষ করিয়া ফেলিয়াছেন। কবিকঙ্কণের পূর্ব্বে মাধবাচার্য্য কালকেতুকে ঐ ক্ষেত্রে অনেকটা সম্মান করিয়াছেন। ধনপতি সদাগর কবিকঙ্কণের হাতে নিতান্ত চরিত্রহীন ব্যক্তি হইয়াছেন, ধর্ম্মমঙ্গলের লাউসেন বীরপুরুষ; অথচ পদে পদে তাঁহাকে দুর্ব্বল বালকের মত ধর্ম্ম-ঠাকুরের সাহায্য ভিক্ষা করিতে হইয়াছে।

দেবচরিত্রের ও পুরুষচরিত্রের এইরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া সেকালের সামাজিক দুর্দ্দশার পরিচয় পাওয়া যায়, ইহা জাতীয় অবনতির নিদর্শন। কেবল স্ত্রীচরিত্র অঙ্কণে সেকালের কবিগণ অনেকটা সফল হইয়াছিলেন; বেহুলার কাহিনীতে আমরা কতকটা সীতা সাবিত্রীরই পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাই। সে কালের অমার্জ্জিত সাহিত্যে স্ত্রীচরিত্রের এইরূপ মহিমা দেখিয়া বস্তুতই আমরা মুগ্ধ হই।

যাহাই হউক সে কালের সাহিত্যের সমালোচনা করিবার সময় ঠিক্ একালের তুলাদণ্ড ব্যবহার করিলে চলিবে না। সেকালের ইতিহাস ও সামাজিক অবস্থা আলোচনা করিয়া বিচার করিতে হইবে।

সভাপতি ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলিলেন, দীনেশ বাবু অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের সাহিত্যে যে অধিকার পাইয়াছেন, তাহাতে তিনি অদ্বিতীয়। আজিকার বক্তৃতায়, কেবল সাহিত্যের নহে, আমাদের জাতীয় ইতিহাসেরও আভাস দিয়াছেন; দীনেশ বাবুর চেষ্টায় আমরা জানিয়াছি, প্রাচীনতায় ইংরেজি সাহিত্য অপেক্ষা বাঙ্গলা সাহিত্য হীন নহে। দীনেশ বাবু দীর্ঘজীবী হউন।

৫। সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী জানাইলেন, যে কিছুদিন পূর্ব্বে ৺বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুদিন উপলক্ষে পরিষদের গৃহে সভা হইয়াছিল, সেইদিন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র নারায়ণ বাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একখানি তৈলচিত্র পরিষৎকে দান করিয়াছেন; সেই চিত্র আজি পরিষদের ঘরের প্রাচীরে দেখা যাইতেছে। নারায়ণ বাবুর নিকট পরিষৎ এজন্য চিরপ্রতিজ্ঞ।

৬। সম্পাদক পুনশ্চ জানাইলেন, অদ্যকার সভাপতি শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় ও পরিষদের সভ্য মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় সম্প্রতি কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যপদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তজ্জন্য পরিষৎ আনন্দিত। উভয়ের সাহায্য-লাভে বিশ্ববিদ্যালয় এত দিন বঞ্চিত ছিলেন। নূতন আইন অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন বিধি-ব্যবস্থা গত বৎসর সঙ্কলিত হইয়াছে। ডাক্তার রায় সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকিলে তাঁহার সাহায্য ও পরামর্শ দেশের কাজে লাগিত। ঘটনাচক্রে তাহা হয় নাই। যাহা হউক, পরিষৎ এ জন্য আনন্দ প্রকাশ করুন।

ডাক্তার রায় অদ্য পাঁচখানি পুস্তক পরিষৎকে উপহার দিয়াছেন। পুস্তকের নাম "নব্য রাসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি"। কেবল উপহার নহে, তিনি পরিষৎকে ঐ স্বপ্রণীত গ্রন্থের প্রকাশ-ক্ষমতা দিয়াছেন। উহা তিনি রচনা করিয়া নিজব্যয়ে ছাপাইয়াছেন;

কিন্তু পরিষদের প্রকাশিত গ্রন্থাবলীভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইবে। রসায়নশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া ডাক্তার রায় পৃথিবীতে যশস্বী হইয়াছেন; ভারতবর্ষ তাঁহার নাম লইয়া আজি গৌরব করিতেছেন, তিনি সর্ব্বদা রসায়ন শাস্ত্রালোচনায় ব্যাপৃত থাকায় পরিষদের অধিবেশনে সর্ব্বদা উপস্থিত হইবার অবকাশ পান না। কিন্তু স্বরচিত গ্রন্থের সহিত পরিষদের এই সম্পর্ক স্থাপন করিয়া তিনি স্বহস্তে পুস্তক লইয়া আজ উপহার দিতে আসিয়াছেন। তাহাতে পরিষৎ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। তিনি প্রথমে এই গ্রন্থ পরিষৎকে উৎসর্গ করিবেন ইচ্ছা করিয়াছিলেন, আমি (সম্পাদক) পরিষদের পক্ষ হইতে উহার প্রকাশভার প্রার্থনা করিবামাত্র তিনি এ প্রস্তাবে সম্মত হন।

বাঙ্গলাতে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের অভাব; যে কয়খানি প্রচলিত আছে তাহাও স্কুলপাঠ্য। এই গ্রন্থখানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও স্কুল পাঠ্য গ্রন্থ নহে। প্রবীণেরাও ইহাতে অনেক কথা শিখিবেন। ডাক্তার রায়ের ন্যায় শাস্ত্রবেত্তা যে বাঙ্গালায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ লিখিয়াছেন, ইহাতে আজ বাঙ্গালা সাহিত্যের পক্ষে শুভদিন। এই গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু পুস্তকের মলাটে মাইকেলের যে কবিতাটি উদ্ধৃত হইয়াছে; তাহাতে আশা করিতে পারি, ডাক্তার রায়ের অবকাশ হইলে তিনি বৃহত্তর গ্রন্থ লিখিয়া বাঙ্গালাসাহিত্য অলঙ্কৃত করিবেন।

মহামহোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ আজ সভায় উপস্থিত নাই, কিন্তু পরিষদের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার ও অনুরাগের কোন ত্রুটী নাই, তাঁহার এই সম্মান লাভে পরিষৎ তাঁহাকে অভিনন্দন করুন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সভাপতিকে ধন্যবাদ দিলে সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
সম্পাদক

শ্রীসারদাচরণ মিত্র
সভাপতি

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন

৩রা ভাদ্র, ১৯ আগষ্ট, রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥টা

উপস্থিত ব্যক্তিগণ

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল, সভাপতি।

কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, এম, এ,
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম, এ,
রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর এম,বি,এফ,সি,এস,

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বিদ্যাম্বুধি
" কিরণচন্দ্র দত্ত
" গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
" অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, এম্, এ,
" যাদবচন্দ্র মিত্র
" সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
" বোধিসত্ত্ব সেন, এম্, এ,
" নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম্, এ, বি, এল্,
" হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত, এম্, এ,
" ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি, এ,
" শিবচন্দ্র শীল
" বামাচরণ চট্টোপাধ্যায়
" শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
ডাক্তার শ্রীযুক্ত রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী
শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, বি, এ,
" ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, এম, এ
" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
" নৃপেন্দ্রনাথ বসু
" মনোজমোহন বসু, বি, এল,
" যতীশচন্দ্র সমাজপতি
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ শাস্ত্রী (রঙ্গপুর)
শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র, এম্, এ,
" চারুচন্দ্র বসু
অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ

শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রসেবক নন্দী
রায় গগনচন্দ্র রায়বাহাদুর
অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
যোগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
সুরেন্দ্রনাথ সাঙ্কী গোস্বামী
পূর্ণচন্দ্র দত্ত
নিবারণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়
নৃপেন্দ্রনাথ বসু
রাজবল্লভ মুখোপাধ্যায়
যামিনীকান্ত সর্ব্বজ্ঞ
সুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
হরিচরণ পাল
হিরণ্ময় মুখোপাধ্যায়
সুরেন্দ্রকৃষ্ণ দে
হরিদাস মুখোপাধ্যায়
বিরজাকান্ত ঘোষ
হৃষীকেশ মিত্র
রামচন্দ্র সেন
শ্যামলাল সরকার
ডাক্তার অম্বিকাচরণ মজুমদার
" শ্রীপতিচরণ ঘোষ
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্, এ, (সম্পাদক)
" মন্মথমোহন বসু, বি, এ, (সহ-সম্পাদক)

আলোচ্য-বিষয়—

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সভ্য-নির্ব্বাচন। ৩। বক্তৃতা—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ, কর্ত্তৃক "মৃত্যু ও পুনর্জীবনের মধ্যবর্ত্তী অবস্থা সম্বন্ধে তিব্বতীয় মত"। ৪। ঐ সম্বন্ধে বক্তা কর্ত্তৃক একখানি তিব্বতীয় পুস্তক প্রদর্শন। ৫। প্রবন্ধ—শ্রীযুত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক "মুণ্ডেশ্বরীর খোদিতলিপি" নামক প্রবন্ধ। ৬। বিবিধ।

পরিষদের সভাপতি মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্, এ, বি, এল্, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	১। শ্রীউমেশচন্দ্র নাগ ২২৫ রাজার দেউড়ী ঢাকা
"	"	২। জে, এন দাস গুপ্ত, বি, এ, প্রেসিডেন্সী কলেজ
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	"	৩। রাইমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
"	"	৪। উমাপতি দত্তজী পাঁড়ে বি, এ ৬ ভবানীচরণ দত্ত ষ্ট্রীট

৩। সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ তাঁহার বক্তব্য শুনাইলেন, তাহার মর্ম্ম :—

দার্জ্জিলিঙ্গে আমার সহিত দুইজন লামার পরিচয় হইয়াছিল। তাঁহারা গূম বিহারে ছিলেন, তাঁহাদের নিবাস তিব্বতের উত্তরাংশ হোর দেশ। সে দেশ মরুভূমি, শস্যের অভাব, মাংস ও দুগ্ধ প্রধান আহার্য্য, লোকে তাম্বুতে বাস করে। তাঁহাদের নিকট অনেক অনুনয়ে তিন খানি পুঁথি সংগ্রহ করি, [পুঁথি তিন খানি প্রদর্শিত হইল।] ঐ পুঁথিতে মৃত্যুর পর মনুষ্যের অবস্থার ও তৎকালে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও প্রেতকৃত্যাদির বিবরণ আছে। ঐ পুস্তকে মৃত্যুর পর অবস্থাসম্বন্ধে এইরূপ মত বিবৃত আছে। মৃত্যুর পর তিন দিন মানুষ জানিতে পারে না যে, তাহার মৃত্যু হইয়াছে। এ কয়দিন কোন অনুভবশক্তি থাকে না। ৪ হইতে ৪৯ দিন পর্য্যন্ত জীব চন্দ্রলোকাদিতে ভ্রমণ করে। সেই সময়ে শবের সংকার হয়। লামা উক্ত পুস্তকোক্ত মন্ত্র পাঠ করেন ও প্রেতের উদ্দেশে খাদ্যাদি প্রদত্ত হয়। প্রেতের কোন্ পথে যাওয়া উচিত, কিরূপে পাপ ক্ষয় হইবে, লামা এই সকল উপদেশ দেন। ৫০ দিনে কর্ম্মানুসারে দেব নর তির্য্যগাদি কোন্ এক লোকে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয়।

৫০ দিন পর্য্যন্ত জীবের চন্দ্রলোকাদিতে পরিভ্রমণ অনেক বিষয়ে বৈদিক মতের সদৃশ। অতি প্রাচীন বৈদিক মতে প্রেত ঊর্দ্ধে যমের নিকট গমন করে। যমলোকে কোন ক্লেশ নাই। কেবল যমের সারমেয় চারিটি ভয়ানক—তাহাদিগকে এড়াইয়া গেলে আর কোন ক্লেশ নাই। তৎপরে যমের অধীন পিতৃলোকে যাইতে হয়, সেখানে পুত্রাদি প্রদত্ত অন্ন ভিন্ন অন্যান্য ভোগের ব্যবস্থা আছে, সেখানেও কোন ক্লেশ নাই। স্মার্ত্তমত বৈদিক মতের উপর প্রতিষ্ঠিত ও অনেকাংশে অভিন্ন ; কিন্তু আমাদের দার্শনিক মত, বৈদিক ও স্মার্ত্তমত হইতে অত্যন্ত ভিন্ন। দর্শন মতে মৃত্যুর পর আতিবাহিক দেহ থাকে না, তৎপরক্ষণেই জীবকে অন্য দেহ ধারণ করিতে হয়। আতিবাহিক দেহ না থাকিলে পিণ্ডাদি দানের ফল কি, বুঝা কঠিন।

তৎপরে বক্তা প্রাচীন মিশর পারস্য প্রভৃতি দেশের এই বিষয়ে মত সংক্ষেপে বর্ণনা করিলেন।

লামা শব্দের উচ্চ অর্থ ; যে সন্ন্যাসীদিগকে লামা বলিয়াছি, তাঁহারা আপনাদিগকে লামা বলেন না, ঠাপা বলেন।

তৎপরে ডাক্তার চুণিলাল বসু রায় বাহাদুর বক্তাকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বুঝাইলেন, পরলোক সম্বন্ধে হিন্দু মতই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সুসঙ্গত। খ্রীষ্টানেরা বিচারের পর চিরকাল স্বর্গবাস বা নরক বাসের কল্পনা করেন, ইহা অবিচার। কর্ম্মফলানুসারে নির্দ্দিষ্টকাল মাত্র সুখভোগ বা দুঃখভোগই—সুযুক্ত। মনুষ্য অপেক্ষা উচ্চতর জীবের অস্তিত্ব বিজ্ঞানবিরুদ্ধ নহে। পূর্ব্বজন্ম না থাকিলে ইহজন্মের আপাততঃ বিনা হেতুতে সুখভোগ বা দুঃখবোধ বুঝা যায় না। ইংরেজিতে যাহাকে Precocity বলে, তাহাও পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মের ফল বলিয়া মানিলে বুঝিতে পারা যায়।

ডাক্তার রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী বলিলেন, নিদ্রা ও মূর্চ্ছার পর জাগরণ দেখিয়া পুনর্জ্জন্মের কল্পনা হইয়াছে। পুনর্জ্জন্ম সম্ভব বলিয়াই সময়ে দেহ রক্ষার ও বিবিধ পরিচর্য্যা ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার উৎপত্তি হইয়াছে। উপনিষদে যম নচিকেতাকে মৃত্যুর পরবর্ত্তী অবস্থাসম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর দেন নাই। উহা দুর্জ্ঞেয়। অসভ্য জাতির মধ্যে ও সুসভ্য জাতির মধ্যে এই বিষয়ে মতের ঐক্য আছে। বেদে ও দর্শনে একবারে বিরোধ নাই।

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ বলিলেন, প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিনা এ সকল বিষয়ে বিচার হয় না। তবে যাহা ইন্দ্রিয়ের অগোচর, তাহা যন্ত্রাদিযোগে প্রত্যক্ষ হইতে পারে। মৃত্যুর পর যে একটা কিছু থাকে, আজকাল বৈজ্ঞানিকেরা কৌশলে প্রত্যক্ষ করিতেছেন, উহাকে আর কেবল অনুমান বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

৪। তৎপরে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মুণ্ডেশ্বরীর শিলালিপির নকল দেখাইয়া উহার সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। ঐ শিলালিপি অদ্যাপি অপ্রকাশিত। শিলালিপি হর্ষের সাংএর সমকালীন ; উহার তারিখ ৩০, হর্ষসংবৎ ২২শে কার্ত্তিক ; কিন্তু উহার অক্ষর চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী অক্ষরের ন্যায় ; ভারতের লিপির ইতিহাসে এতদ্দ্বারা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটিবে। যে মন্দিরে এই লিপি পাওয়া গিয়াছে, উহা প্রস্তরনির্ম্মিত। পাথরে কোন মশলা নাই [এই প্রবন্ধ ও শিলালিপির নকল ১৩শ ভাগ প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা পরিষৎ পত্রিকায় বাহির হইয়]

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় ঐ লিপিসম্বন্ধে কিছু বলিলে পর, সভাপতি মহাশয় সতীশবাবু ও রাখালবাবুকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বলিলেন, দেখিতেছি এই বৌদ্ধ মতে মৃত্যুর পর তিনদিন অচেতন অবস্থায় থাকে, তারপর চেতনা হয় ও পূর্ব্বজন্মের প্রতি মমতা থাকে ; শেষ দিনে সেই মমতা কাটাইয়া অন্যদেহ ধারণ করে। রাখালবাবু বালক, তিনি ভবিষ্যতে দেশবিদেশে খ্যাতি লাভ করিবেন আশা করি।

তৎপরে সভাপতিকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
সম্পাদক

শ্রীচুনিলাল বসু
সভাপতি

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন।

১০ই ভাদ্র, ২৬শে আগষ্ট রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥০টা।

উপস্থিত ব্যক্তিগণ।

ডাক্তার রায় শ্রীযুক্ত চুনিলাল বসু বাহাদুর এম, বি, এফ, সি, এস, সভাপতি।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ,

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু, এম, এ,
" বরদাপ্রসন্ন সোম বি, এল,
" পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,
" ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, এম, এ,
" শিবচন্দ্র শীল
" বোধিসত্ত্ব সেন এম, এ,
" হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত এম, এ, এম, আর, এ, এস
" নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম, এ, বি, এল,
" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি,
" বিহারীলাল সরকার,
" অম্বিকাচরণ শাস্ত্রী,
" বামাচরণ চট্টোপাধ্যায়,
" চারুচন্দ্র বসু,
" রাজকুমার বেদতীর্থ,
" অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ,
" জগদ্বন্ধু মোদক,
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম, এ, বি, এল,
" সতীন্দ্রসেবক নন্দী,
" বাণীনাথ নন্দী,
" উমাপতি দত্তজী পাঁড়ে বি, এ, এম, আর, এ, এস,
" নিশিকান্ত সেন,

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দত্ত,
" ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়,
" প্রভাসচন্দ্র মিত্র,
" জগদিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
" চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য,
" বীরেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত,
" সুধীরচন্দ্র সেন গুপ্ত,
কবিঃ " প্রবোধচন্দ্র বৈদ্যরত্ন,
" যোগীন্দ্রনাথ বসু বি, এ,
" কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ,
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়,
" মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা,
" রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী,
" নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
" চারুচন্দ্র মিত্র, এম, এ,
" প্যারীমোহন দত্ত,
" ইন্দুভূষণ দে,
" অতুলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়,
" হেমচন্দ্র সেন গুপ্ত,
" হেমেন্দ্রনাথ দত্ত,
" পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, বি, এ, } সহঃ সম্পাদক।
" ব্যোমকেশ মুস্তফী, }

আলোচ্যবিষয় :—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সভ্য নির্বাচন। ৩। পুস্তকোপহারদাতাগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ (ক) শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র

দাসগুপ্ত এম, এ, মহাশয়ের "বাঙ্গলায় ভূমিকম্প" ও (খ) শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম্, এ, বি এল্, মহাশয়ের "সার্ব্বজনীন ভাষা ও লিপি" নামক প্রবন্ধ। ৫। শোকপ্রকাশ,—৺আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের মৃত্যু উপলক্ষে। ৬। বিবিধ।

ডাক্তার রায় শ্রীযুক্ত চুনিলাল বসু বাহাদুর এম্, বি, এফ্., সি, এস্., মহাশয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী,	শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু,	১। শ্রীযুক্ত বহুবল্লভ শাস্ত্রী সংস্কৃত কলেজ।
" মন্মথমোহন বসু,	" ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ,	২। শ্রীযুক্ত রায় বিপিনবিহারী মিত্র ২২৩ আপার সার্কুলার রোড।
		৩। শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু বি, এল, গবর্ণমেণ্ট উকীল কটক।
" পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়,	" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত,	৪। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মজুমদার ১৬৭ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

৩। নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির উপহারদাতাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল,—

(১) রাজভক্তি—একলিপিবিস্তারপরিষৎ।

(২) ময়মনসিংহের ইতিহাস—শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

৪। তৎপরে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত মহাশয় তাঁহার "বাঙ্গলায় ভূমিকম্প" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। তিনি এতৎসম্বন্ধে একটী বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিতেছেন, বর্ত্তমান প্রবন্ধটি তাহারই একাংশ। তিনি এই প্রবন্ধে ভূমিকম্পের কয়েকটী কারণ নির্দ্দেশ করিলেন এবং এ পর্য্যন্ত বাঙ্গলাদেশে যে সকল ভূমিকম্প হওয়ার বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তাহার যে তালিকা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা দেখাইলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন—প্রবন্ধলেখকের নিকট আমার একটী আবদার আছে। ভূমিকম্প-নিবন্ধন বাঙ্গলার অবস্থার কোথায় কি কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহার একটা বিবরণ আমরা তাঁহার নিকট পাইবার আশা করি। তিস্তা ও কুশী নদীর গতি-পরিবর্ত্তন, সাবাজপুরের উত্থান প্রভৃতির কারণ কি? বরিশাল-গান ব্যাপারটা কি?

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় বলিলেন, আমারও আবদার আছে, ১৭৬২ খৃঃ অব্দে চট্টগ্রামে বিষম ভূমিকম্প হয় শুনা যায়, যাহার ফলে সেখানকার একটা পাহাড় জলের ভিতর ডুবিয়া যায়, ব্যাপারটা কি! শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখরকালী মহাশয় "জন্মভূমিতে"

লিখিয়াছিলেন, ভূমিকম্পের ফলে সিরাজগঞ্জে যমুনা নদীর সহসা আবির্ভাব হয়, কথাটা কতদূর সত্য? তার পর ভূমিকম্পের কারণের কথা—আমরা হিন্দু, আমরা বলি, আমাদের পাপের ফলেই এ সকল দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় প্রবন্ধকারকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বলিলেন, বিহারী বাবুর কথা শুনিয়া হৃৎকম্প হয়। প্রবন্ধকারের সংগৃহীত তালিকায় দেখা যায় যে, ভারতের মধ্যে বাঙ্গালা দেশেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকবার ভূমিকম্প হইয়াছে, সুতরাং সে হিসাবে বঙ্গবাসীই সর্ব্বাপেক্ষা পাপী। সে যাহা হউক প্রবন্ধকারকে আমার এই অনুরোধ যে তিনি ভূমিকম্প সম্বন্ধে যে বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিতেছেন তাহাতে ভূমিকম্পজনিত অনিষ্ট নিবারণোদ্দেশে এ পর্য্যন্ত যে সকল প্রতিষেধক উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, সেগুলি আলোচনা করিতে যেন না ভুলেন।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধপাঠকের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। তিনি পরিষদে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাঠের যে সূচনা করিলেন, আশা করি পরিষৎ তাহার বিস্তৃতি করিবেন। পরিষদে এইরূপ মধ্যে মধ্যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাঠ আবশ্যক। হেমবাবু তাঁহার প্রবন্ধে ইংরাজী খৃষ্টাব্দের পরিবর্ত্তে যে বাঙ্গালা অব্দের ব্যবহার করিয়াছেন তাহা বড়ই ভাল হইয়াছে, এইরূপ জাতীয় ভাব প্রশংসনীয়।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধ অতি সুন্দর হইয়াছে। হেম বাবু ভূবিদ্যায় পণ্ডিত ও সেই বিষয়ের অধ্যাপনা করিয়া থাকেন; সুতরাং এরূপ প্রবন্ধ তাঁহারই নিকট আশা করা যায়। সৌভাগ্যক্রমে অদ্যকার সভায় শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু এম, এ, মহাশয় উপস্থিত আছেন, তিনি এ বিষয়ে বাঙ্গালীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম পারদর্শিতা লাভ করেন। আশা করি, অদ্যকার প্রবন্ধ সম্বন্ধে তিনি দুই একটি কথা বলিবেন। তিব্বতীয়েরা ভূমিকম্প সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন, কারণ তিব্বতে বড় ভূমিকম্প হয়। তাঁহারা সকল বিষয়েই আমাদের নিকট ঋণী, কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহারা অনেক নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। তিব্বতীয় গ্রন্থে দেখা যায় যে ভূমিকম্পের সহিত গ্রহ নক্ষত্রের সম্বন্ধ আছে। তিব্বতীয়েরা এই সম্বন্ধ ধরিয়া ভবিষ্যৎ ভূমিকম্প গণনা করিয়া থাকেন। আমি জানি দার্জ্জিলিঙ্গে লামা সেরাব গাছো ভূমিকম্প গণনা করিতেন। ভূমিকম্প হইবার দুই তিন মাস পূর্ব্বে তিনি বিজ্ঞাপন দিয়া সকলকে সতর্ক করিয়া দিতেন। তিব্বতীয় মতে মহাদেবের তিন অবস্থা, উত্থান, শয়ান ও অর্দ্ধোত্থান। অর্দ্ধোত্থিত অবস্থাতেই ভূমিকম্প হয়।

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু মহাশয় বলিলেন—ভূবিদ্যা-সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় বলা বড় কঠিন। হেমবাবু এ বিষয়ে অনেকটা কৃতকার্য্য হইয়াছেন। নদী পর্ব্বতের পরিবর্ত্তনের সহিত বাঙ্গালার অনেক সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন হইয়াছে বটে, কিন্তু এ সকলের সহিত ভূমিকম্পের বড় সম্বন্ধ নাই। সুন্দরবন আগে বাসযোগ্য ছিল, এখন নাই, কিন্তু তাহার

কারণ ভূমিকম্প নয়। গঙ্গার প্রধান জলস্রোত প্রথমে ভাগীরথী দিয়া প্রবাহিত হইত। তাহার পর তাহাতে পলি পড়িয়া বাধা পাওয়াতে অন্যপথাবলম্বী হয়। এইরূপে ভাগীরথীর পর হরিণঘাটা, তারপর আড়িয়াল খাঁ, তারপর এখন মেঘনা দিয়া সেই স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। সেখানে এখন যেরূপ পলি জমিতেছে, তাহাতে বোধ হয় শীঘ্রই সে স্রোত কোন পুরাতন পথে ফিরিয়া আসিবে। তাই সে দিন যখন ভাগীরথী কাটাইবার প্রস্তাব হয়, গভর্মেণ্ট তাহাতে সম্মত হন নাই, কারণ ভাগীরথীর পথে সে স্রোত ফিরিলে কলিকাতার পক্ষে যথেষ্ট বিপদের সম্ভাবনা, ভাগীরথী কাটিলে সে বিপদ অনেকটা ডাকিয়া আনা হইবে। যমুনা নদীর আবির্ভাব প্রভৃতির কারণও এই পলি পড়া। ভূমিকম্পের সহিত ইহাদের বিশেষ সম্বন্ধ দেখা যায় না। যাহা হউক, এ সকল বিষয় আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন।

শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন সোম মহাশয় বলিলেন, পার্ব্বতীয় প্রদেশে বা পর্ব্বত নিকটে থাকিলে ভূমিকম্প অধিক হয়। মৈমনসিংহ, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে এই জন্য ভূমিকম্পের জোর এত হয়। পর্ব্বতের সহিত ভূমিকম্পের সম্বন্ধ নির্ণয় করা আবশ্যক। ভূমিকম্পের পূর্ব্বে যে শব্দ হয় তাহার কারণ কি?

শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, কাশীর চারিধারে পাহাড়ের অভাব নাই, কিন্তু একটা প্রবাদ আছে কাশীতে ভূমিকম্প হয় না। কাশীতে ভূমিকম্প অনুভূত হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু কম্পনিবন্ধন সেখানে কখন কোন অনিষ্ট হইতে দেখা যায় নাই।

শ্রীযুক্ত রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, ১৮৪২ খৃঃঅব্দে ভূমিকম্পের তত্ত্ব নির্ণয়ার্থ যে সমিতি বসে, তাহার অনুসন্ধানের ফলে জানা যায় যে পার্ব্বত্য প্রদেশেই ভূমিকম্প বেশী হয়। ভূমিকম্পের সহিত তাড়িত ও চৌম্বক শক্তির সম্পর্কের কথাও তখন উল্লিখিত হইয়াছিল। অদ্ভুতসাগর, জ্যোতির্ব্বিদরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থে ভূমিকম্পগণনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত মহাশয় বলিলেন, আপনারা আমার প্রবন্ধ যেরূপ আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন তাহার জন্য আপনাদিগকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ভূমিকম্পের সহিত গ্রহ নক্ষত্রের সম্বন্ধ বিচার করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে উভয়ের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই। তাড়িতের সহিত ভূমিকম্পের কোন সম্পর্ক আছে কি না সে বিষয় আলোচনা করিয়া তাঁহারা এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই। যাহা হউক এই দুইটী বিষয়ই আরো আলোচিত হওয়া আবশ্যক। পার্ব্বত্য প্রদেশে ভূমিকম্প অধিক হয়, তাহার কারণ এই যে সেখানে জমির উত্থান পতন প্রায়ই হইয়া থাকে। যাহা হউক আমার ইচ্ছা আছে ভূমিকম্পের কারণসম্বন্ধে ভবিষ্যতে আরও আলোচনা করিব।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—প্রবন্ধটী বেশ হইয়াছে। আমাদের অনেক জ্ঞান লাভ হইল। প্রবন্ধকারকে অনেক প্রশ্ন করা হইয়াছে, আশা করি পুনরায় তিনি যে প্রবন্ধ পাঠ

করিবেন, তাহাতে তিনি সকলের কৌতুহল নিবৃত্তি করিবেন। ভূমিকম্পের সকল কারণ বিশেষ ভাবে লিখিতে গেলে প্রবন্ধ বড় বিস্তৃত হইয়া পড়ে, বোধ হয় সেই জন্য প্রবন্ধলেখক ভূমিকম্পের দুই একটীমাত্র কারণ দেখাইয়াছেন। বলিতে গেলে, কারণ এখনও বড় স্থির হয় নাই। প্রবন্ধলেখক বলিয়াছেন, আগ্নেয়গিরির সহিত ভূমিকম্পের বিশেষ নিকট সম্বন্ধ নাই। কিন্তু অনেক বড় বৈজ্ঞানিক বলেন, আছে। দেখিতে পাওয়া যায় যে সকল স্থানে আগ্নেয়গিরি আছে, সেই সকল স্থানে ভূমিকম্প খুব হয়। ভূমিকম্পের ন্যায় আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের পূর্ব্বে শব্দ হয়। তাহার পর বাষ্প প্রভৃতি উঠে, জমি ফাটিয়া যায়। ভারতে যে যে অঞ্চলে ভূমিকম্প হইয়াছে, সেখানে আগ্নেয়গিরি থাকা সম্ভব। অবশ্য মত ভেদ আছে। নিত্য নূতন মত শুনিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে বিশ্বাস ছিল পৃথিবীর মধ্যভাগ উষ্ণ ও তরল। Lord Kelvin বলেন এটা ভ্রান্ত মত, পৃথিবীর মধ্যভাগ অত্যন্ত কঠিন। ভূমিকম্পের সহিত ভূপৃষ্ঠ হইতে ৩০।৩৫ মাইল নীচের কোন সম্পর্ক নাই দেখিতে পাওয়া যায়, যত নীচে যাওয়া যায় তত উত্তাপ বেশী। Kelvinএর পুত্র বলেন, ভূপৃষ্ঠে অধিক পরিমাণে radium থাকাতেই এই তাপ অনুভূত হয়, মধ্যভাগে বেশী radium নাই সুতরাং সেখানে তাপ কম। ভূপৃষ্ঠের অভ্যন্তরে উষ্ণ তরল পদার্থপূর্ণ অনেক খাত আছে, তাহারাই আগ্নেয়গিরি প্রভৃতির কারণ। পৃথিবী ক্রমাগত সঙ্কুচিত হইতেছে, ফলে ভূপৃষ্ঠে কোন স্থান উঠিতেছে, কোন স্থান নামিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগত ভূকম্পও হইতেছে। এই কম্প একটু অধিক হইলেই আমরা অনুভব করি। যাহা হউক এ সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত ভাবে আলোচনা আবশ্যক। হেমবাবুর তালিকায় দেখা যায়, বাঙ্গালা দেশ বড় হতভাগ্য, যত ভূমিকম্প এখানেই হয়; কিন্তু তালিকাটী একটু ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলেই দেখা যাইবে যে তালিকায় উল্লিখিত অধিকাংশ বড় ভূমিকম্পের কেন্দ্র এখানে নয়, বাঙ্গলা দেশে তাহারা ধরা পড়িয়াছে এই মাত্র। প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের কারণ শুধু ভূমিকম্প নয়। শশীবাবু সে কথা আমাদের বলিয়াছেন। বরদা বাবু পাহাড় দেশে ভূকম্পের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আগ্নেয়গিরির সহিত ভূমিকম্পের নিকট সম্পর্ক থাকিলে এইরূপ হইবারই সম্ভাবনা; কিন্তু দাক্ষিণাত্যে বহু পার্ব্বত্য প্রদেশ আছে অথচ সেখানে ভূমিকম্প কম হয়। বোধ হয় সেখানে আগ্নেয়গিরির অভাব।

শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ের প্রবন্ধ সময়াভাবে পঠিত হইল না। আগামী অধিবেশনে পঠিত হইবে স্থির হইল।

(৫) তৎপরে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় পরিষদের পক্ষ হইতে ৺আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের জন্য শোক প্রকাশ করিলেন এবং নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী সভা সমক্ষে উপস্থিত করিলেন।

"বঙ্গের অত্যুজ্জ্বল রত্ন, বঙ্গদেশের ও বঙ্গভাষার অকৃত্রিম বন্ধু, স্বজাতিবৎসল ৺আনন্দ মোহন বসু মহাশয়ের পরলোক-গমনে আজ সমস্ত বঙ্গ-সমাজ গভীর শোক-সাগরে মগ্ন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এইজন্য সেই মৃত মহাত্মার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট সমবেদনা জানাইতেছে।"

শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয় উপরি উক্ত প্রস্তাবটী সমর্থন করিয়া বলিলেন, আনন্দমোহন বাবু আমাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন, যেদিন সার্কুলার রোডে মিলন-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয় সেই দিন তিনি আমার দিকে চাহিয়া বলিয়াছিলেন, "এই বার সন্ন্যাসী হইয়া লাগিয়া যান।" এই কথায় তাঁহার স্বদেশ-প্রেম কিরূপ ছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সকলেই জানেন, তিনি কেমন নীরবে কার্য্য করিতেন। একটা উদাহরণ দি। এক জন সাহেব রাজকর্ম্মচারী একবার ঝরিয়ার রাজার কয়লার খনিগুলি হস্তগত করিবার চেষ্টা করে। আনন্দমোহন বাবু সে কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ ছোটলাটের কাণে সে কথা তুলিলেন, ছোটলাটও সেই কর্ম্মচারীকে সেখান হইতে সরাইয়া দিলেন। এইরূপে ঝরিয়ার রাজার ৮ লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি রক্ষা পাইল, অথচ ব্যাপরটা কেহ টের পাইলেন না, এরূপ স্থলে মনে করিলে, আনন্দমোহন বাবু অনেক টাকা লইতে পারিতেন; কিন্তু তিনি কিছুই গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার ন্যায় নিঃস্বার্থ স্বদেশ-প্রেমিকের স্থান পূরণ করিবার লোক দেখিতে পাই না। তাঁহার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি।

সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া উপরি উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
সহঃ সম্পাদক	সভাপতি

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন।

৩০ ভাদ্র, ১৯ই সেপ্টেম্বর, শনিবার অপরাহ্ণ ৫৷৷০

উপস্থিত ব্যক্তিগণ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল্	শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
" বিহারীলাল সরকার	" নিবারণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
" শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী	" অরুণকুমার দাস
" নিখিলনাথ রায় বি, এল্	" হেমনাথ মিত্র
" শিবচন্দ্র শীল	" শশীকুমার সরকার

শ্রীযুক্ত বামাচরণ চট্টোপাধ্যায়
” নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম, এ, বি, এল,
” ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর
” পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,
” বোধিসত্ত্ব সেন এম, এ,
” উমাপতি পাঁড়ে বি, এ,
” দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ এম, এন, পি, এস্
” অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি, এল,
” চারুচন্দ্র মিত্র এম, এ
” পূর্ণচন্দ্র দে বি, এ,
” শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল
” কুলদাপ্রসাদ মল্লিক
” হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত এম, এ

শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী
” বরদাপ্রসাদ বসু
” শরচ্চন্দ্র রায়চৌধুরী বি, এল,
” বাণীনাথ নন্দী
” বিধিনাথ চট্টোপাধ্যায়
” শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য
” প্রবোধচন্দ্র বিদ্যার্ণব বৈদ্যরত্ন
” কৃত্তিবাস কাব্যতীর্থ
” কুলদাপ্রসাদ মল্লিক
” জানকীনাথ গুপ্ত এম, এ,

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ সম্পাদক
” মন্মথমোহন বসু বি, এ সহ-সম্পাদক

আলোচ্য বিষয়—

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ ২। সভ্যনির্ব্বাচন

৩। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সেওড়াফুলী রাজবাটীর শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ অন্যান্য পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন।

৪। প্রবন্ধ (ক) শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম, এ, বি, এল মহাশয়ের “সার্ব্বজনীন ভাষা ও লিপি” এবং (খ) শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের “লুচি-তরকারী” নামক প্রবন্ধ পঠিত হইবে।

৫। শোকপ্রকাশ—৺রমেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের মৃত্যু উপলক্ষে। ৬। বিবিধ।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বি, এ মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলে উহা গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য-নির্ব্বাচিত হইল।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু	১। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৫।১ বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট
” অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ	ঐ	২। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দে, ১৯১।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলেজ,

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু	৩। মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী ১৯১।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলেজ,
" শিবচন্দ্র শীল	শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	৪। শ্রীযুক্ত দীননাথ দত্ত এম,এ ১৯ চোরবাগান লেন,
" হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত	" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	৫। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায় এম,এ ২৮।১৬ অখিল মিস্ত্রীর লেন,
		৬। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র সেন বি,এ, কালীতলা দিনাজপুর,

৩। নিম্নলিখিত উপহার-প্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল ;—

(ক) উপহারদাতা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১। কৃষ্ণদাস রচিত ভক্তমাল (হস্তলিখিত) ২। বিদ্যাদর্শন ১৭৬৪

৩।৪। ব্যবস্থা-দর্পণ—শ্যামাচরণ সরকার ৫। New Testament.

৬। খৃষ্টানি বাইবেল্ (ইংরেজি) ৭। সেরপুর বিবরণ প্রথম খণ্ড

৮। Elements of Algebra in Hindee, ৯। বাল্মীকি রামায়ণ (আদিকাণ্ড)

১০। জ্ঞান-রত্নাকর। ১১। পঞ্জাবেতিহাস।

১২। প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয়। ১৩। ঐ (একপৃষ্ঠে ইংরাজি একপৃষ্ঠে বাঙ্গালা

১৪। গ্রীকদেশের ইতিহাস। ১৫। ভারতবর্ষের ইতিহাস (মার্সমান বাঃ)

১৬। ভারতবর্ষের ইতিহাস (মার্সম্যানের বাঙ্গালা) ১৭। সত্য ইতিহাস সার।

১৮।১৯।২০। পদার্থবিদ্যাসার। ২১। গোলাধ্যায়। ২২। ভূগোল।

২৩। জ্যোতির্ব্বিদ্যা। ২৪। মহম্মদের জীবন চরিত্র। ২৫। সারাবলী।

২৬। প্রশস্তি প্রকাশিকা গ্রন্থ। ২৭। সদর দেওয়ানী আদালতের সারকুলার।

২৮। পতিব্রতাখ্যান। ২৯। জ্ঞানচন্দ্রিকা। ৩০। বাঙ্গালার ইতিহাস।

৩১। East India Gazetteer. ৩২। History of England. ৩৩। বাঙ্গালার ইতিহাস।

৩৪।৩৫। দিগ্‌দর্শন। ৩৬। সঙ্গীত রসমাধুরী। ৩৭। সদ্ধর্ম্ম-নিরূপণ। ৩৮। বিদ্যাকল্পদ্রুম

৩৯। মুগ্ধবোধং ব্যাকরণম্—কাঠের হরপে ছাপা।

৪০। আনবার-শোহেলী—গোপীমোহন ভট্টাচার্য্য ১২৬১। ৪১। জ্ঞানার্ণব (আদি অন্ত নাই)

৪২। বিদ্যাকল্পদ্রুম ৩য় কাণ্ড। ৪৩। ঐ ৪র্থ কাণ্ড। ৪৪। পদার্থ বিদ্যাসার।

৪৫। দর্শনদীপিকা। ৪৬। উপক্রমণিকা। ৪৭। ভদ্রার্জ্জুন—তারাচরণ শিকদার ১৭৭৪

৪৮। লর্ড ক্লাইব। ৪৯। কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত। ৫০। মনোরঞ্জনেতিহাস।

৫১। উদ্ভিজ্জবিদ্যা। ৫২। কীথের ব্যাকরণ। ৫৩। চারুপাঠ—প্রথম ভাগ।

৫৪। বালকরঞ্জন। ৫৫। হাতেমের উপাখ্যান—বর্দ্ধমান ১৮৬২।

৫৬। জগচ্ছবি—শ্রীকণ্ঠ মলিক ১৮৬১। ৫৭। বিশ্বশোভা—কৈলাসবাসিনী দেবী ১৮৬৯।
৫৮। প্রাকৃত ভূগোল। ৫৯। ইংলণ্ডদেশে ধর্ম্মারুণোদয়।
৬০। রিহুদীদিগের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত। ৬১। ধর্ম্মপুস্তকের প্রামাণ্য। ৬২। সুসমাচার।
৬৩। বৈধব্য ধর্ম্মোদয়—নন্দকুমার কবিরত্ন ১৭৭৭। ৬৪। কায়স্থ-দীপিকা।
৬৫। মালতী মাধব নাটক। ৬৬। বর্ণমালা। ৬৭ আনন্দ লহরী।
৬৮। ভাগীরথী স্তোত্রমালা। ৬৯। অদ্ভুত ইতিহাস।
৭০। মুসলমানদিগের অভ্যুদয়ের সংক্ষেপ ইতিহাস।
৭১। অশুভ পরিহারক বা বিধবা বিবাহের ঔচিত্য বিচার, ১৮৮৪।
৭২। স্বভাব দর্পণ ১ম, কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী ১৭৭৪ শকাব্দ। ৭৩। ডাকের কথা।

(খ) শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—

১। দুর্গালীলা-তরঙ্গিণী ২। বন্দে মাতরম্। ৩। নিম্ন প্রাথমিক বৈজ্ঞানিক পাঠ।
৪। বিজ্ঞান পাঠ। ৫। নিম্ন প্রাইমারী বিজ্ঞান রীডার।
৬। Census of India 1901. ৭। A Dictionary of Economic Products of India ৮। Gazetteer of Bombay Presidency. ৯। An historical sketch of the Brahmo Samaj. ১০। Bengal Technical Inst. ১১। A short sketch of Babu Anandakrishna Bose. ১২। High-handed proceedings of an Official Municipal Chairman of Calcutta. ১৩। Opinions of the Moffussil Land-holders on the Bengal Tenancy Bill. ১৪। Hinduism and the age of Consent Bill. ১৫। An appeal to the Victory to save the Hindu religion by the subsitution of puberty for Twelve years age in the Consent Bill.
১৬। A pinch of Common salt. ১৭। A Memorial of the Hindoo inhabitants of Bengal, Behar and Orissa to the Governor General of India in Council against the proposed act for altering the Hindoo Law of Inheritance. ১৮। The Mundak Upanishad. ১৯। On University Education and Draft Regulation. ২০। The Congress and Conference of 1905.
২১। A full report of the public meeting in honour of Lord Northbrook.
২২। Petition of the British Indian Association.
এবং কতকগুলি ইংরাজী ও বাঙ্গালা মাসিক পত্রের সংখ্যা।

(গ) উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার—১ চিত্র।

তৎপরে নিম্নলিখিত পুথিগুলি প্রদর্শিত হইল :—

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ—সেওড়াফুলী রাজবাটী।

১। উদিচ্য মহামহোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ কৃত—(১) বৃয়োৎসর্গকৌমুদী। (২) অধিকরণ-কৌমুদী। (৩) সংকল্পকৌমুদী।
২। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যকৃত—(১) মঠপ্রতিষ্ঠাতত্ত্ব, (২) বাস্তুযাগপ্রয়োগ।
৩। ঐ শুদ্ধিতত্ত্ব।

৪। ঐ (১) তিথিতত্ত্ব (২) উদ্বাহতত্ত্ব (৩) প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব (৪) শুদ্ধিতত্ত্ব।

৫। ঐ আহ্নিকাচার তত্ত্ব।

৬। ঐ মলিম্লুচতত্ত্ব।

৭। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারকৃত—(১) দায়সংগ্রহ, (২) ব্যবহারতত্ত্ব, (৩) শুদ্ধিতত্ত্ব।

৮। মহেশ পণ্ডিতের ব্যবহার তত্ত্ব।

৯। বাচস্পতি মিশ্রের শ্রাদ্ধচিন্তামণি।

১০। শূলপাণি কৃত—শ্রাদ্ধবিবেক ও গোবিন্দ কবিকঙ্কণকৃত শ্রাদ্ধবিবেক-কৌমুদী।

১১। মাথুরী, ১২। ঐ ১৩। ঐ ১৪। জগদীশী। ১৫। ঐ ১৬। ঐ

১৭। গাদাধরী ১৮। ঐ

১৯। শ্রীপতি দত্তকৃত কাতন্ত্র পরিশিষ্ট।

২০। ত্রিলোচন দাসের কাতন্ত্রবৃত্তি। ২১। দুর্গসিংহের কাতন্ত্রবৃত্তি

২২। অধ্যাত্মরাম মনকথা সংগ্রহ (সুন্দরকাণ্ড) ২৩। মহাভারত কথা সংগ্রহ (বিরাট ও উদ্যোগপর্ব)

২৪। শিহ্লনকৃত—শান্তিশতকম্।

২৫। বিশ্বনাথ কবিরাজকৃত—সাহিত্যদর্পণ।

উপহারদাতা—কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম,এ,—কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

" " গোপীমোহন সিংহ বি,এ—জেমো, কান্দী।

১। প্রেমানন্দের চৈতন্যচন্দ্রোদয়। ২। নরোত্তম দাসের গুরুক্রমকথা ও পাষণ্ডদলন।

উপহারদাত্রী—৺যশোদানন্দ প্রামাণিক মহাশয়ের পত্নী

(১) যদুনন্দন দাসের—কর্ণানন্দরস (২) বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত।

(৩) লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল।

২। কাশীদাসী মহাভারত (উদ্যোগপর্ব, দ্রোণপর্ব ও বনপর্ব)

কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষের ভীষ্মপর্ব।

৩। ভাগবতাচার্য্যের ভাগবতপুরাণের অনুবাদ।

৪। প্রবোধানন্দ সরস্বতীকৃত—চৈতন্যচন্দ্রামৃত ও তাহার টীকা।

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—শশীসেনা।

উপহারের পুস্তক ও পুঁথিগুলি প্রদর্শন করিয়া সম্পাদক বলিলেন, গত চৈত্র মাসে আমাদের সহকারী সভাপতি ও আদি ব্রাহ্ম-সমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই পুস্তকরাশি প্রদান করিয়াছেন। পুস্তকগুলি আদি ব্রাহ্ম-সমাজের লাইব্রেরীভুক্ত ছিল। কতকগুলি পুস্তক তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পত্তি ছিল, পরে আদি ব্রাহ্ম-সমাজের পুস্তকালয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। এই পুস্তকরাশির মধ্যে বিস্তর দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন পুস্তক রহিয়াছে। ১৮২০।১৮৩০।১৮৪০ অব্দে প্রকাশিত অনেক পুস্তক রহিয়াছে। দুই এক খানি পুস্তক আরও পুরাতন ; শ্রীরামপুরের মিশনারিদের প্রকাশিত কাঠের খোদাই অক্ষরে

ছাপা। দুইখানি পুস্তকে ৺দ্বারকানাথ ঠাকুরের স্বাক্ষর আছে। পুস্তকগুলি পরিষদের ব্যয়ে বাঁধান হইয়াছে। রবীন্দ্র বাবুর সহিত সর্ত্ত ছিল যে এই পুস্তক সম্বন্ধে একটা 'রিপোর্ট' পরিষদে পাঠ করিতে হইবে। সম্পাদকের অনবকাশে রিপোর্ট লেখা অদ্যাপি ঘটে নাই। ভবিষ্যতে পত্রিকায় বাহির করিবার আশা আছে। উপহারদাতা পরিষদের কৃতজ্ঞতার দাবি রাখেন।

গত বৎসর আষাঢ় মাসে সেওড়াফুলিনিবাসী শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষের কলিকাতায় সহিত সাক্ষাৎ হয়, সম্পাদক সেই সময় পরিষদের জন্য পুথিগুলি ভিক্ষা করেন; গিরিশ বাবুও তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হন। পরে শীতকালে পুথিগুলি সেওড়াফুলি হইতে আনান হয়। পুথিগুলির অবস্থা তখন শোচনীয় ছিল; বিশৃঙ্খল ও বিপর্য্যস্ত ভাবে এ পুথির পাতা, ও পুথির ভিতর গিয়াছিল। অনেক চেষ্টায় কতকগুলি পুথির পাতা মিলাইয়া সম্পূর্ণ গ্রন্থের উদ্ধার হইয়াছে; ন্যায়শাস্ত্রের অনেক পুথি অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। ঐ সকল পুথির জন্য উপহারদাতা ধন্যবাদার্হ।

শান্তিপুরনিবাসী ৺যশোদানন্দন প্রামাণিক মহাশয়ের পত্নী ইহার পূর্ব্বে দুই বারে প্রায় শতাধিক পুথি পরিষদে দান করিয়াছেন। তাঁহার শ্বশুরের সংগৃহীত আর যে কয়খানি পুথি ছিল, তাহাও সম্প্রতি দিয়া পাঠাইয়াছেন।

বঙ্গবাসী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার মহাশয় উপহারদাতাদিগকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়া তাঁহাদিগকে পরিষদের কৃতজ্ঞতা জানাইবার প্রস্তাব করিলেন। প্রস্তাব গৃহীত হইল।

৪। তৎপরে শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। জাতীয়তা-রক্ষার ও সম্বর্দ্ধনার জন্য ভারতবর্ষে একভাষা ও একলিপির প্রয়োজন দেখিয়া এক্ষণে উহা সম্ভবপর বটে কিনা সে বিষয়ে প্রবন্ধলেখক আলোচনা করিলেন। ইংরেজি, হিন্দি, ও উর্দ্দু মধ্যে কোন ভাষা এইরূপে জাতীয় ভাষা স্বরূপে গৃহীত হইতে পারে সে বিষয়ের বিচার করিলেন। তৎপরে সমস্ত পৃথিবী মধ্যে এক ভাষার বিস্তার সম্বন্ধে ইউরোপে ও আমেরিকায় পর্য্যন্ত যত চেষ্টা হইয়াছে, তাহার বিবরণ দিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে যে সকল কল্পিত ভাষা সৃষ্টির প্রস্তাব হইয়াছে, তাহারও উল্লেখ করিলেন। ঐ সকল কল্পিত ভাষার গঠন-প্রণালী দেখাইয়া দিয়া লেখক বলিলেন, পৃথিবী মধ্যে এক ভাষার প্রচলন হউক আর না হউক, ভারতবর্ষে উহা কতদূর চলিতে পারে, তাহা বিবেচনা করা উচিত।

একলিপিবিস্তার পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত উমাপতি দত্তজী পাঁড়ে হিন্দি আশ্রয় করিয়া বলিলেন, ভারতবর্ষে এক ভাষার প্রচলন অসম্ভব হইলেও একলিপি-প্রচলন অসম্ভব নহে। এ বিষয়ে মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের যত্নে অনেকটা কাজ হইয়াছে। তাঞ্জোরের লোকে দেবনাগরে মুদ্রিত বাঙ্গালা বহি পড়িয়া সহজে বুঝিতে পারিয়া বলিয়াছে, বাঙ্গালাভাষা কত সুন্দর ও সহজ। ভাষার সৃষ্টি মানুষের

চেষ্টায় হইবে না; কিন্তু সাধারণ লিপির প্রচলন সহজ-সাধ্য। জাতীয় ভাব বর্দ্ধনের জন্য উহা আবশ্যক।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন; দেশ মধ্যে বিভিন্ন আচারের পার্থক্য সত্ত্বেও যেমন এক প্রাণদ্বারা দেশের ঐক্য সাধিত হয়, সেইরূপ ভাষাভেদ ও লিপিভেদ সত্ত্বেও জাতীয় একপ্রাণতা থাকিতে পারে। ঐ ভেদ বিলোপের চেষ্টা উপহাস্য।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বলিলেন, অবয়ব বিভিন্ন থাকিলেও যেমন এক স্নায়ুযন্ত্র তাহাদের যোগ সাধন করে, সেইরূপ ভাষা বিভিন্ন হইলেও একলিপিদ্বারা তাহাদের যোগ সাধিত হইতে পারে।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বলিলেন, যে জাতীয়তার সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে, বিভিন্ন ধর্ম্মের লোক লইয়া তাহা গঠিত হইবে কিনা? একলিপির প্রস্তাবে আপত্তি উঠিবে, এই লিপি দেবনাগর হইবে না বাঙ্গালা হইবে?

শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার বলিলেন, তন্ত্রশাস্ত্রে বাঙ্গালা অক্ষরের যেরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে বাঙ্গালা অক্ষরের সহিত আমাদের ধর্ম্মসাধনের সম্পর্ক দাঁড়াইবে। এ ক্ষেত্রে আমরা বাঙ্গালালিপি ত্যাগ করিতে পারিব কি?

প্রবন্ধলেখক উত্তর দিলেন, হিন্দি ও উর্দ্দুতে কেবল শব্দের ভেদহেতু পার্থক্য দাঁড়াইয়াছে, নতুবা উভয় ভাষায় গঠনপ্রণালী একরূপ। স্বাভাবিক বৈচিত্র্য নষ্ট করা অসাধ্য ও অনাবশ্যক, ভেদ সত্ত্বেও অভেদ কতটা চলিতে পারে, তাহাই বিচারের জন্য আমি প্রার্থনা করিয়াছি।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখককে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বলিলেন, প্রবন্ধে প্রচুর বিদ্যাবত্তা প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রবন্ধলেখক একভাষা প্রচলনসম্বন্ধে নানা পণ্ডিতের মত প্রকাশ করিয়াছেন; নিজের মত কিছুই বলেন নাই। অপক্ষপাতে অনুকূল ও প্রতিকূল দুই দিকের মত প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র; অতএব তাঁহার সহিত কাহারও বিরোধ হইতে পারে না। ভাষাভেদ সত্ত্বেও লিপিভেদ না থাকিতে পারে; ভাষা নৈসর্গিক ও লিপিভেদ কৃত্রিম। সম্প্রতি ভারতবর্ষে প্রায় একশত লিপি প্রচলিত আছে। অশোকের সময় হইতে প্রাচীন লিপি ধরিলে লিপি সংখ্যার গণনা দুষ্কর হয়। এ বিষয়ে আলোচনা আবশ্যক। একলিপি-বিস্তার-পরিষৎ আলোচনা উপস্থিত করিয়া প্রশংসার্হ হইয়াছেন।

৫। শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর "লুচি তরকারি" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন, উহা মুখ্যতঃ ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কিত প্রসঙ্গ। বৈদিককালে অপূপ, পিষ্টকাদি যে সকল খাদ্যের প্রচলন ছিল, তাহার উল্লেখ করিয়া দেখাইলেন, একালেও সেই প্রাচীন খাদ্য কিঞ্চিৎ বিকৃত নামে প্রচলিত আছে। এই বলিয়া তিনি সেকালের ও একালের অনেকগুলি খাদ্যের বিবরণ দিলেন ও একালের নামগুলি কিরূপে সেকাল হইতে আসিয়াছে দেখাইলেন। বৈদিককালের নিকট এজন্য যে আমরাই ঋণী এমন নহে। ইউরোপীয়েরা ও এদেশের

অনেক খাদ্য গ্রহণ করিয়াছেন। এই বলিয়া উদাহরণ স্বরূপ প্রবন্ধলেখক গ্রীস রোম ও আধুনিক ইংলণ্ড জর্ম্মণী প্রভৃতি স্থানে চলিত বিবিধ খাদ্যের নামের সহিত বৈদিক নামের সাদৃশ্য দেখাইয়া মত প্রকাশ করিলেন। (প্রবন্ধ ১৩১৩ সালের পুণ্যে বাহির হইয়াছে)

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার লেখকের সরস ও মনোজ্ঞ প্রবন্ধের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বলিলেন, প্রবন্ধের প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক মূল্য ছাড়িয়া দিলেও আজিকার দিনে উহা স্বদেশী ভাবের উদ্দীপনায় সাহায্য করিবে। আমাদের এই দিন মনে করিতেই আনন্দ হয়। লেখক লুচি তরকারি চর্ব্বণদ্বারা তাহার রস আস্বাদনেব অবসর আমাদিগকে দিলেন না, কিন্তু তাঁহার প্রবন্ধের সাহিত্য রস কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিয়াছে।

শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল বলিলেন, সংস্কৃতে চুলিক শব্দ আছে, লুচি উহা হইতে আসিয়াছে কি?

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন, লেখক নানা বিষয়ক প্রত্নতত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন, আজ খাদ্য সামগ্রীর প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া তৃপ্ত করিলেন। রসগোল্লার প্রত্নতত্ত্ব বলিয়া রাখি; উহার বয়স ৫০।৬০ বৎসরের অধিক নহে। কৃত্তিবাসের জন্মস্থান ফুলিয়া গ্রামে রসগোল্লার জন্মভূমি, ঐ গ্রামের হারাধন ময়রা রাণাঘাটের পালচৌধুরী মহাশয়দের মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিত, তাঁহার শিশু কন্যা কাঁদিতেছিল। তাহাকে সান্ত্বনার জন্য উনানের উপর তৈয়ারী রসে ছেনা ফেলিয়া দেখিল উৎকৃষ্ট সামগ্রী তৈয়ার হইয়াছে। পালচৌধুরী জমিদারেরা উহার "রসগোল্লা" নাম করণ করেন।

সভাপতি মহাশয় লেখকের গবেষণার জন্য ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, নাম-সাদৃশ্য দেখিয়া ঋণ গ্রহণ অনুমান চলে না। আমাদের ও ইউরোপীয়দের এক পূর্ব্বপুরুষ; কাজেই নাম সাদৃশ্য আসিয়াছে। Max Muller-এর Biography of words গ্রন্থে ইহার বহুল উদাহরণ আছে। সম্ভবতঃ ঐ সকল খাদ্য প্রাচ্য পাশ্চাত্য উভয় আর্য্যের সাধারণ পৈতৃক সম্পত্তি।

৬। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু ৺রমেশচন্দ্র বসুর অকাল মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করিলেন। তিনি পরিষদের উদ্যোগী কর্ম্মঠ ও অকপট বন্ধু ছিলেন।

সম্পাদক বলিলেন, রমেশ বাবু নানা বিষয়ে সম্পাদককে সাহায্য করিতেন। এ বৎসর পত্রিকার জন্য তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস-ঘটিত নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। তিনি নীরবে কাজ করিতেন, তাঁহার কোন আড়ম্বর ছিল না। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে পরিষৎ বন্ধুহীন।

সভাপতি এই শোক-প্রকাশে যোগ দিয়া রমেশ বাবুর প্রাচীন ইতিহাসে অনুসন্ধান প্রিয়তার উল্লেখ করিয়া বলিলেন, তিনি সম্প্রতি কথকতার ইতিহাস অনুসন্ধান করিতেছিলেন। সে বিষয় তাঁহার প্রবন্ধও সম্পূর্ণ হইয়া থাকিবে। তাঁহার আত্মীয়বর্গের নিকট সমবেদনা জ্ঞাপন করা হউক। তৎপরে সভাপতিকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
সম্পাদক।

শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
সভাপতি।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন।

২৫শে কার্ত্তিক, (১৩১৩), ১১ নভেম্বর, (১৯০৬), রবিবার অপরাহ্ন ৫৷৷০ টা।

উপস্থিত ব্যক্তিগণ।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
" পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম,এ বি, এল,
" সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
" অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
" বাণীনাথ নন্দী
" বামাচরণ চট্টোপাধ্যায়
" নরেন্দ্রনাথ দত্ত
" শ্রীনাথ সেন (ভাষাতত্ত্ব)
" প্রভাসচন্দ্র মিত্র
" হরগোপাল দাস কুণ্ডু (রঙ্গপুর শাখা)
" নিশিকান্ত সেন
" জগৎপ্রসন্ন রায়
" জগদ্বন্ধু মোদক

কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
" হরিপদ চট্টোপাধ্যায়
" সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
" প্রভাতচন্দ্র দোষে দেওয়ান সাহেব
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" সতীন্দ্রসেবক নন্দী
" রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ
" হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত এম, এ
" রাজেন্দ্রলাল দত্ত
" তেজচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
" মুনীন্দ্রনাথ সাংখ্যতীর্থ
" মণীন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল
" সুরেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল
" মন্মথমোহন বসু } সহঃ সম্পাদক।
" ব্যোমকেশ মুস্তফী }

আলোচ্য বিষয়—

১। কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সভ্য-নির্ব্বাচন।

৩। পুস্তকোপহার দাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন।

৪। (ক) শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ মহাশয় "প্রতাপাদিত্যের কামানের কারখানা" এবং (খ) শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় "চীন পরিব্রাজকগণের বঙ্গবিবরণ" নামক প্রবন্ধ পাঠ।

৫। শোকপ্রকাশ ৺ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের মৃত্যু উপলক্ষে।

৬। বিবিধ।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
ডাঃ শ্রীসরসীলাল সরকার	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র সাহা চৌধুরী। বাঙ্গালা বাজার ঢাকা।
পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী	মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	২। " ব্রজকিশোর মুখোপাধ্যায় বিএ, হিন্দুস্কুলের এসিষ্টেণ্ট শিক্ষক।
		৩। " বিধুভূষণ সেনগুপ্ত এম এ, ঐ
		৪। " দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ৬৫ কলেজ ষ্ট্রীট।

৩। নিম্নলিখিত উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল ও উপহারদাতাগণকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল :—

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রদত্ত—

১। একটী প্রশ্ন ও তাহার উত্তর। ২। কার্য্য-বিবরণী বৌদ্ধ ধর্ম্মাঙ্কুর-সভা।
৩। কার্য্য-বিবরণী Calcutta Temperence and Federation Society.
৪। ,, Ram krishna Sevaram এবং ২০ খানি মাসিক পত্রিকা।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রদত্ত—

৫। Notices of Sanskrit Manuscript.
৬। Convocation address of Mr. Pedlar.
৭। Proceedings—Town hall meeting regarding Swami Vivakananda.
৮। Full and corrected report of a Town Hall meeting—Administration of the country.
৯। Do In honor of him Grey.
১০। The study of sanskrit. ১১। Three Essays—Rajendra ch. Sastri.
১২। Age of consent. ১৩। Biography of Sir Stuart Baley K. C. S. I.
১৪। Bengali Grammar—Yates & Wenger.
১৫। Easy step in Logic. ১৬। The Ramayan of Valmiki.
১৭। A Note on the Sanitary condition of Jessore and how to improve it.
১৮। হিন্দু ১৯। প্রতাপসিংহ ২০। ভারতবর্ষের ইতিহাস ২১। রামচন্দ্র-গীতাবলী
২২। বল্লাল চরিতম্ ২৩। বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা ২৪। ব্যাধি ও প্রতিকার।
২৫। বেদ-সংহিতা। ২৬। শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের নিয়মাবলী।
২৭। ব্রহ্মসঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন। ২৮। চণ্ডীদাস চরিত ২৯। আচার্য্যের উপদেশ।
৩০। দেরাদুন, মসুরী ও হরিদ্বার, ৩১। হেম জ্যোতিঃ।
এবং কতকগুলি মাসিক পত্র।

৩২।	Coloquies (পুরাতন ছাপা ১৮০১ খৃঃ)	শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
৩৩।	বেণু বীণা	ঐ
৩৪।	সোনার বাংলা	„ নিখিলনাথ রায় বি,এল
৩৫।	প্রতাপাদিত্য	ঐ
৩৬।	মহাব্রত	„ অতুলচন্দ্র মিত্র
৩৭।	মক্কা শরীফের ইতিহাস	„ সেখ আবদুল জব্বর
৩৮।	সদ্ভাব সঙ্গীত	„ হরগোপাল দাস কুণ্ডু (রঙ্গপুর)
৩৯।	প্রবাহ	„ অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ

৪। প্রবন্ধ (ক) শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। তিনি বলিলেন, কালীঘাট হইতে খাল পথে ১০ মাইল গেলে ধনগেছিয়ার খাল পাওয়া যায়। এই খাল স্থানে স্থানে মজিয়া গিয়াছে। ইহারই নিকট নটীর জাঙ্গাল নামে একটী ১২০ ফুট চওড়া রাস্তার ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায়। ইহারও স্থানে স্থানে কতকাংশ এখন ব্যবহৃত হয়। এই রাস্তা খুব দৃঢ়, ইট খাদরী করিয়া গাঁথা। পথের নিম্নে মাঝে মাঝে খিলান আছে। এই রাস্তা ধরিয়া গড়মুকুন্দপুরে যাওয়া যায়। গড়মুকুন্দপুর মহারাজ প্রতাপাদিত্যের যে একটী বিশেষ দৃঢ়তর দুর্গ ছিল তাহা শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয়ের নব প্রকাশিত প্রতাপাদিত্যে উল্লিখিত হইয়াছে। এই গড়ের নিকট কুশলী নামক গ্রাম; সেখানে এখনও ধান্য ক্ষেত্রের মধ্যে কৃষকেরা গোলাগুলি পাইয়া থাকে। এই স্থানটী সুন্দরবনের ১০১ নং লাটভুক্ত। গড়মুকুন্দপুর হইতে ৪।৫ মাইল উত্তরপশ্চিমে গেলে একটী বিস্তৃত স্থান পাওয়া যায়। এই স্থানে ইষ্টকালয়ে ভগ্নস্তূপাদি পাওয়া যায় এবং উহার এক স্থানে বহু পরিমাণে Iron slag-নামক ধাতব পদার্থ স্তূপীকৃত হইয়া আছে। চলিত কথায় উহাকে লৌহবিষ্ঠা (লোহার গু) বলে। উহাতে পিতলের অংশ অনেক বেশী। এরূপ পদার্থ কামান বন্দুক নির্ম্মাণেই বিস্তর আবশ্যক হয়। ইহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে। আমাদের অনুমান এই স্থানেই মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কামানের কারখানা ছিল। এই স্থানে কামান প্রস্তুত হইয়া ঐ চওড়া রাস্তা দিয়া গড়মুকুন্দপুরে নীত হইত। এই স্থানের বর্ত্তমান অধিকারী সাহিত্য পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় প্রতাপাদিত্যের রাজ্যের এই অংশের একখানি সুরঞ্জিত মানচিত্র প্রস্তুত করাইতেছেন। উহা প্রস্তুত হইলে পরিষদে এক দিন প্রদর্শিত হইবে।

প্রবন্ধ (খ) তৎপরে সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। ফাহিয়ান হইতে আরম্ভ করিয়া মাহুয়ান পর্য্যন্ত সমস্ত চীন-পরিব্রাজকদিগের ভ্রমণ বিবরণ হইতে বঙ্গদেশের বিবরণ যতটুকু পাওয়া যায়, তাহা তিনি তাঁহার প্রবন্ধে সংগ্রহ করিয়াছেন। পরিব্রাজকেরা এদেশীয় লোকের আচার ব্যবহার চরিত্র সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য লিখিয়াছেন, তাহাও সংগ্রহ করিয়াছেন। অমূল্য বাবু বলেন,

ঋক্‌সংহিতায় ও ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গশব্দের উল্লেখ আছে, কিন্তু সে বঙ্গ কি এবং কোথায়, তাহা বেদের বর্ণনাতে স্পষ্ট জানা যায় না।

শ্রীযুক্ত বামাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উভয় প্রবন্ধ শ্রবণের পর বলিলেন, প্রথম প্রবন্ধে বাঙ্গালীর গৌরব বর্দ্ধিত হইল। প্রতাপাদিত্যের জাহাজঘাটা, দুর্গ, নৌ-সেনা ইত্যাদি থাকার কথা ইতিপূর্ব্বে শুনা গিয়াছে, তৎসম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার যে কামানের কারখানা ছিল তাহা এই নূতন শোনা গেল। ভাগ্যক্রমে ইহার স্থান পর্য্যন্ত নির্ণীত হইয়া গেল। পঞ্চানন বাবুর এই আবিষ্কার ও অনুসন্ধানের জন্য তিনি আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। অমূল্য বাবুর প্রবন্ধ বিশেষ অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফল। তাঁহাদ্বারা বাঙ্গালার ইতিহাসের বিশেষ সহায়তা হইল। আমরা অনেক পুরাতন কথা জানিতে পারিলাম।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন, অমূল্যবাবু সেফিয়ালন শব্দে সঙ্ঘারাম করিয়াছেন, তাহা এই প্রথম শুনিলাম। ফাহিয়ান বাঙ্গালীদিগকে যে নিন্দা করিয়াছেন, তাহার মূল্য আছে। তিনি বাঙ্গালী নাবিকের সমুদ্রগামী পোতে পূর্ব্ব সমুদ্রে যাইতেছিলেন। যবদ্বীপ ছাড়াইয়া গিয়া বিষম ঝড় উঠে। বাঙ্গালী নাবিকেরা স্থির করিল, নৌকায় বৌদ্ধশ্রমণ আছে, তাই এই বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে। অতএব উহাকে জলে ফেলিয়া দাও। তারপর তাহা আর কার্য্যতঃ করা হয় নাই। মাহুয়ান এদেশে চীন প্রতাপ দেখাইবার জন্য আসিয়াছিলেন, কিন্তু তখন বাঙ্গালার সিংহাসনে জালালুদ্দিন বা যদু রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি মাহুয়ানের কার্য্যাবলীতে চীনের প্রতাপ বুঝিতে পারিয়া ভয় পাইয়াছিলেন কিনা তাহা ইতিহাসে কিছু লেখে না।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধ দুইটিই অতি সুন্দর হইয়াছে। প্রথমটির ভাষা বেশ সুললিত। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সভাপণ্ডিত আচার্য্য যিনি ছিলেন, তাঁহার নাম সত্যদেব সরস্বতী। তাঁহার রচিত কয়েকখানি গ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে ২।৩ খানি প্রতাপাদিত্যের অনুমতিক্রমে রচিত। ইনি আমাদের কুটুম্ব। পঞ্চানন বাবুর আবিষ্কার বাঙ্গালীর পক্ষে গৌরব-বর্দ্ধক সন্দেহ নাই। অমূল্য বাবু কৃতি পুরুষ, তাঁহার গবেষণা অসাধারণ। তিনি চীনপরিব্রাজকগণের লিখিত বঙ্গবিবরণ একত্র সংগ্রহ করিয়া বিশেষ উপকার করিয়াছেন। চীনপরিব্রাজকেরা সংস্কৃত বা দেশীয় শব্দগুলিকে চীন ভাষায় ভাষান্তরিত করিয়া লিখিতে গিয়া অনেকস্থলে গোল ঘটাইয়াছেন।

তৎপরে সর্ব্বসম্মতিক্রমে উভয় প্রবন্ধই পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে স্থির হইল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় বরাহনগরের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিলেন। শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, গরীব গৃহস্থের বাড়ীতে অধিক রাত্রিতে তিনি খালি গায়ে গিয়া বিনা দর্শনীতে রোগী দেখিয়া আসিতেন। এরূপ দু'একটা ঘটনা আমার

জানা আছে। ডাক্তার বাবুর শোকসন্তপ্ত পরিবারগণকে সমবেদনা জানাইয়া পত্র লেখা হউক।

তৎপরে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের কাশী হইতে "বেদান্তরত্ন" উপাধি লাভের জন্য আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, বাঙ্গালার কাশীবাসী পণ্ডিতগণ এতদ্দিন পরে একটী যোগ্য পাত্রে উপযুক্ত উপাধি দান করিয়া আপনাদের যথার্থ গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন।

পঞ্চানন বাবু বলিলেন,—হীরেন্দ্রবাবুর লেখা পড়িয়া অনেকে বেদান্ত ধর্ম্ম অবগত হইয়াছেন। অনেকে ইংরাজিতে অনুবাদ পড়িয়া বেদান্ত বুঝিতে চেষ্টা করেন। হীরেন্দ্র বাবু তাহা করেন না। তিনি রীতিমত ভাষ্য সূত্র টীকা টীপ্পনি নিজে পড়িয়া শিক্ষকের উপদেশ লইয়া নিজে হাতে দ্বার ঠেলিয়া বেদান্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহার গুণ আছে, কাশীস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী সে গুণের আদর করিয়াছেন জানিয়া আমরা সুখী হইলাম।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—হীরেন্দ্রবাবু বেদান্তসম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ রচনা ও পাঠ করিয়াছেন। তিনি হিন্দুদর্শন শাস্ত্র অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করেন। তাঁহার ঈশ্বরদত্ত প্রতিভা আছে। তিনি দর্শনের জটিলতত্ত্ব যেমন সহজ সরল ভাষায় প্রকাশ করিতে পারেন, এমন আর কেহ সহজে পারেন না। তাঁহার উপাধি প্রাপ্তিতে আমরা বিশেষ সুখী। উপাধিটিও তাঁহার জ্ঞানের উপযুক্ত হইয়াছে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী — সহঃ সম্পাদক

শ্রীশিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য — সভাপতি

সপ্তম মাসিক অধিবেশন।

৯ই অগ্রহায়ণ, ২৫শে নবেম্বর, রবিবার অপরাহ্ণ ৪॥০ ঘটিকা

উপস্থিত ব্যক্তিগণ।

শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বিএল, (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্ এ, বিএল,	শ্রীযুক্ত ডাঃ রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী,
„ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার,	„ চিত্তসুখ সান্যাল,
„ শ্রীনাথ সেন,	„ রাজকৃষ্ণ দত্ত,
„ কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী,	„ পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী,
„ অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ,	„ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, এম্ এ,
„ হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত, এম্ এ,	„ বাণীনাথ নন্দী,

শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়,	শ্রীযুক্ত রাজকুমার বেদতীর্থ,
„ হরগোপাল দাসকুণ্ডু, (রঙ্গপুর শাখা)	„ লালগোপাল মুখোপাধ্যায়,
„ বামাচরণ চট্টোপাধ্যায়,	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত,
„ ব্রজসুন্দর সান্ন্যাল, এম্, আর, এ, এস,	হরেন্দ্রকুমার মজুমদার,
„ নিশিকান্ত সেন,	করুণাভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়,
„ নরেন্দ্রনাথ দত্ত,	হেমচন্দ্র ঘোষ,
„ শিবচন্দ্র শীল,	প্রবোধগোপাল বসু,
„ উমেশচন্দ্র গুপ্ত কবিরত্ন,	অম্বিকাচরণ রক্ষিত,
„ বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় বি এল,	বঙ্কুবিহারী রায় কবিরাজ,
„ বিরজাকান্ত ঘোষ,	অমৃতগোপাল বসু,
„ অমূল্যচরণ সিংহ,	অনঙ্গনাথ বসু,
„ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্ এ, (সম্পাদক)
„ যোগেশচন্দ্র গুপ্ত,	ব্যোমকেশ মুস্তফী, মন্মথমোহন বসু বিএ, সহঃ সম্পাদক।
„ শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী,	

আলোচ্য বিষয়,—

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সভ্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃ-গণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ—(ক) শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন মহাশয়ের "বাঙ্গালা বিভক্তি (খ) কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের "আয়ুর্ব্বেদ ও বাঙ্গালা ভাষা" এবং (গ) শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের "পাণিনি" নামক প্রবন্ধ পঠিত হইবে। ৫। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বি এ সহকারী সম্পাদক মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পাঠ করিলে উহা গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য নিযুক্ত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীগঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১। শ্রীরামচন্দ্র চৌধুরী এম্ এ, বিএল্, এল, এল, বি, মুন্সেফ, হাট্রাস, আলিগড়।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	„	২। শ্রীসিদ্ধেশ্বর শর্ম্মা, কাশী।
„	„	৩। শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ, ১১৭-১ বহুবাজার ষ্ট্রীট।
শ্রীহেমচন্দ্র দাস গুপ্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৪। শ্রীতারকনাথ দাস, চাঁদসী।

৩। নিম্নলিখিত পুস্তক ও পুথিগুলির উপহারদাতাগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

(১) বাঙ্গালা অভিধান (হস্তলিখিত, প্রাচীন)—শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সাহা, (২) বর্দ্ধমান রাজবাটীর মূল সংস্কৃত হরিবংশ এবং মহাভারত, (৩) হিতৈষী, (৩ বৎসরের, সাপ্তাহিক) (৪) ধর্ম্ম-সমন্বয়, (৫) শব্দস্তোমমহার্ণব, (৬) নারদীয় পুরাণ, (৭) আয়ুর্ব্বেদ সঞ্জীবনী, (৮) পরমার্থজ্ঞানরত্নাকর, (৯) হিতোপদেশ, (লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার) (১০) বিলাপ, (অমৃতলাল বসু) (১১) বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না, (১৩) বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত নহে, (১৪) শ্রীহর্ষচরিত, (১৫) দার্জ্জিলিঙ্গের ইতিহাস, (১৬) বিধবা বিবাহ প্রতিবাদ, (১৭) ভাগবতগীতা, (১৮) তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা, (১৯) হেমপ্রভা, (২০) বৃত্রসংহার, (২১) ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান, (২২) কামন্দকীয় নীতিসার, (২৩) History of Indian Revolt. (২৪) History of Rome. (২৫) অষ্টাঙ্গহৃদয়, (বাগভট্ট) (২৬) কবিবচনসুধা (হিন্দী) (২৭) ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিবাদ শ্লোক-সংগ্রহ।—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, (২৮) A descriptive Catalogue of Sanskrit manuscripts nos 22 & 23—(২ খানি) সংস্কৃত কলেজ। (২৯) আকাহানতুয়া নাটক, (৩০) চিন্তামঞ্জরী, (৩১) প্রসাদ, (৩২) ত্রিবেণী, (৩৩) পুথি সন্ধান (৩৪) কবিতাবিলাস, (৩৫) এলোকেশী, (৩৬) নরমেধযজ্ঞ, (৩৭) লিপিদাস, (৩৮) আমার দেশ, (৩৯) ভারত উৎসব, (৪০) মুকুল, (৪১) পাণ্ডব বনবাস—শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ। (৪২) মুসলমান বৈষ্ণব কবি—শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্যাল।

পুথি

(১) কাশীদাসী মহাভারত—(আদি, সভা, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, স্বর্গপর্ব্ব)

(২) কর্ণমুনির পালা, দাতাকর্ণ, দানখণ্ড, অক্রূরাগমন, প্রহ্লাদ-চরিত, নারদ সংবাদ, সুদাম-চরিত, কলঙ্ক-ভঞ্জন, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, প্রার্থনা, নিগমগ্রন্থ, একাম্নপদ, নন্দবিদায়, মোহমুদ্গর উপাখ্যান, কৃষ্ণজন্মকথা।

(৩) প্রাচীন অঙ্ক পুস্তক, (৪) কৃত্তিবাসী রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড, (৫) কবিকঙ্কণ চণ্ডী, (৬) বত্রিশ সিংহাসন, (৭) বৈষ্ণব-বন্দনা, বিদ্যাসুন্দর, হরগৌরী ছন্দ।

শ্রীশশিভূষণ সিংহ বিএ,—পঞ্চযুগী

৪। প্রবন্ধ—অতঃপর শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার "আয়ুর্ব্বেদ ও বঙ্গভাষা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধকার বলেন, আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থসমূহ বহুলরূপে উপযুক্ত ব্যক্তিগণ দ্বারা অনুদিত হইলে বাঙ্গালা ভাষার বিশেষ পুষ্টি ও উন্নতি হইবে। নিদান, শারীর স্থান, চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয় হইতে পারিভাষিক শব্দ এত পাওয়া যাইবে যে তদ্দ্বারা অনেক অভাব দূর হইবে। উদ্ভিদ্‌বিদ্যা সম্বন্ধে ও রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক তথ্য ও অনেক তত্ত্ব প্রকাশিত হইবে। এতদ্ভিন্ন আজকাল বাঙ্গালী ডাক্তারেরা যেমন বাঙ্গালা ভাষায় স্ব স্ব অভিজ্ঞতার ফলগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া হোমিওপ্যাথির যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন, কবিরাজ মহাশয়েরা যদি সেইরূপে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার নিজ নিজ অভিজ্ঞতার

ফলগুলি বাঙ্গালা ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন তাহা হইলে দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় ঔষধ প্রয়োগের ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়া আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাপ্রণালীর শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে এবং এ সম্বন্ধে আবার কতকগুলি মৌলিক পুস্তক রচিত হইয়া যায়। ইহাদ্বারাও বাঙ্গালা সাহিত্যের উপকার হইতে পারে। সংস্কৃতে অত্যল্প জ্ঞান সংগ্রহ করিয়াই অনেক কবিরাজী ছাত্র ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। দুরূহ সংস্কৃত মূল গ্রন্থ অনেকস্থলে তাঁহাদের অবোধ্য থাকে। বাঙ্গালা ভাষায় ঐ সকল গ্রন্থের অনুবাদ হইয়া গেলে, ঐ সকল ব্যক্তিদ্বারা চিকিৎসা বিভ্রাটের কোন আশঙ্কা থাকে না।

তৎপরে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বিএ মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধের প্রশংসা করিয়া বলিলেন, এরূপ চেষ্টা যে হইতেছে না এরূপ নহে, তবে আরও দ্রুত এবং উপযুক্তরূপে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

তৎপরে শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন মহাশয় তাঁহার "বাঙলা বিভক্তি" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনে ক্রমশ প্রকাশিত হইতেছে। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী মহাশয় বলিলেন, সংস্কৃত গদ্য প্রাচীনকালে ছিল না বলা ঠিক নহে। যজুঃ শব্দ গদ্যব্যঞ্জক। পাণিনি গদ্য ভাষায় ব্যাকরণ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধলেখক বাঙ্গালা বিভক্তির প্রকৃতি নির্ণয়ে সুন্দরভাবে অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন। এ সকল তথ্য নির্ণয় করিতে হইলে সংস্কৃতশাস্ত্রবিদেরা কি নিয়মে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা বিশেষ ভাবে অনুধাবন করিলে তিনি বক্তব্য বিষয়ে আরও নূতন আলোক দেখিতে পাইতেন। জৈমিনি প্রভৃতির শাস্ত্রাদি অনুসন্ধান করিয়া লিখিলে প্রবন্ধ আরও সুন্দর হইত। পাণিনি কেবল আঠারটি বিভক্তি হইতে ১৮০টি ক্রিয়া বিভক্তি প্রস্তুত করিয়াছেন। শব্দ নিত্য, ব্যাকরণকার বুঝাইবার নিমিত্ত ধাতু প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া শব্দকে ভাঙ্গিয়া ফেলেন। শব্দের পর ব্যাকরণের ব্যবস্থা। পাণিনি যে শব্দকে নিষ্পন্ন করিতে গিয়া নিয়মের মধ্যে ফেলিতে পারেন নাই, সেখানে নিপাতনের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বি,এ মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধলেখক ইংরেজি ভাষাবিদের অস্ত্র লইয়া নামিয়াছেন। এদেশের প্রাচীন পণ্ডিতেরা ঠিক এ হিসাবে ভাষাতত্ত্বের বা শব্দের ইতিহাস আলোচনা করেন নাই। শব্দের বিকৃতি বা অপভ্রংশ স্বীকার করেন। কিন্তু কেন বিকৃতি হইল, তাহার আলোচনা কর্ত্তব্য। সংস্কৃত ভাঙ্গিয়া প্রাকৃত হইয়াছে কি প্রাকৃতের সংস্কারে সংস্কৃত হইয়াছে, ইহা বিচার্য্য। সম্ভ্রমের "ন" হয়ত দেবত্ববাচক ঁ চিহ্ন অর্থাৎ ঁ চন্দ্রবিন্দু হইতে আসিয়াছে। কেবল ক্রিয়াপদে নহে, "তিনি" "তাঁহারা" ইত্যাদি সর্ব্বনামেও ঐ "ন" দেখা যায়, ইহা বিচার্য্য।

শ্রীযুক্ত রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেন,—শ্রীনাথ সেন মহাশয় বাঙ্গালার ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেছেন। লেখকের সম্ভবতঃ ধারণা আছে, বাঙ্গালা, সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন। বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্য হইতে ভাষার ইতিহাস পাওয়া যাইবে। এ কালের

শব্দ দ্বারা হইবে না। "করিব" প্রাচীন সাহিত্যে "করিমু" ছিল। "মু" কবে "ব" হইল জানা আবশ্যক। এই "মু" এখনও প্রাদেশিক ভাষায় আছে। "রামকে" পদের "কে" কোথা হইতে আসিল তাহা এখনও স্থির হয় নাই। সম্ভবতঃ বাঙ্গালা ভাষা সর্ব্বত্র সংস্কৃত হইতে আসে নাই। শ্রীনাথ বাবুর পরিশ্রম ও উদ্ভাবনাশক্তিকে ধন্যবাদ।

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় বলিলেন,—আমার বিশ্বাস সংস্কৃতের বিকারেই বাঙ্গালা। বৈদিকযুগেই এই বিকার আরম্ভ হইয়াছে। একালের অনেক প্রচলিত শব্দ বেদে আছে যথা—"আগাহি"—এগো৩, "খেঙড়া" "খেদান" প্রভৃতি শব্দের মূলে সংস্কৃত শব্দ আছে। "কৃ" "নম" প্রভৃতি কাল্পনিক সৃষ্ট পদার্থ নয়, উহারাই মূল শব্দ।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন,—বাঙ্গালা বিভক্তিই অদ্যকার আলোচ্য বিষয়। প্রবন্ধলেখক আলোচনার সুবিধার জন্য কয়েকটি মাত্র বিভক্তির আলোচনা উপস্থিত করিয়াছেন, কিন্তু কোন সমালোচকই সে সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিলেন না। এক একটি বিভক্তি লইয়া আলোচনা করিলে সুবিধা হয়। কেবল শব্দসাদৃশ্য দেখিয়া মূলগত ঐক্য স্থির করা উচিত নহে। প্রথমে শব্দ সংগ্রহ কর্ত্তব্য। উহাদের তুলনা দ্বারা সম্পর্ক নির্ণয় করিতে হইবে। প্রমাণের জন্য শব্দের পরিবর্ত্তনের ধারাবাহিক ইতিহাস আবশ্যক। এই সমস্ত করিতে পারিলে তবে বিভক্তির তথ্য নির্ণীত হইবে।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বলিলেন,—বাঙ্গালাভাষার প্রাদেশিক আকারগুলি সংগ্রহ করা আবশ্যক। শ্রীনাথ সেন মহাশয় "করিব" শব্দের "ব" কারকে বিভক্তির রূপ ধরিয়া লইয়াছেন। কিন্তু সকল প্রদেশে ঐরূপ নাই। "পাইলাম" "পেলাম" "পালাম" "পাইনু" "পেনু" প্রভৃতি শব্দ কথোপকথনে বিভিন্ন প্রদেশে বর্ত্তমান। ইহার কোন কোনটি সাহিত্যেও গৃহীত হইয়াছে, অতএব এই সমস্তের তুলনা করিয়া রূপ স্থির করা উচিত। অনেকে হিন্দি, উড়িয়া, ফরাসী, উর্দ্দু প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় ভাষার শব্দের তুলনায় এবং আরও অনেকে ইউরোপীয় ভাষার তুলনায় বাঙলা শব্দের মূল স্থির করিতে লোলুপ। আমার বোধ হয় সমগ্র বাঙ্গালাদেশের বাঙলাভাষী ২২শটি জেলার প্রাদেশিক ভাষার শব্দ ও বিভক্তির সম্পর্ক নির্ণয় প্রথমে করা আবশ্যক। আর সেইরূপ পূর্ব্ব ও পশ্চিমে উত্তর ও দক্ষিণের ভাষার আলোচনায় যে মূল নির্ণীত হইবে, তাহাই সম্ভবতঃ খাঁটিরূপ হইবে। তৎপরে অপরাপর ভারতীয় ভাষার সম্পর্কে বাঙলাভাষায় যে সকল বিদেশীয় শব্দ প্রবেশ করিয়াছে বা তৎ-সংক্রান্ত যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে, তাহা আলোচনা করা কর্ত্তব্য। তৎপরে প্রবন্ধ-পাঠক শ্রীনাথ সেন মহাশয় বলিলেন, আমার বিশ্বাস সংস্কৃতভাষাবিৎ একদল লোক অনার্য্য দলন করিতে করিতে পশ্চিম হইতে ক্রমশঃ বঙ্গে উপস্থিত হন। স্থানীয় ভাষার সম্পর্কে ও স্থানীয় প্রভাবে তাঁহাদের ভাষা ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া বাঙলায় দাঁড়াইয়াছে। একদিক্ হইতে টানিতে টানিতে বাড়িয়া গিয়াছে। এখন ইহার যে আকার সাহিত্যগ্রাহ্য হইয়াছে, আমি তাহা হইতেই প্রকৃতি ও বিভক্তিনির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছি।

অতঃপর শ্রীযুক্ত সহকারি-সম্পাদক মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বলিলেন, এরূপ গুরুতর বিষয় লইয়া যেরূপ ধৈর্য্য সহকারে আলোচনা হইল ইহাই আমাদের ভরসার কথা। ভাষা সম্বন্ধে প্রবন্ধ শুনিতে যে এতটা আগ্রহ আছে তাহা জানিতাম না। শব্দতত্ত্বের আলোচনাই একে নীরস ও কঠিন, তায় ইহা আবার তাহার একাংশ বিভক্তি সম্বন্ধে, ইহা যে কত দুরূহ তাহা বলা যায় না। যাহা হউক প্রবন্ধকার যেরূপ দীর্ঘ গবেষণায় বহুপরিশ্রমে এই বহুচিন্তার বিষয়ীভূত প্রবন্ধ আমাদের শুনাইলেন ইহার জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীমন্মথমোহন বসু
সহঃ সম্পাদক

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
সভাপতি

অষ্টম মাসিক অধিবেশন।

২৩শে অগ্রহায়ণ, ৯ ডিসেম্বর রবিবার অপরাহ্ণ ৫টা

উপস্থিত ব্যক্তিগণ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্‌এ (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই,
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্‌এ, বি এল,
রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্‌এ, বিএল,
চারুচন্দ্র মিত্র এম্‌এ,
যতীশচন্দ্র বসু, এম্‌এ,
হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত এম্‌এ,
অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল,
মহেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্‌এ, বিএল,
হৃদয়ানন্দ দত্ত এম্‌এ,
কিশোরীমোহন চৌধুরী এম্‌এ,
মনীন্দ্রকুমার দত্ত, এম্‌এ,
বাণীনাথ নন্দী,
নৃত্যগোপাল বিশ্বাস,
নন্দলাল ঘোষাল,
ডাঃ অম্বিকাচরণ মজুমদার, এল, এম্, এস্,

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়,
চিত্তসুখ সান্যাল,
নিশিকান্ত সেন,
রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী,
সতীন্দ্রসেবক নন্দী,
হরগোপাল দাসকুণ্ডু,
যোগেন্দ্রনাথ মিত্র,
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়,
শিবচন্দ্র শীল,
অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ,
চারুচন্দ্র বসু,
সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়,
জগবন্ধু মোদক,
পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী,
মন্মথমোহন বসু, বি, এ, } সহঃ সম্পাদক
ব্যোমকেশ মুস্তফী, }

আলোচ্য বিষয়,—

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ-পাঠ, ২। সভ্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদজ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পাণিনি নামক প্রবন্ধ পঠিত হইবে, ৫। বিবিধ।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বিএ মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলে উহা গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য-নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১। শ্রীযতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিএ সাবরেজিষ্টার দুবরাজপুর।
	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	২। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫।১।১ হৃদয়কৃষ্ণ বানার্জ্জির লেন, হাওড়া।
	ঐ	৩। শ্রীঅমরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য-চৌধুরী, মুক্তাগাছা ময়মনসিংহ।
শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৪। শ্রীকেশবচন্দ্র দাস, ৫নং জরীফ্‌স্ লেন।
ঐ	ঐ	৫। শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্‌এ, ৩৮।২ শিবনারায়ণ দাসের লেন।
শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীশরচ্চন্দ্র মজুমদার	৬। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু, উকীল।

৩। নিম্নলিখিত উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতাগণকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী—

(১) বিধবাবেদননিষেধক, (২) রাজা প্রতাপাদিত্যের চরিত (হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কার) (৩) মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জীবনচরিত, (৪) ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর প্রশ্ন।

৪। অতঃপর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার "পাণিনি" প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে মহাশয়ের প্রেরিত "পাণিনি" সম্বন্ধে একখানি পত্র পঠিত হইল। পূর্ণবাবুর পত্রে কবি পাণিনির কতকগুলি কবিতা ছিল; ঐ সকল কবিতা এসিয়াটিক্ সোসাইটীর পত্রিকায় প্রকাশিত, এবং উক্ত কবিতাগুলি সম্বন্ধে অমূল্য বাবুও তাঁহার প্রবন্ধে আলোচনা করিয়া যাওয়ায় উহার সম্বন্ধে অধিক আলোচনা আবশ্যক হইল না।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় জানাইলেন, যে পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী মহাশয়

সম্প্রতি মহাভাষ্যের যে বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন, উহা শীঘ্রই পুস্তকাকারে ছাপা হইবে। ঐ পুস্তকের ভূমিকারূপে অমূল্যবাবুর এই প্রবন্ধ মুদ্রিত হইবে। সামাধ্যায়ী মহাশয়ের ইচ্ছা মুদ্রণের পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে ভালরূপ আলোচনা হইলে পাণিনির ঐতিহাসিকতত্ত্ব সাধারণের নিকট বিশদভাবে প্রকাশিত হইতে পারে। অতএব এ সম্বন্ধে উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলী আলোচনা করিলে বড়ই সুখের হয়।

রায় শরচ্চন্দ্র দাস সি, আই,ই, বাহাদুর বলিলেন,—তিব্বতীয় গ্রন্থ হইতে পাণিনি সম্বন্ধে যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারি, তাহা পরে প্রবন্ধকারের নিকট পাঠাইয়া দিব। অমূল্যবাবুর প্রবন্ধ অতীব সুন্দর গবেষণাপূর্ণ হইয়াছে। পরিষদে এইরূপ প্রবন্ধই চাই। প্রবন্ধকার ইয়ুরোপীয় ও নিজের মত লিখিয়াছেন ইহাই আবশ্যক। প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেকে প্রবন্ধ লেখেন, তাহাতে ইউরোপীয় মতের সমালোচনা থাকে, অনেক স্থলে মীমাংসা থাকে না। সে সকল প্রবন্ধ অপেক্ষা যাহাতে অপরের মত—সমালোচনার সহিত লেখকের নিজের মত প্রকটিত হয় সেই সকল প্রবন্ধই সমধিক আদরণীয়। আমাদের এখন এ সকল বিষয়ে মৌলিকত্ব দেখান আবশ্যক। প্রবন্ধ-লেখককে আমার অশেষ ধন্যবাদ।

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু বলিলেন,—পাণিনি সম্বন্ধে আমার জ্ঞান সামান্য। অমূল্যবাবু পাণিনি সম্বন্ধে এদেশীয় ও বিদেশীয় যাবতীয় মতের সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু আমরা তদতিরিক্ত নূতন কিছু চাই। ৬০ বৎসর ধরিয়া পাণিনি বুদ্ধের আগে কি পরে এই তর্কই চলিয়া আসিতেছে। গোল্ডষ্টুকার ও মুলার পাণিনিকে বুদ্ধের আগে বলেন। সভাপতি মহাশয় পালিব্যাকরণের আলোচনাকালে সসঙ্কোচে পাণিনিকে বুদ্ধের আগে বলিয়াছেন। কতকগুলি শব্দ সহায়ে অনেকে পাণিনিকে বুদ্ধের পর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—নির্ব্বাণ, শ্রমণ প্রভৃতি। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে বর্ণিত আছে শ্রমণেরা বেদমন্ত্রের উপাসক ও উপদেষ্টা ছিলেন। রামায়ণে দশরথ কর্ত্তৃক শ্রমণভোজনের কথা আছে। শবরী শ্রমণা রামায়ণের এক অপূর্ব্ব চিত্র ইত্যাদি। আমার এত কথা বলিবার উদ্দেশ্য অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিককালের আলোচনাতেও এই একটা বিষয়ের মীমাংসা হইল না। এইরূপ নিষ্ফল আলোচনায় ফল পাওয়া যায় না। যাহা হউক অমূল্যবাবুর গবেষণার জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ করিতেছি।

পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী বলেন,—গুটিকতক শব্দ লইয়া সময় নিরূপণের চেষ্টা সকল সময়ে সুফল প্রসব করে না। জৈমিনি যে ভাবে শব্দ বিচার করিয়াছেন তাহাতে শব্দ দ্বারা সময়াদি নিরূপণে আমাদের ন্যায় লোকের ঘোর সন্দেহ হয়। আমার পাণিনির সময় বা স্থানের নিরূপণ করিতে একবারেই সাহস কুলায় না। প্রক্ষিপ্ত নির্ণয় ব্যাপারটা অনেক স্থলেই আমরা আমাদের ইচ্ছানুকূল করিয়া থাকি। পাণিনির সূত্রগুলি পড়িয়া পাণিনির স্থান কাল নির্ণীত হইতে পারে এমন কোনও অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত আমি পাণিনি পড়িয়া পাই নাই। তবে এইটুকু ঠিক যে ক্যাত্যায়ন পাণিনির বহু পরবর্ত্তী, কারণ তিনি তাঁহার

বার্ত্তিকে পাণিনিসূত্রের বিস্তার করিয়াছেন। ভাষ্যকার পতঞ্জলি আবার বার্ত্তিককার কাত্যায়নের পরবর্ত্তী কারণ পতঞ্জলি কাত্যায়নের কতকগুলি বার্ত্তিকে দোষারোপ করিয়াছেন। যোগসূত্রকার পতঞ্জলি ও মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি একই ব্যক্তি, ভগবান ব্যাস যোগসূত্রের ভাষ্য করিয়াছেন। তিনি দ্বাপর যুগের লোক, অতএব স্থির করুন পাণিনি কতকালের লোক।

শ্রীযুক্ত রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন,—অমূল্যবাবুর প্রবন্ধে গবেষণা ও পরিশ্রম বড় বেশী, এত খাটিয়া একটা প্রবন্ধ লিখিতে সাধারণতঃ কাহাকেও দেখা যায় না। কিন্তু ইহাতেও হয় নাই, আরও খাটুনি চাই। বিভিন্নতর প্রমাণ আভ্যন্তরীণ আলোচনা আরও বেশী চাই, তবে পাণিনিতথ্য নির্ণীত হইবে। সিদ্ধ শব্দের দ্বারা বিচার করিতে গেলে অতি ধীর ভাবে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। ত্রিমুনির মধ্যে পার্থক্য বড় বেশী দিনের নয়। পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি খুব বেশী দিনের ব্যবধানের লোক নহেন। তাঁহারা খৃষ্টের পূর্ব্ববর্ত্তী ইহা নিশ্চিত, তবে বুদ্ধের পরবর্ত্তী কি পূর্ব্ববর্ত্তী তাহার সঠিক মীমাংসা হওয়া দুরাশা মাত্র।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন,অমূল্য বাবুকে অগণ্য ধন্যবাদ। তাঁহার পরিশ্রম অধ্যবসায় ও গবেষণা। এতদিন পর্য্যন্ত যেখানে যাহা কিছু আলোচনা হইয়াছে, অমূল্য বাবু স্বীয় প্রবন্ধে প্রায় তাহার সকল গুলিরই আলোচনা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে বৈদেশিক মত এত বিভিন্ন প্রকার আছে যে তদ্দ্বারা আমরা বিভ্রান্ত হইয়া পড়ি। কিছুই স্থির করিতে পারি না। তিব্বতীয় টোঙ্গুরগ্রন্থমধ্যে পাণিনি ব্যাকরণ ও চন্দ্র ব্যাকরণ উল্লেখ আছে। উহা দ্বারা তিব্বতীয়গণের সংস্কৃতানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। উহাতে পাণিনির সময় সম্বন্ধে কিছুই নাই। বৈয়াকরণ পাণিনি ও কবি পাণিনির কথা প্রবন্ধকার বলিয়াছেন, তদ্ভিন্ন উক্ত পাণিনি দর্শনকার ছিলেন। দর্শনের মধ্যে পাণিনীয় দর্শন নামে এক দর্শনের উল্লেখ দেখা যায়। সংস্কৃত ভাষাও অর্থাৎ বর্ত্তমান কালে আমরা যে আকারে সংস্কৃত ভাষা দেখিতেছি, প্রবাদ এই লৌকিক সংস্কৃত ভাষা কবি বাল্মীকি হইতে সৃষ্টি, বাল্মীক প্রথম কবি বটেন। কিন্তু লৌকিক ভাষার আদি স্রষ্টাই পাণিনি। বৈদিক ও লৌকিক এই বিভাগকর্ত্তাই পাণিনি। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন, বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যাদি বৈদিক ভাষায় রচিত আর পরবর্ত্তীগুলি লৌকিক ভাষায় লিখিত। পাণিনি অপেক্ষা প্রাচীনতম ব্যাকরণ আর নাই। পাণিনির পূর্ব্বে ঐন্দ্র ব্যাকরণ নামেই হউক আর যে কোন নামেই হউক এক প্রকার বিস্তৃত ব্যাকরণ যে ছিল, তাহার প্রমাণ পাণিনিতেই পাওয়া যায়। তবে তাহার অস্তিত্ব এখনও দেখা যায় নাই। কলাপ পাণিনির পরে রচিত কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে বোধ হয়, কলাপ পূর্ব্ব ব্যাকরণের মতে রচিত। পাণিনির সময় সম্বন্ধে বলা যায়—এক উপবর্ষ পাণিনির গুরু ছিলেন, আর এক উপবর্ষ ধননন্দের মন্ত্রী ছিলেন। দর্শনশাস্ত্রের ভাষ্যে শাব্দিক উপবর্ষের মতাদি দেখিতে পাওয়া যায়। শবরস্বামীর গ্রন্থে উপবর্ষের মতাদি উদ্ধৃত। এখন পাণিনি যদি নন্দমন্ত্রী

উপবর্ষের শিষ্য হন, তাহা হইলে তিনি খৃষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর লোক হন। প্রবাদেও কিছু সত্য আছে। শবরস্বামী বলেন 'নেম' শব্দের অর্থ অর্দ্ধ, 'পিক' অর্থ কোকিল, তামরস অর্থে পদ্ম, সুতরাং এগুলি বৈদেশিক শব্দ। যাহা হউক পাণিনি সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক। এপর্য্যন্ত যে সকল সাক্ষ্য সংগৃহীত হইয়াছে তদ্দ্বারা পাণিনিকে নিঃসন্দেহে বুদ্ধপূর্ব্ব লোক বলা যায় না। অমূল্য বাবুর প্রবন্ধ অতি উপাদেয় হইয়াছে, আমি তজ্জন্য পুনরায় তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বসু
সম্পাদক	সভাপতি

নবম মাসিক অধিবেশন

৪ঠা ফাল্গুন, ১৬ ফেব্রুয়ারী শনিবার অপরাহ্ণ ৫টা

উপস্থিত ব্যক্তিগণ

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, বি, এ সভাপতি

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ

শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী	শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ রক্ষিত
" হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত এম, এ	" পঞ্চানন ঘোষাল এম, এ
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি এল,	" বিহারীলাল সরকার
" অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ	" উপেন্দ্র নারায়ণ পাল
" রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়	" অতুলকৃষ্ণ বসাক
" ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ	" জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়
কবিঃ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন বিদ্যাভূষণ এম, এ	" প্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত
শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী	" শশিভূষণ সেন
" সুরেশচন্দ্র সেন এম, এ,	" অবিনাশচন্দ্র সরকার
" নরেন্দ্রনাথ ঘোষ	" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সম্পাদক
" উপেন্দ্রনাথ ঘোষ	" ব্যোমকেশ মুস্তফী } সহঃ সম্পাদক।
" সত্যচরণ পাল বি এ,	" মন্মথমোহন বসু }

আলোচ্য বিষয়—

১। গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পাঠ ২। সভ্যনির্ব্বাচন ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদজ্ঞাপন ৪। প্রবন্ধ (ক) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম,

এ মহাশয়ের "তীব্বতীয় গ্রন্থে উল্লিখিত সংস্কৃত গ্রন্থকার কায়স্থ চাকদাস" এবং (খ) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "ভারতে শকাধিকার কাল এবং কনিষ্ক" নামক প্রবন্ধ পঠিত হইবে। ৫। ৺রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ। ৬। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু বি, এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী সহকারী সম্পাদক মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পাঠ করিলে উহা গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীঅনঙ্গমোহন লাহিড়ী	শ্রীমন্মথমোহন বসু বি এ,	১। শ্রীসতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিএল ১ ঈশ্বর মিলের লেন।
শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	ঐ	২। রাধাকুমদ মুখোপাধ্যায় এম, এ, ১৯১।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট।
শ্রীঅম্বিকাচরণ শাস্ত্রী	শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী	৩। শ্রীঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কান্তিবাবুর বাসা জয়পুর।
ঐ	ঐ	৪। শ্রীআশুতোষ গুপ্ত, কোয়ালা দিল্লী
ঐ	ঐ	৫। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন ঠাণ্ডি শরক কাণপুর।
শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৬। শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় এম,এ হেডমাষ্টার শান্তিপুর।
ঐ	ঐ	৭। শ্রীমুনীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কৃষ্ণনগর
মুন্সী আবদুল করিম্	শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ	৮। শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত সাধনাকুণ্ড।
শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	৯। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বাকচী, রাজসাহী।
শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	১০। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সিংহ, ১৪৮ বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট।
শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	ঐ	১১। শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় ৭২।২ বাগবাজার ষ্ট্রীট।
শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	ঐ	১২। শ্রীপরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি, এল, মুন্সেফ, দুবরাজপুর বীরভূম।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	ঐ	১৩। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১ নং পিয়ারীমোহন পালের লেন।
ঐ	ঐ	১৪। শ্রীবলরামচন্দ্র গোস্বামী, শান্তিপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	১৫। শ্রীদুর্গান[illegible] [illegible]য় ৫৫ শিবুঠাকুর লেন
ঐ	ঐ	১৬। শ্রী [illegible]নাথ চট্টোপাধ্যায়,
ঐ	ঐ	১৭। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মিত্র ত্রিলোচনপুর,
ঐ	ঐ	১৮। মহম্মদ ওয়াজুদ্দিন্ ৩২ কাইলিয়ট হোটেল, কলিকাতা।
ঐ	ঐ	১৯। শ্রীদ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী এম এ, বি এল, ৭২ রসা রোড।
ঐ	ঐ	২০। শ্রীনীরদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ফরিদপুর নড়িয়া।
ঐ	ঐ	২১। শ্রীচিন্তাহরণ ঘটক, নড়িয়া, ফরিদপুর
ঐ	ঐ	২২। শ্রীহরিমোহন দাস, ৩৭ কালীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেন, দক্ষিণব্যাটরা, হাওড়া।
ঐ	ঐ	২৩। শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্র এম, এ, বি এল, পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর।
ঐ	ঐ	২৪। মাননীয় শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী, এম্, এ, ব্যারিষ্টার।
ঐ	ঐ	২৫। শ্রীপার্ব্বতীশঙ্কর রায়চৌধুরী, ৪৪ ইউরোপীয়ান এসাইলাম লেন।
ঐ	ঐ	২৬। শ্রীহেমেন্দ্রকুমার বসু, H. Bose. ৫ শিবনারায়ণ দাসের লেন।
ঐ	ঐ	২৭। শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র, "সঞ্জীবনী"
ঐ	ঐ	২৮। শ্রীপ্রভাতকুসুম রায়চৌধুরী, ব্যারিষ্টার, ২১০।৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্।
ঐ	ঐ	২৯। রাজা পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায়, এম এ, বি এল, উত্তরপাড়া।
ঐ	ঐ	৩০। শ্রীপ্রসাদদাস গঙ্গোপাধ্যায়, ৩০ হাজরা রোড, কালীঘাট।
ঐ	ঐ	৩১। শ্রীনলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়, ১নং দুর্গাচরণ পিতুড়ীর লেন, বহুবাজার।
ঐ	ঐ	৩২। অনুকূলচন্দ্র গুহ, ১১।১ রাজেন্দ্রনাথ ঘোষের লেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৩৩। ডাঃ বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র, এম বি, মেও হাসপাতাল, পাথুরিয়াঘাটা
ঐ	ঐ	৩৪। পণ্ডিত ডি গোপাল চালু, আয়ুর্ব্বেদিক ল্যাবরেটারী, মান্দ্রাজ
ঐ	ঐ	৩৫। শ্রীকালাচাঁদ সেন, পানিহাটি,
ঐ	ঐ	৩৬। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু, জামালপুর।
ঐ	ঐ	৩৭। শ্রীকুলভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫৮ শাঁখারীটোলা লেন, কলিকাতা
ঐ	ঐ	৩৮। শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, শিবপুর, হাওড়া।
ঐ	ঐ	৩৯। শ্রীসতীপ্রসাদ সেনগুপ্ত, সুপারিঃ মেলসার্ব্বিস, ঢাকা।
ঐ	ঐ	৪০। শ্রীমৃগাঙ্কনাথ রায়, মেদিনীপুর।
ঐ	ঐ	৪১। শ্রীবিপিনবিহারী চন্দ্র, বীরভূম।
ঐ	ঐ	৪২। শ্রীশশিভূষণ সরকার, উকীল কালনা
ঐ	ঐ	৪৩। শ্রীবৈকুণ্ঠচন্দ্র রায় এম এ, দিল্লী।
ঐ	ঐ	৪৪। শ্রীগঙ্গাদাস রায় বি এল, বরিশাল।
ঐ	ঐ	৪৫। শ্রীরাখালদাস মজুমদার, ৭৩ গড়পার রোড।
ঐ	ঐ	৪৬। শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় উকীল, কটক।
ঐ	ঐ	৪৭। শ্রীসুরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় নদীয়া
ঐ	ঐ	৪৮। শ্রীবগলাচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বর্দ্ধমান।
ঐ	ঐ	৪৯। শ্রীরজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য, কলিকাতা
ঐ	ঐ	৫০। শ্রীসারদাকান্ত সেন, ঢাকা।
ঐ	ঐ	৫১। শ্রীঅতুলচন্দ্র ভাদুরী, ময়মনসিংহ।
ঐ	ঐ	৫২। শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু ১৪।১ জেলিয়াটোলা
ঐ	ঐ	৫৩। শ্রীউমেশচন্দ্র চৌধুরী, ১৬ রঘুনাথ চাটুর্য্যের গলি।
ঐ	ঐ	৫৪। শ্রীতুলসীন্দ্রনাথ মিত্র ৬ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ঐ	ঐ	৫৫। শ্রীরামচরণ ভট্টাচার্য্য, বলাই [illegible],